উদ্বাস্তু

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে; ফলে সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশকে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে, আজও দিতে হচ্ছে। বিড়ম্বিত ছিন্নমূল এই মানুষগুলি 'উদ্বাস্তু' নামে আখ্যাত হয়েছে। বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত যে বিপুল উদ্বাস্তুর স্রোত পশ্চিম বাঙলাকে প্লাবিত ও সমস্যাসঙ্কুল করে তোলে, সত্য বলতে কি, আজও তার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি। তবু এই জাতীয়-বিপর্যয়ের মুখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যে পুনর্বাসন ও সমাধানের প্রচেষ্টা হয়েছে, তাও প্রণিধানযোগ্য। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উদার হৃদয়ের অধিকারী বলে সুবিদিত। প্রথম থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মুখ্য-সচিব ও মহাধ্যক্ষ হিসাবে। তাই তাঁর স্মৃতিকথা সম্বলিত এই বইটিতে একাধারে যেমন অগণিত মানুষের দুর্ভোগের ইতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তেমনি অসীম মনোবল নিয়ে সমস্যা সমাধানের যে দুর্জয় প্রচেষ্টা হয়েছিল, তারও ইতিহাস বহুলাংশে রচিত হয়েছে। এই বই রচনার জন্য বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন, আশা করি। পরবর্তীকালে এই বই বাঙালীর ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা

ও

উদ্বাস্তু সমস্যার শহিদ

৺পূর্ণচন্দ্র দাসের উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভূমিকা

পুরাণে গল্প আছে সাগর মন্থন করে একভাগ যেমন অমৃত পাওয়া গিয়েছিল তেমন একভাগ গরলও উঠেছিল। বিশ্বের কল্যাণের জন্য মহাদেব তা কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে যেমন পরাধীনতা-শৃঙ্খল অপসারিত হয়েছিল, তেমন বাঙালীর ভাগ্যে জুটেছিল দেশের অঙ্গবিচ্ছেদ। তার ফলে যে অগণিত নরনারী বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তাদের দুর্দশা পশ্চিম বাঙলার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জীবনে বিষের মতই ক্রিয়া করেছে। বাঙলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে অধ্যায়ে ব্যাপক হারে বাস্তুত্যাগ ঘটেছিল, তা পশ্চিম বাঙলার এক অতি দুঃসময়ের কাহিনী।

সেই একান্ত দুর্দশার দিনে প্রশাসনিক কর্মচারী হিসাবে আমি পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে আমি দীর্ঘকাল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের বিভাগীয় সচিব এবং মহাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলাম। সেই সময়ে আমি এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম যা কোন বিশেষ মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার সঙ্গে সহকর্মীদের নিয়ে যে অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল তা যেমন একদিকে একান্ত দুঃখময়, তেমনি অপরদিকে আর্তসেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্তে নানাক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল।

পশ্চিম বাঙলার ইতিহাসের সেই একান্ত করুণ অথচ রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ইতিহাস ভবিষ্যতে কোনদিন লিপিবদ্ধ হবে কিনা জানি না। সরকারী দপ্তরে তার যে প্রমাণপত্র আছে তা হয়ত একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্বন্ধে বিবরণ উত্তরকালের জন্যে রক্ষিত হওয়া উচিত—এই রকম একটা বোধ অনেকের মনে জেগেছে। যাঁদের মনে এই প্রয়োজনীয়তা-বোধ জেগেছে তাঁদের কেহ কেহ আমার স্মৃতিকে ভিত্তি করে একটি বিবরণ লিখতে আমায় বারবার অনুরোধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উদ্বাস্তু-নেতা যেমন আছেন, তেমন সমাজ-সেবকও আছেন। এই প্রসঙ্গে দু'জনের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের একজন হলেন শ্রীনেপালচন্দ্র গুহ এবং অপরজন হলেন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। তাঁরা বারবার এবিষয়ে আমাকে তাগিদ দিয়েছেন।

বাহির হতে এই তাগিদ আমার মনকে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণের সপক্ষে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উদ্যোগী করেছে। একটি অনুকূল পরিবেশও এবিষয়ে সাহায্য করেছে। সরকারী কর্ম হতে অবসর

গ্রহণের পর এই কাজে হাত দেবার অবকাশও আমার জুটেছে। যে প্রেরণা এবিষয়ে আমার মধ্যে সব থেকে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তা হল এই যে, আমার গুরুদায়িত্ব পালন করতে এমন কয়েকজন উদ্বাস্তু-দরদী দেশনেতার পরিচয় পেয়েছিলাম যাঁদের কথা জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এবং সর্বোপরি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের হৃদয় উদ্বাস্তুদের দুর্দশায় কতখানি ক্লেশবোধ করেছিল এবং তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য জনসাধারণের অগোচরে তাঁরা কতখানি উদ্বেগ প্রকাশ করতেন তা আমাদের জানা দরকার। বর্তমান বিবরণ বোধহয় এই বিষয়ে খানিক পরিমাণ আলোকপাত করতে পারবে। এইখানেই তার বিশেষ সার্থকতা।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উদ্বাস্তু সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

আমার পুরাতন প্রকাশক 'সাহিত্য সংসদ' এই গ্রন্থ প্রকাশনের ভার নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের আনুকূল্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বাস্তু

এক

(১)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস। সারা ভারত জুড়ে একটা থমথমে ভাব। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে চলে যাবে। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনার ফলে এও ঠিক হয়ে গেছে যে আগামী কালের ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হবে। তার যে অংশটি হবে মুসলমান-প্রধান তার নাম হবে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং অপরটি হবে ভারত রাষ্ট্র। সেই সম্পর্কে এও ঠিক হয়ে গেছে যে ভারতে যে দু'টি প্রদেশ মুসলমান-প্রধান তারাও মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মুসলমান-প্রধান অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অন্য অংশ ভারতের সহিত যুক্ত হবে। বাঙলা প্রদেশ তাদের অন্যতম। বাঙলার কিভাবে বিভাগ হবে তা চূড়ান্তভাবে ঠিক হবার আগেই বিভিন্ন জেলাগুলি কোন্ রাষ্ট্রে পড়বে তারও একটা অস্থায়ী বাটওয়ারা হয়ে গেছে। ১৫ই আগস্ট তারিখে এই দু'টি নূতন রাষ্ট্র যে জন্মগ্রহণ করবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। নূতন রাষ্ট্রকে শাসনভার অর্পণের জন্য যে অনুষ্ঠান হবে তারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে যে নূতন জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান হবে তারও পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

আমি তখন অবিভক্ত বাঙলা সরকারের জেলাজজের কাজে নিযুক্ত। উত্তর-বঙ্গের দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং এই তিনটি জেলা জুড়ে আমার জজিয়তী। জজের অপিস অবস্থিত দিনাজপুর শহরে, কিন্তু তাকে পালা করে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ কোর্ট করে আসতে হত।

বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে দু'টি বিভিন্ন প্রদেশ গঠিত হবার কথা। একটির নাম হবে পুর্ব পাকিস্তান এবং অপরটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। যেহেতু আমি মুসলমান নই, সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আমার আত্মীয়স্বজন সেখানেই বাস করেন, সংস্কৃতিগত আকর্ষণও আমার সেই দিকেই। এদিকে দিনাজপুর জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তা অস্থায়ীভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে ঠিক হয়ে গেছে। দিনাজপুরের যিনি কালেকটর তিনি জাতিতে মুসলমান। ১৫ই আগস্ট সেখানে

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হবে এবং তাকে অভিবাদন জানিয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা উৎসব পালিত হবে। স্বভাবতই তিনি উৎসাহভরে তার সমস্ত ব্যবস্থা করছেন।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কেবল একটি জেলার তত্ত্বাবধানে যদি থাকতাম তাহলে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না। আমার জেলা যদি পাকিস্তানে পড়ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে এমন স্থানে বদলী করবার ব্যবস্থা করতেন যেখানে স্বাধীনতা দিবসে আমি ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে পারতাম। আর যদি সে জেলা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় পড়ত, আমার সেখান থেকেই সে আনন্দ ভোগ করবার সৌভাগ্য হত। এই অবস্থায় এই অনেক প্রত্যাশিত শুভদিনটিতে নিজস্ব জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে পারব না—এই আশঙ্কাই আমার মনে বেদনা সঞ্চার করছিল। এমন শুভদিন জাতির জীবনে দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তা হতে বঞ্চিত হওয়াও তেমন পরম দুর্ভাগ্য। অথচ সেদিন নিজস্ব অনুষ্ঠান হতে শুধু দূরে থাকা নয়, বাধ্য হয়েই সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমায় এক বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকাকে অভিবাদন জানাতে হবে, নিজের আপিসে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে, তা আরও বেদনাদায়ক।

আমার মন তাই এই অপ্রীতিকর সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজছিল। ভাবতে ভাবতে সে পথ পেয়েও গেলাম। আমি ভাবলাম, আমার যখন তিনটি জেলা জুড়ে কর্মক্ষেত্র এবং অপর দু'টি জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে, তখন তাদের একটিতে কোর্টের কাজ ফেলে ত আমি এই সময়ে সেখানে যেতে পারি। সুতরাং এই পথে এই অপ্রীতিকর সম্ভাবনা হতে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়ে আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে জলপাইগুড়িতে কাজ ফেলে ওই সময় সেখানেই থাকব।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য অনেক। মাসে মাসে যেমন একা একা সার্কিট কোর্ট করতে কিছুদিনের জন্য সেখানে যেতাম, আবার দিনাজপুরে ফিরে আসতাম, এ তো সে রকম যাওয়া নয়। এ যে একেবারে দিনাজপুর হতে তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বিদায় নিয়ে যাওয়া। ফলে বদলী হবার হাঙ্গামা সবই ঘাড়ে এসে পড়ে। অথচ বদলী হলে নূতন একটা থাকবার বাড়ী মেলে, এখানে তা মিলবে না। যাই হক সে ভাবনা পরে ভাবা যাবে। এখন তো এখান হতে বিদায় নিতেই হবে। নিজস্ব আসবাবপত্র জিনিস-সহ সপরিবারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং যাবার ব্যবস্থা হল। ১০ই আগস্ট অপিসের কাজ শেষ করে আমার জলপাইগুড়ি রওনা হবার কথা। দিনাজপুর হতে মিটারগেজে পার্বতীপুর জংশন এবং তারপর সেখান হতে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে জলপাইগুড়ি যাওয়া ঠিক

হয়েছিল। মালপত্র সব আগেই চলে গিয়েছিল। এখন সপরিবারে ট্রেনে ওঠবার জন্য স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছি।

গাড়িতে তুলে দিতে অনেকেই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সহকর্মী আপিসের কর্মচারী আছেন, স্থানীয় পরিচিত বন্ধুও আছেন। হিন্দু মুসলমান অনেকেই আছেন। আমার সঙ্গে যে চাপরাশিরা কাজ করত তাদের তিনজনও আছে। পূর্বে চাকুরী জীবনে বদলীর মুখে এমনভাবে বিদায়ের পরিবেশের সম্মুখীন অনেকবার হয়েছি। কিন্তু এবারকার অভিজ্ঞতার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যবারেও সমাগতপ্রায় বিচ্ছেদের দুঃখ এমনি বতমান থাকে। তবু জানা থাকে, যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে তারা একই দেশের মানুষ রয়ে যাবে। কর্মসূত্রে বা অন্যসূত্রে আবার তাদের সঙ্গে দেখাশোনা হবে। তা নাই হক, একই দেশবাসী হিসাবে, একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে একাধিক বন্ধনে তখনও আমরা পরস্পর সংযুক্ত থাকব।

এবারকার চলে যাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। যেখান থেকে চলে যাচ্ছি তা ভারতের অঙ্গ থাকবে না, তা অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যতকাল বাস করেছি, এ দেশকে স্বদেশজ্ঞানেই ভালবেসেছি, এখানকার যে মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের অনেকের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছি। আজ যখন চলে যাব তখন এ দেশকে বিদেশজ্ঞানেই ত্যাগ করতে হবে। আজ এখানকার যে বন্ধুদের ছেড়ে যাব তারা বিদেশী মানুষ হয়ে যাবে। ভাবতে কিরকম মনের ভিতর একটি ঘনায়মান বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। গাড়ি যখন এল, তখন তাই যন্ত্রচালিতের মত কামরায় গিয়ে উঠলাম। অন্যবার এ সময় কত কথোপকথন হয়, বলে আসি, আবার দেখা হবে। মন দুঃখে ম্রিয়মাণ হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখি। এবার সে প্রবৃত্তি আসে না। মনমরা হয়ে চুপ করে বসে থাকি।

হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টা বাজল, সঙ্গে গার্ডের হুইস্‌ল্ ধ্বনিত হল। তাই শুনে মন একটু বিচলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা করুণ আর্তনাদ সেই শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেখি আমারই এক আর্দালি গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে করাঘাত করে কাঁদছে আর বলছে, "হায়, আমার সায়েব চলে গেল, আর আসবে না। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না সায়েব। এ দুগ্‌খু কোথায় রাখব?"

আমার সে আর্দালি ছিল জাতিতে মুসলমান। আমাকে সে ভালবেসেছিল। দিনাজপুর তার স্বদেশ। তা হতে চলেছে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে দিতে হচ্ছে। এ ছাড়াছাড়ি রীতিমত ছাড়াছাড়ি। এ শুধু বিচ্ছেদ নয়, আপন মানুষকে পর করে দেওয়া, দেশের মানুষকে বিদেশী করে দেওয়া। আমার সেই সরলহৃদয় সহকর্মী বন্ধু

লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ হলেও এই দারুণ সত্যটি রীতিমত হৃদয়ঙ্গম করেছিল। তাই সে এমন করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি আর কি করব! হাত দুটো জড়িয়ে ধরে 'কেঁদো না ভাই', বলে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। শেষে গাড়ি চলতে আরম্ভ করে সেই মর্মন্তুদ দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিল। তবু খানিক সময় ধরে ইঞ্জিনের শব্দ এবং গাড়ির চাকার শব্দকে ডিঙিয়ে আমার সেই পেছনে ফেলে-আসা ভাইটির আর্তনাদ কানে ভেসে আসতে লাগল।

এই যে এরফান কাজি মুসলমান হয়েও আমাকে এমন ভালবাসল যে আমার আসন্ন-বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল,—এটা কি অস্বাভাবিক? তা যদি হয় তাহলে মাস দুয়েক আগে যখন আমার নিজের পিস্তল আকস্মিক-ভাবে ছুটে গিয়ে আমার হাতকে গুলিবিদ্ধ করল তখন আমার নাজির সাহেব মুসলমান হয়েও আমার জন্য জীবন বিপন্ন করলেন কেন? আমার হাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে দেখে ডাক্তার সাহেব অস্ত্রোপচার করলেন, কিন্তু তাতেও ভরসা পেলেন না। তিনি বললেন—আমার পেনিসিলিন চাই তা না হলে এঁকে বাঁচাতে পারব কিনা জানিনা। কিন্তু পেনিসিলিন তো কলিকাতা ভিন্ন তখন পাওয়া যায় না।

এখন কোথায় দিনাজপুর আর কোথায় কলিকাতা শহর। স্বাভাবিক অবস্থা নয় যে রেলে করে কলিকাতা গিয়ে কেউ পেনিসিলিন জোগাড় করে আনবে। সারা বাঙলা দেশে তখন সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ছোঁয়াচ লেগেছে। কলিকাতার তো কথাই নেই। পূর্ব বৎসর ১৬ই আগস্ট থেকে সেখানে দাঙ্গা আর খুনোখুনি প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে আজ আপিস করতে বাইরে গেল সে সন্ধ্যায় যে বাড়ী ফিরবে তার নিশ্চয়তা নেই। হিন্দুর পাড়ায় মুসলমানের যাওয়ার বিপদ আছে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের পাড়ায় যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকের অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে, প্রাণ দিয়ে আসতে হবে। মুসলমানবহুল অঞ্চলেও হিন্দুর গতিবিধি নিরাপদ নয়। এই তো পরিস্থিতি! এখন এই অবস্থায় জীবন বিপন্ন করে কে কলকাতায় যাবে পেনিসিলিন আনতে?

সমস্যার হঠাৎ সমাধান করে দিলেন নাজির সাহেব। তিনি বললেন, তিনি যাবেন পেনিসিলিন আনতে। কিন্তু যেতে হবে যে হিন্দু পাড়ায়, সেখানে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পেনিসিলিন জোগাড় করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও কি তিনি সে ঝুঁকি নেবেন? তিনি বললেন, তিনি নেবেন, তাঁর জজসাহেবের জন্য যাওয়া তাঁর কর্তব্য। তিনি গেলেনও। পরের দিন পেনিসিলিন নিয়ে ফিরলেন।

তিনি যে নিজের জীবনকে এইভাবে বিপদের সামনে ঠেলে দিলেন সেও কি অস্বাভাবিক? আমার মন বলে তা নয়। আমার নাজির সাহেব, আমার

আর্দালি ভাই আমার দেশেরই মানুষ। একই দেশে আমরা মানুষ হয়েছি, একই ভাষায় কথা বলতে শিখেছি, একই কবির রচনা আবৃত্তি করে আনন্দলাভ করেছি। একই সংস্কৃতির আমরা উত্তরাধিকারী। সেই কারণেই তো প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা সরল স্বাভাবিক গতিতে পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। ঘটনাচক্রে তার ধর্ম হতে আমার ধর্ম ভিন্ন। কিন্তু সেই ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও তো আমরা পুরুষানুক্রমে একই সঙ্গে বাস করে এসেছি। পরস্পরের সঙ্গে ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েছি, পরস্পরকে বন্ধুজ্ঞানে প্রীতি করেছি। তবু ধর্মের ভিন্নতাই আমাদের দেশকে বিখণ্ডিত করবার কারণ হয়ে পড়ল।

আমাদের পরস্পরের প্রীতির সংযোগটাত অস্বাভাবিক নয়, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যা অস্বাভাবিক, যা কৃত্রিম তা হল এই দেশকে ভেঙে দু'ভাগ করা। কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্র ধরে রাজনৈতিক কারণে সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটি সংঘটিত হল। হলও অতি দ্রুত গতিতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যিনি ছিলেন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কর্ণধার, সেই অমিতবিক্রম উইন্সটন চার্চিল সাহেব বলেছিলেন—তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত নন। যুদ্ধে বিজয়লাভের পর যখন নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে ইংরেজ ভোটদাতা তাঁকে পুনরায় অধিনায়কেয় পদে বসাবে না। কিন্তু যা অভাবনীয় তাই ঘটল। শ্রমিক দলের নেতা ক্লেমেণ্ট এটেলি নির্বাচিত হলেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী। তিনি যে নূতন নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে অতি দ্রুত গতিতে ভারতের স্বাধীনতার দিনটি এগিয়ে এল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পেথিক লরেন্স প্রমুখ তিনজন ব্রিটিশ নেতা ভারতে এলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা রচনা করতে। ওই বছরেই মে মাসে তাঁরা পরিকল্পনা রচনা করে মন্ত্রিসভার নিকট স্থাপন করলেন। মূলত ঠিক হল ভারত সাম্রাজ্য একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিবর্তিত হবে। কেন্দ্রীয় শক্তির ওপর আন্তর্জাতিক বিষয়, যোগাযোগ এবং সংরক্ষার ভার ন্যস্ত হবে। ভারতের প্রদেশগুলি নিয়ে তিনটি অঞ্চল গড়া হবে। অবশ্য এই অঞ্চলগুলি হতে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার প্রদেশগুলির থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তবর্তিকালীন সরকার ভারতীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত হবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে সম্রাটের প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুর একটি কর্মপরিষদ গঠন করলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা কেউ তাতে যোগ দিলেন না। বরং এই সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লীগ 'ডিরেক্ট একশান'-এর কর্মসূচী ঘোষণা করল। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যেদিন নূতন কর্মপরিষদের কার্যকাল শুরু

হবার কথা, সেই ১৬ই আগস্ট তারিখে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। আক্রান্ত হলে হিন্দুও যে জিঘাংসাপরায়ণ হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেখানে মিলল। তার প্রত্যুত্তর হিসাবে সেই বছর পূজায় মুসলমানপ্রধান অঞ্চল নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর ব্যাপকহারে উৎপীড়ন শুরু হল। সেখানকার অবস্থা আয়ত্তে আনবার পূর্বেই পাল্টা দাঙ্গার বন্যা বইল বিহার অঞ্চলে। এর পরিণতি কোথায় ভাবা যাচ্ছিল না।

এই অনিশ্চয়তার পরিবেশ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার আর নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে চাইছিলেন না। লর্ড মাউন্টব্যাটন এলেন গভর্নর জেনারেল হয়ে ২৪এ এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার নূতন ব্যবস্থা করতে। তিনি কাজের মানুষ, বসে থাকলেন না। তাঁর সুপারিশে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, তারা অনতিবিলম্বে ভারত শাসনের ভার হতে মুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একটি নূতন পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেল দুই মূল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করে। তাতে ঠিক হল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং মুসলমান সম্প্রদায় যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, তাদের সে অধিকার দেওয়া হবে। তবে এও ঠিক হল যে পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত হলে পশ্চিমে পঞ্জাব প্রদেশ এবং পূর্বে বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হবে যাতে তাদের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি তা হতে পৃথক হয়ে ভারতরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হতে পারে।

৩রা জুন ১৯৪৬ তারিখে সন্ধ্যার সময় লর্ড মাউন্টব্যাটন এই সিদ্ধান্তগুলি বেতারযোগে প্রচার করেছিলেন। আমার সে দিনটি বেশ মনে পড়ে। কাছাকাছি কোথাও রেডিও ছিল না, না আমাদের বাড়ীতে না জেলাশাসক আবদুল হামিদের বাড়ীতে। পরিচিত মানুষদের মধ্যে কাছে ছিল পিটারদের বাড়ীর রেডিও। তাই আমরা স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে সমবেত হলাম রেডিওতে আমাদের জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে এই ঘোষণা শোনবার জন্য। কি অধীর আগ্রহভরে আমরা সেই ঘোষণা শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিলাম। কি দারুণ উত্তেজনাকে বুকে বহন করে আমরা তা শুনেছিলাম। সেদিন হতে নিশ্চিত জেনেছিলাম যে আমাদের বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবে।

কিন্তু দেশকে ভাগ করা তো পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগের মত সহজ জিনিস নয়। পরিবারের বিভিন্ন সম্পত্তি ভাগ করে বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বণ্টন করে দিতে অসুবিধা নেই। কারণ বণ্টনের যা বিষয় তা হল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। কার ভাগে কে পড়ল তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মাথা ঘামাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তারা জড়বস্তু। কিন্তু একটি দেশ তো শুধু জড়বস্তু দিয়ে গঠিত নয়, তার সক্রিয় অংশ মানুষ দিয়ে গড়া। সেই মানুষ

প্রত্যেকে এক একটি ব্যক্তি। তাদের মন আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে। রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে হয়ত দেশের ওপর একটি লাইন টেনে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়, কিন্তু তাতে বিভিন্ন মানুষের, বিভিন্ন পরিবারের কত যে জটিল সমস্যা মাথা নাড়া দেয় তার অন্ত নেই। পাকিস্তানে কত হিন্দু রয়ে গেল। তারা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে রাতারাতি দেশের যে অংশের প্রতি তাদের মন টানে, সে অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কৃত্রিমভাবে যে নূতন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ভাগ্য সংযুক্ত হল তার রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে সে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে না। তখন এক অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

তার একটা সমাধান আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে। যে নূতন রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে মনের মিল নেই অথচ যার সঙ্গে ভাগ্য সংযুক্ত হল তা ছেড়ে অপর রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। কিন্তু যাই বললেই তো যাওয়া যায় না। মানুষ যেখানে বাস করে তার পরিবেশের সঙ্গে সে এমনভাবে মিশে যায় যে তা ত্যাগ করা তার সহজ হয় না। শুধু জীবিকানির্বাহের জন্যই সে নানাভাবে সেই পারিপার্শ্বিকের সহিত জড়িত। ধীরে ধীরে বৎসরের পর বৎসর ধরে পুরুষানুক্রমে সেই যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। তাকে ছিন্ন করে গেলে জীবিকানির্বাহের উপায় হতেও বিচ্ছিন্ন হতে হয়। নূতন পরিবেশে নূতন করে তাকে গড়ে তোলা দুষ্কর, সাধ্য যদিই বা হয়, তা সময়সাপেক্ষ। তখন অনাহারের সমস্যার কি করে সমাধান হবে ভেবে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় রাজনৈতিক কারণে নিজের জন্মস্থান হতে বিচ্ছিন্ন হবার মত দুর্ভাগ্য বোধহয় মানুষের আর কিছু হতে পারে না।

দেশের রাজনৈতিক নেতারা যে এবিষয়ে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। ইংরেজের ভারতত্যাগের পর ব্রিটিশ ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যে যে নিদারুণ বিপর্যয় আনবে তার প্রতিকারের জন্য তাঁরা কিছু চিন্তাও করেছিলেন মনে হয়। যে অংশ নিয়ে ভারতের রাষ্ট্র গঠিত হবে তার বাহিরে ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে অনেক অমুসলমান রয়ে যাবে। যে হেতু পাকিস্তানের আদর্শ হবে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা, এরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অবহেলিত নাগরিকের পর্যায়ে পড়বে। একই আন্দোলনে সমান আত্মত্যাগ স্বীকার করেও এই দুর্ভাগারা স্বাধীনতা লাভের পর তার সুফল লাভে বঞ্চিত হবে। তাদের অধিকারের কথা কি সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হবে? দেশের নেতারা ততখানি নির্মম হতে পারেন নি।

তাই দেখি ইংরেজ সরকারের পক্ষ হতে যখন ঘোষণা করা হল যে তাঁরা ভারতত্যাগের পূর্বে ভারতকে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করবার ব্যবস্থা করে যাবেন, তখন ভারতীয় অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের পক্ষ হতে তার কর্ণধার

জওহরলাল নেহেরু একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেছিলেন। তার মর্ম হল এই যে দেশ বিভাগের পর যাদের নাড়ির যোগ ভাবী ভারত রাষ্ট্রের সহিত ছিন্ন হবে অথচ যারা রয়ে যাবে ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে, তাদের কল্যাণচিন্তা ভারতের ভাবী শাসকদের মনে নিত্য জাগ্রত থাকবে এবং এমন কি প্রয়োজন হলে তারা যদি অবস্থা-বিপর্যয়ে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়, তাদের ভারতের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। ঘোষণায় এই অঙ্গীকারই ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশঙ্কা হতে তাদের পরিত্রাণ করবার একমাত্র ক্ষীণ আশার আলোকবর্তিকারূপেই সেদিন বিরাজ করেছিল।

(২)

সেদিন রাত্রেই সপরিবারে জলপাইগুড়ি পৌছালাম। সঙ্গে পরিচারক ও ব্যবহারের জিনিসপত্র প্রভৃতি। আসবাবপত্র আগেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু এতো সাধারণ নিয়মে বদলী হয়ে আসা নয়, দেশের যে অংশ পাকিস্তানে পরিণত হতে চলেছে, তা ত্যাগ করে যে অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার মধ্যে এসে আশ্রয় নেওয়া। ভাগ্যক্রমে আমার সেখানে পদাধিকার বলে কিছু ক্ষমতা আছে, কিছু জনবলও আছে, তাই রক্ষা। সার্কিট কোর্ট করতে আসলে এখানকার সার্কিট হাউসের একটা ঘরে আমার বাস করার অধিকার আছে। সেই ঘরখানিই আমাদের সমগ্র পরিবারের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাসস্থান হল। কিন্তু সঙ্গে যে বাড়ী সাজানর আসবাবপত্র তার বহর তো কম নয়। তার গতি কি হবে সে উপায় একটা ভেবে বার করা হল। আমার নিজের বসবার জন্য একটি ছোট আদালত বাড়ী ছিল। তার বারান্দার আধখানা দখল করে সেখানে আসবাবপত্র রাখা হল। তার একদিক খোলা। সেদিক হতে ঝড়ের ঝাপ্টা আর বর্ষার জলের দাক্ষিণ্য তাদের ওপর বর্ষিত হতে লাগল। তা উপায় কি?

এই অভিজ্ঞতা থেকেই খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম যে দেশ বিভাগের ফলে যাদের ভাগ্য পুড়ল তাদের কি দুর্দশা না জানি হবে। আমার তো তবু পদাধিকার বলে একটা ঘর জুটল, মাল রাখবার একটা বারান্দাও জুটল। তাদের তো তাও জুটবে না। উন্মুক্ত মাঠে বা গাছের তলায় হয়ত তাদের আশ্রয় জুটতে পারে। দলে দলে তারা যখন বাস্তুত্যাগী হবে তখন তাদের কি উপায় হবে?

চোদ্দই আগস্টের রাত বারটার ঠিক পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক সভাও হবে। লর্ড মাউণ্টব্যাটন আমাদের দেশনায়ক জওহরলাল নেহেরুর হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরাধীনতামুক্ত হব। ভাবতে অঙ্গ পুলকিত হয়!

আজন্ম পরাধীনতার পরিবেশে মানুষ হয়েছি আমরা। জাতির পক্ষ হতে তুমুল আন্দোলনও স্বচক্ষে দেখেছি। শাসকজাতির অবর্ণনীয় অত্যাচারও দেখেছি। দেশের কত সন্তানকে শহিদ হতে দেখেছি। সেই দীর্ঘ সাধনার পরিণতিরূপে আজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পরাধীনতামুক্ত হব। সুতরাং এই শুভক্ষণটির অপেক্ষায় আমরা অধীরআগ্রহে অপেক্ষা করছি। সারা ভারতের কোটি কোটি নরনারী এই আগ্রহ একসাথে হৃদয়ে অনুভব করেছে। যারা রাজধানী হতে দূরে আছে তারা রেডিওর সন্ধানে আছে। যেখানে রেডিও জুটছে তাকে টিউন করে তার সামনে সেই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক বিবরণী শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

আমরাও একটি রেডিও জোগাড় করেছি। আমরা সার্কিট হাউসের যে ঘরে বাস করছি সে ঘরের বিছানার ওপর তাকে স্থাপন করেছি। ঘুম আজ পলাতক হয়েছে। বেতারে দিল্লী রেডিওর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে অপেক্ষা করছি। দেখতে দেখতে ঘড়িতে রাত বারটা বাজল। ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর-করণের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুন্দর ভাষণ শুনে আমরা পুলকিত হলাম। শেষে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাইলেন সুচেতা কৃপালানী। সে সঙ্গীত আগে আরও কতবার শুনেছি। কিন্তু সেদিন তা যেমনভাবে মর্মস্পর্শ করেছিল তার তুলনা হয় না। সেদিনকার সেই সঙ্গীত অনুভূতিতে চন্দন-প্রলেপের মত স্নিগ্ধ ঠেকেছিল, হৃদয়কে তা আনন্দবিধুর করে তুলেছিল। সে আনন্দ একজনের নয় সকল ভারতবাসীর, আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সকল পরিবারের সকল মানুষের সম্পদ।

আর ভারতের যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একই সময়ে নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল তার মধ্যে যারা জবরদস্তিভাবে পাকিস্তানী হয়ে গেল, অথচ মন পড়ে রইল ভারতে তাদের মনে কি ধরনের অনুভূতি জাগল? হায় ভগবান, সে কথা তো ভাবা যায় না। যে অনুষ্ঠান আমাদের এত আনন্দ দিল, সে অনুষ্ঠান একই সঙ্গে তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে দিল। যা আমাদের জীবন আলোয় আলোকময় করে দিল, তা তাদের জীবনকে আঁধারে আচ্ছন্ন করে দিল। যাঁরা আজ ভারতের শাসনভার পৃথক ভাবে পাকিস্তান ও ভারতের হাত হতে তুলে নিলেন, এই অনুষ্ঠানের সময় তাঁদের মনে কি এই দুর্ভাগাদের দুর্দশার কথা উদয় হয়েছিল?

স্বাধীনতালাভের পরেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমার মূল কাজ হয়ে পড়ল দেশের এই অংশে একটি নূতন বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এখানে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং—এই তিনটি জেলার বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব। দেশ বিভাগের ফলে দিনাজপুরের

পূর্ব অংশ এবং জলপাইগুড়ির দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আমাদের কেন্দ্রীয় আপিস ও বিচারালয় ছিল দিনাজপুরে। তা এখন পাকিস্তানে চলে গেল। সুতরাং নূতন করে কেন্দ্রীয় আপিস গঠনের দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ল। বিচার বিভাগের যে সব কর্মচারী যে অঞ্চল পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে অঞ্চলে কাজ করতেন অথচ দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একে একে আসতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে আমাদের নূতন আপিস তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আপিসের জায়গা নিয়ে এবং জজের নিজের বাসস্থান নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে অভাবনীয়ভাবে তার একটা সমাধান হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে উত্তর বাঙলায় আর আলাদা বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হলেন না। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের যিনি কমিশনার নিযুক্ত হলেন তাঁরই ওপর এই অংশের ভার পড়ল। যেহেতু কলকাতায় তাঁর নিজস্ব আপিস আছে, এখানে বড় আপিস থাকবার বা বাসগৃহ থাকবার প্রয়োজন রইল না। নূতন ব্যবস্থা হল যে তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে স্থানীয় কাজ শেষ করে চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে কমিশনারের বাসগৃহটি জজের বাসগৃহরূপে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ হল। আমি থাকবার জন্য বাসা পেয়ে গেলাম। কমিশনারের আপিসের অর্ধেক অংশ আমাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল। সেখানেই আমাদের নূতন আপিস এবং বিচার কক্ষগুলির জায়গা হয়ে গেল।

এমন সময় অভাবনীয়ভাবে ডাক পড়ল ভিন্ন ক্ষেত্রে। সেদিনটি আমার বেশ মনে পড়ে। স্বাধীন পশ্চিম বাঙলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রথম জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে এসেছেন। তিনি সার্কিট হাউসে ওঠেন নি, তাঁর থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস আপিসে। এই ব্যতিক্রমও একটা চাঞ্চল্যের কারণ এবং আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় জেলাজজ হিসাবে আমার তাঁর সহিত সাক্ষাতের ডাক পড়েছে। আমিও যথাসময়ে হাজির হয়েছি দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য।

কিন্তু উপস্থিত হওয়া মাত্রেই তিনি যে বিষয়ের অবতারণা করলেন তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দু'টি শাখা ছিল। তার একটি বিচার বিভাগের কাজ করত এবং অন্যটি শাসন বিভাগের করত। ভারতীয়দের মধ্যে যারা ইংরেজদের সঙ্গে ভাল রকম খাপ খাইয়ে চলতে পারত না, বা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে চাইত না, তারা বিচার বিভাগীয়

কাজ নিত। আমি পাকাপাকিভাবে বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সুতরাং প্রশাসনিক বিভাগে আবার ফিরে যাবার কথা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।

ডক্টর ঘোষ কিন্তু সোজাসুজি সেই প্রস্তাবই করে বসলেন। তিনি বললেন, আমার হয়ত হাইকোর্টে যাবার পথ বন্ধ হবে কিন্তু তিনি চান আমি বিচার বিভাগ হতে প্রশাসন বিভাগে ফিরে আসি। স্বাধীন দেশের নিজেদের জাতীয় নেতার এই ইচ্ছা পূরণ করতে আমার আপত্তি ছিল না। সুতরাং আমায় বিচার বিভাগ ছাড়তে হবে জানলাম। তারপর যখন কলিকাতা হতে লিখিত নির্দেশ এল তখন তা আর এক বিস্ময় সৃষ্টি করল। আমি দেখি যেখানে আমি এতকাল বিচারক হিসাবে কাজ করেছি,, সেই জলপাইগুড়ি জেলাতেই প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি।

প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়ে দেখলাম যে দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জেলাশাসককে এখন তারা নিজেদের মানুষ মনে করে এবং আশা করে যে তিনি তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিশেষ-ভাবে তৎপর হবেন। কোথায় ঝড়ের উৎপাতে বাড়ীঘর ভেঙেছে, রাতারাতি তার ত্রাণ.ও সাহায্যমূলক ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় বন্যা হয়েছে, তখনি দুর্গতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বিষয় দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে দেখলে তারা সব থেকে বেশি খুশি হত।

কিন্তু ওদিকে দেখতে দেখতে সাধারণ প্রশাসনিক কাজের থেকে আর একটি নূতন সমস্যা দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে লাগল। জলপাইগুড়ির সংলগ্ন অংশে পাকিস্তান হতে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে আসতে লাগল। তাদের মধ্যে দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যেত। এক শ্রেণী ছিল তুলনায় স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। তারা বাড়ী ভাড়া করে সেখানে পরিবারকে স্থানান্তরিত করতে লাগল। আব একদল ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তাদের এমন সঙ্গতি ছিল না যে বাড়ী ভাড়া করতে পারে। যেখানে পুরাতন অর্ধভগ্ন অব্যবহৃত খালি বাড়ী দেখে সেখানে আশ্রয় নেয়। জলপাইগুড়ি শহরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল। আর আলিপুরদুয়ার শহরে প্রথম শ্রেণীর মানুষ বেশি সংখ্যায় আশ্রয় নিয়েছিল।

যারা ভাঙা বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবস্থা তখনও এমন খারাপ হয় নি যে আমাদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আর যারা নিজেদের চেষ্টায় ঘর ভাড়া করে নিজেদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে, তাদের ব্যাপারটা আমার প্রথমে বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় নি।

সেটা দৃষ্টিগোচর হল মফস্বলে সফর করতে গিয়ে। আমি গিয়েছিলাম প্রশাসনিক কাজে আলিপুরদুয়ারে। সেটি জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মহকুমার

শাসনকেন্দ্র। পাশে কালজানি নামে ছোট নদী। নামেই তা শহর। পাকা বাড়ী বিশেষ নেই। মহকুমা শাসকের থাকবার বাড়ীর আশেপাশে কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে। আর সবই শালগাছের খুঁটি দিয়ে নির্মিত টিনের বাড়ী। আর নদীর ধারে আছে মারোয়াড়িদের মাল রাখবার ছোট ছোট অসংখ্য ঘর। শুনলাম অনেক মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু সেই সব ঘর ভাড়া করে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বিষয় খবর সংগ্রহ করবার জন্য আমি তাদের দেখতে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম সত্যই শহরের সে অঞ্চল অনেক মানুষের সমাগমে রীতিমত কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারে সারবন্দি একতলা পাশাপাশি অনেক ঘর, অনেকটা মিলের কুলিলাইনের মত। তাদের এক একটির আয়তন একশ' বর্গফুট হবে কিনা সন্দেহ। সামনে একফালি করে খোলা বারান্দা। এক একটি কামরায় এক একটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। স্তূপীকৃত মালপত্র ঘরের অনেকখানি জায়গা দখল করে পড়ে আছে। একেবারে দেশত্যাগী হয়ে আসলে তো লটবহরের পরিমাণ বেশি হবেই। অল্পবয়স্কদের মধ্যে নিতান্তই যে শিশু সে তার একপাশে শায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। আর বয়সে যারা একটু বড় তারা বাকি অংশটায় খেলা জুড়ে দিয়েছে।

অন্দর বাহির বলে কোন ব্যবস্থা নেই। স্থানাভাবে বাহিরের খোলা বারান্দায় হেঁসেল বসেছে। তোলা-উনুনে সবেমাত্র অগ্নিসংযোগ হয়েছে, সারবন্দি উনুনে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। রাস্তার ধারে যে অল্প কয়েকটি টিউবওয়েল দেখা যায়, তার চারিপাশে মেয়েদের ভিড়। সেখান হতে বালতি করে জল সংগ্রহ করলে, তবে রান্না, তবে কাপড়কাচা। বারান্দার একপাশে বা সংলগ্ন সিঁড়িতে কর্তারা অনেকেই হাতের ওপর চিবুক স্থাপন করে উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন।

যিনি আমাকে সঙ্গে করে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একজন স্থানীয় সমাজকর্মী। দেখা গেল, এঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে। তিনি নমস্কার করলে তাঁরা প্রতিনমস্কার করেন। কারণ খুঁজতেও দেরি হল না। এঁরা দেশত্যাগ করে এখানে এসেছেন নূতন করে ঘর বাঁধতে। বাস্তুজমি পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইনি স্থানীয় অধিবাসী, অনেক খবর রাখেন। এবং সেই কারণেই জমির জন্য অনেকে তাঁর কাছে দরবার করেন।

শুনেছি দেবতারা সাগর মন্থন করে যখন অমৃত লাভ করেন, তখন একভাণ্ড গরল উঠেছিল। আমাদের ভাগ্যেও যেন স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতারূপ অমৃতের সঙ্গে গরল উঠল। পঞ্জাব আর বাঙলার অঙ্গবিচ্ছেদ হল। ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু দেশের মানুষের এক বড় অংশ প্রকৃত স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হল। তার ফলে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধল, পশ্চিম ভারতে তা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। উভয় পঞ্জাবে ব্যাপক আকারে দাঙ্গা, খুন অপহরণ

শুরু হল। যারা এই জীবন-মরণ সংঘর্ষে লিপ্ত তারা নিজেরাই তার সমাধান করে দিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পার্শ্ববর্তী স্বজাতির রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। হিন্দু আর শিখ চলে এল পুর্ব পঞ্জাবে, আর মুসলমান চলে গেল পশ্চিম পঞ্জাবে। এইভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মানুষ বিনিময় সংঘটিত হওয়ায় সেখানে আগুন নির্বাপিত হল।

পুর্ব অঞ্চলে কিন্তু স্বাধীনতার পর, যখন দেশ বিভাগ হয়ে গেল, অবস্থা ভিন্ন রূপ নিল। এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধল না। বরং পুর্ব হতে যেখানে দাঙ্গার জের চলছিল তা স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। কলিকাতার অবস্থা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ এক বৎসরব্যাপী দাঙ্গার ওপর উভয় সম্প্রদায় যবনিকা টেনে দিয়েছিল। তাই একসময়ে মনে হয়েছিল পুর্বাঞ্চলে দেশবিভাগ হওয়া সত্ত্বেও হয়ত শান্তি অক্ষুন্ন থাকবে। অন্তত প্রথম দিকে আপাতদৃষ্টিতে শান্তি অক্ষুন্নই ছিল। তাই যদি হয় তবে এত মানুষ পুর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে আসে কেন? এই প্রশ্ন সেদিন আমার মনে উদয় হয়েছিল। নিজের দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় এত কষ্ট বরণ করবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি?

আমি তাই যে ভদ্রলোক সঙ্গে এসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—এঁরা দেশত্যাগ করে এমনভাবে চলে আসছেন কেন তার খবর নিয়েছেন কি?

তিনি বললেন,—নিয়েছি বৈকি? তবে তার উত্তরটা আমি আর দিই কেন? এঁদের মুখেই শুনুন না।

এই বলে নিকটে উপবিষ্ট একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি নিজের যে পরিচয় দিলেন, তা হতে জানা গেল, তিনি ছিলেন বগুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের এক ডাক্তার। বর্ধিষ্ণু পরিবার, প্রজাবিলি জমি আর খাস জমি কিছু ছিল। সব ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি চলে এসেছেন।

আমার সঙ্গী তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন,—দেখুন, এই ভদ্রলোক জানতে চান, দেশে তো কোন গোলমাল নেই, তবু কেন আপনারা দেশ ছেড়ে চলে এলেন?

ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল, খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ্য করলাম, তাঁর মুখের ভাবের এক অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল। তীব্র উত্তেজনা দৃঢ়চিত্তে দমন করলে মুখের ভাব যেমন হয়, এ অনেকটা সেই রকম। চোখ উত্তেজনাপুর্ণ, একটু রঞ্জিত, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। তবু তিনি স্বরটা যতখানি সম্ভব নরম করে বললেন:

—সত্যিই তো এমনকিছু মারধোর খুনজখম হয় নি। তবে বুঝলেন কিনা সকলেরই সহ্যশক্তি সমান নয়। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি শুনুন। তাহলে আমাদের অবস্থার খানিকটা বুঝতে পারবেন।

তারপর তিনি যে কাহিনী বললেন তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়। বাড়ীতে মোটা চালের অভাব না হলেও এঁরা সরু চাল বাজার হতে বরাবর কিনে খেতেন। এই সূত্রেই স্বাধীনতার পরের একদিনের তিক্ত ঘটনার কথা বললেন। সেদিন পুরাতন পরিচিত মুদির দোকানে গিয়ে এক বস্তা চাল কিনলেন। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় প্রতিবেশী কালু মিঞা এসে হাজির। তিনি একজন স্থানীয় মোক্তার। তিনিও মুদির দোকানে এসেছেন সরু চালের খোঁজে। দুর্ভাগ্যক্রমে দোকানে তখন এক বস্তা মাত্র মিহি চাল ছিল এবং তা ইতিমধ্যেই বিলি হয়ে গেছে। তিনি নাকি তখন তাই শুনে মুদিকে বললেন :

—তাই নাকি ? তাহলে ওই বস্তাটাই আমাকে দাও।

ভদ্রলোক তখন প্রতিবাদ করে বললেন, তিনি যে ও বস্তাটা আগেই কিনে ফেলেছেন, এমন কি দামও মিটিয়ে দিয়েছেন, কাজেই সেটা কি করে হয় ? কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। হুঙ্কার দিয়ে কালু মিঞা নাকি বললেন :

আলবৎ হয়। একি হিন্দুস্থান পেয়েছ ? বলে জোর করেই বস্তাটা কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

এই কাহিনী বলতে বলতে, মনে হল, ভদ্রলোকের উত্তেজনা যেন আরও বেড়ে চলেছে। তাঁর মনের দুঃখের আবেগে তিনি আরও কিছু কথা বলে চললেন যা আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক হবে, তাই যতদূর স্মরণ হয় তাঁর নিজের মুখেই সেটা বলতে চেষ্টা করব। তিনি বলতে শুরু করলেন :

—এমনকি আর করেছে বলুন, মারধোর তো করে নি। তবে কি জানেন, আমার চামড়া একটু পাতলা তাই সেদিন মনে ভারি আঘাত লেগেছিল। তবু দেশের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে মায়া হল। তাই তখনও রয়ে গেলাম !

ভদ্রলোক থামলেন না, আরও বলে চললেন :

—কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর বার হতে জোর গলায় ডাক শুনলাম—কর্তা, বাড়ী আছ হে ?

ভাবলাম কে বুঝি চেনাজানা মাতব্বর মুসলমান প্রতিবেশী এসেছে। বাইরে গিয়ে দেখি, আমারই বহু কালের এক পুরাতন প্রজা এসে হাজির। এক গাল হেসে বলল :

—কর্তা, ইংরেজ চলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের পাকিস্তান হয়েছে। তাই দোস্তানি করতে এলাম।

তার এই উঁচু স্বরে কথা আর গায়ে-পড়া ভাব দেখে আমার মনে মনে বেশ রাগ হল। আগে দেখা হলে এরাই দশ হাত দূর থেকে অন্তত দশবার সেলাম ঠুকত। কিন্তু এখন যে পাকিস্তান। কাজেই মুখে খুশির ভান করে বললাম,

—তা বেশ।

সে তখন বলল,—তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন কর্তা, ভিতরে চল।

এই বলে বাড়ীখানা যেন তারই সম্পত্তি এমন ভাব দেখিয়ে একরকম আমাকে টেনে নিয়ে ভিতরে চলল। বৈঠকখানায় নয়, একেবারে অন্দরে শোবার ঘরে। দিব্যি আরাম করে বিছানায় বসে আমাকে একরকম জোর করে পাশে বসিয়ে বলল :

—কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। মনে রেখ, আমরা আর ছোট নই। ভুলে যেও না, এখন থেকে সমানে সমানে আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে।

কাহিনী বলা এখানে শেষ হয়ে গেল। এর পর ভদ্রলোক একটু থেমে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে, আমাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বললেন :

—কি মশাই, এর পরেও কি পাকিস্তানে থাকতে বলেন ?

ভদ্রলোক যে রীতিমত অপমানিত বোধ করে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় উদ্বাস্তু হয়েছেন, তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর কাহিনী শুনে তার উত্তরে কিছু বলবার মত কথাই মুখে জোগায় না। কোনমতে ঢোক গিলে সেখান হতে চলে আসতে চাইলাম।

কিন্তু আমাকে চলে আসতে দিলেন না। তিনি নয়, আর একজন। বলা বাহুল্য, তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনে এখানে আমাদের চারিপাশে আরও অনেক উদ্বাস্তু জড় হয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন আমাকে আর একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন :

—ওঁর কাছে তো একদফা শুনলেন। এখন আমার কাছে আর একদফা শুনুন।

দেখলাম, তাঁরও মুখে উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে। আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি বলে চললেন :

—পাকিস্তানে হিন্দুর মেয়ের পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়া আর সম্ভব নয়। খবর রাখেন ?

আমি আর কি খবর রাখব ? তাঁদের কাছ থেকেই তো জানতে এসেছি। তিনি যা বিবরণ দিলেন তা বেদনাদায়ক। যা বললেন, তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই রকম :

হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমন বয়সে প্রবীণ প্রৌঢ়ও আছে। দাঁড়িয়ে নাকি তারা ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গায় :

—পাক পাক পাকিস্তান,

আর অন্য পাড়ের লোক বলে,

—হিঁদুর ভাতার মুসলমান।

এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মতে তার সেই আচরণ ভারি কৌতুক-বোধ জাগায়। তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলে :

—ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চলল। আর দেরী কেন ? এবার ঘরে চল।

সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই প্রৌঢ় মানুষটি এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে :

—ওরে, তোর চাচীর পায়ে বুঝি খিল ধরেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না।

ভদ্রলোক এইখানেই কাহিনী শেষ করলেন। তারপর বললেন, এরপর আর দেশে থাকি কি করে। পালিয়ে আসি। তবে একথা ঠিক, খুনোখুনি এখনও শুরু হয়নি। এরপর আমরা ওখান থেকে চলে আসি।

এই ধরনের কাহিনীগুলি একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয় যে এই সময়ে যারা পুর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে আসছিল তারা মানসিক নিপীড়ন হেতুই চলে আসছে। পাকিস্তান হবার পর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হেতু এখন তাদেব সেখানে মান-সম্ভ্রম ইজ্জৎ নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়, এই তাদের ধারণা হয়েছে। পূর্বের পরিবেশে সমাজে যে সম্মান পেতে তারা অভ্যস্ত তা এখন পাওয়া যায় না। বরং পাওয়া যায় উদ্ধত ব্যবহার এবং পদে পদে যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত সেখানে অন্যায় অত্যাচার। মেয়েদের ইজ্জৎ রাখা সেখানে দুষ্কর। নিজের ভিটেমাটি কেউ সহজে ত্যাগ করে না। এরা যে করেছে, তা বাধ্য হয়েই করেছে। এরা ভদ্রশ্রেণীর উন্নত রুচির মানুষ। এদের অপমানবোধ তীক্ষ্ণ। তাই অত্যাচার চরমে ওঠবার আগেই, যখন তা মানসিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তখনি তারা চলে এসেছে। এইসব ভেবে আমার মন সেদিন আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম—হায় ভগবান, শুরুতেই এমন হল, পরে না জানি কি দাঁড়াবে।

এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুর সংখ্যা এ জেলায় ক্রমশ দিনে দিনে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করল। যারা নিজে কিছু আর্থিক সঙ্গতি রাখে, তাদের খাসমহলে জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে উৎসাহ দেওয়া হল। কিন্তু যারা এসব সঙ্গতি রাখে না, তাদের সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠল। জলপাইগুড়ি শহরে যে কয়টি ভাঙা ও পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল, তা দেখতে দেখতে ভরে গেল। স্টেশনেও লোক জমতে আরম্ভ করল।

এখন উপায় কি ? ঠিক করলাম, অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের পশ্চিম প্রান্তে তিস্তা নদীর ধার ঘেঁষে সরকারী পিলখানা বা হাতিশালার

সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। সেখানে ত্রিপলের ছাদ আর দরমার বেড়া দিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর করা হল। প্রথমে এক সার, তারপরে দুসার। তাও যখন ভরে গেল, তখন শহরের ঠিক বাহিরে এই রকম থাকবার বাসা তৈরি করা হয়েছিল।

আমাদের ডিভিশনের কমিশনার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। এই সময়ে আমি একদিন তাঁকে পিলখানার আশ্রয় শিবির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনিও উৎসুক হয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এমন কয়েকটি পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা কেন দেশ ছেড়ে চলে আসছে।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁরও মনে হয়ে থাকবে যে পাকিস্তানে তো এখনও কোন ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসে নি, তবু কেন তাদের পূর্ব-পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে তারা চলে আসছে। সেখানে যা উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, তা আমার আলিপুরদুয়ারের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে। মোটামুটি দৈহিক অত্যাচার শুরু না হক, নানাভাবে এমন সব অত্যাচার তারা ভোগ করছিল যা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে তারা দেশত্যাগী হয়েছে।

এই সময়ে আরও একটা জিনিস নজর করা গিয়েছিল। ওপরে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা যেমন মানসিক নিপীড়নের ফলে চলে এসেছিল তেমন আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যারা নিপীড়নের জন্যও অপেক্ষা করে নি, দেশ বিভাগ হবার পরেই, সোজা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এ আচরণের অর্থ হয় না, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে তাদের এ বিষয় একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ ছিল এবং তাও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সক্রিয়ভাবে রীতিমত যোগ দিয়েছিল, তেমন পূর্ববঙ্গের হিন্দুও দিয়েছিল। ঠিক বলতে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরাই প্রধানত স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এসেছে। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মাষ্টারদার নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে হক বা অহিংসভাবে হক স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের নেতৃত্বে। জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম করে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন এবং সংগ্রামের পর কিন্তু যখন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়ে উঠল তখন নানা বিরোধী স্বার্থের সংঘাত ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে নিজ মাতৃভূমিতে স্বাধীনতার যে রূপটি ফুটে উঠল তা তাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল।

যারা স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য আন্দোলন করল, মরণপণ যুদ্ধ করল, প্রাণ দিল, তারা দেখল পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে বলে ইংরেজ' ভারতত্যাগ করলেও তারা প্রকৃত স্বাধীনতা পেল না। কারণ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের সৃষ্টি হবার ফলে সেখানে হিন্দুর প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের সম্ভাবনা রইল না। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হল ঐস্লামিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করা। সেখানে যে ইসলাম-ধর্মী সেই নাগরিকের পুর্ণ মর্যাদা পাবে, যে অন্য ধর্মের মানুষ সে বাধ্য হবে নিকৃষ্ট নাগরিকরূপে বাস করতে। সুতরাং এক হিসাবে দেখতে গেলে হিন্দুর অবস্থা ইংরেজের শাসনে পরাধীনতার যুগে যেমন ছিল এক দিক হতে তার থেকেও নিকৃষ্ট হবে। নিকৃষ্ট নাগরিকত্বের মর্যাদা নিয়ে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা হেতু এরা তাই নিজ জন্মভূমিতে বাস করতে চাইল না। বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতালাভের পর তারা এমন জায়গায় বাস করতে চাইল না, যেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের পুর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই তারা আপাতদৃষ্টিতে বিনা কারণেই দেশ বিভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগী হল।

এদিকে দিনে দিনে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়ে চলল। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, যারা সরকারের উপর প্রাথমিক আশ্রয়ের জন্য এবং পুনর্বাসনের সাহায্যের জন্য নির্ভর করে তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। এতদিন আশ্রয় শিবির খুলে আর কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করে চলছিল। এখন আর তা চলে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ব্যবস্থা করতে হয়।

ভাগ্যক্রমে এই সময়ে এমন একটি সমাজকর্মীর সহিত পরিচয় হল যিনি নিজগুণে আমার নির্ভরস্থল হয়ে উঠলেন। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায় এ অঞ্চলের বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী। দেশের এই দুর্দিনে তিনি সমাজসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্মক্ষমতা এবং সর্বোপরি সংগঠন শক্তি উদ্বাস্তুদের ত্রাণের কার্যে তাঁর উপযোগিতা প্রমাণ করল। তিনি স্বেচ্ছায় এই গুরুদায়িত্বের ভার নিয়ে আমার কর্তব্য সম্পাদন অনেক সহজ করে দিলেন।

ত্রাণকার্য পর্যবেক্ষণের জন্য একটি উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হল। শ্রীরায় তার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কতকগুলি সুস্থ মানুষকে দিনের পর দিন আর্থিক সাহায্য দিয়ে বসিয়ে খাওয়ান ঠিক মনে হল না। তাতে দিনে দিনে যেমন তাদের আত্মমর্যাদা-বোধ শিথিল হয়ে যায়, তেমন শ্রমবিমুখ হওয়া অভ্যাস হয়ে যায়।

সুতরাং একটা পরিকল্পনা রচিত হল। ব্যবস্থা হল, বয়স্ক এবং কার্যক্ষম মেয়ে বা পুরুষ যারা সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য চায় তাদের কাজ দেওয়া হবে এবং সেই কাজ অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এখানে প্রচুর চা বাগান আছে। সেখানে দু'রকম জিনিসের অপর্যাপ্ত চাহিদা ছিল। প্রথম

জিনিসটি হল, চা গাছের পাতা তুলে রাখবার ঝুড়ি। চা বাগানের মেয়ে শ্রমিকরা এই ঝুড়ি পিঠে বেঁধে চা গাছের পাতা সংগ্রহ করে। আর দরকার হয় শণের দড়ি। এদের প্রধানত এই দুটি পণ্য উৎপাদন করতে দেওয়া হত।

কিন্তু শুধু কাজ দিয়ে তো এদের অনিশ্চিতকাল আশ্রয় শিবিরে বসিয়ে রাখা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আশা না পেলে এদের মনের বল শিথিল হয়ে যাবে। এই ভেবে আমাদের মনে হল এদের যেমন করে হক পুনর্বাসনের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। যারা আশ্রয় শিবিরে এসেছিল তাদের দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি দলে পড়ে যারা অকৃষিজীবী। তাদের কারও পেশা ছিল ছোট ছোট ব্যবসা করা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পৈত্রিক সূত্রে কারিগরী শিক্ষা পেয়েছিল, যেমন কামার কুমার প্রভৃতি শ্রেণী। আর অন্য শ্রেণীটি ছিল কৃষিজীবী। সুতরাং তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়।

যারা অকৃষিজীবী তাদের জন্য গৃহনির্মাণের একখণ্ড জমি যদি সংগ্রহ করে দেওয়া যায় আর ব্যবসায়ের জন্য কিছু ঋণ দেওয়া যায়, তারা নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারবে। জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যেই পাণ্ডাপাড়া অঞ্চলে কিছু সরকারী খাস জমি ছিল। সেই জমি নিয়ে একটি ছোট কলোনির পরিকল্পনা রচিত হল। ছোট ছোট দাগে তা ভাগ করা হল। আর অকৃষিজীবী পরিবারদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়া হল।

শিলিগুড়ি যাবার পথে রেল লাইন যেখানে তাকে কেটেছে সেখানেও অনেক পতিত জমি ছিল। জায়গাটা জলপাইগুড়ি শহর হতে মাত্র পাচ মাইল দূরে। তার যাঁরা মালিক তাঁরা একটি পরিকল্পনা করে সেই জমি অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে ভাগ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই জায়গাটি শহরের কাছে বলে আমরাও সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। এখানেও আশ্রয় শিবির হতে অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পাঠান হয়েছিল। এই উপনিবেশের নাম দেওয়া হয়েছিল মোহিতনগর কলোনি।

এখন কৃষিজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের শুধু একখণ্ড জমি দিলেই চলে না, চাষ করবার মতও কিছু জমি তাদের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে সন্ধান করতে করতে এক লপ্তে অনেকখানি জমি পাওয়া গেল। শিলিগুড়ি যাবার রাস্তায় জলপাইগুড়ি হতে বার মাইল দূরে বেলাকোপা রেল স্টেশন হতে যে রাস্তা রাজগঞ্জের দিকে গেছে সেই রাস্তা এক চৌমাথা সৃষ্টি করেছে। তারই কাছে একটি জায়গা আছে, যা ফাটাপুকরি নামে পরিচিত। তার সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা যায়। এই দীঘির পাড়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তা প্রায় কুড়ি ফুট মত উঁচু। অর্থাৎ দীঘির চারদিকে উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা হয়েছে। এই বাঁধের উত্তর অংশের মাঝখানটায় খানিকটা ফাঁক আছে। সম্ভবত অতিরিক্ত জল দীঘিতে জমা হলে তাকে বের করে

দেবার জন্য এই ব্যবস্থা। এবং সম্ভবত তার চারপাশ ঘিরে যে বাঁধ আছে, তার এক অংশ কাটা বলেই এ জায়গাটির নাম ফাটাপুকুরি। জলপাইগুড়ি হতে শিলিগুড়ি যাবার যে জাতীয় সড়ক আছে এটি তার সংলগ্ন এবং সে রাস্তা দিয়ে যেতে নজরে পড়ে।

এই ফাটাপুকুরির কাছে এক লপ্তে ১৩৫০ একর মত জমি পাওয়া যায়। তা এতকাল অনাবাদী পড়ে ছিল। প্রায় সমতল জমি, তবে আগাছা আর জঙ্গলে স্থানে স্থানে ভরা ছিল। পাশে বড় দীঘি আর তার উঁচু পাড় অস্থায়ী শিবির স্থাপনের পক্ষে বেশ উপযুক্ত। জমির যাঁরা মালিক তাঁরা এই জমি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করতে দিতে সম্মত ছিলেন। এমন কি আপোসে দখল দিতেও আপত্তি ছিল না। সুতরাং আগে দখল নিয়ে পরে আইনমত ভূমি সংগ্রহ করার অসুবিধা ছিল না। পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে কাজে রূপান্তরিত করতে বাধা নেই।

সুতরাং ঠিক হল, এখানে কৃষিজীবীদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। এখানকার জমি খুব উর্বর নয় বলে পরিবার পিছু পনর বিঘা মত জমি বরাদ্দ করা হবে ঠিক হল। মোট ২৫০ চাষী পরিবারের এইভাবে এখানে স্থান হয়। ঠিক হল, চাষের জমি আর বাস্তুজমি ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হবে। আবাসের জন্য নির্বাচিত অংশে প্রতি চাষী পরিবার এক বিঘা করে জমি পাবে আর বাকি ১৪ বিঘা জমি পাবে যে অংশ চাষের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সেখানে। এছাড়া এদেরই প্রয়োজনে কিছু অকৃষিজীবী পরিবারও নির্বাচন করা হবে, যেমন শিক্ষক, কামার, ছুতোর, কুমোর ইত্যাদি। ঠিক হল, এখানে এই রকম ৫০টি অতিরিক্ত পরিবার রাখা চলবে। তাদের কেবল এক বিঘা করে বাস্তু জমি দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন উঠল চাষী পরিবারগুলি নিজ নিজ জমিতে আলাদা আলাদাভাবে চাষ করবে কিনা। মণিবাবু প্রস্তাব করলেন এই সুযোগে সমবায় ভিত্তিতে এদের নিয়ে একটি কৃষিখামার গড়ে তোলার চেষ্টা হক। অর্থাৎ ঠিক হল, সমগ্র চাষের জমি সমবায়ের তত্ত্বাবধানে চাষ হবে। বিভিন্ন পরিবারের সমর্থ পুরুষ সেখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করবে। তারা পারিশ্রমিক হিসাবে যা পাবে, তা নিজস্ব; আর চাষের থেকে যে লাভ হবে তা সমবায়ের তহবিলে জমা হবে এবং অংশীদার হিসাবে তারা লাভের অংশ পাবে। চাষের জমিতে প্রতি চাষীর স্বত্ব থাকবে কিন্তু তা সাধারণ খামারের অংশ হবে। কখন কোন শস্য উৎপাদিত হবে, কি রীতিতে চাষ হবে, তা ঠিক করবে সমবায়ের কর্তৃপক্ষ। মোটামুটি সমবায়ের ভিত্তিতে যৌথ খামারে চাষ হবে, এই হল প্রস্তাব।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর এই প্রস্তাবে আমরা সম্মত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করতে আপত্তি কি? যদি সফল হয়

একটা নূতন পথ খুলে যাবে। যদি সফল না হয়, পরিকল্পনা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হল ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস হতে। আমি তার আগেই ওই জেলা ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম, কারণ আমাকে চব্বিশ পরগণার জেলা-শাসকের ভার নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরের ইতিহাস মনের মত হয় নি। দু'বছর যৌথ খামারের ভিত্তিতে চাষ হয়েছিল; কিন্তু নানা কারণে চাষীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব লক্ষিত হওয়ায় চাষের জমি তাদের মধ্যে পৃথক করে বণ্টন করে দেওয়া হয়। চাষের দায়িত্ব যে যার নিজে বহন করতে থাকে। তখন সমবায়ের দায়িত্ব সঙ্কুচিত হয়ে তাদের নানাভাবে সাহায্য করার কাজে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন সার বা বীজ সরবরাহ, ট্র্যাক্টার দিয়ে জমি চষে দেওয়া ইত্যাদি।

আপোসে জমি পেয়ে যাওয়ার জমি উদ্ধারের কাজ কিন্তু আমি থাকতেই শুরু হয়ে যায়। আমরা প্রথমে আশ্রয় শিবির ওখানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যারা ওখানে পরে পুনর্বাসনে যাবে তাদের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করি। এই সময় কৃষি বিভাগের ইঞ্জিনিয়র শ্রী বি এন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাঁর মত তৎপর এবং উৎসাহী কর্মী খুব কম দেখা যায়। তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় সফরে এসেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলি এবং ফাটাপুকুরির নির্বাচিত জমিতে নিয়ে যাই। প্রায় দুই বর্গমাইল জমি। কায়িক পরিশ্রমে তাকে উদ্ধার করতে অনেক সময় যাবে। ফলে সমস্ত শীতকাল জমি ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং তিনি পরামর্শ দিলেন, জমি উদ্ধারের জন্য প্রথমে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার এই উত্তর প্রান্তে ট্র্যাক্টর কোথায় পাই?

তিনি বললেন, সে দায়িত্ব তাঁর। বলতে আনন্দ লাগে, তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কলিকাতা হতে তিনি দু'খানি ট্র্যাক্টর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে সেই জমি চাষ করিয়ে আগাছা তুলিয়ে মাটি আলগা করে দিয়েছিলেন। ফলে শীতের মরসুমেই সে বছর কিছু চাষের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল।

এইরূপে একাধিক ভাবে ফাটাপুকুরি পরিকল্পনা নানাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু কলোনিগুলির মধ্যে তা প্রথম। তার জন্ম ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। সমবায় ভিত্তিতে কৃষির পরীক্ষাও সেখানেই প্রথম।

(৩)

এরপর আমার বদলীর আদেশ এল। আমাকে চব্বিশ পরগণার জেলা-শাসকের পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। আলিপুরে আমাদের কেন্দ্রীয় আপিস।

এখানে এসে গ্রামাঞ্চলে নানা কাজ উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করবার সময় পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত উদ্বাস্তুদের তেমন ভিড় নজরে পড়ে নি। গ্রামাঞ্চলে কেবল কয়েকটি সরকার পরিচালিত উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবির নজর করেছি। সেগুলি অবস্থিত ছিল হাবড়া ও তার নিকটবর্তী গ্রাম বাইগাছিতে। যারা সরকারের ওপর সাহায্যের জন্য নির্ভরশীল নয় তারা প্রধানত ভিড় করেছে কলিকাতা অঞ্চলেই।

কলিকাতার উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার দু'রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। একদল উদ্বাস্তু কেবল বাসস্থানের সমাধানের জন্যই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়েছিল। উপার্জনের সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধান করে নিয়েছিল। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের সরকার দু'টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একটি ভাগে পড়ে তুলনায় ভাল অবস্থার পরিবার। থাকবার জায়গা পেলে তার ভাড়া দেবার ক্ষমতা রাখে। কেবল বাড়ি সংগ্রহ করাই এক্ষেত্রে সমস্যা। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুর জন্য সরকার অনেকগুলি বাড়ি হুকুম-দখল করেছিলেন। এবং তারপর তাকে ভাগ করে ছোট ছোট ফ্ল্যাটের আকারে বিভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দিতেন।

অন্য শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের অবস্থা তুলনায় তত স্বচ্ছল ছিল না। তাদের জন্য সরকারের বাড়ি সংগ্রহ করে দিতে হত এবং তার ভাড়া নিজে বহন করতে হত। এরা এইভাবে আবাসিক সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্নসমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নিত। গুরুসদয় রোডে, কলিকাতায় সমর বিভাগের অনেকগুলি কুঠি এখনও দেখা যায়। তার উত্তর অংশে যে কুঠিগুলি ছিল, সরকার এইভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করতেন।

আর এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু ছিল যারা এই দুই শ্রেণীর মত অন্নচিন্তার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছিল কিন্তু যাদেব আবাসিক সমস্যার সমাধানে সরকার কোনও সাহায্য করে উঠতে পারেন নি। তারা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করে নিতে উদ্যোগী হয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতি এবিষয় তাদের অনুকূল ছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে সৈন্যদের অস্থায়ী বাসের জন্য অনেক ব্যারাক নির্মাণ হয়েছিল। এখন যাকে বলি রবীন্দ্র সরোবর, তার উত্তর অংশে সাদার্ন এভনিউ ঘেঁষে অনেক ব্যারাক নির্মিত হয়েছিল। সেই রকম এই রাস্তার উপর দক্ষিণ অঞ্চলেও এক বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অসংখ্য ব্যারাক নির্মিত হয়েছিল। যুদ্ধ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি খালি হতে আরম্ভ করে। তার অব্যবহিত পরেই ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে। দেশে যখন স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এগুলি খালি হয়ে গিয়েছে। অপর পক্ষে স্বাধীনতার সঙ্গেই পূর্ববঙ্গ-ত্যাগী উদ্বাস্তু পরিবারদের ভিড় কলিকাতা অঞ্চলে জমতে থাকে। তাদের বাসস্থানের সমস্যা একদিকে, অপর দিকে এতগুলি খালি ব্যারাক পড়ে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাধান কোন পথে তার ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এই পথেই তাদের বাসস্থানের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিল। এই সব খালি ব্যারাকগুলিকেই তারা দখল করে নিয়ে নিজেদের বাসের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করল। এইভাবে লেক অঞ্চলের ব্যারাকগুলি উদ্বাস্তু পরিবারে ভরে গেল। নিউ আলিপুর অঞ্চলের অনেক ব্যারাকও উদ্বাস্তু পরিবার দখল করে নিল।

যাকে আমরা যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনি বলি তা কিন্তু ঠিক এই শ্রেণীতে পড়ে না। যে রাস্তা বজবজ লাইন পার হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে রেখে দক্ষিণে চলে গেছে, আরও খানিক দক্ষিণে তার পশ্চিমে একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এই রাস্তা-বরাবর পশ্চিমমুখী গিয়ে প্রায় মাইল দুই দূরে পশ্চিম প্রান্তে টালিগঞ্জের নেতাজী সুভাষ বসু রোডের সহিত মিলিত হয়েছে। এই রাস্তারই পূর্বদিক ঘেঁষে তার উত্তরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর লোকেদের অস্থায়ী বাসের জন্য এক রীতিমত উপনগরী গড়ে উঠেছিল। বাঁধান রাস্তা, সৈন্যদের থাকবার জন্য ব্যারাক এবং স্থানে স্থানে বড় বড় হলঘরযুক্ত বাড়ি তার মধ্যে ছিল। শ্রীসন্তোষকুমার দত্তের নেতৃত্বে এখানে একটি উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ গড়ে তোলবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল।

যাঁরা এই পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত ছিলেন তাঁরা ভাল সংগঠনের ক্ষমতা রাখতেন। এই পরিকল্পনায় লিখিত না হক, মনে হয় মৌখিক অনুমোদন তাঁরা সরকারের কাছ হতে পেয়েছিলেন। তারপর তাঁরা বসে থাকেন নি; জমি বিলি করে অল্পদিনের মধ্যে একটি সুবিন্যস্ত উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। রাস্তার সমস্যা আগে হতে সমাধান হয়ে গিয়েছিল। কারণ সামরিক বিভাগ হতে পূর্বেই তা নির্মাণ করা হয়েছিল। বড় হলঘরযুক্ত বাড়িগুলি তাঁরা বিদ্যালয় গড়ে তোলবার জন্য সংরক্ষিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে মুক্ত জায়গায় পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। এখানে যেসব পরিবার পুনর্বাসন নিয়েছিল তারা উদ্যোগী এবং নিজেদের অন্নসমস্যার সমাধান নিজেরাই করে নিয়েছিল। কলিকাতা অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের নিজেদের উদ্যোগে এইভাবে এখানেই প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

কাজেই চব্বিশ পরগণা জেলার ভার নিয়ে প্রথম দিকে আমায় উদ্বাস্তু সমস্যায় বেশি রকম জড়িয়ে পড়তে হয় নি। তবে এইভাবে বেশি দিন যায় নি। শীঘ্রই এই সমস্যার সঙ্গে রীতিমত জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তখন উদ্বাস্তু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি। আমি জলপাইগুড়ি থাকতে তিনি সেখানে একবার গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রায় সমগ্র জেলা সঙ্গে করে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনতে হয়েছিল। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। বিভাগীয় সচিব ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র এবং

মহাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীব্রজকান্ত গুহ। শ্রীগুহই আমাকে এই কাজের মধ্যে টেনে এনেছিলেন।

সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল দুই দিক হতে। প্রথমত বেশ কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার হাবড়া ও বাইগাছির আশ্রয় শিবিরে সরকারের আশ্রিত হয়ে বাস করছিল। তাদের সেভাবে বেশি দিন ফেলে রাখা যায় না। তাদের পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অপর দিকে নিউ আলিপুর অঞ্চলের এক বিরাট অংশ জুড়ে সেনা নিবাসের যে ব্যারাকগুলি নির্মিত হয়েছিল, তাতে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ তার জন্য ব্যাহত হচ্ছিল। ব্যারাকগুলি খালি না হলে ভাঙা যায় না। ভাঙা শেষ হলে তবে অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া যায়। কর্তৃপক্ষ তাই সরকারের নিকট ব্যারাকগুলি উদ্বাস্তুমুক্ত করবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে তো রাস্তায় বার করে দেওয়া যায় না। তাদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

এই সূত্রেই শ্রীব্রজকান্ত গুহ আমাকে স্মরণ করেছিলেন। একটা উপনিবেশ যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে একসঙ্গে দু'টি সমস্যারই সমাধান সম্ভব হয়। আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের সেখানে যেমন পুনর্বাসন দেওয়া যায় তেমন নিউ আলিপুরের ব্যারাকবাসী উদ্বাস্তুদেরও সেখানে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় যেমন কলিকাতা অঞ্চলে সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল তেমন পশ্চিম বাঙলার গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল। প্রশস্ত রাস্তা, অস্থায়ী ব্যারাক এসব তো ছিলই ; তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানে প্লেন রাখবার ব্যবস্থা ছিল এবং প্লেন ওঠবার ও নামবার জন্য 'রানওয়ে' ছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর এগুলি কোনও কাজে লাগছিল না। এখন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের কাজে এগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। এই কাহিনীর যথাস্থানে তার বিবরণ দেওয়া হবে। এখানে কেবল যেটির আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে আসছে তার কথাই বলব।

যুদ্ধের সময় হাবড়া অঞ্চলে একটি বিরাট সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল। সেখানে আকাশ বাহিনী রাখবার ব্যবস্থা ছিল। কাজেই যোগাযোগের রাস্তা ব্যতীত একটি বেশ দীর্ঘ বাঁধান 'রানওয়ে' নির্মিত হয়েছিল। সমগ্র এলাকাটির আয়তন হবে প্রায় পাঁচ বর্গমাইল। স্থানটি কলিকাতা হতে মাত্র সাতাশ মাইল দূরে। যশোহর রোডের ধারে অবস্থিত হওয়ায় রাস্তাযোগে এবং রেলযোগে কলিকাতার সহিত সংযোগ স্থাপন সহজ। পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ শ্রীব্রজকান্ত গুহ প্রস্তাব করলেন এই জায়গায় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তুললে কেমন হয়। আমি বললাম, ভালই হয়। তিনি তখন আমাকে এই উপনিবেশ গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিতে বললেন।

তখনও শীতকাল যায় নি। মাঘের শেষ হবে। আমি নজর দিলাম এখানে উপনিবেশ গড়ে তোলবার কাজে। এই সূত্রেই আমার দু'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সহিত আলাপ হয়। সে আলাপ পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের একজন হলেন জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু। অপরজন হলেন নির্মাণপর্ষৎ-এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের যেমন কর্মক্ষমতা তেমন অতি দ্রুত কাজ সম্পাদন করবার শক্তি। কাজেই পরে সমস্যা যতই জটিল হতে লাগল ততই তাঁদের ওপর বেশি করে নির্ভর করতে শিখেছিলাম। একথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তার জন্য কোন দিন পরিতাপ করতে হয় নি।

পরে কি আশ্রয় শিবির, কি উপনিবেশ খুলতে বা গড়তে হলেই এঁদের সহযোগিতা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ত। কলোনি গড়তে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবার জন্য ছিলেন শ্রীবসু এবং রাস্তা গড়তে বা অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গড়তে ছিলেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে একদিন হাবড়ার প্রস্তাবিত উপনগরীর জায়গাটা পরিদর্শনের জন্য হাজির হলাম। আলোচনার পর নক্সা করার একটা সিদ্ধান্ত হল। কোথায় রাস্তা বসবে, কোথায় বা বাসগৃহের প্লট বিলি হবে, কোথায় খোলা জায়গা থাকবে, কোথায় বিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গা সংরক্ষিত হবে তার ব্যবস্থা হল। নক্সা গড়ে তুলতে আমাদের একসঙ্গে অনেকবার সেখানে যেতে হয়েছিল। সেই সূত্রে মনে পড়ে সেখানে যে সময়টা কাটত তার সমস্তটাই কাজের কথা দিয়ে নিরেটভাবে ঠাসা থাকত না। কোথায় আমবাগানের স্নিগ্ধ ছায়া। সেখানে আমরা বসে কিছু সময় কাটিয়ে দিতাম। কোথায় পুরাতন দীঘির পাশে বাঁধা ঘাট। তার সামনে বসে আমরা মাছের খেলা দেখতাম। কোথায় কুল গাছে কুল ধরেছে। তার ডাল থেকে কুল পেড়ে দু-চারটে মুখে পুরে দিতাম। এইভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ করতাম। সেটা যেন আশা-না-করা অপ্রত্যাশিত উপরি-পাওনা।

হাবড়ার পরিকল্পনা একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে শেষকালে গড়ে উঠল। সেটা ঘটেছিল যে যুগ্মসমস্যার সমাধানের জন্য তার উৎপত্তি, তা হতে। আগেই বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে দুটি সমস্যার একসঙ্গে সমাধানের জন্য। একটি সমস্যা হল স্থানীয় হাবড়া ও বাইগাছি আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বাসস্থান সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় সমস্যা হল কলিকাতা নিউ আলিপুর অঞ্চলে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি সৈন্যদের পরিত্যক্ত ব্যারাক দখল করে বসে আছে, তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। সুতরাং একই জায়গায় গ্রামবাসী এবং শহরবাসীর বাসের উপযুক্ত কলোনি গড়তে হবে।

এই কারণেই ঠিক হল যে হাবড়ার উপনিবেশটির দু'টি অংশ থাকবে। একটি অংশ উপনগরী হিসাবে গড়ে উঠবে এবং অপর অংশটি গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে উঠবে। শহর অঞ্চলে বাসস্থানের জন্য যে প্লট বিলি হবে তা আয়তনে ছোট হবে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রশস্ত রাস্তা থাকবে। আর গ্রামাঞ্চলের অংশে বাসস্থানের সংলগ্ন অনেকখানি জায়গা থাকবে। সেখানে গাছ লাগাবার ও সবজি উৎপাদনের জায়গা থাকবে। প্রশস্ত বাঁধান রাস্তার সেখানে ততটা দরকার নেই। এই ভাবেই হাবড়ার কলোনির দু'টি অংশের পরিকল্পনা রচনা করা হয়। তার উপনগরী অঞ্চল পরে অশোকনগর নামে পরিচিত হয় আর গ্রামাঞ্চলের নাম দেওয়া হয় কল্যাণগড়। উভয় ক্ষেত্রেই এই নামকরণ স্থানীয় উদ্বাস্তুদের ইচ্ছা অনুসারে হয়।

গ্রামাঞ্চলের পরিকল্পনাতেই প্রথম হাত দেওয়া হয়। নক্সা তৈরি হবার পর বিলি করবার জমি দাগ কাটা হলে আমার কাছে অনুরোধ আসে নিউ আলিপুরের যেসব উদ্বাস্তু পরিবার সেনা বিভাগের পরিত্যক্ত জায়গায় বাস করছে তাদের হাবড়ায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাদের সম্মতি ভিন্ন তো তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

আমি তাই একদিন তাদের ওখানে গিয়েছিলাম। পরিবারগুলির নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করে আমি তাদের নূতন পরিকল্পনার কথা বললাম এবং পুনর্বাসনের কি সুযোগ-সুবিধা সরকার হতে দেওয়া হবে তাও জানালাম। এই বিষয় এই সময়ে মধ্যস্থতা করেছিলেন ব্যারিস্টার শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মৈত্র এবং বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। শ্রীমৈত্রের ফরিদপুরে বাড়ি। সেখানে যখন জেলা-জজ ছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত। কাজেই পূর্ব হতে পরিচয় ছিল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের সহিত এই প্রথম দেখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোসহীন যোদ্ধা হিসাবে তাঁর খ্যাতির সহিত পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, আলাপে এমন ঠাণ্ডা মানুষটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এই সূত্রে সমাজসেবক শ্রীনেপালচন্দ্র গুহের সহিতও আমার পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যস্থতায় আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নেতাদের কাছে যখন আমার প্রস্তাব নিয়ে গেলাম, তাঁরা জায়গাটি দেখতে চাইলেন। খুবই সঙ্গত প্রস্তাব। তার ব্যবস্থা করা হল। তাঁরা জায়গা দেখে পছন্দ করলেন। ফলে হাবড়া গ্রাম্য পরিকল্পনায় এই পরিবারগুলি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল।

যেদিন তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেদিনটির কথা খুবই মনে পড়ে। পুনর্বাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিবারগুলির স্থানান্তর করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সরকার তখন সবেমাত্র পরিবহণ বিভাগ খুলেছেন। তার বাঘমার্কা অনেকগুলি বাস এই সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছিল। এদিকে আমরা জীপে করে

পূর্ব হতেই উপস্থিত ছিলাম। বেশ মনে পড়ে, তাদের স্বাগত জানাতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মৈত্রও উপস্থিত ছিলেন।

এই পরিবারগুলি স্বেচ্ছায় এই স্থান নির্বাচন করেছিল বলে তারা প্রথম হতেই নিজেদের পুনর্বাসনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। নিজস্ব নির্দিষ্ট স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে ঘর তুলে, নানা ফলের গাছ রোপণ করে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্থানটির চেহারা পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। এই সূত্রে মনে পড়ে, একটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট দাগে একটি ছোট ডোবা পড়ে গিয়েছিল। বর্ষার প্রথম আবির্ভাবের পরেই তাদের বিশেষ ইচ্ছা হয় এখানে মাছ ছাড়বার। পরিবারের কর্তার তার জন্য একটি ছোটখাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবারও ইচ্ছা হয়েছিল। তাতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস এবং আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমরা দুজন তাতে সানন্দে সাড়া দিয়েছিলাম এবং একদিন বিকালে সেখানে গিয়ে পুকুরে মাছ ছেড়ে গৃহস্বামীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করেছিলাম।

হাবড়ার বেশ কয়েক মাইল উত্তরে যশোহর রোডের পশ্চিমে জয়তারা বলে একটি গ্রাম আছে। সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই কিছু অনাবাদী জমি পড়ে ছিল। পুনর্বাসন বিভাগের ইচ্ছা ছিল সেই জমিতেই তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তাদের কিন্তু সে জায়গাটা পছন্দ হচ্ছিল না। তাদের দলপতি দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে একটি জায়গা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, এই পরিবারগুলিকে সেখানে স্থানান্তরিত করে সেখানে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেন। এই সূত্রেই বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতী লীলা রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি ও শ্রীসুনীল দাস একদিন আমার সঙ্গে এই উদ্বাস্তু দলটির সমস্যা আলোচনা করেন এবং তাদের স্থানান্তর করবার প্রস্তাবটি আমার নিকট স্থাপন করে আমার সহায়তা চান।

আমার তখন মনে হয়েছিল, যেখানে তারা বসেছে সেটা একবার চোখে দেখে আসা দরকার। এ জায়গাটি তাদের অপছন্দ হবার সঙ্গত কারণ আছে কিনা দেখা প্রয়োজন। যদি থাকে তাহলে তাদের দক্ষিণে চলে যাবার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হবে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে ঠিক হয়—আমরা একদিন জয়তারাতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের যেখানে রাখা হয়েছে সেই জায়গাটি দেখে আসব। তার জন্য একটি দিন ধার্য করা হয় এবং ব্যবস্থা হয় বারাসাতের মহকুমা-শাসকও আমাদের সঙ্গে যাবেন। কারণ আশ্রয় শিবিরটি তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম। সঙ্গে শ্রীমতী লীলা রায় ও শ্রীসুনীল দাস ছিলেন। পথে বারাসাত হতে মহকুমা-শাসককে তুলে নিয়েছিলাম। তাঁর নাম মিঃ ভি এস. সি. বোনার্জি। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমান বাহিনরী

পদস্থ অফিসার ছিলেন। পথে তাঁর নানা কৌতুকপূর্ণ গল্প এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমাদের পথভ্রমণের ক্লান্তি যে অপনোদন করেছিল তা বেশ মনে পড়ে।

জয়তারা গিয়ে উদ্বাস্তুরা যেখানে আশ্রয় শিবির স্থাপন করেছে সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম। তাদের এখানে স্থায়ীভাবে বাস করবার অনিচ্ছার সপক্ষে কি যুক্তি আছে তা জানতে চাইলে তারা যা বলল তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়: তারা প্রধানত কৃষিজীবী। সুতরাং পুনর্বাসনের জন্য তাদের আবাদযোগ্য চাষের জমি চাই। কিন্তু তাদের চাষ করবার জন্য যে জমি দেবার প্রস্তাব হয়েছে, তা বালিতে ভরা। কাজেই সেখানে ফসল ভাল ফলবে না।

আমরা তখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি পরিদর্শন করতে গেলাম। তা আশ্রয় শিবিরের কাছেই অবস্থিত ছিল। আমরা দেখলাম, জমি বালিতে ভরা। কাজেই অন্য কাজের উপযুক্ত হলেও কৃষিজীবী পরিবারের পুনর্বাসনের তা উপযুক্ত নয়। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করলাম, পুনর্বাসনের মহাধ্যক্ষের নিকট তাদের প্রস্তাব সমর্থন করে চিঠি লিখব। এইভাবে শ্রীলীলা রায়ের প্রস্তাব আমি সমর্থন করে বসলাম। কিন্তু তার জন্য যে আমার এক অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, তখন আদৌ ভাবি নি।

যথাসময়ে এই পরিবারগুলিকে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে স্থানান্তর করবার প্রস্তাব আমি পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষের নিকট লিখিত আকারে পাঠালাম। তিনি আমার প্রস্তাব সমর্থন করে ত্রাণ বিভাগে বিবেচনার জন্য পাঠালেন। তার ফলে একদিন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয়ের সহিত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য আমার মহাকরণে ডাক পড়ল।

পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ শ্রীব্রজকান্ত গুহ আমাকে ত্রাণ সচিবের নিকট নিয়ে গেলেন। তখন ত্রাণ সচিব ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র। কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সম্মতি নিয়ে তিনি আমাদের দুজনকে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রীমহাশয় আমাদের স্বাগত জানিয়ে বসতে বললেন। তাঁরই কন্যা শ্রীআভা মাইতি তাঁর একান্ত সচিবরূপে বেশ দক্ষতার সহিত সম্পর্কিত কাগজপত্র স্থাপন করলেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যা সাধারণত চোখে পড়ে না—যে আগন্তুকদের চেয়ারে বসতে বলে এখানে আতিথেয়তার সমাপ্তি ঘটে না। সচিব মহোদয়া একটু পরেই আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক কাপ করে চা এনে দিলেন। চা এমন পানীয় যার ব্যবহারের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। সুতরাং আমারাও তার সদ্গতি করলাম। এখানে এটা বলে রাখা যেতে পারে যে এই মন্ত্রীর ঘরে এইভাবে আপ্যায়ন যে কচিৎ ঘটে তা নয়। কারণ নজর করেছি, যতবারই তাঁর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁর ঘরে এসেছি, তাঁর একান্ত সচিব চা পরিবেশন করেছেন। তা প্রমাণ করে, তিনি স্বভাবতই অতিথিবৎসল।

তারপর জয়তারার উদ্বাস্তুদের স্থানান্তর করবার প্রস্তাবটি উত্থাপিত হল। আমি তার সপক্ষে যুক্তিগুলি স্থাপন করলাম। জয়তারা পরিদর্শনে লব্ধ অভিজ্ঞতার কথাও বললাম। কিন্তু কাজ খুব বেশি দূর অগ্রসর হল না। অপ্রাসঙ্গিকভাবে নানা আলোচনার মধ্যে কার কোন জেলায় দেশ সে প্রশ্নটি উঠে পড়ল। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীমহাশয় আমাকে বললেন, আপনার দেশ তো ঢাকা বিক্রমপুরে। না?

আমি উত্তরে জানালাম, তাঁর অনুমান ভুল হয়েছে। কারণ আমার কলিকাতায় জন্ম। সুতরাং আমি কলিকাতার মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের ছেলে।

আলাপ আলোচনার পর আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আমার প্রস্তাবমত এই পরিবারগুলিকে দক্ষিণে তাদের মনোনীত স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। তিনি বললেন, পরে তিনি এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে তিনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং পরিবারগুলিকে দক্ষিণে পাঠান হয়েছিল।

এইবার তার জের হিসাবে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটেছিল তা বলার সময় হয়েছে।

জেলা-শাসক হিসাবে আমার আপিস ও বাসস্থান ছিল একই বাড়িতে। আলিপুরের ১নং থ্যাকারে রোডে প্রেসিডেন্সি জেলের সংলগ্ন স্থানে তা অবস্থিত। এই বাড়িতে বিখ্যাত ইংরেজ কথাসাহিত্যিক থ্যাকারে বাল্যকালে কয়েক বৎসর কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নামেই এই রাস্তার নাম। বহু প্রাচীনকালের বাড়ি। আমি বাস করতাম দোতালায় আর আপিস করতাম একতলায়। একদিন বিকালের দিকে সেখানে বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় এসে হাজির।

আমি তাঁকে ডেকে এনে আপিস কামরায় যেখানে বসে কাজ করি সেখানে বসালাম। ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়েছিল। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে গ্রামাঞ্চলে উদ্বাস্তু ছাত্রদের একটি আবাসিক কেন্দ্রের তিনি ভার নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সরকারী সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে তিনি আসতেন। পরস্পরের ব্যবহারে হৃদ্যতাও খানিকটা গড়ে উঠেছিল।

সেদিন কিন্তু প্রথম হতেই তাঁর ভিন্ন মূর্তি লক্ষ্য করলাম। তিনি সোজাসুজি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি শ্রীমতী লীলা রায়কে সঙ্গে নিয়ে জয়তারা উদ্বাস্তু কলোনিতে সম্প্রতি গিয়েছিলাম কিনা।

এ প্রশ্নের কারন আমি প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। অর্থাৎ এই ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে পাই নি। তবে তাঁর প্রশ্নের ধরন আমার ভাল লাগে নি। এযেন আমার ওপরওয়ালা আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবার ভঙ্গিতে আমাকে প্রশ্ন করছেন।

আমি তাই তাঁকে উত্তরে জানালাম, গিয়েছিলাম বৈকি, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

তিনি বেশ রুষ্ট হয়ে তার উত্তরে যা বললেন, তার মর্ম হল এই: শ্রীমতী লীলা রায় হলেন কংগ্রেসের বিরোধী দলের নেতা আর বর্তমান সরকার কংগ্রেস দল কর্তৃক পরিচালিত। সুতরাং সরকারী কর্মচারী হয়ে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কিত কাজে প্রতিপক্ষের নেতার সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত হয় নি।

এ বিষয়ে আমার মত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে দেশ বিভাগের ব্যবস্থা হতে। সুতরাং উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনমত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারের। কাজেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোনও উদ্বাস্তু পরিবারের কাছ হতে সাহায্যের আবেদন পেলে আমার কর্তব্য হবে সে বিষয় তদন্ত করা এবং সরকার তাদের জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছেন তার সুযোগ দেওয়া। এক্ষেত্রে কার মারফত কোন উদ্বাস্তু পরিবার আমার কাছে এল, সে প্রশ্ন অবান্তর। তারা সোজা আসতে পারে, রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ সমাজসেবকের সঙ্গে আসতে পারে বা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গেও আসতে পারে। কংগ্রেস বিরোধী দলের কোনও নেতা এই পরিবারগুলির আবেদন স্থাপন করেছেন বলে তা প্রণিধানযোগ্য হবে না, এ নীতি আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম না।

এ সম্বন্ধে নিয়োগী মহাশয়ের নিজস্ব মত একটা থাকতে পারে তা স্বীকার্য। তা আমার কাছে স্থাপন করার জন্য আমি ততটা রুষ্ট হই নি, যতটা হয়েছিলাম তার বলার ধরনের জন্য। যেন তিনি আমাকে নির্দেশ দেবার অধিকার রাখেন, এই ভঙ্গিতেই তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। সেইখানেই আমার বিশেষ আপত্তির কারণ।

আমি তাই তাঁকে মোটামুটি স্পষ্ট কথা নিজেও প্রত্যুত্তরে কিছু শুনিয়ে দিয়েছিলাম। জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি এবং আমার মতে আমার কর্তব্য হল কোন উদ্বাস্তু পরিবার যে কোন সূত্রে বা যে কোনও দলের মারফত আসুক, আমি তার কথা শুনে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। আমার মতে তাই হল আমার কর্তব্য। আমি আরও বলেছিলাম যে এবিষয় তার আমাকে কোন নির্দেশ দেবার অধিকার আছে স্বীকার করি না। সুতরাং সরকারের কাছ হতে লিখিত আকারে তাঁর মতের অনুবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এক্ষেত্রে যা করেছি তাই করে যাব।

আমার প্রত্যুত্তর শোনার পর তিনি আর কিছু বলেন নি। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে তিনি উঠে চলে গেলেন।

বলা বাহুল্য সরকার হতে তাঁর মতের সমর্থক কোনও নির্দেশ বা উপদেশ লিখিত বা মৌখিক আকারে আমার কাছে আসে নি।

দুই

এই সময় কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে আমার আবার বদলীর আদেশ এল। প্রায় দু'বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে পূর্বপাকিস্তান হতে অনেকে পশ্চিম বাঙলায় চলে এসেছে। প্রথমে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার এসেছিল, পরে বাস্তুত্যাগীর আসার হার কমে গিয়েছিল। এখন প্রায় থেমে গিয়েছে। রাণাঘাটে একটি আশ্রয় শিবির সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল, রূপশ্রী পল্লী। সেখানে আশ্রয়প্রার্থী আসা প্রায় থেমে গিয়েছিল। এক রকম বলা চলে দেশ বিভাগের ফলে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তার আনুষঙ্গিক ফল প্রায় থেমে এসেছিল। তাই উদ্বাস্তু সমস্যা একটি স্থিতাবস্থা লাভ করেছিল।

এর ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার পরিমাণ কতখানি, একরকম আন্দাজ করা যাচ্ছিল। মোটামুটি যারা এসেছিল, তারা তিনভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছিল। যারা উদ্যমশীল এবং তুলনায় অবস্থাপন্ন তারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। যারা তুলনায় তত অবস্থাপন্ন নয় অথচ উদ্যমশীল, তারা সরকারের আশ্রয় শিবিরে না গিয়ে, পরিত্যক্ত বা খালি বাড়িতে বা পতিত জমিতে অস্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করে নিজেদের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছিল। আর এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু ছিল যারা দরিদ্র এবং যাদের এমন মনের বল নেই যে আংশিক-ভাবেও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে। এরাই সরকারের আশ্রয় শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মোট সংখ্যা তখন দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ হাজারের মত।

উদ্বাস্তু সমস্যাটি তখন এক রকম এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আর নূতন পরিবার আশ্রয় শিবিরে আসছে না। যারা এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিলেই তখনকার মত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অথচ এরা পুনর্বাসনের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের মুখাপেক্ষা। সরকারকেই সুতরাং এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ এপর্যন্ত স্রোত একমুখী ছিল। আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তু আসে, কিন্তু সেখান হতে যায় না, কারণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে তো তারা যেতেও পারে না। ওদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও এবিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। তার জন্য তাঁরা ষাট লক্ষ টাকা বরাদ্দও করেছিলেন।

তখন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে তিনি এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ঠিক এই সময় পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ শ্রীব্রজকান্ত গুহ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলেন। এই

ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ডাঃ রায় নিজে একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। মোটামুটি তিনি এই সমস্যাটির ভার নিজে নিয়ে তার দ্রুত সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ এবং ত্রাণ সচিবের পদ এতকাল ভিন্ন ভিন্ন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এই দুটি পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর ধারণায়, তাহলে ডিপার্টমেণ্ট ও ডাইরেকটোরেট একযোগে কাজ করবে এবং একাজ ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত ডাঃ রায় ঠিক করলেন পুনর্বাসনের কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হবে। এতকাল পুরাতন ত্রাণ বিভাগই উদ্বাস্তুদের কাজ দেখে আসছিল। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে গুরুত্ব দিতে হলে তাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর দূরদর্শিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরে যখন পুনর্বাসনের দায়িত্ব আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, তখন এই ব্যবস্থা খুব কাজ দিয়েছিল।

তৃতীয় যা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তা হল তিনি নিজেই এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তা হতে বোঝা যায়, তিনি এ বিষয় কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে এই নূতন বিভাগ কাজ করলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

এই নূতন পরিস্থিতি মূলত আমার বদলী হবার কারণ। হঠাৎ আমাকে পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ এবং পুনর্বাসন সচিবের কার্যভার গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হল। ওদিকে নূতন বিভাগের দায়িত্ব ডাঃ রায় নিজে গ্রহণ করলেন। সুতরাং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে আমি চব্বিশ পরগণার জেলা-শাসকের পদ ত্যাগ করে এই নূতন গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।

কার্যভার গ্রহণের পর ডাঃ রায় তাঁর পরিকল্পনাটি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। মোটামুটি তখন আমার কাজ হবে ভারত সরকারের বরাদ্দ টাকার সাহায্যে সেই আর্থিক বৎসরের মধ্যেই আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই কাজে সাহায্য এবং পরামর্শদানের জন্য তিনি একটি পুনর্বাসন বোর্ডও স্থাপন করলেন। সেই বোর্ড সভাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীজে. কে. মিত্র। পুনর্বাসন মন্ত্রী পদাধিকার বলে ডাঃ রায় হলেন তার সভাপতি।

এর অব্যবহিত পরেই ডাঃ রায় দু'মাসের জন্য বিলাতভ্রমণে চলে গেলেন। অস্থায়ীভাবে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজস্ববিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ পুনর্বাসন মন্ত্রী হলেন।

যথাসময় পুনর্বাসন বোর্ডের প্রথম সভা ডাকা হল। কিন্তু প্রথম সভাতেই একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাল। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বোর্ডের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল নূতন ধরনের। তাঁর মতে, বোর্ডের কাজ হবে প্রতিদিন পুনর্বাসন সচিবের সঙ্গে বসে তাঁর ফাইলগুলি দেখা এবং সে সম্বন্ধে প্রতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। অন্য সভ্যদের মত হল, বোর্ডের কাজ হবে পুনর্বাসন সচিব যে সমস্ত বিষয়ে বোর্ডের পরামর্শের জন্য স্থাপন করবেন, তার উপদেশ তাতেই সীমাবদ্ধ রাখা। তবে সচিবের কাজের সুবিধার জন্য সাধারণভাবে বোর্ড কতকগুলি নীতি বেঁধে দিতে পারেন। দুই দলের কেহই নিজস্ব মত ছাড়তে বা বোঝাপড়া করতে প্রস্তুত নন। কাজেই এ বিষয় কোনও মীমাংসা হল না। ফলে ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতে বোর্ডের কাজ বিশেষ অগ্রসর হল না।

তিনি যখন ফিরি এলেন, এই অচল পরিস্থিতির বিষয় তাঁকে অবহিত করা হল। আবার বোর্ডের সভা ডাকা হল। তুমুল তর্ক হল। ডাঃ রায় শ্রীসতীশ-চন্দ্র দাশগুপ্তের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। সুতরাং শ্রীদাশগুপ্ত সভ্যপদ ত্যাগ করলেন। তারপরে বোর্ড অবহেলিত হয়ে পড়ে রইল। ক্রমে তার কথা লোকে ভুলে গেল।

শ্রীদাশগুপ্ত যে কয়েক সপ্তাহ উদ্বাস্তু বিভাগের সহিত জড়িত ছিলেন, তখন তিনি যে কোনও কাজ করেন নি, তা নয়। ঠিক বলতে কি, তাঁর কর্তব্যবোধ এবং কর্মনিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন প্রতিদিন তিনি সোদপুর হতে আমাদের আপিসে আসতেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে দৈনিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে পরামর্শ দিতেন। উদ্বাস্তু সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার কথা উঠেছিল। সেই সূত্রে তিনি আমাকে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ রায়ের কর্মদক্ষতা অসাধারণ। একটি সামান্য চিকিৎসা-কেন্দ্র হতে তিনি কি বিরাট হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক বলতে কি, এই সব আলোচনার সূত্র ধরেই পরে এখানে উদ্বাস্তুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। যারা হাসপাতালে থাকবে না, তাদের জন্য একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্রও এখানে খোলা হয়েছিল।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সহায়ক হিসাবে শ্রীদাশগুপ্ত কুটির শিল্প গঠনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর সোদপুর আশ্রম। মৌমাছির চাষ, গো-পালন, দেশলাই উৎপাদন প্রভৃতির নানা ব্যবস্থা সেখানে ছিল। তাঁর আশ্রমে আমাকে নিয়ে

গিয়ে তার বিভিন্ন বিভাগের কাজের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে কুটির শিল্প কিভাবে গঠন করতে হয় সে বিষয় আমার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল।

(২)

এই সময়ে ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু আমাদের গভর্নর ছিলেন। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক নেতা। একাধারে পণ্ডিত, কীর্তিমান আইনজীবী ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী হওয়ায় তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। তাঁর সহিত পরিচয়ের ফলে আমি তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক আবিষ্কার করেছিলাম যা তাঁর প্রতি আমাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। তা হল তাঁর হৃদয়বত্তা। উদ্বাস্তুদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে সহানুভূতিপরায়ণ ছিলেন।

এই সূত্রেই আমার তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল। পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার পর তিনি যতদিন পশ্চিম বাঙলায় ছিলেন, প্রতিমাসে নিয়মিত উদ্বাস্তুদের বিষয় আলাপ করবার জন্য তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। পুনর্বাসনের কাজ কেমন এগোচ্ছে, কোনও বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয় উত্থাপন করতেন। ফলে আমাদের আলোচনা বেশ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হত। উদাহরণস্বরূপ একটি কথা উত্থাপন করা যেতে পারে।

বেশ মনে পড়ে, একবার প্রশ্ন উঠেছিল উদ্বাস্তুদের জন্য ভূমি সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ঠিক বলতে কি, আমার মফস্বলে ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পতিত এবং অব্যবহৃত জমির সন্ধান করা। সেইজন্য নক্শা হাতে নিয়ে গ্রামের পথে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়তাম। প্রসঙ্গত এই কথা তাঁকে জানালে পরে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, ছোট প্লেন ভাড়া করে তাতে চড়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে একাজ আরও দ্রুত সম্পাদিত হবে।

ডঃ কাটজু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ফুলিয়াতে একটি উদ্বাস্তু উপনগরী গড়ে উঠেছিল। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নামে তার নামকরণ হওয়া উচিত। কারণ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতে ছিলেন ভারতের জাতীয়তা-বোধের জনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁর সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, ফুলিয়ার উপনিবেশ ফুলিয়া নামেই এখন পরিচিত। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সহিত সংযুক্ত হলে তার মর্যাদা বাড়ত বৈ কমত না।

ঠিক এই সময় কলিকাতার সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ করে—দক্ষিণ দিকে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ব্যাপকভাবে পতিত জমি দখল করে বাস করতে আরম্ভ করে।

ব্যাপারটা ঘটত এইভাবে। কলিকাতা মহানগরীর স্বভাবতই একটা বিস্তারের দিকে গতি আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির অনুপাতে বহিরাংশে পতিত জমি উদ্ধার করে নূতন আবাসিক অঞ্চল গড়ে ওঠে। এই স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই বালিগঞ্জে নূতন নূতন আবাসিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ঠিক স্বাধীনতার পূর্বে হিন্দুস্থান ইনসিউরেন্স কোম্পানির তত্ত্বাবধানে এই ভাবেই নিউ আলিপুর আবাসিক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। আরও দক্ষিণে তুলনায় ধনী পরিবারদের জন্য রিজেন্ট পার্ক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল।

এই আবাসিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ কতকগুলি বিত্তবান মানুষের হাতে চলে গিয়েছিল। কারণ একাজে মুনাফা লাভের সুবিধা প্রচুর। যেদিকে আবাসিক অঞ্চলের বিস্তার ঘটছে সেই অঞ্চলে চাষের জমি অল্প মূল্যে কিনে পতিত রেখে দেওয়া হত। তারপর চাহিদা বাড়লে সেখানে জমির উন্নয়ন-সাধন করে, রাস্তা বাহির করে জমি বহু দাগে ভাগ করে বিক্রয় করা হত। তাতে যে মূলধন নিয়োগ হত, তা অনেকগুণ হয়ে তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীর হাতে ফিরে আসত।

স্বভাবতই উদ্বাস্তুদের আগমনের পর এই ধরনের জমিগুলির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়েছিল। কলিকাতার সংলগ্ন জমি। এখানে একবার বসতে পারলে জীবিকা-অর্জনের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। আইনসঙ্গত ভাবে মালিকের কাছে অর্থ দিয়ে দলিল করে কেনবার সামর্থ্য বা সময় নেই। আবাসিক সমস্যার যে তখনি সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের চাপে পরিবারগুলি জবর-দখলের পথ অবলম্বন করল। পথটি আইনসিদ্ধ নয়, কিন্তু একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অনেকেরই যখন এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখন বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয়ে তাদের আইনসম্মত পথে চলা সম্ভব হল না। সুতরাং নানা স্থানে এই পতিত জমিগুলির ওপর জবরদখল উপনিবেশ গড়ে উঠল।

কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে সবার প্রথম যে উপনিবেশ উদ্বাস্তু পরিবারদের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, তা হল বিজয়গড় কলোনি। তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার ইতিহাস কিছু স্বতন্ত্র। সরকারের হুকুমদখল করা জমিতে সৈন্যদের জন্য যে ছাউনি গড়ে উঠেছিল, যুদ্ধসমাপ্তির পর সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। তারপর শ্রীসন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে এই পরিবারগুলি এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করবার কথা সরকারের নিকট উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবের সম্মতিসূচক ইঙ্গিত যে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট পেয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই কারণে এটিকে ঠিক সাধারণ জবরদখল কলোনির সমস্থানীয় জ্ঞান করা যায় না। তাদের কর্মোদ্যম এবং সংগঠন শক্তি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কলোনিটির স্থায়িরূপ দিয়ে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হতে জবরদখল কলোনিগুলি ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে লাগল। অনেকগুলি পরিবার দলবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ স্থান নির্বাচন করত। তারপর তার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হতেন। তারপর একদিন আকস্মিকভাবে একযোগে পরিবারগুলি এসে জায়গাটি দখল করে নিত। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিবারকে জমি বিলি করা হ'ত। তারাও বাঁশের খুঁটি ও হোগলার বেড়া দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দখল বজায় রাখার মত একটা ঘর তুলে নিত। উন্মুক্ত পতিত জমিতে আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত দখলের কাজ এইভাবে সমাপ্ত হয়ে যেত বলে মালিক বাধা দেবার সুযোগ পেত না। আর দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় এতগুলি পরিবারের সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা কোন কাজও দিত না। কলোনিগুলির স্বাধীনতাসংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা বা শহিদদের নামে নামকরণ হত। এইভাবে যাদবপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বাঘা যতীন কলোনি, নেহেরু কলোনি, নেতাজী কলোনি প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।

এই বিষয়টির প্রতি ডঃ কাটজুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। চিরকাল আইনের সেবা করে আইনে যা অসিদ্ধ, তার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ স্পর্শকাতর ছিলেন। উদ্বাস্তুদের অস্বাভাবিক সমস্যার যে সমাধানের প্রয়োজন, তা তিনি খুবই উপলব্ধি করতেন। কিন্তু তাঁর মনে হত, এই সমস্যাটির আইনসঙ্গতভাবে সমাধান করা যায় না কি? তাঁর তাই ইচ্ছা হল, এই জবর দখল কলোনিগুলি একবার পরিদর্শন করে তাতে যারা বাস করছে, তাদের সহিত এবিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখেন।

এই সূত্রেই তাঁর একান্ত সচিব শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায় আমাকে স্মরণ করলেন। ডঃ কাটজুর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাকে সবিস্তার অবহিত করে আমার কাছে জানতে চাইলেন, এইভাবে জবরদখল কলোনি পরিদর্শন করা যায় কিনা। আমি তাতে আপত্তির কারণ বা বিপদের কোনও আশঙ্কা দেখলাম না। আমি তাঁকে সঙ্গে করে বিভিন্ন কলোনি দেখিয়ে নিয়ে আসবার ভার নিলাম। ঠিক হল ১৯শে আগস্ট তারিখে তাঁকে দক্ষিণের কলোনিগুলি দেখিয়ে নিয়ে আসব।

রসা রোডের ট্রাম ডিপোর দক্ষিণ ঘেঁষে দক্ষিণ-পূর্বে রিজেণ্ট পার্কের দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে। এখন তার নাম হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড। যাদবপুর অঞ্চলে হতে পূবদিক হতে, বিজয়গড় কলোনির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটি রাস্তা পশ্চিমদিকে এসেছে। সেই রাস্তা যেখানে নেতাজী সুভাষ রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সামনে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। তার স্থানীয় নাম 'রানী কুঠি'। তার ঠিক উত্তরে অনেকখানি পতিত জমি পড়ে ছিল। জায়গাটি সবে উদ্বাস্তু পরিবারের দখলে এসেছে। পূর্বদিকে আর একটু দূরে নেহেরু কলোনি অবস্থিত। তার বয়স একটু প্রাচীন। তার পূর্বে বিজয়গড়

কলোনি। এ অঞ্চলে তখন অন্য কলোনি বড় একটা গড়ে ওঠে নি। আমরা ঠিক করেছিলাম সেখানেই ডঃ কাটজুকে নিয়ে যাব।

আমরা যথাসময়ে হাজির হয়েছিলাম। দলে ডঃ কাটজু ছিলেন, তাঁর একান্ত সচিব ছিলেন আর আমি ছিলাম। মনে হয় উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আগে হতে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে ডঃ কাটজু আসবেন। জায়গাটা যে অতি সম্প্রতি জবরদখল হয়েছে, তার চিহ্ন তখনও পড়ে ছিল। কোথাও আধপাকা বাড়িও ওঠে নি। বিভিন্ন পরিবার বাঁশের খুঁটির ওপর হোগলার ছাউনি দিয়ে আর হোগলার বেড়া দিয়ে বাস করছে। দু একটি হোগলার ঘর খালি পড়ে ছিল। তারই একটিতে তাঁকে স্বাগত জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এত দুর্দশার মধ্যেও তারা স্বাধীন সরকারের স্বদেশী গভর্নরকে সম্মান করবার কথা ভোলে নি!

আয়োজন অতি যৎসামান্য হলেও অন্তরকে তা স্পর্শ করে। একটি টেবিল এনে পাতা হয়েছে, কোথা হতে জানিনা ; একটি নকশা-কাটা সুদৃশ্য ঢাকনি তার ওপর পাতা হয়েছে। গুটি তিনেক চেয়ারও জোগাড় হয়েছে। একটি ফুলদানিতে কিছু ফুল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। যারা সর্বস্ব হারিয়ে এসেছে তাদের বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাবার আয়োজনে কোনও ত্রুটি নেই। ডঃ কাটজু আসবামাত্রই একটি ছোট বালিকা তাঁর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে স্বাগত করল। তারপর আমাদের সেই টেবিল ঘিরে বসতে বলা হল। অথচ আমরা চেয়ারে বসে এদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে আলাপ করতে পারব তা কল্পনাও করতে পারি নি।

তারপর যা ঘটল, তা আমাদের আশ্চর্য করে দিল। দলের নেতা শ্রীশৈলেন চৌধুরী জানালেন যে মহামান্য অতিথির চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁরা সামান্য কিছু আয়োজন করেছেন এবং ব্যবস্থা অনুসারে কাজ শুরু করবার অনুমতি চাইলেন। ডঃ কাটজু সানন্দে অনুমতি দিলেন। তারপর একটি করে ছোট ছেলে বা মেয়ে এসে আবৃত্তি বা গান করে আমাদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। এটা অনুমান করা শক্ত নয়, যে যারা জমি কিনে বাড়ি করবার ক্ষমতা রাখে না তারা দরিদ্র। তবু তাদের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তাদের এই আবৃত্তি ও গানে পারদর্শিতা হতেই অনুমান করা যায়।

ডঃ কাটজু সংবেদনশীল হৃদয়বান মানুষ। তিনি এই আনন্দ পরিবেশনটুকু শুধু উপভোগ করলেন না, তার তাৎপর্যও উপলব্ধি করলেন। ঠিক বলতে কি, তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখেছ এত দুর্দশার মধ্যেও ওরা সাংস্কৃতিক চর্চা অক্ষুন্ন রেখেছে।

আমি উত্তরে বলেছিলাম যে সেটা খুবই সত্য এবং তা আরও প্রমাণ করে, তাদের নিজের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ কত গভীর। ঠিক বলতে সেই জন্যই তো তারা দেশত্যাগী হয়েছে। তিনি এ মন্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করেছিলেন।

এইভাবে সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠান শেষ হবার পর যে প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে এসেছিলাম সেই প্রশ্নটি ডঃ কাটজু নিজেই উত্থাপন করলেন। তিনি কলোনির নেতাদের উদ্দেশ করে সোজা বললেন যে অপরের জমির ওপর এই রকম জবরদখল করে ঘর তোলা অন্যায় হচ্ছে না কি?

তাঁরা স্বীকার করলেন, যে একহিসাবে হচ্ছে, কিন্তু সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ জানাতে চাইলেন যে এ ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। মোটামুটি তাঁদের কথার মর্ম হল এই যে তাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাঁরা গৃহত্যাগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে এমন সম্বল কোথায় যে টাকা দিয়ে জমি কিনবেন? আর এত মানুষ একসঙ্গে জমি কিনতে গেলে মালিক কি দয়া করবে, না আরও দর বাড়িয়ে দেবে? অগত্যা পরিবেশের চাপে বাধ্য হয়েই তাঁরা এইভাবে আইনবিরুদ্ধ উপায়ে জমি সংগ্রহ করেছেন।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে তাঁদের এই যুক্তির ডঃ কাটজু বিশেষ বিরোধিতা করতে পারলেন না। তিনি তখন আমাকে বললেন, এমন কিছু করা যায় না কি যাতে সরকার জমি হুকুমদখল করে ন্যায্য দামে কিনে নিয়ে এদের মধ্যে বিলি করে দিতে পারেন? তা সম্ভব হলে তো তাদের এমনভাবে জমি জবরদখল করে আইনবিরুদ্ধ আচরণ করতে হয় না।

আমি উত্তরে বললাম, সেটা সম্ভব এবং তার সপক্ষে কিছু যুক্তিও আছে। প্রথমত হুকুমদখল আইন প্রয়োগ করলে জমি দখল নেওয়া ত্বরান্বিত হবে। দ্বিতীয়ত নূতন যে আইন পাশ হয়েছে (ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন) তাতে ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যে মূল্য প্রচলিত ছিল, সেই মূল্যেই জমি পাওয়া যাবে। ফলে দেশের এই দুর্দিনে কৃত্রিম চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে মালিক অযথাভাবে মুনাফা নিতে পারবে না। তবে কথা হচ্ছে, সরকার যে জমি দখল করবেন তা উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পছন্দমত যদি না হয়, তাহলে তারা সরকার কর্তৃক সংগৃহীত জমিতে উঠে যেতে নাও সম্মত হতে পারে।

এই মন্তব্যের উত্তরে ডঃ কাটজু একটি সুন্দর প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তু পরিবারদের প্রতিনিধি তাদের পছন্দমত জমির সন্ধান এবং বিবরণ এনে দিতে পারেন। তার ভিত্তিতে জমি হুকুমদখল হলে সেখানে নিশ্চয় তারা উঠে আসবে।

তাঁর এই প্রস্তাবে উদ্বাস্তুদের নেতারা তখনি রাজী হয়ে গেলেন। তাঁদের নেতা শ্রীশৈলেন চৌধুরী আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁরা তাঁদের পছন্দমত নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত জমির সন্ধান আমাকে দিয়ে যাবেন।

এখান থেকে উঠে ডঃ কাটজু পূর্বদিকে অবস্থিত আরও দু'একটি কলোনি দেখলেন। সেখানে কলোনিগুলি কয়েকমাস আগেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

কাজেই সেখানে আর হোগলা পাতার ছাউনি দেখা যায় না, সেখানে বাস করার জন্য অনেক আধপাকা বাড়ি উঠেছে। শালের খুঁটি, বাঁশের বেড়া এবং টিনের ছাদ, এই হল সাধারণ ক্ষেত্রে বাড়ির উপকরণ। এখানেও উদ্বাস্তু কলোনির অধিবাসীরা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে প্রথম কলোনির স্বাগত জানাবার ব্যবস্থার অনুসরণ করবার তাদের সুযোগ হয় নি। মৌখিক কিছু আলাপের পরেই তিনি তাদের কাছ হতে বিদায় নিয়েছিলেন।

সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর নূতন পরিবেশে সেদিন একটি বিষয় লক্ষ্য করে ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম। রাজ্যপাল স্বয়ং এসে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন, তাদেরই একজনের মত হয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, সঙ্গে খালি একান্ত সচিব ও এ ডি সি। এ এক অভিনব দৃশ্য। পরাধীনতার যুগে তো আমরা দেখেছি, এ অবস্থায় কত আড়ম্বর, কত সেপাই শান্ত্রী, নিরাপত্তার জন্য কত না ব্যবস্থা। এখন দেশের মানুষ রাজ্যের নায়ক, জনগণের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। কাজেই এসবের প্রয়োজন ছিল না।

এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারদের আইনসঙ্গত উপায়ে কলোনি স্থাপনে উৎসাহিত করবার চেষ্টা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা বলে নেওয়া যেতে পারে।

এই বিশেষ কলোনিটির নেতা শ্রীশৈলেন চৌধুরী তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি এই অঞ্চলেই একটি বড় বাগানবাড়ির সন্ধান আমাকে দিয়েছিলেন। জায়গাটির নাম ডালগ্রিসের বাগান। টালির নালা বা আদিগঙ্গা যেখানে পুব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে তখনকার দিনে টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির দক্ষিণ সীমা চিহ্নিত করছিল, তারই সমান্তরাল একটি রাস্তা গিয়েছে। তার নাম তখন বাঁশদ্রোণী রোড। তার উত্তর দিকে এই বাগানবাড়িটি অবস্থিত।

এই কলোনির উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে যথাসময় এই বাগানবাড়ি হুকুমদখল করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনা-প্রণয়নের পর এই কলোনির উদ্বাস্তুদের বাস্তু জমি বিলির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল। তারা রানীকুঠির সামনে জবরদখল-করা জায়গা ত্যাগ করে ওই নূতন কলোনিতে এসে ঘর তুলেছিল।

এইভাবেই এই অঞ্চলে নাকতলা এক নম্বর কলোনি গড়ে উঠেছিল। এখন তা এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, গ্রন্থাগার আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়িও সেখানে গড়ে উঠেছে।

তবে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে নিয়ে এইভাবে আইনের অনুগামী হয়ে কলোনি গড়ে তোলবার চেষ্টা আমাদের সফল হয় নি। কেবল এই একটি স্থানেই তা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলও ছিল অস্থায়ী, কারণ কয়েক মাস বাদে যে জমি

জবরদখলকারীদের স্থানান্তরিত করে মুক্ত করা হয়েছিল, তা নূতন উদ্বাস্তু পরিবার জবরদখল করে নিয়েছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই জবরদখল করে কলোনি স্থাপনের রীতি অত্যন্ত বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল, তখনকার জটিল পরিস্থিতি। কলিকাতার উপকণ্ঠেই অনেক অব্যবহৃত পতিত জমি পড়ে ছিল। সেখানে বাসস্থান করতে পারলে জীবিকা অর্জনের সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। অন্য দিকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। অগণিত পরিবারের যখন এই সমস্যা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে মালিকের তরফ হতে বাধা বিশেষ আসবে না। সুতরাং পরিবেশ সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল বলে ডঃ কাটজুর সেই শুভকল্পনা সফল হয় নি।

(৩)

এই সময় জীওন সিং নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সূত্রেই আমার পরিচয় হয়। খিদিরপুর ছাড়িয়ে যে রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিমে বজবজের দিকে চলে গেছে, তার পাশে সন্তোষপুর নামে একটি জায়গা আছে। সেখানেও গত মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের থাকবার ছাউনি ছিল এবং যুদ্ধের পর সেগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। একাধিক বড় দীঘি সমেত সেখানে অনেকখানি পতিত জায়গাও পড়ে ছিল।

জীওন সিংজি সেখানে তাঁর আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই মানুষটি মনে গভীর রেখাপাত করার ক্ষমতা রাখেন। আর কিছুর জন্য না হক, তার দৈহিক আয়তনের জন্য। আমাদের এঅঞ্চলে এমন বিরাটকায় মানুষ দেখা যায় না। উচ্চতায় বোধহয় সাড়ে ছয়ফুট হবেন। বুকের ছাতি ও হাত-পা সেই অনুপাতে গড়া। পাঞ্জাবের আবহাওয়াই এমন আকৃতির মানুষ গড়বার ক্ষমতা রাখে। তার ওপর তাঁর গুম্ফ ও শ্মশ্রু শোভিত বদনমণ্ডল তাঁকে আরও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এত বড় দেহের ওপর আবার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। এহেন মানুষকে একবার দেখলে কি ভোলা যায়? চেহারার অনুপাতে মানুষটি ঠাণ্ডা। কথা ধীরে ধীরে বলেন। আচরণে উগ্রতা প্রকাশ পায় না, বরং বেশ মিষ্টভাষী।

তিনি ভারত-সরকারের অনুমতি নিয়েই এখানে আস্তানা স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনা রূপায়িত করবার জন্য ভারত সরকার তাঁকে লক্ষাধিক টাকাও দিয়েছেন। সেই সূত্রেই তাঁর সহিত আলাপ। পরিকল্পনার বিষয়টি বলবার আগে তাঁর বিষয় আরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

পূর্বে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বেতনভোগী সেনাবিভাগের কর্মচারী। শুনেছি সেনানায়কদের দলের ছোটখাট একটা পদও তাঁর ছিল। পরে

জাপানীরা যখন বর্মা আক্রমণ করে দখল করে নেয়, তখন তিনি ইংরেজদের অন্য সৈন্যদের সঙ্গে জাপানীদের হাতে বন্দী হন। তারপর সেখানে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে। যখন ব্রিটিশের বেতনভোগী ভারতীয় সেনানায়কগণ নেতাজীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তিনিও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং নেতাজী-গঠিত বিখ্যাত আই.এন.এ. সেনাবাহিনীর তিনি অঙ্গীভূত হয়েছিলেন। তারপর দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি সেনা-বাহিনী ত্যাগ করে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এই ভাঙাগড়ার যুগে আমাদের দেশের রাজনীতির জগতে তখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। এটলী সরকার ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ভারত বিভাগ না হয়ে তিনটি অঞ্চলে চিহ্নিত হবে। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের নেতা জনাব মহম্মদ আলি জিন্না মেনে নিতে রাজী হন নি। মুসলিম লীগ তার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করবার জন্য, যাকে বলা হয়েছিল 'ডিরেক্ট অ্যাকশন', সেই নীতি অবলম্বন করেছিল। ফলে কলিকাতায় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এবং তার অল্প দিন পরে নোয়াখালি জেলায় ব্যাপক হারে হিন্দু নিগ্রহের অভিযানও শুরু হয়। তখন হিন্দুরা দলে দলে আশ্রয়ের জন্য কলিকাতায় চলে আসতে থাকে।

এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী ঠিক করেন, তাঁর দলবল নিয়ে নোয়াখালি গিয়ে বাস করবেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। তখন শ্রীজীওন সিং তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর অতীত জীবনের ইতিহাস মানুষকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট করা উচিত।

এখন তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। তাঁর ধারণা ছিল, হিন্দু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও, মুসলমান সমাজের অত্যাচারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেখানে বাস করতে পারে। তার জন্য দরকার গান্ধীজির আদর্শের অনুসরণে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন এবং মনোবল সঞ্চয়। হিন্দুর মধ্যে, অত্যাচারিত হলেও আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করব না, এই মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত অত্যাচার হলেও অত্যাচারীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে তা সহ্য করে যাব এই আশায় —যে ফলে অত্যাচারীর মন পরিবর্তিত হবে!

কাগজে কলমে এই পরিকল্পনার তাৎপর্য খুব গভীর। দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানের হিন্দু যখনই অত্যাচারিত হয়েছে, তখনই পরিত্রাণের জন্য ভারতে চলে এসেছে। চলে আসবে এটাই হল মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। পশ্চিম পাকিস্তানে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যাওয়ায় তাই ঘটেছে। অর্থাৎ ভারতের মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের

হিন্দু ভারতে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানে ঠিক এ ব্যাপার স্বাধীনতার পর ঘটে নি। নোয়াখালির দাঙ্গার ফলে কিছু কিছু হিন্দু পশ্চিম বাঙলায় চলে এসেছিল। তবে তখনও তো দেশ বিভাগ হয় নি। দেশ বিভাগের সঙ্গে বেশ কয়েক লক্ষ হিন্দু দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধা সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙলা, আসাম ও ত্রিপুরায় চলে এসেছিল। ভবিষ্যতে যে দাঙ্গা হবে না, এবিষয় কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। যদি সত্যই দাঙ্গা বাধে পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তান হতেও হিন্দু বিরাট সংখ্যায় বাস্তুত্যাগী হয়ে চলে আসতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে এমন যদি কোনও উপায় বাহির করা যায় যা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর মনে এমন বল এনে দেবে যে শত অত্যাচার সত্ত্বেও তারা দেশত্যাগী হবে না, তা হলে তো উদ্বাস্তু সমস্যার একরকম সহজ সমাধান হয়ে যায়। কারণ উদ্বাস্তুর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এহেন লোভনীয় প্রস্তাব যে ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উদ্বাস্তু সমস্যা তো মূলত ভারত সরকারেরই দায়িত্ব।

তাই আমার কৌতূহল হয়েছিল জানতে যে জীওন সিংজি কি কৌশলে হিন্দুর মনকে এমন পরিবর্তিত করছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে তাঁর আশ্রমে একাধিকবার যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখা গেল তিনি জন কুড়ি-পঁচিশ যুবককে একত্রিত করে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুনলাম, তারা প্রধানত নোয়াখালির দাঙ্গার সময় যে হিন্দু পরিবারগুলি এদিকে চলে এসেছিল, তাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হয়েছে। তার সপক্ষে যুক্তি সহজেই বোঝা যায়। যারা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছে, তাদের এবিষয়ে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দেশ বিভাগের পরেও তারা যদি তাঁর শিক্ষার ফলে নোয়াখালিতে ফিরে গিয়ে বাস করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে খানিকটা ফল হয়েছে, অনুমান করতে পারা যায়। শ্রীজীওন সিং আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষার এই ফলই তিনি আশা করেন। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত না হলে ফিরে যাবার সময় আসে না। কাজেই তখন সেভাবে প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব ছিল না।

পরে আমার যতদূর জানা আছে, তিনি যাদের আশ্রমে এনে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তারা কেউ পাকিস্তানে ফিরে যায় নি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ব্যাপক দাঙ্গার ফলে হিন্দুরা যখন বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগী হয় তখন এ শিক্ষা কোন কাজ দেয় নি। দেওয়া আমার মতে সম্ভবও নয়।

তবে এই আশ্রমে জীওন সিংজি একটি গুণের ভাল প্রমাণ দিতে পেরেছিলেন। তা হল তিনি ভাল চাষী ছিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এই জায়গায় পতিত জমির তিনি যেভাবে সদ্ব্যবহার করেছিলেন, তা অন্যের আদর্শ হবার যোগ্য। সরকারের কৃষি খামারকে তিনি হার মানিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে একদিকে যেমন সাফল্যের সঙ্গে হাঁসের এবং মুর্গীর উৎপাদন চলত, তেমন অপর দিকে ফসলেরও চাষ হত। তাঁর ক্ষেতে যে পাট হত, তা দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট লম্বা হত। ফলে আশ্রমটি আর্থিক দিক থেকে স্বয়ং নির্ভর হতে পেরেছিল। পরে তাঁর পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সরকারী সাহায্য টানতে পারল না, তখনও তাঁর আশ্রমের সমৃদ্ধি অক্ষুন্ন রয়ে গেল।

(৪)

এই সময় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের এক উদ্বৃত্ত জমি পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রস্তাবটি একটু অসাধারণ গোছের। তাই তার অসাধারণত্ব বোঝবার জন্য এই জমি সংক্রান্ত কিছু বিবরণ দেওয়া প্রথমে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কলিকাতা করপোরেশনের জলনিষ্কাশনের দুটি সমস্যা আছে। প্রথম, যাকে বলা হয় ড্রেন-পায়খানা, তার ময়লা জল নিষ্কাশনের সমস্যা এবং দ্বিতীয়, বর্ষায় যখন কলিকাতার রাস্তা প্লাবিত হয়, তার নিষ্কাশন ব্যবস্থা। ড্রেন-পায়খানার ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য প্রতি রাস্তার তলায় ভূগর্ভস্থ নালা আছে। এই নালা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে প্রতি বাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মূল শাখার ব্যাস আট-দশ ফুটও আছে। ছোট নালা হতে মূল নালা দিয়ে এই জলকে নিষ্কাশিত করা হয় নদীতে। একই পথে বর্ষার উদ্বৃত্ত জল ভূগর্ভস্থ নালা বাহিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে।

এ সম্বন্ধে পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, প্রাকৃতিক অসহযোগিতার ফলে তা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রথম ভূগর্ভস্থ নালার জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন পরিকল্পনা অনুসারে কোন নালাই পশ্চিম তীরে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত হয় নি। তার সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। প্রথম কলিকাতা অঞ্চলের মাটি স্বভাবত পশ্চিম দিকে উঁচু এবং ক্রমশ পুর্বদিকে ঢালু হয়ে নিচু হয়ে গেছে। কলিকাতার বাহিরে পুর্বাঞ্চলে তা এত নিচু যে সারা বছর সেখানে জল থাকে। জব চারনক যখন কলিকাতাকে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য নির্বাচন করেন, তখন এই পুর্ব প্রান্তের জলা জায়গার অবস্থিতিই স্থান নির্বাচনের সপক্ষে একটি বড় যুক্তি বলে বিবেচিত হয়েছিল। শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার সেটা একটা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে বলে। আর দ্বিতীয় কারণ হল সম্ভবত ভাগীরথীর জলকে ময়লা ফেলে *দূষিত করা উচিত হবে না বিবেচনা করা হয়েছিল।*

তখন কলকাতার পুর্বাঞ্চলের তথা পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। ভাগীরথী তখনও খরস্রোতা শক্তিমতী নদী। গঙ্গা হতে প্রচুর জল

টানবার তা ক্ষমতা রাখত। ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের শাখানদীগুলি বেশ গভীর ছিল। কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে বিদ্যাধরী নামে এইরূপ একটি শাখানদী প্রবাহিত ছিল। এখন তার কোনও চিহ্ন নেই। পলি পড়ে তা মরে গেছে। এর দক্ষিণে পিয়ালী নদী প্রবাহিত ছিল। তা উত্তরভাগ হয়ে দক্ষিণে চলে গিয়েছিল। এখন খাল কেটে তার দক্ষিণ অংশ সোনারপুর আড়াপাঁচ অঞ্চলের নিচু জমি জল নিষ্কাশনের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। নিচু এলাকা হতে সেই জল তোলবার জন্য উত্তরভাগে বিরাট বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প বসেছে।

পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে এই বিদ্যাধরী ও পিয়ালী নদীর পথেই কলিকাতার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ নালার জল বিদ্যাধরীতে পড়ত এবং তার প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তা সমুদ্রে পড়ত। এই ছিল ব্যবস্থা।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে এই অবস্থার দ্রুত অবনতি সংঘটিত হল। তার মূল কারণ, সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে গঙ্গা নদীর পথ পরিবর্তন। পুর্বে গঙ্গা নদীর একটি মূল জলধারা ভাগীরথীর পথে প্রবাহিত ছিল। অন্যটি পদ্মার পথে দক্ষিণ-পূর্বগামী ছিল। কিন্তু কোন কারণে ঠিক জানা নেই, গঙ্গার মূল স্রোত সমগ্রভাবেই পদ্মার প্রবাহের পথে সরে গেল। ফলে ভাগীরথীর ভাগে জল কমে গেল। মূল নদী হতে জল টানতে না পেরে ভাগীরথী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। জঙ্গীপুর অঞ্চলে তা রীতিমত শীর্ণকায় হয়ে গেল। ফলে নদীর যে অংশে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, কেবল সেই অংশ সারা বছর সজীব থাকে। উত্তরের অংশ বর্ষাকাল ছাড়া আর প্রবাহিত থাকে না। এর আনুষঙ্গিক ফল হিসাবেই পিয়ালী ও বিদ্যাধরী নদী মজে গিয়েছিল॥

এই পরিস্থিতি রীতিমতভাবে কলিকাতার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবার উপক্রম করল বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। তখন জল নিষ্কাশনের নূতন বিকল্প ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ল। করপোরেশনের তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ দে তার প্রতিকারের জন্য যে নূতন পরিকল্পনা রচনা করলেন তা হল মোটামুটি এই :

কলিকাতার পূর্বদিকে খরস্রোতা সজীব নিকটতম নদী হল কুলটি নদী। তা কলিকাতা হতে যোল মাইল পুর্বে প্রবাহিত। দূষিত তথা বর্ষার অতিরিক্ত জলকে সেই নদীতেই এনে ফেলতে হবে। সুতরাং কলিকাতার পুর্বপ্রান্ত হতে জল নিষ্কাশনের জন্য একটি খাল কাটার ব্যবস্থা হল। এই জলবাহী নালা যাতে পলি পড়ে হেজে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে বানতলা নামে জায়গায় দূষিত জল হতে অতরল অংশ পৃথক করবার জন্য একটি গোলাকার দীঘির ব্যবস্থা হল। এই কাজ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

জল নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘ যোল মাইল লম্বা এবং তিনশ গজ-মত চওড়া একফালি জমি হুকুমদখল করা হয়। জল নিষ্কাশনের জন্য খাল

কাটার পর খালের ধার বরাবর দক্ষিণ প্রান্তে একফালি জমি উদ্বৃত্ত থেকে যায়। খালের তত্ত্বাবধানের জন্যও দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর একটি রাস্তা নির্মাণ হয়েছিল। ঠিক তার দক্ষিণে সংলগ্ন হয়ে এই উদ্বৃত্ত জমি দীর্ঘকাল পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল।

একটা প্রস্তাব আসে এই উদ্বৃত্ত জমিটি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা যায় কিনা। তার সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি ছিল। প্রথমত এই জমি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। সুতরাং পুনর্বাসনের কাজে তাকে ব্যবহার করতে কোন পক্ষের আপত্তি হবে না। দ্বিতীয়ত, এই জমির পশ্চিম প্রান্ত কলিকাতার অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এখানে যারা বসবে তারা কলিকাতা অঞ্চলে জীবিকা অর্জনের সুবিধা পাবে। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলে সবজি উৎপাদনের খুব সুবিধা আছে। নিকটবর্তী ধাপা অঞ্চলে যে সবজি চাষ হয়, তার কলিকাতার বাজারে প্রচুর কাটতি। এখানে যে পরিবার বসবে, তারা যদি সবজি চাষ করে, অল্প জমির ওপর নির্ভর করে, তারা জীবিকা অর্জন করতে পারবে। এখানকার ময়লা জলই সারের গুণ রাখে। তার পলিমাটি উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

অপর পক্ষে একটি প্রতিকূল পরিবেশও ছিল। ময়লা জলের খাল দিয়ে যে জল প্রবাহিত হয় তা হতে একটি অসহনীয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। নূতন মানুষ সেখানে গেলে তা তার অসহ্য বোধ হবে। তবে স্থায়িভাবে থাকলে গন্ধ তার তেমন অনুভূত হয় না। যেমন মফস্বল হতে শহরে এলে তার হট্টগোল প্রথমে অসহ্য বলে মনে হয়, কিন্তু পরে সহনীয় হয়ে ওঠে। তবু কথা ওঠে, এই দুর্গন্ধময় পরিবেশ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর কিনা। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন হানিকর নয়।

সুতরাং এই পরিকল্পনাটিকে কাজে পরিণত করাই সিদ্ধান্ত হল। সমগ্র জমিটিকে ছয়টি খণ্ডে ভাগ করা হল। প্রতি খণ্ডের জন্য তার কেন্দ্রস্থলে বাস্তুজমি নির্বাচিত হল; আর দুই পাশে প্রতি পরিবারের জন্য কিছু চাষের জমি বরাদ্দ হল। জায়গাটির দৈর্ঘ্য বেশী অথচ প্রস্থ যৎসামান্য বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই উপনিবেশের জমি বণ্টনের ব্যবস্থা ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দেই শেষ হয়ে যায়। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি, প্রধানত আশ্রয় শিবিরের বাহিরে যারা বাস করছিল, তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়। কারণ, এই রকম জায়গায় বাধ্য করে কাউকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

এই উপনিবেশ এখনও বেঁচে রয়েছে। তবে তার জন্য যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশা আমরা পোষণ করছিলাম, তা পূর্ণ হয় নি। ধাপা অঞ্চলের মত সবজি উৎপাদন করে এখানকার পরিবারগুলি স্বচ্ছল অবস্থায় বাস করবে, আমরা

এই রকম আশা করেছিলাম। কিন্তু উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে সেভাবে সবজি উৎপাদন করতে পারে নি। খালের পলিমাটির সারেরও তারা বিশেষ সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। চাষের জন্য বরাদ্দ জমিতে কিছু ধান হয়। আর অপ্রত্যাশিতভাবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে এখানে ভাল মিষ্টি আলু ফলে। কারণ জমি সর্বতোভাবে তার উপযুক্ত। সুতরাং এখানে এখন ব্যাপকভাবে মিষ্টি আলুর চাষ হয়ে থাকে।

(৫)

শ্রীসতীশ দাশগুপ্তের পদত্যাগের পর পুনর্বাসন বোর্ড একরকম কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটতে লাগল এবং ফলে তা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদেশ হতে ফিরে নিজেই এই বিভাগের মন্ত্রিত্বের ভার নিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কর্মীদের উপরেই পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এসে পড়ল।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে উদ্বাস্তুদের আগমনের স্রোত স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আগমনের হারও ক্রমশ নিচের দিকে চলেছিল। তাই তখনকার মত নূতন উদ্বাস্তু সমস্যা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছিল। সুতরাং এই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকারের স্থাপিত আশ্রয় শিবিরের সকল উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে আশ্রয় শিবিরগুলি তুলে দেবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য সকল আশ্রয় শিবির তুলে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ এমন অনেক পরিবার ছিল যাদের কর্তা পুনর্বাসনের ক্ষমতা রাখত না, যাদের নেতৃত্বে ছিল বিধবা মা। এছাড়া এমন অনেক পরিত্যক্ত বা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন অসমর্থ বৃদ্ধ বা পঙ্গু মানুষ ছিল যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখত না। সুতরাং এরা পুনর্বাসনের অযোগ্য ছিল। এই কারণে পুনর্বাসনের কাজের সুবিধার জন্য শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। একটি শ্রেণীতে ফেলা হত যে পরিবারগুলি পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হত, তাদের এবং অপর শ্রেণীতে ফেলা হত যারা পুনর্বাসনের অযোগ্য তাদের।

এখন হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে সে সময় মোট ৭০,০০০ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে বাস করছিল। তাদের মধ্যে যারা পুনর্বাসনের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭,৫০০। সুতরাং বাকি ৬২,৫০০ মানুষের পুনর্বাসনই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের মূল সমস্যা। গড়ে পরিবার পিছু পাঁচজন মানুষ আছে ধরলে ১২,৫০০ পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের জরুরী কর্তব্য।

এই সাড়ে বার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাদের একদল ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। পূর্বপাকিস্তানে তারা জোত-

জমা দেখত, ছোটখাট ব্যবসা করত, দোকান চালাত ইত্যাদি। এদের বেশির ভাগ পরিবারই কলিকাতার সংলগ্ন আশ্রয় শিবিরগুলিতে স্থান পেয়েছিল, যেমন হাবড়া, বাইগাছি এবং কাঁচড়াপাড়ার নিকট গয়েশপুরের আশ্রয় শিবিরে। আর একদল পরিবার ছিল যারা কৃষিজীবী। তাদের কারও নিজেদের চাষের জমি ছিল, কারও ছিল না। যাদের নিজস্ব চাষের জমি ছিল না তারা ভাগে চাষ করত কিম্বা চাষের কাজে মজুর খাটত। এরা সংখ্যায় প্রায় প্রথম শ্রেণীর সমান ছিল। আর দুটি শ্রেণী ছিল যারা সংখ্যায় অল্প। এদের একদল ছিল তাঁতি শ্রেণীর মানুষ। অর্থাৎ এরা শিক্ষিত কারিগর শ্রেণীর মানুষ। আর একটি ক্ষুদ্র দল ছিল যারা পেশায় মৎস্যজীবী।

কৃষিজীবী পরিবারগুলি প্রধানত বর্ধমান জেলার শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন বর্ধমান জেলার প্রশাসক ছিলেন শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পুনর্বাসনের কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই জেলার পূর্ব অঞ্চলে অনেক বিস্তৃত এলাকা অনাবাদী পড়ে ছিল। বিশেষ করে কালনা ও কাটোয়া মহকুমার ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন অনেক চাষের উপযুক্ত জমি পুনর্বাসনের ব্যবহার করার যোগ্য ছিল। এইসব জায়গায় এই কৃষক পরিবারগুলিকে নিজেদের চেষ্টায় ভূমি সংগ্রহ করে নিজেদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার ভার নেবার কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। সরকার কৃষি ও বাস্তুজমি কেনবার ঋণ এবং চাষ করবার বলদ কেনবার ঋণ দেবেন এবং এক বৎসরের খোরাকি দেবেন,—এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

সৌভাগ্যের কথা এই পরিকল্পনা অভাবনীয়ভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। কৃষক পরিবারগুলি নিজেরাই ঋণের টাকায় জমি কিনে এই সকল অনাবাদী জমি উৎসাহ সহকারে চাষ করেছিল। এ অঞ্চলে ডাঙা জমি পাট চাষের বেশ উপযুক্ত। পূর্ব বাঙলার চাষী পাট চাষে বেশ দক্ষ। অথচ পশ্চিম বাঙলায় পাট চাষ বেশি প্রচলিত ছিল না। এরাই এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পাট চাষের প্রবর্তন করেছিল। বলা বাহুল্য এইভাবে তারা জাতীয় কৃষি ও শিল্পকে বাঙলা বিভাগের পর নূতন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতার পর পাট উৎপন্ন হত প্রধানত পূর্ববঙ্গে এবং কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার হত পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর দুই কূলে অবস্থিত পাটকলগুলিতে। বাঙালা বিভাগের ফলে পাটকলগুলির কাঁচা মালহিসাবে পাট সংগ্রহ করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন নূতন পুনর্বাসনপ্রাপ্ত এই চাষী পরিবারদের উৎপাদিত পাটই তাদের এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছিল। বর্তমানে পাটকলে ব্যবহারের জন্য পাটের চাহিদা সম্পর্কে যে আমাদের দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তার প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গ হতে বিতাড়িত এই কৃষক পরিবারদের উদ্যম।

আগেই বলা হয়েছে যে সব থেকে বড় দলটি ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। তার কারণ ছিল। তখনও পূর্ববঙ্গে পরিস্থিতি এত খারাপ হয় নি যে অত্যাচারের চাপে হিন্দু পরিবারগুলি আসতে বাধ্য হবে। যারা কৃষিজীবী এবং গ্রামের মানুষ তারা রাজনীতিতে এমন অভিজ্ঞ নয় যে পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক মুসলমান রাজ্য হওয়ায় হিন্দু-হিসাবে তাদের কি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা হৃদয়ঙ্গম করবে। তাই ব্যাপকভাবে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। এই শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার তাৎপর্য কি তা ভাল রকম বুঝত। তাই বঙ্গ বিভাগের ফলে যখন তারা ভাগ্যদোষে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল, তারা বুঝল ইংরেজ চলে গেলেও তারা প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না। তারা এক ধর্ম প্রভাবিত রাষ্ট্রের নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে। সেই কারণেই তারা পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামার বা গোলমালের অপেক্ষা না করেই দেশ বিভাগের পরেই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে শুরু করে।

এদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। যারা তেমন অবস্থাপন্ন নয় কিন্তু উৎসাহী, তারাও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। এরাই জবরদখল কলোনি করতে উৎসাহী হয়েছিল। আর যারা দরিদ্র অথচ আত্ম-ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে না তারাই সরকারী আশ্রয় শিবিরে ভর্তি হয়ে সরকারের সাহায্যে পুনর্বাসনের অপেক্ষা করেছিল। এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবার-গুলি কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় শিবিরগুলিতে স্থান নিয়েছিল। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁতিদের যে ছোট দলটি ছিল তারা কলিকাতার সংলগ্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন চেয়েছিল। এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে পূর্ববঙ্গ হতে এক বিরাট তাঁতি শ্রেণীর দল ইতিপূর্বেই এখানে নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। যে অঞ্চল তারা নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করেছিল তা হল জলাঙ্গী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত স্বরূপনগর অঞ্চল। তা পূবে কৃষ্ণনগর এবং পশ্চিমে নবদ্বীপ, এই দু'টি বিখ্যাত প্রাচীন নগরের মাঝখানে অবস্থিত। আশ্রয়বাসী তাঁতিরা কিন্তু এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। তারা চেয়েছিল এমন জায়গায় নূতন বসতি স্থাপন করতে যেখান হতে সহজেই তাঁতে উৎপাদিত কাপড় বিক্রয় করা যায়। এই সম্পর্কে হাওড়ার হাট উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁতের কাপড়ের এত বড় পাইকারী বিপণন কেন্দ্র বোধহয় বাঙলা দেশের আর কোথাও নেই। তারই আকর্ষণে তারা কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতে চেয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে এই রকম একটি স্থানের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল। গড়িয়ার দক্ষিণে রাজপুর ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে যে বড় রাস্তা চলে গেছে তারই পশ্চিম দিকে এই স্থান অবস্থিত। রাজপুরের প্রায় সংলগ্ন। এইখানে চৌহাট্টা গ্রামে অনেকখানি জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এই জায়গা আশ্রয় শিবিরবাসী তাঁতিদের পছন্দ হওয়ায় এইখানেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যারা মৎস্যজীবী তাদেরও স্বতন্ত্র সমস্যা। তাদের জন্য এমন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা প্রয়োজন যেখান হতে তাদের মাছ ধরা সহজ হয়। আশ্রয় শিবিরবাসী মৎস্যজীবীরা অধিকাংশই গয়েশপুরের আশ্রয় শিবিরে বাস করত। তারা নিজেদের থেকেই একটা ইচ্ছা প্রকাশ করল যে কাঁচড়াপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে তারা খুশি হবে। এই স্থানটি মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের সত্যই উপযুক্ত।

এখানে প্রয়োজনমত জমি পাওয়া শক্ত ছিল না, কারণ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে রেল লাইনের দুধারে বিরাট জমি হুকুমদখল করা হয়েছিল। এখানে সেনা নিবাস, যুদ্ধের উপকরণ এবং জঙ্গী বিমান রাখার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নূতন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমগ্র জায়গাটির দখল নিয়েছিলেন। সুতরাং যে জমির প্রয়োজন তা সরকারের অধিকারেই ছিল।

কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল অন্য দিক হতে। কলিকাতা মহানগরী হতে জনতা-বৃদ্ধির চাপ শিথিল করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে এক আধুনিক ধরনের নগরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এখানেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসীকন্যা কল্যাণী নগরী স্থাপিত হয়েছে। রেল লাইনের পশ্চিম দিকের সব জমি কল্যাণীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটির তখন ভার ছিল স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ওপর। শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত তখন তার ভারপ্রাপ্ত সচিব। এখন কল্যাণী পরিকল্পনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নদীর তীরে অবস্থিত কয়েক শত বিঘা মাত্র জমি পেলেই মৎস্যজীবীদের একটা পছন্দমত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

শ্রীগুপ্তের নিকট যখন প্রস্তাব নিয়ে গেলাম তখন বিষয়টি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাবের সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সুপারিশমত সরকারের নিকট মৎস্যজীবীদের জন্য উপনিবেশ করবার জায়গা এইখানেই পাওয়া গিয়েছিল। জায়গাটির নাম মাঝেরচর। সুতরাং এই উদ্বাস্তু কলোনির নাম হয়েছিল মাঝেরচর কলোনি। কল্যাণী নগরীর ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা যে জায়গায় হয়েছে তার পশ্চিমে সেই কলোনি অবস্থিত। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে আশ্রয় শিবিরে যত মৎস্যজীবী উদ্বাস্তু পরিবার ছিল তাদের ওইখানেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

এখন মূল সমস্যা আশ্রয় শিবিরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারগুলি নিয়ে। এরা কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি আশ্রয় শিবিরে স্থান নিয়েছিল। ঠিক বলতে কি এই আশ্রয় শিবিরগুলি প্রধানত তারাই দখল করেছিল। এই শ্রেণীর শিবির ছিল তিনটি। একটি ছিল হাবড়াতে, একটি হাবড়ারই পুর্ব দিকে মাইলখানেক দূরে বাইগাছিতে আর তৃতীয়টি ছিল গয়েশপুরে অবস্থিত। হাবড়া ও বাইগাছি বনগাঁর দিকে যে রেলপথ গিয়েছে তার দুই দিকে অবস্থিত, হাবড়া পশ্চিম দিকে এবং বাইগাছি পুর্ব দিকে। এই দুই স্থানেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক বিস্তৃত ভূখণ্ড সরকার হুকুমদখল করে বিদেশী সৈন্যদের অস্থায়ী বাসের জন্য ব্যবহার করেছিল। কাজেই বড় বড় 'ডরমিটারি' ধরনের অনেক ঘর তৈরি হয়েছিল। হাবড়াতে জঙ্গী বিমান রাখার ব্যবস্থা ছিল। তাই বিমান রাখবার ঘর এবং বিমান ওঠানামা করবার জন্য দীর্ঘ বাঁধান রানওয়ে ছিল। নূতন করে দখল করবার হাঙ্গাম ছিল না। দ্বিতীয়ত এক সঙ্গে অনেক মানুষের বাস করবার উপযোগী অনেক তৈরী বাড়ি ছিল বলেই এখানে আশ্রয় শিবির গড়ে উঠেছিল :

গয়েশপুর রাণাঘাটগামী রেলপথের পুর্বপ্রান্তে চাঁদমারী রেল স্টেশনের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। এ জায়গাটি ঠিক বলতে কি প্রথমে কল্যাণীর জন্য যে জায়গা নির্বাচিত হয়েছিল তারই অংশ। লাইনের দু পাশের জায়গাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হুকুমদখল করা হয়। এখানে সেনানিবাস এবং যুদ্ধের ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হত। গয়েশপুরেও অনেক লম্বা লম্বা পাকা ডরমিটারি পাওয়া গিয়েছিল। সেই কারণে সেখানেও আশ্রয় শিবির গড়ে উঠেছিল।

এছাড়া বর্ধমান অঞ্চলের কতকগুলি আশ্রয় শিবিরে ছড়ানভাবে কিছু মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল। সেখানকার চাষী পরিবারগুলি যেমন নিজেদের চেষ্টায় ভূমি সংগ্রহ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছিল এরা তেমন পারে নি। এরা সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর পুনর্বাসনের জন্য নির্ভর করেছিল। সুতরাং এদের জন্যও ব্যবস্থা করবার দরকার ছিল।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল অন্তত কিছুকালের জন্য পুর্ববাঙলা হতে আগত বাস্তুত্যাগীর সংখ্যা নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তাদের জন্য আশ্রয় দানের সমস্যা আর থাকবে না। এই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঠিক হয়েছিল যেখানে আশ্রয় শিবিরগুলি আছে সেখানেই এই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেটা তখন সম্ভব, কারণ নূতন উদ্বাস্তু পরিবারের পুর্ববঙ্গ হতে আসা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই ব্যবস্থার অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত এদের পুনর্বাসনের জন্য নূতন করে জমি সংগ্রহ করতে হবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে জমিগুলি

হুকুমদখল হয়েছিল সেগুলি ব্যবহার করা যায়। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নেই। অতিরিক্ত সুবিধা হল তখনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে সম্ভব, কারণ যে জমি ব্যবহার করা হবে তা সরকারের দখলে আছে।

সব থেকে বড় সুবিধা হল, উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যে আশ্রয় শিবিরে এতদিন বাস করেছে তার নিকটবর্তী অঞ্চলেই পুনর্বাসন পেতে পারবে। ঠিক বলতে কি, অর্থনীতিক পুনর্বাসনের দিক থেকে দেখতে গেলে এটি মস্ত বড় সুবিধা। কোন উদ্বাস্তু পরিবার যেখানে আশ্রয় নেয়, কয়েক মাস বাস করার পর সেই স্থানের সহিত বেশ পরিচিত হয়ে পড়ে। সকলেই সরকারের মঞ্জুর করা সামান্য আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না। যাদের উদ্যম আছে, নিজেদের চেষ্টায় নানা বৃত্তি অবলম্বন করে অতিরিক্ত আয়ের পথ আবিষ্কার করে। আশ্রয় শিবির উঠে গেলে পুনর্বাসনের জন্য ভিন্ন স্থানে চলে যেতে হলে এই সুবিধাগুলি হতে তারা বঞ্চিত হবে। আবার নূতন করে নূতন স্থানের আর্থনীতিক বিন্যাসের সহিত নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সুতরাং আশ্রয় শিবিরের সংলগ্ন স্থানে পুনর্বাসন পেলে, আর্থনীতিক পুনর্বাসনের কাজ তুলনায় সহজ হয়ে যায়।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করে ঠিক হয় যেদুটি স্থানে হুকুমদখল করা জমির ওপর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তদের জন্য কলোনি স্থাপনের ব্যবস্থা হবে তাদের প্রথমটি হল হাবড়া এবং দ্বিতীয়টি চাঁদমারী। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে এই দুই স্থানে যতগুলি উদ্বাস্তু পরিবারকে জায়গা দেওয়া যায় তাতে সকল আশ্রয় শিবিরবাসী মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারদের স্থান হয় না। তাই চাকদার সংলগ্ন রেল লাইনের যে পতিত জমি আছে তাও হুকুম-দখল করে সেখানেও একটি কলোনি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে রেল লাইনের পূর্বদিকে যে জমি পাওয়া গিয়েছিল তার স্থানীয় নাম খোসবাস মহল্লা। আর লাইনের পশ্চিম দিকে যে জায়গায় জমি পাওয়া গিয়েছিল তার স্থানীয় নাম হামিদপুর। এই দুই জায়গাতেই কলোনি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

হাবড়ায় যে জমি পাওয়া গিয়েছিল তার জন্য দুটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। যে অংশে জঙ্গী বিমান রাখা হত সেখানে শুধু চওড়া বাঁধান রানওয়ে ছিল না, অনেক পিচঢালা বাঁধান রাস্তাও ছিল। তা ছাড়া এ অঞ্চল কলিকাতার বেশ নিকটে। রেলপথেও রাস্তার সরাসরি তার সঙ্গে যোগ আছে। এই সব কথা বিবেচনা করে এখানে একটি উপনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। যারা আশ্রয় শিবিরবাসী নয় তাদের মধ্যে এমন অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিল যাদের গৃহ নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন ছিল। তাদের জন্য এই পরিকল্পিত উপনগরী বিশেষভাবে উপযুক্ত হবে বিবেচিত হয়েছিল।

সেই কারণে হাবড়ার হুকুমদখল করা জমির দক্ষিণ অংশ উপনগরী পরিকল্পনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যেটা ছিল জঙ্গী বিমানের রানওয়ে সেটাকে পরিণত করা হল তার রাজপথে। এবং তাকে কেন্দ্র করে উপনগরী পরিকল্পনা রচনা করা হল। সেই সঙ্গে কিছু তৈরি বাড়ি বিক্রয়ের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। দুই কামরাযুক্ত ছোট ছোট তিন শ' বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে স্যানিটারি পায়খানা। এগুলির নির্মাণ-কার্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই শেষ হয়ে যায়। এইভাবে হাবড়া উদ্বাস্তু নগরীর সূত্রপাত হয়। যে সব পরিবার এখানে জমি বা বাড়ি পেল, তাদের ইচ্ছায় তার নামকরণ হল অশোকনগর।

হাবড়ার উত্তর অংশে যে হুকুমদখল করা জমি পাওয়া গিয়েছিল, সে জায়গা নিয়ে একটি গ্রাম্য উপনিবেশের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল যে এখানে রাস্তা চওড়া হবে না, কিন্তু বাস করবার জন্য প্রতি পরিবারকে যে জমি দেওয়া হবে, তার পরিমাণ হবে বেশি। হাবড়ার নাগরিক পরিকল্পনায় প্রতি পরিবারের জন্য দশ কাঠা জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এখানে যারা বসবে তারা কিছু গাছ লাগাবে, কিছু জমিতে ফসল উৎপাদন করবে, সম্ভব হলে গরু রাখতে পারবে। স্থানীয় লোকেরা তার নাম রেখেছিল কল্যাণগড়।

এই কল্যাণগড় কলোনিতেই হাবড়া ও বাইগাছি আশ্রয় শিবিরে যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবার ছিল, তাদের সকলের জায়গা জুটে গিয়েছিল। সুতরাং আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে নিজেদের জমিতে নিজেরাই ঘর তুলে উঠে গিয়েছিল। ঘর বাঁধবার জন্য প্রয়োজনীয় টিন সরকার যোগাড় করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই এই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হাবড়া ও বাইগাছির আশ্রয় শিবির তুলে দেওয়া হয়েছিল। কেবল যারা পুনর্বাসনের অযোগ্য তাদের প্রথমে ওখানেই রাখা হয়েছিল এবং পরে তাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এখন বাকি রইল গয়েশপুর আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা। গয়েশপুরে যে পরিবারগুলি মৎস্যজীবী ছিল, কল্যাণীর পশ্চিমে মাঝেরচরে ইতিমধ্যে তাদের ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল। সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বেশিরভাগ পরিবারই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা নানা করণে জটিলতা ধারণ করেছিল: চাকদহের সংলগ্ন খোসবাস মহল্লা অঞ্চলে ইতিমধ্যে অনেকখানি জমি সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কল্যাণগড়ের আদর্শে একটি গ্রাম্য উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিকল্পনাও সেইভাবেই রচিত হয়েছিল। প্রতি পরিবারের জন্য দশ কাঠা বাস্তুজমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। তাতে কয়েক শত পরিবারের স্থান হতে

পারত। গয়েশপুর আশ্রয় শিবিরে যারা ছিল তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেবার হলে অনেকগুলি পরিবার সেখানে যেতে সম্মত হয়। এইভাবে সেখানে যতগুলি পরিবারকে স্থান দেওয়া সম্ভব তাদের পাওয়া যায়।

ফলে গয়েশপুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ছিল তাদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পায়। তবু যাদের পুনর্বাসন বাকি রয়ে গেল, তাদের সংখ্যাও কম ছিল না, বার শ' পরিবারের ওপর হবে। গয়েশপুরের আশ্রয় শিবিরের সংলগ্ন যে জমি পাওয়া গিয়েছিল, তার আয়তন পরিমিত। তাই এখানে বেশি জমি দেওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ জায়গাটি শিল্পাঞ্চলের সংলগ্ন হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুনর্বাসনের বিশেষ উপযোগী ছিল। দ্বিতীয়ত যেখানে প্রায় দুই বৎসর-কাল পরিবারগুলি আশ্রয় শিবিরবাসী-হিসাবে বাস করেছে, সে জায়গার সহিত তারা পরিচিত হয়ে গেছে। সুতরাং সেদিক থেকেও তাদের পুনর্বাসনের পথ তুলনায় সহজ হয়ে গেছে। এই সব দিক বিবেচনা করে ঠিক হয়েছিল যে গয়েশপুরেই একটি উপনগরী পরিকল্পনা করে এই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। জায়গা কম হওয়ায় প্রতি পরিবারের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য চার কাঠা করে জমি বরাদ্দ হয়।

কিন্তু জমির পরিমাণ অল্প হওয়ায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং এই কারণে তাদের অনেকে এখানে পুনর্বাসন নিতে অস্বীকার করে। উদ্বাস্তুদের পক্ষ হতে বক্তব্য এই ছিল যে ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হওয়ায় তাতে ঠিকমত বাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে বক্তব্য ছিল, এটি নাগরিক পরিকল্পনা, সুতরাং রাস্তা চওড়া রেখে আবাসের জন্য জমি কম বরাদ্দ করলে ক্ষতি হবে না। আরও বড় কথা, যখন বাস্তু জমির অভাব এবং ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের জন্য আরও কত পরিবারের জায়গা সংগ্রহ করতে হবে জানা নেই, তখন কমপক্ষে যত ছোট জমি হয়, তত সামগ্রিক কল্যাণের দিক হতে তা বাঞ্ছনীয়। এই নীতির অনুসরণ করে একই সময় হাবড়াতে যে উপনগর পরিকল্পনা করা হয়, তার ক্ষেত্রেও প্রতি দাগের আয়তন চার কাঠায় সীমাবদ্ধ করা হয়। অবশ্য সেখানে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জমি দেওয়া হয় নি, হয়েছিল বাহিরের উদ্বাস্তুদের। তুলনায় তারা আশ্রয় শিবিরবাসী পরিবার হতে অর্থনীতিক দিক হতে ভাল অবস্থায় ছিল। তবু সে জমিগুলি সবই বিলি হয়ে গেল।

উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এইভাবে আপত্তি করায় এখানকার পুনর্বাসন বিলম্বিত হয়ে গেল। এদিকে এই উপনিবেশেই বর্ধমান অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারদের জন্য জমি বরাদ্দ হয়ে গেল। তাদের পক্ষে জমির পরিমাণ কম হওয়ায় কোন আপত্তি হয় নি। তাদের নেতা শ্রীবিনয় পর্বতের নেতৃত্বে এই পরিবারগুলি ইতিমধ্যে গয়েশপুরে তাদের জন্য চিহ্নিত ভূখণ্ডে গৃহনির্মাণ ঋণ নিয়ে বাড়ি করতে আরম্ভ করেছিল।

এদিকে গয়েশপুর আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে বিরোধ ক্রমশই দানা বাঁধতে শুরু করল। নানা রাজনৈতিক দলের নেতা তাদের পক্ষ সমর্থন করে আন্দোলন শুরু করলেন। এই দিক থেকে গয়েশপুর কলোনির প্রথম দিকের ইতিহাস ভারি বিচিত্র। পশ্চিম বাঙলার অনেকগুলি রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ল। প্রতি দলেরই একজন স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। এইভাবে কংগ্রেস দল, সমাজতন্ত্রী দল, প্রজা দল এবং বিপ্লবী কম্যুনিস্ট দল এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে তখন প্রজা দল ও সমাজতন্ত্রী দল পৃথক ছিল। তখনও তারা মিলিত হয়ে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলে রূপান্তরিত হয় নি।

এদের মধ্যে যে তুটি দল সবথেকে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তারা হল প্রজা দল ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট দল। প্রথমদলটির পক্ষ হতে শ্রীমতী লীলা রায় ও শ্রীসুনীল দাস ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান। দ্বিতীয় দলের পক্ষ হতে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সোজা আলোচনা চালিয়ে যান।

এইভাবে পরস্পর আলোচনার ফলে একটি মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মোটামুটি আমাদের হাতে জমির পরিমাণের অল্পতা হেতু বাসের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে আমরা অসমর্থ সেকথা একরকম স্বীকৃত হয়। এই কারণে অন্য বিষয়ে কিছু সুবিধাদানের প্রস্তাব আসে। পুনর্বাসনের জন্য নূতন উপনিবেশ গড়ে উঠলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রতি ত্রিশটি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ বসাবার রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। পায়খানার জন্য উদ্বাস্তুরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেবে এই ছিল রীতি। আমরা কুয়া খুঁড়ে তার ওপর পায়খানা বসাবার উপদেশ দিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, এখানে প্রস্তাব আসে, তার অতিরিক্তভাবে প্রতি দশটি পরিবারের জন্য একটি করে স্যানিটারি পায়খানা সরকারের খরচে নির্মিত হবে। যখন আলোচনার ফলে এই পথে মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন এবিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

সুতরাং আমি প্রস্তাবটি ডাঃ রায়ের কাছে অনুমোদনের জন্য স্থাপন করলাম। তিনি তখন মুখ্যমন্ত্রীও বটে, উদ্বাস্তু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও বটে।

সব শুনে তিনি বললেন, এক কাজ কর। স্যানিটারি পায়খানা যেমন চেয়েছে, তাই দাও। আর তার জন্য যে বেশি খরচ পড়বে, তার কিছুটা কমাবার জন্য নলকূপের সংখ্যা কমিয়ে দাও।

আমি উত্তরে বললাম, কিন্তু স্যার, নলকূপ কমিয়ে দিলে যে ওদের কষ্ট হবে।

উত্তরে তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, তবে রে, সৌ……যে বলেছিল তোমরা হৃদয়হীন, তোমাদের জাতের বুক পাথর দিয়ে বাঁধা।

বলেই তাঁর স্বাভাবিক রীতি অনুসারে হো হো করে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলেন।

কিছু আলোচনার পর তিনি আমার প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গেলেন। অর্থাৎ স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রইল, বরাদ্দ নলকূপের সংখ্যা কমান হল না। এরপর আর স্থানীয় উদ্বাস্তু পরিবারগুলির গয়েশপুর কলোনিতে পুনর্বাসন নিতে বাধা রইল না।

এইভাবে শেষ আশ্রয় শিবির গয়েশপুরে যে মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বাকি ছিল, তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে পুনর্বাসনের স্থানে চলে গেল। একদল গেল খোসবাস মহল্লায়, আর বাকি পরিবারগুলি তাদের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে গয়েশপুরেই উঠে গেল।

আশ্রয় শিবিরে কেবল পড়ে রইল যারা পুনর্বাসনের যোগ্য নয়, সেই শ্রেণীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৭৫০০ বৃদ্ধ, পঙ্গু অথবা বিধবা এবং তাদের নাবালক সন্তানরা। এই পরিবারগুলির মধ্যে যাদের অভিভাবক মেয়ে তারা টিটাগড় আশ্রয় শিবিরে চলে গেল। আর যাদের অভিভাবক বৃদ্ধ বা পঙ্গু পুরুষ তারা স্থান পেল রাণাঘাটের নিকট অবস্থিত একটি বিশেষ আশ্রয় শিবিরে। বাকি সব আশ্রয় শিবির ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে উঠে গেল।

তিন

পূর্ববঙ্গ হতে উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম পর্ব এইভাবে শেষ হল। এ কয়বৎসরে যে পরিবারগুলি চলে এসেছিল তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে প্রাণভয়ে বাস্তুত্যাগ করে নি। তারা প্রধানত দেশত্যাগী হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ায় তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অধিকার পাবে না, এই ছিল তাদের আশঙ্কা। তাদের মধ্যে যারা সরকারের ওপর পুনর্বাসনের জন্য নির্ভরশীল ছিল, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এইভাবে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাগ্যে স্বস্তি লেখা ছিল না। এক পর্ব শেষ না হতেই আর এক পর্বের সূত্রপাত হল। জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই খবর এল, বাগেরহাট অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের হাতে অনেক হিন্দু পরিবার রীতিমত নিপীড়িত হয়েছে। এ নিয়ে দাঙ্গা, মারপিট, খুন, জখমও ঘটে গিয়েছে। ফলে এই অঞ্চল হতে কিছু কিছু হিন্দু পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে আসতে শুরু করে। তখন আশা করা গিয়েছিল যে এই গোলমাল সীমাবদ্ধ থাকবে এবং শীঘ্রই পাকিস্তানের এই অঞ্চলে শান্তি পুনরায় স্থাপিত হবে। এই আশার উপর নির্ভর করে যে নূতন পরিবারগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্রয়প্রার্থী হল, তাদের বনগাঁ অঞ্চলে সোজাসুজি পুনর্বাসনের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। কারণ বনগাঁ অঞ্চলেই বাগেরহাটের নূতন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সে আশা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গ হতে যে নূতন বিতাড়িত উদ্বাস্তু পরিবার আসছিল, তাদের মুখে মুখে যে নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা পশ্চিম বাঙলার হিন্দুদের মনে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। ধীরে ধীরে খবরকাগজগুলিতে সে কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু করল। মুখের কাহিনী ছড়ায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, খবরের কাগজে প্রকাশিত কাহিনী ছড়ায় ব্যাপক ক্ষেত্রে। ফলে এদিকের হিন্দুদের মনে আক্রোশ ও বিদ্বেষভাব রীতিমত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সুতরাং উত্তেজনা যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাতে কোন সন্দেহ রইল না যে প্রতিহিংসা যে কোন মুহূর্তে পশ্চিম বাঙলায় ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে একদিন ঘটলও তাই। সন্ধ্যার পর আপিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে সবে বসে বিশ্রাম করছি। রাত আটটা বেজে গেছে। হঠাৎ লালবাজারে কন্ট্রোল রুম হতে ডাঃ রায় ফোন করে তখনি তাঁর কাছে সেখানে গিয়ে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন।

সেখানে হাজির হয়ে যা শুনলাম তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। জানা গেল, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অত্যাচার করতে হিন্দুরা দাঙ্গা শুরু করেছে। ডাঃ রায় সেখানে কণ্ট্রোল রুমে বসে বিভিন্ন জায়গা হতে খবর নিচ্ছেন এবং দাঙ্গা থামাবার জন্য নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলে কি হবে, প্রতিহিংসাপরায়ণ মারমুখী জনতাকে ঠেকান যাচ্ছে না, অনেক বস্তিতে আগুন জ্বলছে, অনেক নিরীহ মানুষ খুনজখম হচ্ছে।

এইভাবে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে গোলমাল শুরু হল এবং সরকারের পক্ষ হতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনেরও আপ্রাণ চেষ্টা চলল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে এল। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে এলে কি হবে? তার প্রতিক্রিয়া যখন পূর্বপাকিস্তানে শুরু হবে, তখন কি হবে সেই চিন্তাই আমাদের বিশেষভাবে বিব্রত করে তুলল।

এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এদিকের দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর ওদিকে পৌঁছতে দেরি হবে না এবং যখন ওদিকে যাবে, তখন অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়াবে। আর যখন ছড়াবে তখন পূর্ববঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া যা দেখা দেবে, তা ভয়ঙ্কর আকার নেবে। প্রতিশোধটা তোলা হবে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। তার ফলে স্তিমিতপ্রায় উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত আবার স্ফীতিলাভ করবে, তাতে সন্দেহ ছিল না। এবার হয়ত জনস্রোত বন্যারই আকার গ্রহণ করবে। তার জন্য আমাদের তো উপযুক্ত ব্যবস্থা শুরু করতে হয়।

কিন্তু ভাববার তো বেশি সময় পাওয়া গেল না। শীঘ্রই খবর আসতে শুরু করল যে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। হিন্দুর প্রাণ ও সম্পত্তি সেখানে বিপন্ন। বাঙলার দুই অংশে ব্যাপক আকারে এইরকম গোলমাল শুরু হওয়ায় দুই রাষ্ট্রের মুখ্য সচিবের আলোচনা বৈঠক ডাকা হল। আলোচনার স্থান পালাক্রমে কলিকাতা ও ঢাকায় নির্বাচিত হত। এবার ঢাকার পালা। সেখানেই বৈঠক হল। শ্রীসুকুমার সেন তখন আমাদের মুখ্য সচিব। তিনি ঢাকা হতে ফিরে এসে যে খবর দিলেন, তা আমাদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। তিনি বললেন, আমাদের খুব বিরাট সংখ্যার উদ্বাস্তুদের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এমনকি তাদের সংখ্যা দশ লক্ষও হতে পারে। তখন মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস আগের পর্বের উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর একরকম যবনিকাপাত হয়েছে। তার ফলে নূতন উদ্বাস্তুদের প্রতি পূর্ণভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হবে।

ভারত সরকারের উদ্বাস্তু মন্ত্রকের মন্ত্রী তখন ছিলেন শ্রীমোহনলাল সাকসেনা। ভারত সরকারের মনোযোগ তখন পনের আনা পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের ওপরেই সীমাবদ্ধ। এদিকে তখনও এমন কিছু নজর দেবার প্রয়োজন হয় নি। এ অঞ্চলের কাজ নিষ্পন্ন হত ভারত সরকারের ওই মন্ত্রকের এক যুগ্মসচিবের

তত্ত্বাবধানে। তাঁর নাম ছিল বি, জি, রাও। তিনি পশ্চিম বাঙলার সিভিলিয়ান ছিলেন। যখন অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল, তিনি দিল্লী হতে পশ্চিম বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার জন্য কলিকাতায় এলেন।

উদ্বাস্তুদের স্রোত তখনও বনগাঁর দিকেই প্রবাহিত। কারণ বাগেরহাট অঞ্চলেই প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা দু'জনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বনগাঁ গেলাম। বনগাঁ স্টেশনে যেসব নূতন উদ্বাস্তু নামছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম। তাদের কাহিনী শুনে মনে হল, এবার বাস্তুহারা হয়ে যারা আসবে, তারা সত্যই বন্যার স্রোতের মত আসবে। পূর্বে যারা এসেছিল, তারা প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে এসেছিল। তারা পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক হয়ে থাকতে সম্মত ছিল না বলে এসেছিল। এখন যারা আসবে, তারা রাজনীতি সম্বন্ধে এত সচেতন নয় যে নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করে রাজনৈতিক অধিকারের অভাবে দেশত্যাগী হবে। তারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী শ্রেণীর লোক। চাষ করে ফসল উৎপাদন করে অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে জীবিকা ধারণের সুযোগ পেলেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু তারাও বোধহয় এবার থাকতে পারবে না। কারণ এবার নিদারুণ অত্যাচার এবং নিপীড়নের ফলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হবে। থেকে গেলে তাদের ঘর পুড়বে, তাদের মেয়েরা ধর্ষিত হবে এবং নিজেরা খুন হবে।

শ্রীরাও ও আমি আলোচনা করে মোটামুটি ঠিক করলাম যে রেলপথে যেখানে তারা প্রথম ভারতভূমিতে প্রবেশ করবে সেখানে প্রাথমিক ত্রাণের জন্য আশ্রয়-কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কাজের জন্য দুটি কেন্দ্র নির্বাচিত হল। একটি বনগাঁ স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে। আর একটি নির্বাচিত হল দর্শনার নিকট সীমান্ত-বর্তী অঞ্চলে। উদ্দেশ্য, যারা রেলপথে সীমান্ত অতিক্রম করে এই দুই স্থানে আসবে তাদের প্রাথমিক ত্রাণের ব্যবস্থা এখানে হবে এবং তারা যে উদ্বাস্তু হিসাবে এখানে এসেছে তার প্রমাণস্বরূপ তাদের একটি স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র দেওয়া হবে। এই প্রমাণপত্রের ভিত্তিতেই যারা আশ্রয় শিবিরে স্থান চায় তারা তা পেতে অধিকারী হবে। যারা অন্য ধরনের সাহায্য চায়, তারা তা পাবে। এই প্রমাণপত্র পরে বর্ডার-স্লিপ নামে খ্যাত হয়েছিল।

সরকারের কাছে এই ধরনের প্রস্তাব স্থাপন করব ঠিক করে আমরা কলিকাতায় ফিরে এলাম। তারপর রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডাঃ রায়ের কাছে আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার জন্য গেলাম। তিনি সব শুনলেন, শুনে আমাদের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করলেন।

শুধু তাই নয়, আরও ঠিক হল যে সরকারের ওপর যারা আশ্রয়ের জন্য নির্ভর করবে, তাদের থাকবার জন্য যত বেশি সম্ভব আশ্রয় শিবির খোলার ব্যবস্থা হক। এটি ডাঃ রায়ের নিজের নির্দেশ।

আলোচনা শেষ হল। শ্রীরাও আমাদের এই বিরাট দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হবে ভেবে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সেটা প্রকাশ করে ফেললেন। তিনি ডাঃ রায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন :

এত যে লোক আসবে, তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে উঠতে পারব তো স্যার ?

উত্তরে তিনি বললেন, কেন পারব না ? নিশ্চয় পারব।

এই তো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। যেমন ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তি, তেমন অপরিসীম মানসিক বল। দায়িত্ব যত বড়ই হক, তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। এমন নেতার অধীনে কাজ করতে কত আনন্দ।

(২)

এদিকে ভারত সরকারের ওপর মহলে এই বিরাট সমস্যা এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাঁরা তার প্রতি নজর দিতে বাধ্য হলেন। কি সিদ্ধান্ত হল তা তখনি জানতে না পারলেও শীঘ্রই তা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা ২রা মার্চ ১৯৫০ তারিখে কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএ এক সভা ডাকলেন। এই সভায় ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হল। উদ্বাস্তু সমস্যায় আগ্রহশীল কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও তাতে আমন্ত্রিত হন। তাঁদের মধ্যে ডক্টর মেঘনাদ সাহা অন্যতম।

এটা বুঝতে অসুবিধা হল না যে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তটি মুখপাত্র হিসাবে আমাদের গোচরে আনবার জন্যই শ্রীসাকসেনা এই সভা ডেকেছেন। সে সভায় তিনি যে প্রস্তাবগুলি করলেন, তাতে আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

তিনি বললেন, নূতন হাঙ্গামার ফলে যে নূতন উদ্বাস্তুর দল পুর্ববঙ্গ ত্যাগ করে এদেশে আসতে আরম্ভ করেছে, তাদের পুরাতন উদ্বাস্তুদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে. পুরাতন উদ্বাস্তু যারা এসেছিল, তাদের প্রাথমিক ত্রাণের ব্যবস্থা যেমন হয়েছিল, তেমন পুনর্বাসনের দায়িত্বও ভারত সকার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নূতন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব কেবল ত্রাণ-কার্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের জন্য পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হবে না।

বোঝাই গেল, এই হল ভারত সরকারের নূতন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে নীতিগত সিদ্ধান্ত। নূতন উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে না, কেবলমাত্র সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হল, তা প্রধানত এই :

যারা এখন পুর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসছে, তারা প্রাণভয়ে আসছে, সুতরাং যখন শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন ছেড়ে-আসা ভিটেমাটির আকর্ষণে আবার

তারা ফিরে যেতে চাইতে পারে। সুতরাং ঠিক বর্তমান পরিস্থিতে পুনর্বাসনের প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, আকস্মিকভাবে এই সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় এবং পরিশেষে সমস্যা কত বিরাট আকার ধারণ করবে, তা জানা সম্ভব না হওয়ায় পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ঠিক এই মুহূর্তে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, দুটিই এত দুর্বল যুক্তি যে মনে দাগ কাটে না। দুর্বল মকদ্দমায় আদালত কক্ষে ওকালতি মনোভাবপ্রণোদিত হয়ে হয়ত এমন যুক্তি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এখানে তা নিতান্তই অশোভন।

উদ্বাস্তুদরদী ডঃ মেঘনাদ সাহার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি যা বললেন তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়ঃ পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিপক্ষে যা যুক্তি দেখান হচ্ছে তা একান্তই দুর্বল এবং পূর্ববঙ্গ হতে নূতন হাঙ্গামার ফলে যারা আসছে, সেই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করা ভারত সরকারের অন্যায় হবে। তার ফলে তাঁরা কর্তব্য হতে বিচ্যুত হবেন। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাহলে ভারতের বর্তমান নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে। তাঁরা বঙ্গদেশ এবং পাঞ্জাব বিভাগের সময় স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

ডঃ সাহা যা বলেছিলেন, তা খুবই সত্য। স্বাধীনতার পূর্বে দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানে যে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলি থাকবে, তাদের উদ্দেশ করে সত্যই সুস্পষ্ট ভাষায় স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য জওহরলাল নেহেরু এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। মহাত্মা গান্ধী তখন দিল্লীতে অবস্থান করতেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রার্থনা সভায় তিনি একটি ভাষণ দিতেন। ১৬ই জুলাই ১৯৪৭ তারিখে প্রার্থনা সভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া তার বিবরণ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেঃ

"নূতন দিল্লীতে ১৬ই জুলাই ১৯৪৭ তারিখে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা পরবর্তী সভায় বলেছেন যে কল্পিতভাবে বা বাস্তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যেসব হিন্দু পাকিস্তানে তাদের নিজ গৃহে থাকতে পারবে না, তাদের একটা সমস্যা আছে। তাদের কাজকর্ম বা গতিবিধিতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, বা তাদের নিজেদের প্রদেশে যদি তাদের সহিত বিদেশীর মত আচরণ করা হয়, তাহলে তারা সেখানে থাকতে পারবে না! সেক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কিত প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য এমন উদ্বাস্তুদের দু'হাত খুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার

যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। তাদের অনুভব করাতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসে নি।”

জওহরলাল নেহেরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন:

“পূর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কতব্য হবে তাদের নিজেদের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা, আর যদি অন্য উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের নিজেদের দেশেই তাদের আশ্রয় দেওয়া। পূর্ব পাকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু তারা নিশ্চিত আমাদের দায়, এই অর্থে যে তারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে, আর তা যদি না সম্ভব হয় তাদের নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।”[১]

ডঃ মেঘনাদ সাহার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। পারা সম্ভব নয়। কারণ ডঃ সাহা যে অভিযোগ করলেন তা সত্য ঠিক বলতে কি, শ্রীসাকসেনা তো আলোচনা করে তারপরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এই সভা ডাকেন নি, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র হিসাবে এই সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পুর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি জানাতে এসেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন।

ভারত সরকারের এই নূতন সিদ্ধান্ত সত্যই বিভ্রান্তিকর। তার পুর্বের আচরণের সঙ্গে এই নূতন গৃহীত নীতি সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পুর্ব পাঞ্জাবে দেশ বিভাগের ফলে যখন ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়, তখন পাকিস্তান সরকার ও ভারত সরকার মানুষ এবং সম্পত্তি বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। সে ব্যবস্থা মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

শুধু তাই নয়, তা সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। কারণ ভিন্ন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি বিপন্ন হয় তাকে বাহির হতে বিপদ মুক্ত করা একরকম অসম্ভব। আর যখন ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ হয়ে দু'টি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এবং পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত, তখন অন্তত পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য স্থায়ীভাবে থাকবে এবং মাঝে মাঝে তা ব্যাপক দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমন অনুমান করাই সঙ্গত। এই পরিস্থিতিতে মানুষ বিনিময়ই সব থেকে যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেই দেশে যাবে যেখানে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মর্যাদা পাবে। সে স্থায়ীভাবে বিপদের অশঙ্কা হতে মুক্ত হবে। অতিরিক্তভাবে সম্পত্তি বিনিময়ের ব্যবস্থার ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধান সহজে হয়ে যাবে।

১ ১৭ই আগষ্ট ১৯৫০ তারিখে লোকসভায় বিতর্কে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর নিজস্ব ভাষণে উধৃত।

এই নীতি গ্রহণ করার সপক্ষে নেহেরু সরকার তখন যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। অথচ কয়েক বৎসর পরে অনুরূপ পরিবেশে যখন পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু এদেশে প্রাণভয়ে নিতান্তই নিরাপত্তার অভাবে পালিয়ে আসতে শুরু করল, সে যুক্তি আর তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। তাঁরা ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলেন।

ঠিক বলতে কি, কলকাতায় ২রা মার্চ তারিখের সভা ডাকবার আগে এ বিষয়ে লোকসভায় দুই নেতার মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এক দিকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি তখনও কেন্দ্রের অন্যতম মন্ত্রী। অপর দিকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। আমরা দেখি সেই বিতর্কে ডঃ মুখোপাধ্যায় মানুষ বিনিময়ের সপক্ষে প্রস্তাব স্থাপন করছেন এবং অপর পক্ষে জওহরলাল নেহেরু নূতন যুক্তি প্রয়োগ করে তার প্রতিবাদ করছেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই ডঃ মুখোপাধ্যায়কে জওহরলাল নেহেরুকে তাঁর পূর্বপ্রযুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধে নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। এই সম্পর্কে তাঁদের তর্কের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। লোকসভায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ তারিখের বৈঠকে উভয়ের মধ্যে এইরূপ বাদানুবাদ চলে :

জওহরলাল নেহেরু—'এই (মানুষ বিনিময়ের) প্রস্তাব এমন একটি জিনিস যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক এবং আত্মিক নীতির বিরোধী। তার সঙ্গে আরও একটি মহত্তর নীতি জড়িত আছে। তা হল আমাদের বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন।'

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উত্তরে বললেন,—'পণ্ডিত নেহেরু যখন পাঞ্জাবে মানুষ বিনিময়ের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠাণ্ডাঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন মনে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাঁর উচিত হবে বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠাণ্ডাঘরে আবদ্ধ রেখে অভিজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদদের মত বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট মানুষও জওহরলাল নেহেরুর মতকে পরিবর্তিত করতে পারেন নি। পশ্চিম পাঞ্জাব সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাকে বিসর্জন দিয়ে এবার শ্রীনেহেরু ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। এই নূতন নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তান হতে নূতন যারা আসবে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে না, কেবল সাময়িক আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হবে।

এই নীতি-পরিবর্তনের একটি কারণ নিশ্চয় ছিল। কাগজপত্রে তার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তা অনুমান করা শক্ত হবে না। সে কারণ খুঁজতে হবে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে সংঘটিত পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গা আর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের

ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার মধ্যে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার থেকে। যাকে কেন্দ্র করে এই নূতন পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে তা হল কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সহিত বিবাদ।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে পাকিস্তান বেনামীতে কাশ্মীর আক্রমণ করে। কাশ্মীরের মহারাজা তখন বিপদগ্রস্ত হয়ে নিজ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ফলে আক্রমণকারীদের সহিত কয়েক মাস ব্যাপী যুদ্ধের পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশে যুদ্ধবিরতি হয়। এখানকার রাজা হিন্দু, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের সামনে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ রূপটি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবত কর্তৃপক্ষের নিকট একান্তই প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল। সেই কারণেই এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই নূতন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মানুষ বিনিময় করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহলে তো বিশ্বের কাছে প্রমাণ হয়ে যায়—ভারতরাষ্ট্র তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপদে রাখতে সক্ষম নয়।

সুতরাং শ্রীমোহনলাল সাকসেনা ডঃ সাহার প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? তিনি তো স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে আসেন নি! কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মহল দিল্লীতে বসে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তিনি তার মুখপাত্র হয়ে এখানে তা জানাতে এসেছেন।

সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই নূতন সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য আলোচনা শুরু করলেন। তিনি জানালেন, নূতন নীতি অনুসারে নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না, তাদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় শিবিরে স্থান দিয়ে প্রয়োজনীয় ত্রাণকার্যের আয়োজন করতে হবে। তার জন্যও তো একটা ব্যবস্থা দরকার। তিনি ধরে নিলেন, যত মানুষ এই সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসবে, তাদের সকলেই সরকারের আশ্রয় বা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না। তাদের অনেকে নিজেদের ওপর বা আত্মীয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। কেবল যারা সম্পূর্ণরূপে সরকারের ওপর নির্ভর করে থাকবে তাদের জন্যই আশ্রয় শিবির স্থাপন করে তাতে আশ্রয়দান এবং ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর ধারণায় তাদের সংখ্যা হবে দুই লক্ষ মানুষের মত। এদের আশ্রয়দানে সাহায্য করবার জন্য তিনি পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানালেন।

বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনার ফলে যা সিদ্ধান্ত দাঁড়াল তা হল এই: ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যা প্রত্যেকে ২৫,০০০ উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেবার ভার নেবে। বিহার সরকার ভার নেবে ৫০,০০০ উদ্বাস্তুর। আর বাকি সম্ভাব্য আশ্রয়প্রার্থী এক লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার পড়বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর। শ্রীমোহনলাল সাকসেনা আরও নির্দেশ দিলেন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য এই যে

নূতন আশ্রয় শিবিরগুলি স্থাপিত হবে, সেগুলি যতখানি সম্ভব সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় যেন স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বোধ হয় আশা ছিল যে দাঙ্গা মিটে গেলে এবং শান্তির পরিবেশ ফিরে এলে সেক্ষেত্রে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গে ফিরে যাওয়া অনেক সহজ হবে।

তিনি এসে এই সম্পর্কে নূতন উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্যের প্রস্তুতি হিসাবে আর একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছিলেন তাই আমাদের সবথেকে বেশি কাজে লেগেছিল। উদ্বাস্তুদের ব্যয় নির্বাহের সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকারেরই বহন করবার দায়িত্ব ছিল। কেবল প্রশাসনিক কর্মচারীদের বেতনের অর্ধেক ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহন করতে হত। এতকাল দিল্লীর কেন্দ্রীয় আপিস হতেই উদ্বাস্তু-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা হত। সে ব্যবস্থায় এতদিন বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সমস্যা তেমন বড় আকার ধারণ করে নি। কিন্তু নূতন পরিবেশে সমস্যা যেমন বড় আকারে দেখা দিল, তা তেমনি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি করল। এক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থা চালু রাখা বিবেচনার কাজ হবে না।

এই যুক্তি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করলেন যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের একটি শাখা কলিকাতায় স্থাপিত হবে। সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলবার জন্য এক যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হল এবং অর্থবিভাগের একজন উপসচিবকেও তাঁর সহিত সহযোগিতায় কাজ করার জন্য কলিকাতার আপিসে স্থাপন করা হল। দিল্লী হতে বি. জি. রাও ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব হিসাবে এই শাখা আপিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতায় আমাদের কাজ করা অনেক সহজ হয়েছিল। সুদূর দিল্লীতে এই জরুরী অবস্থায় ঘন ঘন ছুটতে হলে নূতন সমস্যার প্রতি নজর দেওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ত।

(৩)

ভারত সরকারের এই নূতন নির্দেশনার ভিত্তিতে আমাদের কতকগুলি ব্যবস্থা করে নিতে হল। চব্বিশ পরগণার পূর্বপ্রান্তে আশ্রয় শিবির স্থাপনের জন্য কিছু খালি জমি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি হুকুমদখল করে দ্রুত আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হল। বসিরহাট অঞ্চলে চণ্ডীপুরের নিকট এবং বনগাঁ মহকুমার বাগদা ও ট্যাংরা গ্রামে এইভাবে আমরা অনেকগুলি আশ্রয় শিবির গড়ে তুলেছিলাম। চেলা বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়াল আর ওপরে টিনের ছাদ দিয়ে অনেক লম্বা লম্বা ঘর বানান হল। সেগুলির মাঝে মাঝে দর্মার বেড়া দিয়ে ছোট ছোট কামরায় ভাগ করা হল। পানীয় জলের জন্য নলকূপ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যায় কুয়া পায়খানাও নির্মাণ করা

হল। এই তিন জায়গায় মোট হাজার পনর মানুষের জায়গা হয়। সুতরাং কেবল সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় শিবির স্থাপন করে নূতন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না বোঝা গেল।

সুতরাং অন্য ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হল। রাণাঘাটে তখনও পুরাতন আমলের একটি আশ্রয় শিবির চালু ছিল। উদ্বাস্তু বিভাগের এক কর্মী তার বেশ একটি কবিত্বপূর্ণ নাম দিয়েছিলেন—রূপশ্রীপল্লী। কি প্রেরণার প্রভাবে জানা নেই, তবে তার মাহাত্ম্য আছে বলতে হবে। কারণ সে নাম এখনও ঠিক আছে। সে শিবিরটিকেও তৈরি রাখা হল নূতন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার জন্য। সেখানে পাঁচ হাজার মানুষের স্থান হত। কোথায় এক লক্ষ মানুষের ভার নিতে হবে, আর সব জড়িয়ে তো মোটে কুড়ি হাজারের ব্যবস্থা হল। কাজেই আরও ব্যাপক আয়োজনের কথা ভাবতে হয়।

সেটা সম্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে। সেই সময় জাপানীদের সঙ্গে ভারতের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে রাণাঘাটে আর ধুবুলিয়ায় অনেকখানি জমি হুকুমদখল হয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। রাণাঘাটের জমি ব্যবহার হয়েছিল যুদ্ধসংক্রান্ত মালপত্র মজুত রাখার জন্য। সেই উদ্দেশ্যে সেখানে বেশ লম্বা লম্বা বাঁকা টিনের ছাদ আর বাঁধান মেজে-সমন্বিত ঘর বসান হয়েছিল। এগুলির পারিভাষিক নাম 'নিসেন হাট'। এক একটি ১০০ ফুট মত লম্বা এবং ২৫ ফুটের ওপর চওড়া। প্রতিটির মধ্যে দুই সারিতে কুড়িটি পরিবারকে স্থান দেওয়া যায়। এই রকম প্রায় ৯০টি নিসেন হাট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাতেই বা কত লোক ধরবে? বড় জোর ১৮০০ পরিবার। সুতরাং তার সংলগ্ন যে ফাঁকা জমি ছিল, সেখানেও বাগদা ও চণ্ডীপুরের মত অনেক অস্থায়ী ঘর বানান হল। এইভাবে এই স্থানেই তিরিশ হাজারের উপর মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা হল।

কিন্তু তাতেও তো ভরসা পাওয়া গেল না। তাই আরও একটি বড় আশ্রয় শিবির খোলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। ভাগ্যক্রমে, খুঁজতে খুঁজতে একটি সুবিধামত স্থানও পাওয়া গেল। কৃষ্ণনগরের উত্তরে জলাঙ্গী নদী পার হয়ে আরও দশ মাইল মত গিয়ে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড পাওয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেটি হুকুমদখল করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। প্লেন ওড়বার ও নামবার জন্য বেশ চওড়া এবং এক মাইল দীর্ঘ একটি রানওয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। সৈন্যদের থাকবার জন্য লম্বা লম্বা ব্যারাক ধরনের অনেক বাড়ি করা রয়েছিল। বাড়িগুলি বেশিরভাগই রেল লাইনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল।

এই জায়গাটি বেশ প্রশস্ত হওয়ায় এবং রেল পথে ও রাস্তার সহিত সংযোগ থাকায় এটিকে একটি বড় আশ্রয় শিবিরে পরিণত করার ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। পশ্চিম প্রান্তের বাড়িগুলি ব্যবহার হয়েছিল বৃদ্ধ ও পঙ্গু পুরুষ এবং বিধবা পরিবারদের থাকবার জন্য। আর পূর্বের প্রশস্ত ভূমিতে রানওয়ের দুই পাশে বাঁশের বা দরমার বেড়া আর টিনের ছাদ দিয়ে অনেক অস্থায়ী প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল। এইভাবে এইখানে মোট ষাট হাজার মানুষের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু পূর্ব বাঙলা হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার শীঘ্রই এত বেড়ে গেল যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বনগাঁ বা বানপুর দিয়েই বেশির ভাগ মানুষ রেলপথে আসত। তাদের এ প্রান্তের রেল স্টেশনে আসার পর অভিজ্ঞানপত্র (যা বর্ডার স্লিপ বলে পরিচিত ছিল) দেওয়া হত, তাই নিয়ে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে আসত। সেখান হতে তাদের সুবিধামত পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বা বিহার বা উড়িষ্যায় পাঠান হত। কিন্তু রোজ স্টেশনে এত ভিড় হত যে দু দিনের আগে সেখান হতে নূতন আগত উদ্বাস্তুদের সরান সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিদিন যারা আসছে—তাদের একদিনের মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে সরাতে হবে—এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। অথচ দূরের আশ্রয় শিবিরে পাঠানর ব্যবস্থা করতে কয়েক দিন দেরি হয়ে যেত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নূতন শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এদের যা কাজ তার দ্বারা তাদের চিহ্নিত করার জন্য তাদের নাম দেওয়া হয় ট্রানজিট ক্যাম্প, অর্থাৎ স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে যাবার ব্যবস্থা করতে যে কয়দিন থাকতে হবে সে দিন ক'টি কাটাবার জন্যই এই অস্থায়ীভাবে বাসের আশ্রয় শিবিরগুলি স্থাপিত হয়। কলিকাতা ও হাওড়া দুই অঞ্চলেই ভাগীরথীর দুই তীরে যেমন পাটের কল আছে, তেমন পাটের গুদামও আছে। এই গুদামে যন্ত্রের সাহায্যে পাটকে চাপ দিয়ে গাঁইটবন্দী করবার ব্যবস্থা থাকত। তারপর সেই পাট গুদামঘরে স্থাপিত করে রক্ষা করা হত। এই গুদামঘরগুলির মেজে পুরু কাঠের তক্তা দিয়ে নির্মিত। দেয়াল ও ছাদ টিনের। কোন কোন গুদাম দু'তলা, এমন কি তিন তলা হত। সুতরাং এখানে ঢালা বড় বড় ঘরে অস্থায়ী-ভাবে অনেক পরিবারের স্থান হতে পারত। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মতই তা প্রশস্ত। আমরা এই রকম কয়েকটি গুদাম হুকুমদখল করে সেখানে অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা করেছিলাম।

উদ্বাস্তুদের স্টেশন হতে সরাবার তখন এই ব্যবস্থা হয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুরা এলে পর স্টেশন হতে প্রতিদিন তাদের অস্থায়ীভাবে এই ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে পাঠান হত। সেখান হতে তাদের পালা করে বিভিন্ন স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পাঠান হত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার নিকটে প্রথমে দুটি বড় পাটের গুদাম ভাড়া করা হয়। তাদের একটি অবস্থিত ছিল কাশীপুর

গানফাউণ্ড্রি রোডে এবং অপরটি ছিল উল্টাডাঙ্গার খালের পূর্বপারে। প্রতি গুদামে প্রায় পাঁচ হাজার উদ্বাস্তুকে প্রয়োজন হলে স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই উদ্বাস্তুদের আগমনের হার এত বেড়ে যেতে লাগল যে তাদের জন্য নিত্য নূতন আশ্রয় শিবির খোলা সম্ভব হল না। তখন এই অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পেই দীর্ঘকাল ধরে অনেক উদ্বাস্তুর থাকতে হত। এই জন্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ঘুষুড়িতেও একটি বড় পাট গুদাম ভাড়া করে সেখানে উদ্বাস্তু পরিবারদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তা সত্ত্বেও শিয়ালদহ স্টেশন হতে প্রতিদিন আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে নিয়মিত আশ্রয় শিবিরে পাঠান সম্ভব হয় নি। ফলে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের পড়ে থাকতে হয়েছিল। যখন উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন স্টেশনে কম করে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তুর পড়ে থাকতে হত।

কথা উঠল কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতায় যখন একটি আপিস খোলা হয়েছে, উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্যে তাদেরও খানিকটা জড়িত থাকা উচিত। এই প্রস্তাবের সপক্ষে একটি যুক্তি পাওয়া গেল। যেসব উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয়ের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করছে, তাদের মূল অংশকে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন শিবিরে স্থান দেওয়া হবে ঠিক হলেও তাদের একটি অংশের বিহার ও উড়িষ্যা সরকার স্থাপিত আশ্রয় শিবিরে যাবার কথা। এই দুই প্রদেশে যাবার জন্য যে পরিবারগুলি নির্বাচিত হবে তাদের ওখানে পাঠাবার ভার কেন্দ্রীয় সরকার সোজাসুজি গ্রহণ করলেই ভাল হয়। তাহলে কাজটি আরও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং একটি আশ্রয় শিবির চালানর দায়িত্ব যদি ভারত সরকারের কলিকাতাস্থিত শাখা আপিস গ্রহণ করে, সেখান হতে উড়িষ্যা ও বিহারে উদ্বাস্তু পরিবারদের পাঠান সুবিধা হয়। এই কারণে ডাঃ রায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

এদের হাতে তুলে দেবার জন্য যে আশ্রয় শিবিরটি নির্বাচিত হয়, সেটি হল রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প। আমরা যতগুলি আশ্রয় শিবির এই সময়ে খুলেছিলাম তাদের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথম স্থান অধিকার করেছিল ধুবুলিয়ার আশ্রয় শিবির। সেখানে এক সময় প্রায় সত্তর হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। কুপার্স ক্যাম্পে চল্লিশ হাজারের ওপর মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারত। এটিকে নির্বাচন করবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। স্থানটির সহিত রেলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই ভাল। এটি জংশন স্টেশন হওয়ায় এখান হতে উড়িষ্যা ও বিহারে অবস্থিত বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে সোজা রেলপথে উদ্বাস্তুদের পাঠান সম্ভব ছিল।

(৪)

ফেব্রুয়ারি ১৯৫০-এর শেষ হতে পূর্ববঙ্গ হতে উদ্বাস্তুদের আগমন বন্যার আকার ধারণ করল। প্রচুর বারিপাতের পর বিভিন্ন নদীর অববাহিকা হতে যেমন বিভিন্ন স্রোতে জলধারা নিম্নভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়, পূর্ব বাঙলার হিন্দু তেমন যে পথে সুবিধা সেই পথে পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয়ের জন্য আসতে আরম্ভ করল।

ব্যাপারটি কিভাবে ঘটেছিল তা ঠিক রকম বুঝতে পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতির একটু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার নিকটতম ভারতভূমির অংশ হল ত্রিপুরা রাজ্য। সুতরাং সেই দিকে এই অঞ্চলের বাস্তুত্যাগী হিন্দুর স্বাভাবিক গতি। শ্রীহট্টের হিন্দুর স্বাভাবিক আশ্রয় হল কাছার জেলা। অনুরূপভাবে ময়মনসিংহ জেলার হিন্দুর আকর্ষণ উত্তর আসামের প্রতি। উত্তরে রংপুর জেলার মানুষের নিকটতম আশ্রয়স্থল কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা। পূর্ব দিনাজপুরের উদ্বাস্তুর গতি পশ্চিম দিনাজপুরের দিকে। রাজসাহী জেলার মানুষের আকর্ষণ মালদহের দিকে। পূর্ব পাকিস্তানের বাকি যে অংশ তার থেকে দু'টি মূল স্রোতে পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণ অংশে উদ্বাস্তু হিন্দুর স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম স্রোতটি ট্রেনযোগে দর্শনায় এসে সীমানা অতিক্রম করে ভারতভূমিতে প্রবেশ করত। তাদের প্রাথমিক সাহায্য দেবার জন্য ভারতের সীমান্তে বানপুরে একটি শিবির স্থাপন হয়েছিল। এই পথে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যভাগে যে হিন্দু পরিবারগুলি বাস্তুত্যাগ করে আসত তাদের স্রোতটি বইত। আর পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হতে যে দ্বিতীয় মূল স্রোতটি প্রবাহিত হত তার প্রাথমিক সাহায্যের জন্য বনগাঁয়ে একটি শিবির স্থাপিত হয়েছিল। বানপুব এবং বনগাঁর পথেই উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বার আনা অংশ ভারতে আশ্রয়ের জন্য প্রবেশ করত।

এ ছাড়া সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষ পায়ে হেঁটেই সপরিবারে সীমানা অতিক্রম করত। বয়স্ক পুরুষদের মাথায় এবং হাতে জিনিসপত্র, বয়স্ক মেয়েদের কোলে শিশু এবং তাদের হাত ধরে হাঁটবার ক্ষমতা রাখে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে সারবন্দী আসত। পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব পাকিস্তানের নানা অংশে এই রকম পায়ে চলা উদ্বাস্তু পরিবারের স্রোত দিনের পর দিন প্রবাহিত হয়েছিল।

মার্চ মাসে এই আশ্রয়প্রার্থীর স্রোত একমুখে প্রবাহিত হয় নি। পূর্ব পাকিস্তান হতে যেমন হিন্দু পরিবারগুলি একান্তই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে খুন জখমের ভয়ে এইভাবে দলে দলে বাস্তুত্যাগ করে চলে আসত, পশ্চিম বাঙলা হতেও তেমন দলে দলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপত্তার

জন্য পাকিস্তান অভিমুখে রওনা হত। তারাও ট্রেনযোগে এবং পায়ে হেঁটে দুই পথেই ভারত ত্যাগ করত। এইভাবে ব্যাপক আকারে মুসলমান পরিবারগুলি বেশি চলে গিয়েছিল নদীয়া জেলা হতে। এই জেলার প্রান্তে অবস্থিত তেহট্ট ও করিমপুর অঞ্চল হতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সহস্র সহস্র মুসলমান পরিবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে গিয়েছিল। চব্বিশ পরগণার উত্তর অঞ্চলেও বাগদা, বনগাঁ প্রভৃতি থানা হতে ব্যাপক হারে মুসলমান বাস্তুত্যাগী পরিবার পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার বেশ মনে পড়ে একটি দিনের কথা। তারিখটি হল ২রা মার্চ, ১৯৫০। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা তখন কলিকাতায়। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের উদ্বাস্তু আগমনের ব্যাপকতার সহিত পরিচিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুতরাং তাঁকে সেদিন সকালে বনগাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। বনগাঁ স্টেশনে রেলগাড়িতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি গাদাগাদি করে কিভাবে আসছে সেদিন তাঁর স্বচক্ষে তা দেখা হয়েছিল। গাড়িতে তিল ধারণের স্থান ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন কি বাহিরের পাদানিতেও অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। বনগাঁতে যে প্রাথমিক সাহায্যের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে, সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। দিনে কয়েকবার ট্রেন-যোগে উদ্বাস্তু পরিবারদের এখান হতে কলিকাতায় পাঠানর ব্যবস্থা ছিল। তবু সেখানে অগণিত মানুষের ভিড়।

তারপর তিনি সীমান্ত এলাকা দেখতে চাইলেন। তাই যশোর রোড ধরে আমরা সীমানার দিকে এগিয়ে গেলাম। বেনাপোলে দুই রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। আমরা পথে যেতেই দেখেছিলাম অনেক মুসলমান পবিবার বাস্তুত্যাগ করে এই পথ ধরে পাকিস্তানের সীমানার দিকে এগিয়ে চলেছে। আবার সীমানার নিকটে গিয়ে দেখি রাস্তার পুর্ব অংশেও অনুরূপভাবে হিন্দু পরিবার পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলার দিকে এগিয়ে আসছে। দুই পাশেরই সীমান্তরক্ষী পুলিশ বিনাবাধায় এই দুটি স্রোতকে উল্টো পথে যেতে দিচ্ছে।

কৃত্রিমভাবে দেশ বিভাগের ফলে যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল, এইভাবে এই দ্বিমুখী স্রোত তার যেন একটা স্বাভাবিক পথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করছিল। যে দু'টি সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি প্রতিবেশী হিসাবে বাস করতে অভ্যস্ত তারা বিভিন্ন বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক খেলার ক্রীড়নক হয়ে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বসল। এই রাজনৈতিক খেলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারই মূল হাতিয়ার। ফলে দেশ বিভাগের পরেও যখন দুই সম্প্রদায় প্রায় আগের মতই পাশাপাশি বাস করতে আরম্ভ করল, তারা দেখল সেই বিদ্বেষ বিষ তাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাদের শান্তির পরিবেশে সহাবস্থিতিকে

একেবারেই অসম্ভব করে তুলেছে। যে রাষ্ট্রে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানে সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব এত বেশি যে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দানা বেধে ওঠে আর তখন পাইকারী হারে হিন্দু হত্যা হয়। যে রাষ্ট্রে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সেখানেও অবস্থা অনুরূপ। তারা সেখানে নিরাপদে কাজ করতে পারে না। সেখানেও সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বাধে, খুন জখম হয়।

এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল বলেই ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের এই দারুণ বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বেধে হিন্দু নির্যাতিত হল ও তার খবর পশ্চিম বাঙলায় পৌঁছলে সেখানকার হিন্দু মুসলমানকে আক্রমণ করল। সে খবর আবার যখন পূর্ব বাঙলায় পৌঁছাল সেখানে আরও ব্যাপক হারে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হল। এইভাবে প্রতিহিংসার প্রেরণায় সীমানার দুই দিকেই দাঙ্গা, খুন ও জখম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র সম্প্রদায়ের মনে যখন বিদ্বেষ এইভাবে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলে, তখন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সদিচ্ছা থাকলেও এই ব্যাপক অত্যাচার দমন করতে ক্ষমতা রাখেন না। পঞ্চাশ সনের ব্যাপক দাঙ্গা সেই সব কথাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

যাঁরা আশাবাদী তাঁরা ভাবেন, হয়ত সদিচ্ছা থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রোষবহ্নি হতে রক্ষা করা যায়। শ্রীজওহরলাল নেহেরু হয়ত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু আমি তো দেখেছি, রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি। আমি তো জানি ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরের কাছে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কেবল রোষবশেই মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিদ্বেষপ্রণোদিত হলে মানুষ যে উন্মাদের মত আচরণ করে এবং সকল সদ্‌গুণ বিসর্জন দিয়ে জঘন্য আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, তাও দেখেছি। এই সূত্রে মনে পড়ে যায়, সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা যিনি নিজের আশ্রিত মুসলমানকে রক্ষা করবার জন্য জনতার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি হলেন আলেকজাণ্ডার লেসলি ক্যামেরন, এণ্ড্ ইউল কোম্পানীর বড় সাহেব। ভাগীরথী শিল্পাশ্রম হতে তিনি নিজের মোটর-গাড়ি করে কলিকাতায় ফিরছিলেন। পথে যেতে তাঁর চালক যে মুসলমান, তা কেমন করে প্রচার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ জনতা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তিনি বাধা দিতে গিয়ে নিজেই খুন হন। এইভাবে সামগ্রিক উত্তেজনা সৃষ্টি হলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিধিবিধান, আদালতের বিচার প্রভৃতি তখন কোনই কাজে লাগে না। সুতরাং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে এই পরিবেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা সন্দেহের বিষয়।

অপর পক্ষে যাঁরা ভাবেন, যে-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভিন্ন রাষ্ট্রে রয়ে গেল অথচ যার সাংস্কৃতিক সংযোগ আমাদেরই রাষ্ট্রের সঙ্গে, তাদের বাইরে থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব, তাঁদের নিতান্তই স্বপ্নবিলাসী বলতে হবে। তা একান্তই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সেটা কিভাবে সম্ভব তা তো ভেবে পাওয়া যায় না। যারা অত্যাচারের মুখে পড়েছে তারা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের নিরাপত্তায় রাখার দায়িত্ব সেই ভিন্ন রাষ্ট্রেরই। তাদের যদি সদিচ্ছা থাকে তা হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তার অভাব হলে তো কথাই নেই। অবশ্য বাহির হতে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু তা সামান্যই ফল দেয়। তার একমাত্র প্রতিকার হল যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু তাও তো বাঞ্ছনীয় নয়।

এই পরিস্থিতিতে দুই রাষ্ট্রই যখন তাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই হিংসাত্মক পরিবেশে নিরাপদে রাখতে পারল না, তখন তারা নিজেরাই এক স্বাভাবিক পথে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করল। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে যে রাষ্ট্রে তারা নিরাপদে বাস করতে পারবে আশা করে, সেই রাষ্ট্রেই তারা আশ্রয় খুঁজতে চলল। সেই কারণেই এই দ্বিমুখী স্রোত। মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে যায়, আর হিন্দু পশ্চিম বাঙলায় আসে।

ঠিক বলতে কি এই পথেই পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হবার অব্যবহিত পরে এই সমস্যার সমাধান সহজে সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়েছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ পূর্ব পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে এই দুই অঞ্চলে নিগৃহীত হবার মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আর কেউ ছিল না। এই ব্যবস্থা অন্য দিক হতেও ভাল। এক দেশ হতে যখন মানুষ বিপুল সংখ্যায় অন্য দেশে আসে তখন তারা শুধু অস্থায়ীভাবে আশ্রয়ের জন্য আসে না, স্থায়ীভাবে থাকতে আসে। সুতরাং আশ্রয়দাতা দেশের তাদের পুনর্বাসন সমস্যারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে এইভাবে মানুষ বিনিময়ের একটা সুবিধা আছে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ চলে গেলে অনেক চাষের জমি, অনেক বাসের ঘর খালি হয় এবং সেখানে যারা আসছে, তাদের বসান যায়। অপর পক্ষে উদ্বাস্তুদের আগমন যদি এক তরফা হয় তাহলে পুনর্বাসন সমস্যা জটিল আকার গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশে একসঙ্গে অনেক নূতন মানুষ এলে তাদের বাসস্থান, তাদের চাষের জমি, এমনকি শিল্পে কাজ জুটিয়ে দেওয়াও শক্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রতিপাদ্যের যুক্তিযুক্ততা খুব ভাল হৃদয়ঙ্গম হবে পূর্ব পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার সহিত পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার তুলনা করলে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাবের দুই দ্বিখণ্ডিত অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবার ফলে ভারত ও পাকিস্তান, উভয় রাষ্ট্রই মানুষ এবং সম্পত্তি বিনিময়ের নীতি গ্রহণ করে। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব হতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয়ের জন্য

পূর্ব পাকিস্তানে আসে, তাদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায়। তাদের মোটা অংশই পূর্ব পাঞ্জাবে পুনর্বাসন নেয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের আদম সুমারি অনুসারে দেখা যায় সেখানে চব্বিশ লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল। অথচ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তাদের পুনর্বাসনের প্রাথমিক কাজ এক রকম শেষ হয়ে গিয়েছিল। যারা পূর্ব পাঞ্জাব ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এত পরিমাণ চাষের জমি এবং এত বাস্তুভিটা ফেলে গিয়েছিল যে সেই সম্পত্তি হতেই এদের বাস্তুজমি ও চাষের জমি বণ্টন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে হয় নি এবং সেই কারণেই সম্ভবত নূতন আগত উদ্বাস্তুদের সহিত তাদের কোন স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটে নি।

পূর্ব বাঙলা হতে এ পর্যন্ত যে উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছিল তা কখনও তুলনায় বিরাট আকার ধারণ করেছে, কখনও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ঠিক দেশ বিভাগের পরেই তা বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরে তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়, তখন আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেক হিন্দু পরিবার চলে আসে। ফলে উদ্বাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি পায়। তারপর আবার তা মন্থর হয়ে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে একরকম থেমে যায় বলা যেতে পারে।

কিন্তু সে সময়ে শান্তির পরিবেশ এমন বিপর্যস্ত হয় নি যে নিরাপদে উদ্বাস্তুদের আগমন বিঘ্নিত হয়েছিল। তারা ইচ্ছামত আসতে পেরেছে। তারা এমন সংখ্যায় আসে নি যে স্থানীয় মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হয়েছে। কাজেই মানুষ ও সম্পত্তি বিনিময়ের প্রশ্ন তখনও ওঠে নি।

অপর পক্ষে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উভয় বঙ্গে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল তা এত ব্যাপক আকার গ্রহণ করল যে উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে একান্তই নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি হল। স্থানীয় রাষ্ট্র এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারল না যা তাদের সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষা সম্ভব করে। ঠিক বলতে কি পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে অবস্থা সংঘটিত হয়েছিল, উভয় বঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই পরিবেশে যখন স্থানীয় সরকারের তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থা হারায় তখন তারা স্বাভাবিক পথেই নিজেরা এই সমস্যার সমাধান খোঁজে। উভয় বঙ্গের মানুষও তাই করল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেখানে তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সেই হেতু স্থানীয় রাষ্ট্রের সহানুভূতি পাবার আশা রাখে, সেখানেই পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটল। এই কারণেই ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের উদ্বাস্তু স্রোত একমুখী হয় নি, তা উভয় মুখেই প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের সহিত তার পার্থক্য

রইল এই যে এখানে এই স্বাভাবিক সমাধানের চেষ্টায় সরকারের কোন সমর্থন রইল না। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একই বৃত্তি পরিচালিত হয়ে, কেবল আত্মরক্ষার ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এইভাবে মানুষ বিনিময়ের ব্যবস্থা করে নিল।

তখন সরকারের এবিষয়ে ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এই স্বাভাবিক রীতিতে সম্পত্তি বিনিময়ের চেষ্টা যে হয় নি তা নয়। অন্তত পশ্চিম বাঙলায় আমি স্বচক্ষে তার প্রমাণ পেয়েছি। এই দুর্যোগের সময় বিভিন্ন আশ্রয়শিবির পরিদর্শনের জন্য আমাকে চব্বিশ পরগণার উত্তর অঞ্চল এবং নদীয়া জেলার বহু স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে এই সময়ে লক্ষ্য করেছি এক একটি স্থানে পাকিস্তান হতে আগত অনেক উদ্বাস্তু পরিবার জমা হয়েছে। নেমে কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি, তারা খবর পেয়েছে নিকটবর্তী গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তান রওনা হচ্ছে। তারা চলে গেলেই সেই গ্রাম তারা দখল করবে বলে অপেক্ষা করছে। এই ধরনের সম্পত্তি ত্যাগ এবং নবাগত উদ্বাস্তু পরিবার কর্তৃক সেই শূন্যস্থান পূরণ একরকম শান্তির পরিবেশেই সংঘটিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে মুসলমান পরিবারগুলি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পূর্ব পাকিস্তানে এই সময়ে চলে গিয়েছিল, তারা যে সম্পত্তি ফেলে গিয়েছিল, তার পরিমাণ সম্বন্ধে তা একটু ধারণা দেবে। রাণাঘাটে রূপশ্রী পল্লী নামে একটি উদ্বাস্তু শিবির যে খোলা হয়েছিল, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নূতন উদ্বাস্তু আগমনের সময় এই শিবিরটি তাদের আশ্রয় দেবার জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাতে এই সময় পাচ হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্রয় শিবিরের সকল মানুষই তা ত্যাগ করে এই সময় মুসলমান বাস্তুত্যাগীর পরিত্যক্ত বাস্তুভূমিতে চলে গিয়েছিল। এই সময় আশ্রয় শিবিরের থেকে যেন এই পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপরই আকর্ষণ বেশি হয়েছিল। মনে হয় এইভাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবহার নবাগত উদ্বাস্তুরা না করলে আমাদের স্থাপিত আশ্রয় শিবিরগুলির ওপর চাপ এই সময় আরও বৃদ্ধি পেত এবং সম্ভবত তাদের এক বিরাট অংশকে আমাদের পক্ষে আশ্রয় শিবিরে স্থান দেওয়া সম্ভব হত না।

(৫)

এইভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা তখন এত বিরাট আকার ধারণ করল যে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এই সময় তিনি দু'বার কলিকাতায় এসেছিলেন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। প্রথম-বার আসেন মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষেই মোহনলাল সাকসেনা দিল্লী ফিরে

যাবার ঠিক পরেই। ৮ই মার্চ তারিখে সকালে তাঁকে বনগাঁ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্থ আগত উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক সাহায্যের জন্য যে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল তা তিনি পরিদর্শন করেন। অনেক উদ্বাস্তুদের প্রশ্ন করে তাদের মুখে তারা কি অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল সে বিষয়েও তিনি খবর সংগ্রহ করেন। তারপরে তিনি দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন।

পরের সপ্তাহে তিনি কলিকাতায় আবার এসেছিলেন। এবার সঙ্গে এসেছিলেন দুটি বিশিষ্ট মানুষ। একজন হলেন উদ্বাস্তুদের দরদী বন্ধু ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অপরজন হলেন শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে। তিনি আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র। স্বাধীনতার পূর্বে বোম্বাই শহরে বৈদ্যুতিক যন্ত্র উৎ-পাদনের এক মার্কিন কোম্পানির স্থানীয় কর্তা হিসাবে মোটা মাহিনার অফিসার ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি আদর্শ উপনগরী রচনার ভার দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব নিয়ে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিলোখেরিতে একটি আদর্শ উপনগরী স্থাপন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মনে হয় পূর্ব সপ্তাহে বনগাঁ অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবির দেখে তাঁর মন বিচলিত হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের স্রোত যে বিরাট আকার ধারণ করেছিল তাতে এখন আর এমন আশা পোষণ করা সম্ভব ছিল না যে পাকিস্তানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে এরা ফিরে যাবে। অন্তত যারা আসছে তাদের এক বিরাট অংশ যে ফিরবে না এবং তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকারকে গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়, মনে হয়, তাঁর সন্দেহ ছিল না। তাই জন্যই সম্ভবত শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে'কে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, কারণ তাঁর সগু-প্রতিষ্ঠিত খ্যাতির ভিত্তিই হল নিলোখেরিতে উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপনে সাফল্য।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর যোগ্য সহকর্মী। তিনি একান্তভাবেই উদ্বাস্তু-দরদী। উদ্বাস্তুদের দুর্দশার সহিত পরিচিত হয়ে পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার আলোচনায় যাতে সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে যায়, তাই দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

১৫ই মার্চ ১৯৫০ তারিখের সকালে রাজভবন হতে আমরা দু'টি গাড়িতে রওনা হলাম। প্রথম গাড়িতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। অন্য গাড়িটিতে স্থান পেলাম বাকি তিনজন, অর্থাৎ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে ও আমি।

প্রথমে আমরা হাজির হলাম রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে। সেখানে চল্লিশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য ব্যারাকের ধরনের লম্বা লম্বা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া নব্বইটি নিসেনহাট তো ছিলই। দু সপ্তাহ ধরে প্রবল আকারে উদ্বাস্তু স্রোত বয়ে চলেছে। ফলে এত বড় আশ্রয় শিবির

ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। শ্রীজওহরলাল নেহেরু সমগ্র শিবির ঘুরে ঘুরে দেখলেন, অনেক উদ্বাস্তুর সঙ্গে আলাপ করে তাদের লাঞ্ছনার কাহিনীও শুনলেন।

কুপার্স ক্যাম্প পরিদর্শনের পর ডাঃ রায় হাবড়া উপনিবেশে প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতীতে যে সব উদ্বাস্তু পরিবার পূর্ব বাঙলা হতে এসেছিল তাদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করতে পেরেছেন তা প্রধান মন্ত্রীকে দেখান। পূর্বে আগত আশ্রয়বাসী এবং বাহিরের উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উপনিবেশগুলি স্থাপন করেছিলেন, তাদের মধ্যে এটির কাজই সব থেকে বেশি এগিয়েছিল। বিশেষ করে হাবড়া উপনগরী পরিকল্পনা বেশ একটি রূপ নিয়েছিল। রাস্তাগুলি তৈরি হয়ে গেছে, এক অংশে সরকারের নির্মিত তিনশ'খানি বাড়ি নির্মিত হয়ে গেছে। তার কিছু বিলি হয়ে গেছে এবং সেখানে উদ্বাস্তু পরিবার বাস করতেও আরম্ভ করেছে। সেই কারণে প্রধান মন্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য ডাঃ রায়ের এত আগ্রহ! প্রধান মন্ত্রী সম্মত হলেন। সুতরাং রাণাঘাট হতে ফিরবার পথে আমরা বারাসতের নিকট উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে যশোহরের রাস্তা ধরে চললাম।

সেখানে এসে এঁরা তিনজনেই হাবড়া উপনগরী পরিকল্পনা দেখলেন। এই অঞ্চলটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জঙ্গি বিমানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হত। সুতরাং অনেক পিচঢালা রাস্তা ছিল এবং একটি কংক্রিট বাঁধান রানওয়ে ছিল। সেই রানওয়ে এখন হয়েছে এই উপনগরীর রাজপথ। তারই তুপাশে উঠেছে সারবন্দী একই ধরনের তিন শ বাড়ি। দেখতে হয়েছে অনেকটা দিল্লী মহানগরীর একটি পাড়ার মত। প্রধান মন্ত্রী তু'একটি বাড়ি দেখলেন, তাদের প্ল্যান কেমন হয়েছে জানবার জন্য। প্রতি বাড়িতে খরচ হয়েছিল মাত্র চার হাজার টাকা আর সংলগ্ন জমির পরিমাণ ছিল চার কাঠা। প্রতি বাড়িতে তুখানি ঘর, সামনে ও পেছনে বারান্দা আর ছোট রান্না ও স্নানের ঘর। খাটা পায়খানা এখানে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে তার ব্যবস্থা করা হয় নি। নূতন পদ্ধতির স্যানিটারি পায়খানা করা হয়েছে। প্রতি তুটি বাড়ির জন্য একটি ঢাকা কূপ খোঁড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। যেখানে কূপ খননের কাজ চলেছে সেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ নির্মাণ কার্যও দেখলেন। তারপরে সকলে কলিকাতায় ফিরে এলাম।

এই প্রসঙ্গে রাজভবনে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে একটি আলোচনাও করেছিলেন। সেখানে তিনি শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দেকে কেন সঙ্গে এনেছিলেন তার কারণ প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর পরিচয় দিলেন নিলোখেরি উদ্বাস্তু উপনিবেশের সফল প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এবং প্রকাশ্যে তাঁর ওপর ভার দিলেন পশ্চিম বাঙলায় একটি আদর্শ উপনিবেশ স্থাপনের। এই নির্দেশের ফলেই শ্রীদের তত্ত্বাবধানে ফুলিয়াকে কেন্দ্র করে পরে একটি

উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছিল। তাতে তাঁতি, অন্যান্য কারিগর শ্রেণীর মানুষ এবং ভদ্রচাষী পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তাঁতি পরিবারগুলি ছাড়া অন্যান্য পরিবারগুলির পুনর্বাসন ভাল রকম সাফল্য লাভ করে নি। ফুলিয়া এখন একটি ব্লকের কেন্দ্র এবং ব্লকের বহু কর্মী সেখানে বাস করেন। তা ছাড়া দুটি গ্রামসেবকের শিক্ষণকেন্দ্র সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে ফুলিয়া উপনগরী ভবিষ্যতে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

নিলোখেরির প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার পক্ষ থেকেও একটি দাবী উত্থাপিত হয়েছিল যে এখানেও একটি সার্থক উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে যে কলোনিটির নাম করা হয়েছিল, তা হল যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনি। তার বিষয় ইতিপুর্বেই বলা হয়েছে। নিলোখেরির সঙ্গে যে তা প্রতিযোগিতা করতে পারে, সে কথা ঠিক। বরং তা এমন একটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে যা নিলোখেরি পারে না। তা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী চেষ্টায়, সরকারের সাহায্য না নিয়ে গড়ে উঠেছিল। নিলোখেরি সম্পূর্ণভাবে সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছিল।

শ্রীজওহরলাল নেহেরুর এই আচরণ হতে বোঝা যায় যে তিনি সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলায় এসে উদ্বাস্তু পরিস্থিতি বিবেচনার পর মনে মনে খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে যারা আসছে, তাদের একটা বড় অংশের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তিনি শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দের ওপর একটি আদর্শ উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলবার ভার দেবেন কেন?

কিন্তু বড় প্রশ্ন রয়ে যায় যে স্বাভাবিক উপায়ে উভয় রাষ্ট্রের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে তাকে নিজস্ব পথে চলতে দেওয়া হবে কি হবে না। ঠিক বলতে কি, দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আচরণের মধ্য দিয়ে যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তখন চলছিল তা হল আরও মৌলিক, অর্থাৎ সংখ্যালঘু সমস্যা। দেশ বিভাগ এমন করে হয় নি যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেবল মুসলমান সম্প্রদায় থাকবে এবং ভারত রাষ্ট্রে কেবল অমুসলমান সম্প্রদায়গুলি থাকবে। তা সম্ভবত নয়, কারণ এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ দেশে মিশ্রিত আকারে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল হল দুই রাষ্ট্রেই একটি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে যারা নিরাপত্তার জন্য নিজ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে পারবে না, যারা সহানুভূতির জন্য বা বিপদে আশ্রয়ের জন্য অপর রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা হতেই উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিজ রাষ্ট্রে অশান্তির উদ্ভব হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপদে বাস সম্ভব হয় না এবং বাধ্য হয়ে তখন তারা একান্তই প্রাণরক্ষার জন্য দেশত্যাগী হয়।

তাই বলছিলাম যে পশ্চিম বাঙলায় তখন যে উভয়মুখী উদ্বাস্তু স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তা স্বাভাবিক পথে মূল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যারই উভয় বঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করছিল। তার স্বাভাবিক পরিণতি দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিনিময়। মুসলমান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাস্তুত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছিল এবং অনুরূপভাবে অমুসলমান সম্প্রদায়ের হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য আসছিল। এই মানুষ বিনিময়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিনিময়। সুতরাং এই দ্বিমুখী স্রোতকে স্বাভাবিক পথে চলতে দিলে আপনা হতেই মানুষ বিনিময় এবং সম্পত্তি বিনিময় সংঘটিত হতে পারে। ব্যাপক আকারে তা ঘটলে সংখ্যালঘু সমস্যাও স্থায়ীভাবে লোপ পেতে পারে এবং অপর পক্ষে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা উভয়রাষ্ট্রে সহজ হয়ে যায়।

তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল এই পরিস্থিতিতে মানুষ এবং সম্পত্তি বিনিময় রীতি গ্রহণ করা হবে কিনা। দেখা যায় শ্রীজওহরলাল নেহেরু পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তু পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখবার জন্য আসবার আগেই এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মহলে রীতিমত আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। অন্ততঃ দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে এই নীতি গ্রহণের সপক্ষে জোরাল দাবী জানিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। তাঁরা হলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। অপর পক্ষে দেখা যায় প্রধান মন্ত্রী তার তীব্র বিরোধিতা করছেন।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শন করতে আসবার পুর্বেই এই বিতর্ক এত তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে লোকসভায় তা প্রকাশ্য বিতণ্ডার আকার গ্রহণ করেছিল। লোকসভায় ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ তারিখে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কিত আলোচনায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অপর দিকে প্রধান মন্ত্রী। উভয়েই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রী অথচ দেখা যায় দু'জনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে তুমুল বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। একদিকে ডঃ মুখোপাধ্যায় মানুষ ও সম্পত্তি বিনিময়ের নীতি গ্রহণ করবার দাবী জানাচ্ছেন। অপর দিকে শ্রীনেহেরু সরকার গৃহীত উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের দোহাই পেড়ে তার প্রতিবাদ করছেন। সুতরাং ডঃ মুখোপাধ্যায় শ্লেষাত্মক ভাষায় তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রধান মন্ত্রী এই উচ্চ আদর্শকে তো পাঞ্জাব সম্পর্কে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি, সুতরাং বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে আর একবার তাকে বিসর্জন দিলে কোন দোষ হয় না।

পরিণতিতে দেখা যায় শ্রীজওহরলাল নেহেরু মানুষ ও সম্পত্তি বিনিময় নীতি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন একটা মীমাংসা করতে যাতে উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়। তাঁরই প্রভাবে এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার

গ্রহণ করেন এবং ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁর সহিত আলোচনার পর উভয় রাষ্ট্রই নিজ রাষ্ট্রে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চুক্তি গ্রহণ করে। সুতরাং স্বাভাবিক পথে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তা বাধা-প্রাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য তার প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী উভয়েই মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেছিলেন। এর পর ডঃ মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘ নামে নূতন রাজনৈতিক দল স্থাপন করে লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শ্রীজওহরলাল নেহেরুর কঠোরতম সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মানুষ-বিনিময় নীতি গ্রহণ না করে প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা এই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হক প্রথমত উভয় রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এবং তারপর যারা বাস্তুত্যাগী হয়ে অপর রাষ্ট্রে চলে গেছে তাদের নিজ রাষ্ট্রে ফিরে যেতে উৎসাহিত করে।

তবে নিশ্চয় তিনি অনুমান করেছিলেন যে যারা পুর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারত রাষ্ট্রে চলে এসেছে, তাদের অধিকাংশই ফিরে যাবে না এবং এখানেই পুনর্বাসনের দাবী করবে। পশ্চিম বাঙলার জনমত যে তখন এ দাবীর পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল, সে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থাও করেছিলেন। পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নূতন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ছিল যে তাদের কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হবে এবং তাদের জন্য পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হবে না। পশ্চিম বাঙলার নেতৃবৃন্দ সেদিন এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। লিয়াকত আলি খাঁর সহিত চুক্তি সম্পাদনের পর প্রধান মন্ত্রী নূতন নীতি ঘোষণা করলেন যে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গার ফলে যারা বাস্তু-ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছে বা আসবে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন।

(৬)

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকের সেই দিনগুলির কথা ভাবতে এখনও আতঙ্ক হয়। কি দিন না গেছে! পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত তখন এমন বিরাট আকার ধারণ করেছিল যে তাকে বন্যার সহিত তুলনা করা যায়। মানুষের বন্যা যেন পুর্ববঙ্গের সীমান্ত উপচে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত করেছিল।

সীমানার নিকটে যাদের বাস ছিল তারা পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পার হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের স্রোত দিন নাই রাত নাই অব্যাবহতভাবে প্রবাহিত

হয়েছে। রেলপথে যাত্রীর ভিড়ের তো কথাই নেই। প্রধানত বানপুর ও বনগাঁয় তারা সীমানা পার হয়। এখানে প্রাথমিক সাহায্যের জন্য দু জায়গাতেই শিবির স্থাপন হয়েছে। সেখানে প্রতি পরিবারের নাম তালিকাভুক্ত হয়। তারপর তাদের পরিচয়পত্র দিয়ে বিশেষ ট্রেনযোগে শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই পরিচয়পত্র তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। এক শ্রেণী ছিল যারা তুলনায় সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ত্রাণ বা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল নয়। এদের পরিচয়পত্র দেওয়া হত ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু পরিবার কিনা সে প্রশ্ন উঠলে তার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের জন্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সরকারের উপর আংশিকভাবে নির্ভরশীল। তারা আশ্রয় শিবিরে স্থান চাইত না, তবে প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে কিছু আর্থিক সাহায্য চাইত এবং ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সাহায্যের আশা রাখত। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ আত্মনির্ভর হবার কোন ক্ষমতাই রাখে না। তারা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় প্রার্থনা করত এবং ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করত। এই বিভিন্ন শ্রেণীকে পৃথক করে চিহ্নিত করবার জন্য পরিচয়পত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রঙ দিয়ে রঞ্জিত করা হত।

তারপর যে পরিবারগুলি আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় চাইত তারা শিয়ালদহে এসে একত্র জমা হত। সেখান হতে উদ্বাস্তু বিভাগের কর্মীরা তাদের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন।

তুলনায় যে পরিবারগুলি সঙ্গতিসম্পন্ন তারা এ সময় অনেকে প্লেনযোগে ঢাকা হতে দমদম বিমানবন্দরে আসত। সুতরাং তাদের প্রাথমিক সাহায্যের জন্য দমদম বিমানবন্দরেও একটি আপিস খোলা হয়েছিল। এমনও হয়েছে যে ওদিকে বিমানবন্দরে আসবার পথে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পাকিস্তানে আক্রান্ত হয়ে জখম হয়েছে। সেই অবস্থায়ই তারা বিমানযোগে কলিকাতায় চলে আসত। সুতরাং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যও বিমানবন্দরে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

যারা কলিকাতায় আসবার পর আশ্রয় শিবিরে যেত না, কিন্তু কিছু প্রাথমিক সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করত, তাদের জন্য অকল্যাণ্ড রোডের পুনর্বাসন মহাকরণে টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে এই বাড়িটির দক্ষিণ ভাগের এক তলায় বারাণ্ডায় অনেকগুলি কাউণ্টার খোলা হয়েছিল। সেইখানে প্রমাণপত্র দেখিয়ে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি অর্থ গ্রহণ করত।

এই সময় প্রাথমিক কাজে যে সকল সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিশ্রামের কোন অবকাশ ছিল না। ঠিক বলতে কি, সে কথা কমবেশি ত্রাণ বিভাগের সকল কর্মচারী সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে যাঁরা সীমান্তবর্তী প্রাথমিক সাহায্য শিবিরে বা শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয়প্রার্থীদের একত্রিত করে শিবিরে পাঠাবার ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের ওপর কাজের চাপ এত বেশি ছিল

যে ভাবা যায় না। এমন কি অকল্যাণ্ড রোডের মহাকরণের আপিসে যাঁরা প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে উদ্বাস্তু পরিবারদের আর্থিক সাহায্যদানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদেরও দুর্দশা অনুরূপ। এই গুরুদায়িত্ব কিন্তু তাঁরা যোগ্যতার সহিতই এই দুর্দিনে পালন করেছিলেন।

এইসব দেখে আমার মনে হয় সকল মানুষের মধ্যেই অন্তহীন শক্তির উৎস লুকিয়ে আছে। উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত প্রেরণা পেলে সে উৎস হতে শক্তি অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত হয়। হৃদয়ে করুণা তেমন ভাবে অনুভব করলে, মহৎ কর্তব্যের আহ্বান আসলে, সাধারণ মানুষও অসাধ্য সাধন করতে পারে; অসাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। এই বিরাট ত্রাণকার্যে এই সময় যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের স্তরের মধ্যেই এই মহৎ প্রেরণার প্রভাব আমি লক্ষ্য করেছি। প্রত্যেকেই যে যার নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাজ করে গেছেন, অথচ কাজে অবসাদ লক্ষ্য করি নি। কোন দিন কোন সহকর্মীকে বলতে হয় নি, কতখানি নিষ্ঠার সহিত কাজ করতে হবে। সকলেই একযোগে অন্তরের প্রেরণা হতেই প্রয়োজনীয় শক্তি ও মানসিক বল সংগ্রহ করেছেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়ত ঠিক হবে না। তবে উদাহরণস্বরূপ দু'একজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়েই বোঝা যাবে অন্যেরা কত নিষ্ঠার সহিত নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাঁদের কথা উল্লেখ করার লোভ আরও একটি কারণেও সংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। কত বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে, তবু তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে ভাসছে।

এই প্রসঙ্গে যার নাম সবার আগে মনে পড়ে তিনি হলেন শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক সাহায্যদানের এবং বিভিন্ন শিবিরে পাঠানর কাজের সাধারণ তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করা হয়েছিল। দিন নেই, রাত্রি নেই তিনি যেভাবে নানা স্থানে ঘুরে এবং ছোটাছুটি করে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার তুলনা হয় না। সে সময় তাঁর কাজ ততটা সম্পাদিত হত না ফাইলে লেখালিখি করে, যতটা সরজমিনে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে। শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রাথমিক ত্রাণের কাজ যাতে সম্পাদিত হয় তার জন্য বিভিন্ন সহকর্মীকে অবিরাম নির্দেশ দিতে দিতে তাঁর গলাই সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনে কাজের তো শেষ ছিল না, সুতরাং সেই ভাঙা গলাতেই তাঁর মৌখিক নির্দেশ দান চলতে লাগল। ফলে ভাঙা গলা আর সারবার অবকাশ পেল না। মাসের পর মাস সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল। তা সারবার সুযোগ পেল অনেক পরে যখন উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আর একজনের কথা উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। তিনি হলেন শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি অকালে একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে তাঁর কথা আরও বেশি মনে পড়ে। অকল্যাণ্ড রোডের মহাকরণে তিনি উদ্বাস্তু পরিবারদের প্রাথমিক আর্থিক সাহায্যদানের কাজের তত্ত্বাবধানে তখন নিযুক্ত ছিলেন। মহাকরণের প্রাঙ্গণ তখন সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী উদ্বাস্তুদের ভিড়ে ঠাসা থাকত। ফুটবল মাঠে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের খেলা পড়লে কাউণ্টারের সামনে যে ভিড় হয়, কিম্বা পূজার ছুটির মুখে শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশনের কাউণ্টারে যে ভিড় হয় তাদের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। এই ভিড় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলত। সাহায্য পাবার অধিকারী উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতিনিধি আর্থিক সাহায্য পেয়ে চলে যেত। আবার নূতন দল আসত। এই বিরামহীন কাজে যারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের কোন দিন কর্তব্যে শৈথিল্য লক্ষ্য করি নি। লক্ষ্য করেছি, সেই ভিড়ের মধ্যেই শ্রীসেনগুপ্ত ঘুরে বেড়িয়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং বিভিন্ন কাউণ্টারের সামনে প্রার্থীদের সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে স্থাপন করেছেন। ভিড়ের মধ্যে চলতে পাছে কারও পা মাড়িয়ে ফেলেন, তাই জুতো খুলে রেখে খালি পায়েই চলাফেরা করছেন। হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের জন্য তার মনের গভীর সহানুভূতি বোধই তাঁকে এই কর্তব্যবোধ দিয়েছিল। দিনের পর দিন গেছে, কিন্তু এই কাজে কখনও তাঁর উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করি নি।

এই সময় কত বিভিন্ন ধরনের জরুরী অবস্থার উদ্ভব হত তার উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকায় শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর তত্ত্বাবধানে একটি অভিভাবকহীন মেয়েদের আশ্রম ছিল। এই সময়ে নিরাপত্তার অভাববোধ করে তিনি আশ্রমবাসিনীদের নিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসবার সিদ্ধান্ত করেন। এতগুলি মানুষের জন্য অগত্যা অতি দ্রুত একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের মানুষদের তো সাধারণ আশ্রয় শিবিরে স্থান দেওয়া যায় না। তাদের পৃথক আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। এদিকে খবর এসেছে আশ্রমের সব মানুষ পাকিস্তান ত্যাগ করে রওনা হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অতি সত্বর অনুসন্ধান করে একটি উপযুক্ত আশ্রয়স্থান সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে অনেক অনুসন্ধানের পর কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটি প্রশস্ত বাগানবাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেইখানেই আনন্দ আশ্রম প্রথম অবস্থায় স্থান পেয়েছিল। চারুশীলা দেবী অনন্যসাধারণ গুণী কর্মী। সুতরাং তাঁর স্বকীয় চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থায়ী কর্মকেন্দ্র সংগ্রহ করতে খুব দেরি হয় নি। বাঁশদ্রোণীতে নেতাজী সুভাষ রোডের ওপর এখন তা অবস্থিত। এখন তা একটি উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এদিকে পায়ের পথে, রেলপথে ও আকাশ পথে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের পরিবহণ সমস্যা ঠিক মত সমাধান সম্ভব ছিল না। আকাশ পথে যে পরিবার-গুলি আসে, তুলনায় তারা সঙ্গতিসম্পন্ন এবং উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যার ভগ্নাংশ মাত্র। যারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাস করে তাদের পক্ষে পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা সম্ভব। সীমান্ত হতে খানিকটা দূরে যারা বাস করে, তাদের পক্ষে এই ভাবে চলে আসা সম্ভব নয়। কাজেই যারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তর দেশে বাস করে তাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হল রেল পথে আসা। সুতরাং এই পথেই বেশির ভাগ উদ্বাস্তু এসময় ভারতরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সকল অংশে তো রেল পরিবহণের ব্যবস্থা নেই। এমন জেলাও আছে, যার কোনও অংশের সহিত রেলপথের সংস্পর্শ ঘটে নি। প্রসঙ্গত বাখরগঞ্জ জেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার কোথাও তখনও পর্যন্ত রেল লাইন বসে নি। তার দক্ষিণ অংশ অসংখ্য শাখা নদী দিয়ে খণ্ডিত। যে জিলায় রেল পথে পরিবহণের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যেও এমন বিস্তৃত অংশ আছে যেখানে রেলপথ স্থাপন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অংশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার অন্তর্ভুক্ত মাদারিপুর মহকুমার সঙ্গে রেলের সংযোগ নেই। আড়িয়াল খাঁ নদীই সেখানে প্রশস্ত রাজপথ। তার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত গোপালগঞ্জ মহকুমা নিতান্তই জলাকীর্ণ অঞ্চল। সেখানে জলপথই পরিবহণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অবস্থাও অনুরূপ।

পরিবহণের ব্যবস্থার অভাবে এইসব অঞ্চলের বাস্তুত্যাগী হিন্দু পরিবার বিশেষ বিশেষ স্থানে আটকে পড়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিকূল পরিবেশে দুর্ভাবনাগ্রস্ত মন নিয়ে একান্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। তাদের সমস্যা সমাধানে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তৎপর হবেন এতখানি আশা করা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে। এদের খবর যখন পশ্চিম বাঙলায় পৌছাল তখন উদ্বাস্তু দরদী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকা তাঁর স্বভাব নয়। তার দ্রুত সমাধানের জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। তখন পূর্ববঙ্গে জলপথে দুটি ষ্টিমার কোম্পানি পরিবহণের কাজে লিপ্ত ছিল। তারা হল আই. জি. এস. এন, ও বি. আই. এস. এন. কোম্পানি। তাদের কর্তৃপক্ষদের ডেকে তাঁদের সহিত আলোচনা করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেন। চুক্তি হল যে যেসব স্থানে নদীর উপকূলে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি অসহায় অবস্থায় আটকে পড়ে আছে সেসব স্থানে ষ্টিমার পাঠিয়ে এই দুই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ধার করবেন এবং জলপথে কলিকাতায় এনে দেবেন। তখন শ্রীসন্তোষকুমার বসু ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের

ডেপুটি হাইকমিশনার নিযুক্ত ছিলেন। টেলিফোনে তাঁর সহিত সংযোগ স্থাপন করে ডাঃ রায় ওদিক হতে এই ব্যবস্থাকে সফল করতে যাকিছু করা দরকার সেবিষয় নজর দিলেন। শ্রীবসু এবিষয় পাকিস্থান সরকার হতে যেটুকু সহযোগিতা দরকার তা আদায় করে দিয়েছিলেন। ফলে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী এই হতভাগ্য উদ্বাস্তু পরিবারগুলি উদ্ধার করবার কাজ অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়েছিল।

এই কাজে মোট পনরখানি বড় ষ্টিমার নিযুক্ত হয়েছিল। এইসব নদী মাতৃক অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্র হতে উদ্বাস্তুদের সংগ্রহ করে এই ষ্টিমারগুলি একসঙ্গে জলপথে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হয়েছিল। আসাম ডেসপ্যাচ সার্ভিস যে পথে খুলনা হতে কলিকাতা যাতায়াত করত সেই পথেই এইগুলি আসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুতরাং খুলনা জেলার সুন্দরবন হয়ে তারপর চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবনে এসে পাথরপ্রতিমা হয়ে কাকদ্বীপ ও ফ্রেজারগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী নামখানার নদী দিয়ে সাগরদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথীর যে শাখা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে পড়ে, তারপর উত্তরমুখী হয়ে তাদের কলিকাতায় আসবার কথা।

নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় ষ্টিমারগুলি হাজির হলে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে নামিয়ে নিয়ে প্রাথমিক সাহায্যের পর বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কম করে পনর হাজার উদ্বাস্তুর জন্য একই দিনে তাদের নামান, প্রতি পরিবার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযানপত্র বিলি এবং বিশেষ ট্রেনযোগে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে পাঠান হয়েছিল, কারণ এই পরিবারগুলি সকলেই এমন অসহায় যে সরকারের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। নামানর কাজে সুবিধার জন্য ভাগীরথী নদীর দুই তীরেই জাহাজকে ঘাটে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। নদীর পূর্ব তীরে বাবুঘাট প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং পশ্চিম তীরে শালিমার ঘাট অবতরণের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দুই স্থানেই মাল পরিবহণের জন্য রেল লাইন ছিল। কাজেই বিশেষ ট্রেনগুলিকে একেবারে ঘাটে নিয়ে গিয়ে হাজির করা সম্ভব হয়েছিল। এই বিরাট দায়িত্ব একরকম সাফল্যের সহিতই সম্পাদিত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ যে সকল কর্মচারীর উপর এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, এই ছিন্নমূল পরিবারগুলির জন্য তাদের হৃদয়ভরা সহানুভূতি।

সেই দুর্যোগের দিনে সহানুভূতি কেবল সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার ছোঁয়াচ সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই দুর্যোগের দিনে সেদিন সত্যই সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মন পূর্ববঙ্গ হতে আগত এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলির জন্য কেঁদেছিল। এই করুণা ও সহানুভূতির প্রাচুর্য এই দুঃসময়ে ত্রাণের কাজ এমনকি পুনর্বাসনের কাজকেও তুলনায় সহজসাধ্য করে দিয়েছিল। অস্থায়ী আশ্রয় শিবির স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে আপোসে জমির দখল পাওয়া

যেত, মালিকপক্ষ হতে কোন বাধা আসত না। বিধি অনুযায়ী আইনসঙ্গত-ভাবে হুকুমদখলের প্রয়োজন হত না। এই রীতিতে দখল পেতে যে সময় লাগে, তার জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না।

এই সময় পশ্চিম বাঙলার মানুষের উদ্বাস্তু পরিবারদের জন্য সহানুভূতি কত যে গভীর ছিল তার উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীবীরেশচন্দ্র দত্ত তখন বারাসাত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক ছিলেন। এই সময় পুর্ব পাকিস্তান হতে সদ্য আগত কয়েক শত উদ্বাস্তু পরিবার তাঁর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে। তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসে উদ্বাস্তু ত্রাণ বিভাগের অধিকারের হাতে সে ভার ন্যস্ত করে দায়িত্বমুক্ত হতে পারতেন। তাহলে যথারীতি পরিবারগুলিকে আশ্রয়ের জন্য আশ্রয় শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গবাসী মানুষের সহানুভূতির গুণে তিনি এমন এক অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন যে তাদের আশ্রয়শিবিরে না পাঠিয়ে ওইখানেই আপোসে জমি দখল নিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়া বেশি সহজ জ্ঞান করেছিলেন। বারাসাত শহরের অতি নিকটে মধ্যমগ্রামে স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তিনি আপোসে দখল পেয়েছিলেন এবং এই পরিবারগুলির মধ্যে তা ভাগ করে দিয়েছিলেন। এইভাবেই মধ্যমগ্রাম উদ্বাস্তু কলোনির পত্তন হয়।

নবাগত উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এই সম্পর্কে স্থাপন করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই সময় উদ্বাস্তুদের আগমনের স্রোত এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে আশ্রয় শিবিরে তাদের অতি সত্বর সরিয়ে নিয়ে যাবার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন অন্তত পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু থেকে যেত। এদের সাময়িক-ভাবে খাওয়ানর দায়িত্ব বেশ বড় দায়িত্ব। এই পরিবারগুলির প্রাথমিক সাহায্যের জন্য এই সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকগুলি উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি গড়ে উঠেছিল। এরা নানাভাবে যেসকল উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবিরে যাবার আগে শিয়ালদহ স্টেশনে জমা হত তাদের সাহায্য করত।

এই প্রসঙ্গে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তা সাম্প্রতিক স্থাপিত উদ্বাস্তু কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীতে পড়ে না। তা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, তার জনবল এবং অর্থবল প্রচুর এবং তার কর্মক্ষেত্র বহু কল্যাণমূলক কাজে বিস্তৃত। ঠিক সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তুদের সেবার কাজ যে এত যোগ্যতার সহিত পালন করেছিল তা সম্ভব হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ হতে এঁরা প্রতিদিন শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রিত উদ্বাস্তুদের জন্য রান্না করে খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই দায়িত্ব দিনের পর দিন তাঁরা প্রায় তিন মাস ধরে নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করেছিলেন। তারপর

আর এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি ; শুনেছি তাদের আর্থিক ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবার ফলে। তা নিঃশেষ হওয়া বিচিত্র ছিল না, কারণ দৈনিক চার-পাঁচ হাজার মানুষকে খাওয়ানর খরচ চালাতে বেশ বড় রকম অঙ্কের আর্থিক ব্যয় ঘটত, তা অনুমান করা সহজ।

এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অক্ষমতা-হেতু যখন শিয়ালদহে আশ্রিত উদ্বাস্তুদের অন্নদান বন্ধ হয়ে গেল, তখন একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হল। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যে এই দায়িত্বের ভার গ্রহণ করবে। তখন সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সরকার না হয় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু রান্না করা খাদ্য বিতরণ করতে যে অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন তার তো সুবিধামত ব্যবস্থা করা চাই।

তখন আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের শরণাপন্ন হলাম। মিশনের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানালাম সরকারের খরচে তাঁরা যদি রান্না করা খাদ্য বিতরণের ভার গ্রহণ করেন তা হলে কাশী বিশ্বনাথ প্রবর্তিত রীতিতে উদ্বাস্তুদের অন্ন বিতরণ সমস্যার সমাধান হয়। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং পাক করা অন্ন বিতরণের ভারও নিলেন। ফলে আগের মতই উদ্বাস্তুদের অন্ন-বিতরণের ব্যবস্থা আরও কয়েক সপ্তাহ চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু অনিশ্চিত-কাল এই দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হলেন না। সেই কারণে আমাদের অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল।

পাক-করা অন্ন বিতরণের রীতির একটা সুবিধা ছিল। তা খাদ্য পাক করার সমস্যা হতে উদ্বাস্তুদের সাধারণভাবে মুক্তি দিত। বিশেষ করে ওই সময় যখন সমগ্র স্টেশন এলাকা উদ্বাস্তু পরিবারে ঠাসা থাকত তখন রান্না করার জায়গা পাওয়া সম্ভব ছিল না। সেই কারণে কাশী বিশ্বনাথ আশ্রম প্রবর্তিত রান্না করা অন্ন বিতরণের রীতি চালু রাখতে বিশেষ উৎসুক ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আর একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে সম্মতি দেওয়ায় আমাদের সুবিধা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ভবেশানন্দ স্বামী এই দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হলেন। তবে ঠিক হল খাদ্য পাক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকেই করে দিতে হবে। সুতরাং ঠিক হল উল্টোডাঙ্গায় আমাদের যে অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির ছিল তার প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী চালা তুলে পাচক নিয়োগ করে রান্না করার ব্যবস্থা হবে। তত্ত্বাবধানের ভার তিনি নিলেন। রান্নার পর খাবার বিভিন্ন আধারে স্থাপন করে ট্রাকে করে শিয়ালদহ স্টেশনে এনে বিলি করার ব্যবস্থা হল।

এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশি দিন চালান সম্ভব হয় নি। কয়েক সপ্তাহ পরে পাচক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ফলে এমন একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে এই ব্যবস্থা তুলে দিতে হয়। সুতরাং রান্না করা

খাবার আর শিয়ালদহে আশ্রিত উদ্বাস্তুদের জন্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। পরিবর্তে শুকনো খাবার বিতরণের ব্যবস্থা হয়। অনেক ভেবে ঠিক হয় যে রান্নার সুবিধা না থাকায় এমন খাদ্য বিতরণ করা উচিত, যাকে সহজেই খাবার উপযুক্ত করে নেওয়া যায়। এ যুক্তিতে মনে হল চিঁড়ে বিতরণ করাই সব থেকে উপযুক্ত হবে। কারণ তা জলে ভিজিয়ে নিলেই খাবার উপযুক্ত হবে এবং সহজপাচ্য হবে। সুতরাং চিড়ে এবং গুড় বিতরণের ব্যবস্থা হল। এই ব্যবস্থাই পরে বরাবর চালু ছিল।

এই সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এখানে আশ্রিত উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে সেবা করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের অনেকগুলিই নূতন স্থাপিত, ঠিক বলতে কি, উদ্বাস্তুদের সেবা করবার উদ্দেশ্যেই তারা জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এখানে পৃথকভাবে কাজে নিযুক্ত হয়। ফলে এদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য দুইভাবে বিঘ্নিত হবার উপক্রম হয়। এতগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেরই আলাদা স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবকের এখানে সমাগম হয়। যেখানে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এত বেশি যে তাদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না, সেখানে কর্মীর সংখ্যা যত কম হয় ততই বাঞ্ছনীয়।

অপর পক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে কাজ করার ফলে সেবাকার্যের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা শক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সামর্থ্যের এবং অর্থেরও অপচয় ঘটছিল। এদের কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য এমন একটি কর্তৃপক্ষের অভাব অনুভূত হচ্ছিল যা তাদের সকলের কার্য নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে।

এ বিষয়টি সমাধানের কাজ আমাদের তখনকার রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সময় শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অসুবিধা দূর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তার ওপর এদের সকলের কাজ তত্ত্বাবধানের ভার দেবার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় তার কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তার নামকরণ হয় 'ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ রিলীফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার'।

এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে তার জন্য একটি শক্তিশালী সাধারণ সমিতি গঠিত হয় এবং স্বয়ং রাজ্যপাল তার সভাপতি নির্বাচিত হন। সমাজসেবিকা ডঃ ফুলরেণু গুহ তার সাধারণ সম্পাদিকা নিযুক্ত হন এবং ভূতপুর্ব উদ্বাস্তু সহাধ্যক্ষ শ্রীব্রজকান্ত গুহ তার কার্যকরী সমিতির

সভাপতি নিযুক্ত হন। এই দু'জন যোগ্য কর্মীর তত্ত্বাবধানে সেই দুর্যোগের দিনে এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণভাবে উদ্বাস্তুদের সেবায় এবং বিশেষ করে শিয়ালদহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে শৃঙ্খলা স্থাপনে বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

এই সময়ে উদ্বাস্তু সমস্যা এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে প্রতিদিনই নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হত। তার প্রত্যেকটিই এত জরুরী যে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা না হলে আরও জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই অবস্থায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রতিদিন সকাল ৯-৩০ টায় আপিসের কাজ আরম্ভ হবার আগে রাইটার্স বিল্ডিংএ তাঁর কক্ষে তিনি একটি সভা ডাকতেন। তাতে পুলিশ বিভাগের প্রধান অধিকর্তা, প্রধান প্রধান সচিব এবং উদ্বাস্তুদের ত্রাণের কাজে লিপ্ত প্রধান কর্মচারীদের যোগ দেবার ব্যবস্থা ছিল। ডাঃ রায় নিজেই তখন উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী। রাজ্যপাল ডঃ কাটজু হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই জরুরী অবস্থায় কেবল ভূষণ হিসাবে দর্শক মাত্র থেকে রাজ্যপালের কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এই সভায় প্রতিদিন নিয়মিত যোগ দিতেন। সেখানে বিভিন্ন কর্মী তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতেন তা আলোচনার জন্য স্থাপিত হত। আলোচনার পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হত। নির্দেশ পালনে কোন বিশেষ বিভাগের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সম্পর্কিত সচিবও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন। এই সভা নিত্য নূতন যে সকল জরুরী সমস্যার উদ্ভব হত, তাদের সমাধানের বিশেষ সহায়তা করত। যতদিন না জরুরী অবস্থার অবসান হয়, এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এ বিষয়ে কি ডাঃ রায়, কি ডঃ কাটজুর মনোনিবেশে শৈথিল্য কোনদিন লক্ষ্য করি নি।

এই সম্পর্কে একটি দিনের আলোচনার কথা মনে পড়ে। তা দেখিয়ে দেবে ডঃ কাটজু কতখানি উদ্বাস্তু-দরদী ছিলেন। মার্চের প্রথমে যখন উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত এত বৃদ্ধি পায় যে তাদের প্রাথমিক সাহায্য এবং আশ্রয়দানে আমাদের ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল, তখন তিনিও আমাদের আশ্রয় শিবিরগুলি পরিদর্শন করে বেড়াতেন।

এই প্রসঙ্গে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ চাঁদমারি আশ্রয় শিবিরে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার ছিল তাদের পুনর্বাসনে পাঠান সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং চাঁদমারি আশ্রয় শিবির ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি উদ্বাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে খুব তাড়াতাড়ি নূতন আশ্রয় শিবির খুলতে হয়েছিল। ডঃ কাটজু পুর্বের দিন সেই নূতন স্থাপিত আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকগুলি মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে এবং এই রোগে দু-চারজনের

মৃত্যুও ঘটেছে। তিনি সেই সংবাদ উল্লেখ করে পরের দিনের সভায় তার প্রতিকারের দাবী করেন। কয়েকজন উদ্বাস্তুর অপমৃত্যু তাঁকে এমন বিচলিত করেছিল যে এবিষয়ে আলোচনার সময় তিনি বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

এখন শিয়ালদহে যেসব উদ্বাস্তু সরকারের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করত তাদের সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। কলেরা বা টাইফয়েড রোগে চিকিৎসা হতে প্রতিষেধক ব্যবস্থা যে বেশি কার্যকরী হয় তা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। প্রতি বছর সাগর দ্বীপের পৌষ সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে কলেরা ব্যাধি যে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ত তা স্বচক্ষে দেখেছি। বাধ্যতামূলক-ভাবে কলেরার প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করে যাত্রীদের মধ্যে কলেরার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, তাও দেখেছি। এই সব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা হয়েছিল যে আশ্রয় শিবিরে রওনা হবার আগে প্রত্যেক উদ্বাস্তুকে কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে। তাতে ভাল ফলও পাওয়া গিয়েছিল।

এখন আমার খবর ছিল যে চাঁদমারী আশ্রয় শিবিরে যারা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের টিকা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ, তারা শিয়ালদহ হয়ে ওখানে যায় নি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের সোজাসুজি আশ্রয় শিবিরে ভর্তি করা হয়েছিল। এই সংবাদ ডঃ কাটজুর কাছে স্থাপন করবার পরেও তাঁর উত্তেজনা কিছুমাত্র প্রশমিত হল না। এখানে আমাদের যা কর্তব্য তা খুবই স্পষ্ট। তা হল, যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আশ্রয় শিবিরে স্থান পাবে, তাদেরও সেখানে ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গেই বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিষেধক টিকা নেবার ব্যবস্থা করা। আমিও সেই প্রস্তাব করলাম।

একটি মানুষকে সেদিন দেখেছিলাম, যিনি এত উত্তেজনা সত্ত্বেও, একান্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও উত্তেজিত হতেন না বা ধৈর্য হারাতেন না। তিনি হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি হাসিমুখে সব কথা শুনে আমাকে নির্দেশ দিলেন, তখনি চাঁদমারী গিয়ে আমার নিজের প্রস্তাব মত ব্যবস্থা করে আসতে। তারপরে সেই আলোচনা বন্ধ করে অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এই সময় সংঘটিত আর একদিনের কথা। তা দেখিয়ে দেবে ডাঃ রায় দুর্যোগের মধ্যে কতখানি হৃদয়বৃত্তিকে সংযত রেখে ধীর বুদ্ধি নিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা রাখতেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিত্য নূতন দাঙ্গার খবর আসত। যেসব উদ্বাস্তু রেলে আসত, তাদের সম্পর্কেও অনেক সময় খুব উত্তেজনাপূর্ণ খবর ছড়াত। একবার খবর এল, একটি গাড়ি যখন পাকিস্তান হতে আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ করে, দেখা গিয়েছিল তার কয়েকখানি

কামরা শূন্য অবস্থায় এসেছে, অথচ তার মধ্যে ছিন্ন কাপড়, ভাঙা শাঁখা ও রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছিল। এ ধরনের খবর যে ভয়ানক উত্তেজনা সৃষ্টি করবে তা নিঃসন্দেহ। মনে হবে, যেসব হিন্দু যাত্রী সেই কামরাগুলিতে ছিল, তাদের সম্ভবত হত্যা করা হয়েছে বা বলপূর্বক নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে খবর শুনে আমাদের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী স্বভাবতই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তেজনার বশে সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ রায়ের কক্ষে এসে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে তার প্রতিকার দাবী করেছিলেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নাম উল্লেখ করতে কোন দোষ দেখি না। তিনি হলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট যোদ্ধা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীভূপতি মজুমদার।

তার উত্তরে ডাঃ রায় মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত সংযত ভাষায় কিছু বলেছিলেন। তাঁর কথাগুলো আমার সঠিক মনে নেই। তবে যতদূর স্মরণ করতে পারি তিনি এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন: এখন উত্তেজিত হয়ে লাভ আছে কি? আমাদের এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবার সময়।

উত্তেজনার যে সঙ্গত কারণ ছিল না তা নয়। যে উদ্বাস্তুরা দলে দলে বহু-পুরুষের ব্যবহৃত ভিটা ছেড়ে আসত তারা নিতান্তই প্রাণভয়ে নিরাপত্তার জন্য আসত। সে সময় সেখানে থাকলে ঘরের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করা সম্ভব মনে করত না, এমন কি প্রাণহানির আশঙ্কাও তাদের রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলত। যারা আসত তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এইসব খবরের সমর্থন করত। কিছু কিছু অবস্থাঘটিত প্রমাণও ত্রাণকর্মীদের নজরে আসত। এমন কি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসার পথেও যে তারা নিরুপদ্রবে আসতে পারত তাও নয়। বনগাঁ অঞ্চলে পাকিস্তানের শেষ রেল স্টেশন ছিল বেনাপোল। ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশের পূর্বে সেখানে গাড়ি তল্লাসী হত এবং তারপর উদ্বাস্তুরা রেল পথে সীমানা অতিক্রম করবার অনুমতি পেত। কত ভদ্র পরিবারের তরুণী কন্যা আসবার পথে এখান হতে অপহৃত হয়েছে, তার খবর আসত। কিন্তু এবিষয় ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হতে প্রতিষেধক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা ভিন্ন রাষ্ট্রের এলাকা। সেখানকার কর্তৃপক্ষেরই সে সম্বন্ধে নিবারণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের একমাত্র অধিকার।

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার কথা মনে পড়ে। তা যেমন করুণ তেমনি দুর্জয় সাহসিকতার পরিচায়ক। ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর শান্তি রক্ষা ও অনধিকার প্রবেশ নিরোধের জন্য আমাদের রাষ্ট্র হতে সীমান্ত পুলিশবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। কয়েক মাইল অন্তর তাদের আস্তানার জন্য একটি করে ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। সেখান হতে সীমান্ত বাহিনীর পুলিশ সীমান্ত বরাবর পাহারা দেয়।

একদিন অতি প্রত্যূষে প্রহরারত পুলিশ বাহিনী রাত্রের কর্তব্য শেষ করে ঘাঁটিতে ফেরবার পথে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলাসহ তুটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা এবং একটি বালককে আমাদের সীমান্তের মধ্যে আবিষ্কার করে। প্রশ্ন করে তারা বুঝতে পারে এরা খুলনা অঞ্চলের এক হিন্দু পরিবারের মানুষ। মা তুই মেয়ে আর ছেলে, এই হল তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক। পরিবারের সকলেই চলে এসেছে, কিন্তু পিতা আসে নি। অবস্থাটি পুলিশ বাহিনীর কাছে রহস্যময় ঠেকেছিল। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর তাদের স্থানীয় মহকুমা শাসকের নিকট স্থাপন করা হয়। প্রশ্ন করে তিনি এদের সম্পর্কিত সমগ্র কাহিনী যা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন, তা হল এই:

এরা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। এদের যে গ্রামে বাস, সে গ্রামের বিদ্যালয়ে পরিবারের কর্তা ছিলেন শিক্ষক। এই অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যখন গ্রামের অন্য হিন্দু পরিবারগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গ্রামত্যাগ করে ভারতের অভিমুখে রওনা হল, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। কিসের ওপর নির্ভর করে তিনি এমন নিশ্চিন্ত হলেন, সে রহস্য কিন্তু পরিবারের অন্য মানুষের কাছে গোপন রয়ে গেল। তা প্রকাশ করে দিলেন অনেক পরে, যখন সমস্ত গ্রাম হতে প্রায় সব হিন্দু পরিবার বাস্তুত্যাগী হয়েছে। যার ওপর নির্ভর করে তিনি পরিবারের নিরাপত্তার জন্য দেশত্যাগ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি, তা হল এই: ওই গ্রামেই এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবার ছিল। তার কর্তা এখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁরই পুত্রের সঙ্গে গোপনে তাঁর প্রথমা কন্যার বিবাহ দেবার চুক্তি করেছিলেন এবং প্রতিদানস্বরূপ স্থানীয় নেতার নিকট নিরাপত্তা সম্বন্ধে অভয়বাণী পেয়েছিলেন।

তাঁর এই ব্যবস্থার কথা শুনে গৃহিণী একান্তই ভেঙে পড়লেন। তাঁর কিছু করবার ক্ষমতা রইল না। খবরটা এই সূত্রে বাড়ির বড় মেয়ের কর্ণগোচর হল। বয়স তার কতই বা, বছর পনর হবে। এই ব্যবস্থা তার কাছে একান্তই অসহনীয় হল, সে তখনি তাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য পাকিস্তান ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হল। রাতের অন্ধকারে পিতার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে মা ভাই আর বোনকে নিয়ে ভারতরাষ্ট্রের অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের নেতা তার মা নয়, সে নিজে। অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সে নিজের দলটিকে বেনাপোল অবধি রেলযোগে নিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে যে বাহিনী গাড়ি তল্লাসী করত তাদের নজর সে এড়াতে পারল না। পুরুষ অভিভাবকহীন এই দলটি সহজেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং এই অজুহাতেই তাদের গাড়ি হতে বলপূর্বক নাবিয়ে স্থানীয় ক্যাম্পে নজরবন্দী রাখা হল।

এই নূতন প্রতিকুল পরিবেশেও মেয়েটি তার সঙ্কল্পসাধন সম্বন্ধে হতাশ হল না। রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম সুযোগেই সদলে ক্যাম্পত্যাগ করে

অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। তারপর মাঠের পর মাঠ ভেঙে তারা তার নেতৃত্বে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে চলতে লাগল, কারণ মেয়েটি স্কুলে যেটুকু ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, তা হতে জানে যে এই দিকেই ভারতের সীমানা এবং এই পথেই বিপদ হতে মুক্তির উপায়। এইভাবেই সৌভাগ্যক্রমে নিজেদের অজানিতে তারা কখন সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বাঙলায় এসে গেছে জানে না। ভোর হলে যখন আত্মগোপনের জন্য আশ্রয় খুঁজছে, তখন তারা সীমান্তরক্ষী পুলিশের নজরে পড়ে এবং কথোপকথনের ফলে যখন জানতে পারে যে ভারতের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন মেয়েটি বুঝতে পারে যে তার সঙ্কল্প সাধিত হয়েছে।

এই রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনীর নায়িকা সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাটির কীর্তি এত বিস্ময়কর যে সকলেরই সে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। মানসিক বল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুর্জয় সাহস এবং ব্যক্তিত্ব—এতগুলি দুর্লভ গুণের পরিচয় সে অল্প বয়সেই দিয়েছিল। সে এখন কোথায় আছে জানি না, তবু তাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাখি। তার কীর্তি যেকোন ঐতিহাসিক বীরাঙ্গণার কীর্তির সহিত প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা রাখে।

চার

এপ্রিল ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ হতে উভয় বঙ্গেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখমের হার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। বিদ্বেষের আগুন তো অনির্দিষ্টকালের জন্য সমান তেজে জ্বলে থাকতে পারে না। এ যেন অনেকটা আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গারের মত। যখন আরম্ভ হয় তখন দারুণ আকারে দেখা দেয় আবার কিছুকাল পরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। আবার সময়ে সময়ে নিভেও যায়। নিভে গেলেও কখন হঠাৎ আবার জ্বলে উঠবে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

আমরা পূর্বে বলেছি, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় উদ্বাস্তুদের আগমন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তারপর ফেব্রুয়ারির শেষে সর্বাত্মক দঙ্গা-হাঙ্গামার বিস্তৃতির ফলে তা ব্যাপক আকার নিয়ে আবার শুরু হয়েছিল। এ যেন নূতন আক্রোশে আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গারের মত। তারপর ধীরে ধীরে উভয় দেশে যেমন শান্তির অবস্থা আস্তে আস্তে ফিরে আসল, উদ্বাস্তু আগমনের হারও কমে আসতে আরম্ভ করল। তুলনায় কমলেও আরও কয়েকমাস উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বেশ বেশি রকমই ছিল। তার কারণ অনুসন্ধান করা শক্ত হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যাপক দাঙ্গার ফলে পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন রীতিমত বিচলিত হয়েছিল। কাজেই ওদেশে থেকে তারা নিরাপদ বোধ করছিল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামলেও তাদের মনেব আতঙ্ক যায় নি। তাই দেখা যায় এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের সহিত চুক্তির পরেও উদ্বাস্তু আগমনের হার বেশি থেকে গিয়েছিল। তা সত্যই কমতে আরম্ভ করে আরও পরে যখন এদের মনে নিরাপত্তাবোধ খানিকটা ফিরে এল।

আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের এই সময় কি হারে শিবিরে আশ্রয় দিতে হত তা হতে বেশ বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাবোধ কখন কমছে বা বাড়ছে তা যেন খানিকটা ব্যারোমিটারের মত কাজ করে। অবশ্য যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি নিজেদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিত তাদের সংখ্যা কত ছিল, তা জানা যাবে না। তবে আশ্রয় শিবিরে যারা আসছিল, তাদের আগমনের হার হতে সামগ্রিকভাবে কোন সময়ে কেমন হারে তারা আসছিল তার একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হবে। নিচে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস হতে প্রথম কয়েক মাস কি হারে উদ্বাস্তুদের সরকারী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হত তার একটা হিসাব দেওয়া হল :

মাস	আশ্রয় শিবিরে ভর্তি উদ্বাস্তুর সংখ্যা
জানুয়ারি ১৯৫০	১,১৫০
ফেব্রুরারি	১,০০২

মাস	আশ্রয়শিবিরে ভর্তি উদ্বাস্তুর সংখ্যা
মার্চ	৭৫,৫৯৬
এপ্রিল	১৪,৯৬০
মে	২৭,৪৪০

মার্চ মাসে পশ্চিম বাঙলায় সরকারের আশ্রয় শিবিরে যত উদ্বাস্তু আশ্রয় চেয়েছিল তাদের সকলে পশ্চিম বাঙলায় স্থাপিত আশ্রয় শিবিরে স্থান পায় নি। তাদের একটা বড় অংশকে ভারত সরকারের অনুরোধে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার নিজেদের আশ্রয় শিবিরে স্থান দিয়েছিল। তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের কম হবে না। এই তথ্য হতে বোঝা যাবে এই বছর মার্চ মাসে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার কি বিরাট আকার ধারণ করেছিল।

এই সময়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর উভয় দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তা ইতিহাসে নেহেরু—লিয়াকত আলি চুক্তি নামে পরিচিত। ভারত উপমহাদেশের পুর্ব অঞ্চলে এই দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক হারে যে বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তাই ছিল এই চুক্তির বিষয়। মোটামুটি এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব সম্বন্ধে দেড় বছর আগে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এখানে প্রয়োগ করা হবে না। সেখানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ ও সম্পত্তির বিনিময় করা হয়েছিল। ঠিক হল এখানে তার বিপরীত নীতি প্রয়োগ করা হবে। উদ্বাস্তুদের যে যার নিজেদের রাষ্ট্রে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে এবং ফিরে গেলে যাতে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনরায় দখল পায় তার ব্যবস্থা হবে।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে অনুরূপ সমস্যা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের কাজকে অনেক পরিমাণে সহজ করে দিয়েছিল। সেখানে উভয় রাষ্ট্রের এই অঞ্চলে সে সংখ্যালঘু পরিবারগুলি বাস করেছিল তাদের যে রাষ্ট্রে তারা সংখ্যালঘু সেইখানে যাবার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল সেখানকার হিন্দু ও শিখ পরিবার প্রধানত পুর্ব পাঞ্জাবে চলে এসেছিল। অনুরূপভাবে পুর্ব পাঞ্জাবে যে মুসলমান পরিবারগুলি বাস করত, তারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। উভয় রাষ্ট্রে যে বিরাট উদ্বাস্তু সম্পত্তি পরিত্যক্ত হয়েছিল সেগুলি সরকারের তত্ত্বাবধানে এসেছিল। ফলে জন-সংখ্যার এক অংশ চলে যাওয়ায় সে স্থান শূন্য হয়েছিল, সেই স্থানেই যারা অপর রাষ্ট্র হতে চলে এল, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সহজ হয়েছিল। পুর্ব পাঞ্জাবে পশ্চিম পাকিস্তান হতে যে সকল হিন্দু ও শিখ পরিবার এসেছিল তাদের বেশির

ভাগ পরিবারকেই ওই পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাহায্যে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই অঞ্চলে যে হিন্দু ও শিখ পরিবারগুলি পূর্ব হতে বাস করত, তাদের সম্পত্তির অংশ হুকুমদখল করে এই নূতন আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নি। ফলে উদ্বাস্তু পরিবারদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সদ্ভাব রক্ষা করা সহজ হয়েছিল।

নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তিতে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ঠিক এর বিপরীত। এই সিদ্ধান্তের ফলে ঠিক সেই কারণেই পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সমস্যা জটিল রূপ গ্রহণ করেছিল। এখানে উদ্বাস্তুরা যে সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছিল তা পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম বাঙলায় যারা পূর্ব হতে বাস করেছে তাদের সম্পত্তির অংশ হুকুমদখল করা ছাড়া পুনর্বাসন সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তুলনায় পূর্ব পাঞ্জাব হতে পশ্চিমবঙ্গ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের আদম সুমারি অনুসারে প্রতি বর্গ মাইলে পূর্ব পাঞ্জাবে ৩৪৭ জন মানুষ বাস করত আর পশ্চিম বাঙলায় বাস করত ৮০৬। সুতরাং পশ্চিম বাঙলায় বসতি আরও ঘন হওয়ায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ আরও শক্ত হয়ে পড়ল। উদ্বৃত্ত জমি বলে এখানে বড একটা কিছু ছিল না। পুনর্বাসনের জন্য জমি সংগ্রহ করতে হলে যারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হতে বাস করছে, তাদেরই ভূমি সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটা মনোমালিন্য বাড়বার সম্ভাবনা রয়ে গেল। তাই পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এক অবস্থায় প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এবিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনার দরকার হয়ে পড়বে।

এই ব্যবস্থা বাঙালীর স্বার্থের বিরুদ্ধে দুইভাবে কাজ করেছিল। পূর্ববঙ্গ হতে যারা বাস্তুত্যাগ করে আসছিল তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম বাঙলা, কারণ সাংস্কৃতিক জীবনের দিক থেকে পশ্চিম বাঙলার মানুষের সঙ্গে তারা এক। তাদের সামান্য অংশ আসাম ও ত্রিপুরায় যেতে বাধ্য হয়েছিল। এরা পূর্ববঙ্গের একেবারে পূর্ব সীমানার মানুষ। এদের পক্ষে পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করা পূর্বপ্রান্তে সহজ বলেই এরা ওই অঞ্চলে গিয়েছিল। পশ্চিম বাঙলায় আসা সহজ হলে তারা সম্ভবত এই দিকেই চলে আসত। যারা পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয়ের জন্য এসেছিল তাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল পশ্চিম বাঙলায়ই স্থায়ীভাবে তারা বাস করতে পারবে। সেই আশা পূর্ণ হওয়া অনেক সহজ হত যদি পাঞ্জাবে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, সে নীতি এখানেও প্রয়োগ করা হত। প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিম বাঙলার মানুষের সহানুভূতি খুব প্রবল ছিল বলে এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ভূমি সংগ্রহ আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলকভাবে জমি সংগ্রহ করে সেখানে

তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে সহানুভূতি যখন শিথিল হয়ে গেল, তখন পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা আসতে লাগল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব হলে বোধহয় এই দুর্ভাগ্য এড়ান যেত। এইভাবে উদ্বাস্তুদের প্রতিকূলে কাজ করে এই নীতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক উদ্বাস্তু পরিবারকে পশ্চিম বাঙলার বাহিরে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

উদ্বাস্তুদের যে যার নিজের রাষ্ট্রে ফিরে যাবার নীতি গ্রহণ করে এবং তাকে সহজ করবার জন্যে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী বোধহয় ভাবতে পারেন নি যে পাকিস্তান হতে আগত সকল উদ্বাস্তু আবার ফিরে যাবে। বাস্তুভিটার মায়া ত্যাগ করে যারা চলে এসেছে, যেখানে তারা নিরাপদে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবে, সেইখানেই থেকে যাওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য একটি সংখ্যালঘু দল এদের মধ্যে ছিল যাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট নয় এবং যারা একান্তই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেমে গেলে এবং পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ফিরে যাবার ইচ্ছা জানাতে পারে। তাদের সেই ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠতে পারে যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে। নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তি সেই সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। উদ্বাস্তুদের এই দলটির মনে তা নিশ্চয় ক্রিয়া করেছিল এবং তারা ফিরেও গিয়েছিল। কিন্তু যারা এসেছিল তাদের বিরাট অংশই চুক্তি সত্ত্বেও এদেশে রয়ে গিয়েছিল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের আদম সুমারি আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে ভাল প্রমাণ। তাতে দেখা যায়, পশ্চিম বাঙলায় তখন তেইশ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু ছিল। এদের এক ভগ্নাংশ মাত্র পঞ্চাশের দাঙ্গার আগে এখানে এসেছিল।

সুতরাং আমাদের প্রধান মন্ত্রী সম্ভবত অনুমান করেছিলেন যে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের হাঙ্গামার ফলে যারা ভারতরাষ্ট্রে চলে এসেছিল তাদের একটা বড় অংশ এই চুক্তি সত্ত্বেও এখানে থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নৈতিক কারণে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেই কারণেই সম্ভবত সে সময় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার পরিবর্তন করা হয়েছিল। তখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দাঙ্গার ফলে যারা পাকিস্তান হতে চলে আসবে তাদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থাই মাত্র হবে, তাদের জন্যে ভারতরাষ্ট্রে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হবে না। এই নীতির বিরুদ্ধেই ডঃ মেঘনাদ সাহা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এখন সে নীতি পরিবর্তন করে ঠিক হল, এদের মধ্যে যারা ভারতরাষ্ট্রেই থেকে যেতে চাইবে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

খুবই ছিল। এই নূতন নীতি গৃহীত না হলে লিয়াকত আলির সহিত চুক্তি সম্পাদনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করত এবং তীব্রতর হত।

(২)

এপ্রিল মাসে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার তুলনায় কিছু কমে গেলে আশ্রয় শিবিরগুলি একটু গুছিয়ে নেবার অবসর পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে আগত যেসব উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে যারা পুনর্বাসনের যোগ্য ছিল তাদের ইতিমধ্যেই পুনর্বাসনের স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হওয়ায় প্রায় সব আশ্রয় শিবিরই তুলে দেওয়া হয়েছিল। কেবল যাদের অভিভাবক বৃদ্ধ বা পঙ্গু বা যারা অভিভাবকহীন অবস্থায় মায়ের তত্ত্বাবধানে বাস করে, তাদের জন্য ছুটি আশ্রয় শিবির রাখা হয়েছিল, একটি নবাবনগরে ও অপরটি চাঁদমারীতে। এবার যখন উদ্বাস্তুদের আগমন বন্যার আকার ধারণ করল তখন তাদের স্থান দেবার জন্য অনেকগুলি বড আশ্রয় শিবির খোলা হল। তাতেও যখন স্থান সঙ্কুলান হল না, তখন যেখানে পূর্বে আশ্রয় শিবির ছিল অথচ উঠে গিয়েছিল, সেখানে সম্ভব হলে নূতন আশ্রয় শিবির খোলা হল। তখন ভাল করে নির্বাচন করবার সময় ছিল না বলে যেখানে যখন জায়গা পাওয়া গিয়েছে সেখানেই আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের পাঠান হয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়োজন ছিল।

এখন সে বিষয়ে নজর দেওয়া সম্ভব হল। প্রধানত আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ছুটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে পড়ে সেই পরিবারগুলি যাদের অভিভাবক সুস্থ এবং সক্ষম। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। অন্য শ্রেণীতে পড়ে সেই পরিবারগুলি যাদের অভিভাবক বৃদ্ধ অথবা পঙ্গু বা অন্য কোন কারণে জীবিকা অর্জন করতে অক্ষম। যারা অভিভাবকহীন অবস্থায় মায়ের তত্ত্বাবধানে বাস করে তারাও এই শ্রেণীতে পড়ে। এই দ্বিতীয় দলকে আবার ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে পরিবারের পুরুষ অভিভাবক আছে, তাদের যে পরিবারের তত্ত্বাবধানে বিধবা মা আছে তা হতে পৃথক করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আশ্রয় শিবিরগুলিকে এইভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এখন পরিবারগুলিকে এই নীতির ভিত্তিতে পৃথক করে দেওয়া সম্ভব হল। যেসব উদ্বাস্তু পরিবার পাকিস্তান হতে আসবার পর সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হত তাদের প্রথম নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে। এই শিবিরগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প নাম দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রেণীতে পড়ে কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুর,

উল্টাডাঙ্গা এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঘুষুড়ি আশ্রয় শিবির। এখানে পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের উপযোগিতার ভিত্তিতে পৃথক করা সম্ভব নয়। স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে তা সম্ভব।

এই জন্য স্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল এইভাবে :

(১) প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আশ্রয় শিবির। এখানে পাঠান হত সেই সব উদ্বাস্তু পরিবারদের যারা পুনর্বাসনের উপযুক্ত। যতদিন না পুনর্বাসনের ভূমিতে তাদের পাঠান সম্ভব হবে, ততদিন তাদের এই আশ্রয় শিবিরে রাখা হবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কুপার ক্যাম্প, ধুবুলিয়া এবং বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নবাব-নগর ও কাংসাতে এই শ্রেণীর আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। শেষের দুটি আশ্রয় শিবির ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে পুরাতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নূতন দাঙ্গার পর আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার নূতন করে তা খুলতে হয়েছিল।

(২) যেসব পরিবারে অভিভাবক পঙ্গু বা বৃদ্ধ হওয়ায় পুনর্বাসনে অসমর্থ তাদের পৃথক করে রাখবার জন্য একাধিক আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। এদের ভরণ-পোষণের ভার সরকারের অনির্দিষ্টকাল ধরে নিতে হবে বলে এদের শিবিরগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল স্থায়ীদায়ের আশ্রয় শিবির (পার্মানেণ্ট লায়াবিলিটি ক্যাম্প)। রূপশ্রী পল্লী ও চাঁদমারী ও বেলতলার শিবিরকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয় এবং এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুগুলিকে এইসব শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়।

(৩) যেসব পরিবারের পুরুষ অভিভাবক নেই, বিধবা মা ও সন্তান নিয়ে গঠিত তাদেরও পুনর্বাসনের অযোগ্য বিবেচনা করা হত। কিন্তু এদের দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সঙ্গে একত্র বাস করা উচিত হবে না বিবেচনা করে তাদের জন্য এক পৃথক শ্রেণীর আশ্রয় শিবির খোলা হল। এই পরিবার-গুলির অভিভাবক নারী হওয়ায় এদের নামকরণ হল নারী আশ্রয় শিবির (উইমেন্স ক্যাম্প)। এদের সংখ্যা তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর থেকে অনেক বেশি ছিল। পাকিস্তানে এরা আত্মীয়ের পরিবারের আশ্রিত হয়ে বাস করত, কিন্তু আশ্রয়দাতারই বাস্তুচ্যুত হওয়ায় তারা আশ্রয়ের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিল। এই কারণে এদের জন্য অনেকগুলি আশ্রয় শিবির খুলতে হয়েছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার টিটাগড় ও কর্তিকপুরে, নদীয়া জেলার রাণাঘাটে রূপশ্রী পল্লীর পাশে, হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়াতে একেবারে নদীর ধারে এবং ভদ্রকালীতে এইসব আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। ধুবুলিয়ার এক অংশও তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এক সময় এদের জন্য স্থানের অভাব এত বেশি হয়েছিল যে কলিকাতার বাবুঘাটে পোর্ট কমিশনের অধীনে অবস্থিত

একটি যাত্রী-নিবাসও এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছিল। জায়গাটি অকল্যাণ্ড রোডে অবস্থিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মহাধিকরণের সংলগ্ন।

যেসব পরিবার পুনর্বাসনের যোগ্য নয় তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গড়ে তোলার ভারও সরকারের ওপর এসে পড়ে। সুতরাং তাদের জন্যও কিছু পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মায়ের ওপর নির্ভরশীল শিশুসন্তান এবং বালক-বালিকা ছাড়া এইসব পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ে বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিয়েছে তাদের পৃথক বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে শিক্ষণের ব্যবস্থা করার নীতি এই প্রসঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এটার খুব প্রয়োজন ছিল, কারণ এই ব্যবস্থা দুইভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। প্রথম, শিক্ষা পেয়ে এরা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে; দ্বিতীয়, তারা উপার্জনক্ষম হলে তাদের পরিবারও পুনর্বাসনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই কারণে এই ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। এদের জন্য যে পৃথক আশ্রয় শিবির স্থাপন হয়েছিল, তাদের চিহ্নিত করবার জন্য তাদের আবাসিক শিবির (হোম) নাম দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে কতকগুলি আশ্রয় শিবির স্থাপিত হয়েছিল। টিটাগড় এবং আন্দুল রোডে শালিমারের নিকট ছেলেদের জন্য শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে তাদের শিক্ষা, শরীর চর্চা ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে এগুলি অনেকটা আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

সরকারের তত্ত্বাবধানে বালিকাদের দুটি আবাসিক শিবির স্থাপিত হয়েছিল। একটি অবস্থিত ছিল কলিকাতার রিজেণ্ট পার্কে অশোক অ্যাভনিউতে। এখানে বালিকাদের পাঠশিক্ষা ছাড়া নানা রকমের হাতের কাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। অপরটি স্থাপিত হয়েছিল উত্তরপাড়ার এক বিরাট জমিদারবাড়ি ভাড়া নিয়ে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটু স্বতন্ত্র। সরকারের আশ্রিত যেসব বয়স্ক মেয়ে ছিল, তাদের নানা ধরনের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যেই এই আবাসিক শিবির স্থাপিত হয়েছিল। এখানে তাদের কাপড় বোনা, সাবান উৎপাদন, দরজির কাজ প্রভৃতি নানা কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা ছিল।

কলিকাতায় মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেখানে বয়স্ক মেয়েদের এই ধরনের নানা কাজ শিখিয়ে উপার্জক করে গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজসেবিকারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির দেখা-শোনা করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে আশ্রয়বাসী বয়স্কা মেয়েদের হাতের কাজ শেখানর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে আশ্রয়বাসিনী মেয়েদের ব্যাপকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে

আনন্দ আশ্রম, নারী সেবা সঙ্ঘ, উদয় ভিলার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোম এবং অল বেঙ্গল উইমেন্স হোম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আনন্দ আশ্রমের উল্লেখ ইতিপুর্বেই করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তু হয়ে কলিকাতায় চলে আসে। তার নূতন আশ্রয় গৃহ স্থাপিত হয় বাঁশদ্রোণীতে শ্রীচারুশীলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। এখানে মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। আশ্রয় শিবির হতে শিক্ষণের উপযুক্ত মেয়েদের নির্বাচন করে এখানে শিক্ষণের জন্য পাঠান হত।

নারী সেবা সঙ্ঘ সৈয়দ আমির আলি অ্যাভনিউর যে বাড়িটিতে অবস্থিত তা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং যুক্ত বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের নিজস্ব গৃহ ছিল। শ্রীসীতা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এখানে মেয়েদের একটি আবাসিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এখানেও আশ্রয় শিবির হতে নির্বাচিত হয়ে মেয়েরা শিক্ষণের জন্য আসত।

উদয় ভিলার শিক্ষা কেন্দ্রটি ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল শ্রীবীণা দাসের ওপর। এখানে উদ্দেশ্য ছিল শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া নয়, শিক্ষার শেষে উৎপাদন কেন্দ্র খুলে তাতে মেয়েদের কাজ দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া। সুতরাং এটির বিন্যাস পরিকল্পিত হয়েছিল আরও ব্যাপক-ভাবে। অন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মত এখানে নানা বৃত্তি শেখানর ব্যবস্থা তো ছিলই, অতিরিক্তভাবে শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে এখানেই যাতে কাজ করে এই শিক্ষিত মেয়েরা জীবিকা অর্জন করতে পারে তার জন্য উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

শ্রীবীণা দাস এই পরিকল্পনার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর নেতৃত্বে এখানকার উৎপাদন কেন্দ্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছাপা কাপড়, চীনেমাটির জিনিস এবং তসরের ওপর কাজ-করা চিত্র প্রভৃতি উৎপাদন করে সুনাম অর্জন করেছে। বিশেষ করে এখানে উৎপাদিত চীনেমাটির নানা পণ্যদ্রব্যের বাজারে বেশ কাটতি আছে।

এর আর এক বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদন কেন্দ্রটি সমবায় সমিতিরূপে গঠিত। সুতরাং যে মেয়েরা বিভিন্ন বৃত্তি শিখে এখানকার উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করে তারা এই সমবায় সমিতির সভ্যও বটে। কাজেই তারা যেমন কাজ করে পারি-শ্রমিক পায় তেমন সমবায়ের অংশীদার হিসাবেও মুনাফার অংশ পায়।

এই প্রকল্পের আরও একটি ব্যবস্থা ছিল এই যে এখানে উৎপাদন কেন্দ্রে যারা কাজ করবে তারা এই কেন্দ্রের মধ্যেই পুনর্বাসনের সুযোগ পাবে। তার ব্যবস্থা এখানে করা সম্ভব ছিল, কারণ এটি পুর্বে ছিল কলিকাতার এক ধনী পরিবারের প্রশস্ত বাগানবাড়ি। মাঝে একটি বড় অট্টালিকা আর চারিপাশে বাগান। সেই বাগানকে ঘিরে সরু আঁকাবাঁকা দীঘি। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় সমগ্র সম্পত্তিটি হুকুমদখল করে ইউরোপীয় সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে তাই সরকারের দখলে সম্পত্তিটি রয়ে যাওয়ায় তাকে এই পুনর্বাসনের কাজে নিয়োগ করা সহজ হয়েছিল। এখানেই এক প্রান্তে সরকারের নিকট ঋণ নিয়ে প্রত্যেক কর্মীর জন্য একটি ছোট পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল।

অল বেঙ্গল উইমেন্স হোমের কেন্দ্রটি অবস্থিত ইলিয়ট রোডে। সমাজকর্মী শ্রীরমলা সিংহ তার তত্বাবধায়ক ছিলেন। এখানেও বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের জন্য ক্যাম্পের মেয়েদের নির্বাচন করে পাঠান হত। কিন্তু এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হল তা এমন এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু মেয়েদের সেবায় দক্ষতা অর্জন করেছিল যা অন্য কোন আশ্রয় বা শিক্ষাকেন্দ্রে সম্ভব নয়। অপহৃতা বা ধর্ষিতা মেয়েদের মানসিক অবস্থা এমন হয়ে থাকে যে তাদের জন্য স্বতন্ত্র আশ্রয় স্থাপনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। উদ্বাস্তু মেয়েদের মধ্যে যে দুর্ভাগারা এই শ্রেণীতে পড়ত উদ্ধারের পর তাদের দায়িত্ব এই কেন্দ্রটি গ্রহণ করত।

যেসব পরিবার পুনর্বাসনের অযোগ্য, তাদের মধ্যে এমন অনেক বৃদ্ধা নারী পাওয়া যেত, যারা ঠিক অভিভাবক হবার উপযুক্ত নয়। ঠিক বলতে কি, তারা অন্য পরিবারের আশ্রিতা হয়েই পাকিস্তানে বাস করত। তারা শুধু জীবিকা অর্জনে অসমর্থ নয়, কোন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়। এরা স্বভবতই ধর্মপরায়ণ এবং তীর্থস্থানে বাস করতে পারলে জীবনের শেষ অবস্থায় অনেকখানি মানসিক তৃপ্তি পায়। সেই কারণে এক শ্রেণীর বৃদ্ধা নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়েছিল। বেলুড়ে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত একটি বাড়ি ভাড়া করে তাদের জন্য একটি পৃথক আশ্রয় শিবির স্থাপন করে সেখানে তাদের রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় এরা খুব খুশিই হয়েছিল, কারণ আশ্রয় শিবির নদীর একেবারে সংলগ্ন হওয়ায় এরা রোজই গঙ্গাস্নানের সুযোগ পেয়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করত।

এই সম্পর্কে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকল্পটি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিজস্ব। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে পাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পশ্চিম বাঙলায় এসে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তারা যে মানসিক আঘাত পেয়েছিল তাতে অনেকেই বেশ খানিকটা অবসাদগ্রস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে পড়েছিল। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ দীর্ঘকাল প্রবল উত্তেজনার মধ্যে বাস করে তারা এদেশে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। বিভিন্ন আশ্রয় শিবির পরিদর্শনের পর এদের এই দুর্দশা দেখে ডাঃ রায়ের অন্তঃকরণ করুণায় ভরে গিয়েছিল। তিনি এবিষয়ে

প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমাদের বিশেষভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই সময়ে তাঁর প্রেরণায় পুনর্বাসন বিভাগে যে চেষ্টা চলেছিল তা খানিকটা সফলও হয়েছিল। এবিষয় আমাদের অভিজ্ঞতা ভারি বিচিত্র। তা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে।

আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মানসিক বল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি চিত্ত বিনোদন সমিতি গঠন করা হয়েছিল। তাতে যেসব বিশিষ্ট শিল্পী পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে সভ্যপদ অলঙ্কৃত করতে সম্মত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী সর্বশ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন এবং নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। আমাদের তদানীন্তন মুখ্য সচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন তার সভাপতি আর আমি ছিলাম সম্পাদক। ২৯শে এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে তার একটি সভা হয়। তাতে ঠিক হয় যে ১লা মে তারিখে আমাদের একটি দল চাঁদমারী আশ্রয় শিবিরে গিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করে আসবে।

সেদিন বিকেলে আমরা এখানে যথাসময়ে হাজির হয়েছিলাম। দলে যেসব শিল্পী গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমন্ত-মুখোপাধ্যায় এবং উৎপলা সেন। আশ্রয় শিবিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাট পেতে শিল্পীদের বসাবার আয়োজন হয়েছিল। আশ্রয় শিবিরবাসী অনেক মানুষ কৌতূহলী হয়ে সঙ্গীত শোনবার জন্য সমবেত হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেখানে বসবার সঙ্গেসঙ্গেই অভাবনীয় ভাবে এক প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। আশ্রয় শিবিরবাসীদের মধ্যে একদল মানুষ ধ্বনি তুলতে তুলতে সেখানে এসে আমাদের ঘিরে ফেলল এবং আমাদের সঙ্গীত পরিবেশনের প্রস্তাবে আপত্তি জানাল। তাদের যুক্তি হল এই যে তারা এখন একান্তই দুর্দশাগ্রস্ত এবং এই দুঃখের পরিবেশের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন অশোভন। এই জনতার উত্তেজনাপুর্ণ আচরণ দেখে কলিকাতা হতে আগত সঙ্গীতশিল্পীদের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। সেটা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

তখন তাদের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হল এই বলে যে তাদের যুক্তি ঠিকই তবে আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমাদের উদ্দেশ্য আমোদ-প্রমোদ করা নয়, দুরবস্থার মধ্যেও যাতে উদ্বাস্তু ভাইদের মনের বল ক্ষুন্ন না হয়, তাই দেখা। তাদের দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণা দেবার জন্যই আমাদের আসা ; মনে হয়, আমাদের যুক্তিতে খানিকটা ফল হল। সৌভাগ্যক্রমে, আশ্রয়বাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে দু-একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের যুক্তি সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা আশ্রয়বাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। তাতে যেন তারা খানিকটা শান্ত হল।

তখন আমরা প্রস্তাব করলাম যে তারাও এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগ দিক। এই আবেদনে ফল ভাল হল। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেক শিল্পীও ছিল যারা কণ্ঠ সঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষ। তারা এগিয়ে এল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

এইভাবে শেষকালে বিনা বাধায় অনুষ্ঠান এগিয়ে চলল। কিন্তু প্রথম দিকের অবাঞ্ছিত ঘটনা আমাদের মন এমন দমিয়ে দিয়েছিল যে সে অনুষ্ঠান তেমন করে জমল না। আমরা কোন রকমে অনুষ্ঠান শেষ করে বেশ রাত্রি করেই কলিকাতায় ফিরে এলাম।

আমাদের অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে জানবার জন্য ডাঃ রায় বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কারণ এবিষয়ে তিনিই ছিলেন সব থেকে বেশি আগ্রহশীল। তাঁকে আমাদের অসাফল্যের কথা জানালাম, সব বিবরণ দিলাম এবং এই ব্যবস্থায় যে ভবিষ্যতে অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাও জানালাম। তাঁর যেমন অভ্যাস তিনি সব চুপ করে শুনলেন। তারপর শুধু প্রশ্ন করলেন, তা হলে এখন তোমরা করবে কি?

আমি বললাম, একাজে যখন হাত দিয়েছি আমরা হার মানব না, অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখব।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কি ভাবে করবে?

আমি বললাম, বাহির হতে শিল্পী নিয়ে গিয়ে করব না, উদ্বাস্তুদের উৎসাহিত করে তাদের দিয়েই মনকে হাল্কা করবার জন্য এবং তাদের মানসিক বল বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করব।

তিনি বললেন, বেশ তাই কর।

তাঁর কাছে নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন পেয়ে আমরা তখনি কাজে লেগে গেলাম, কারণ এবিষয় আমাদেরও খানিকটা জিদ চেপে গিয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় উদ্বাস্তু বিভাগের কর্মীদের মধ্যে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তা ভোলবার নয়।

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে তখন অনুরোধ করা হল এমন একটি নাটক রচনা করতে যাতে উদ্বাস্তুদের মনের বল বর্ধিত হয়। তিনি তখনই সম্মত হলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 'ভাঙাগড়া' নাম দিয়ে একটি নাটক রচনা করে দিলেন। নাটকের নাম হতেই বোঝা যায় তার বিষয়বস্তু কি। বাস্তুত্যাগী উদ্বাস্তুদের কাহিনী অবলম্বন করেই এই নাটক রচিত। দেশ থেকে উৎখাত হয়ে ভাঙার পর্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা এসেছে। এখন তাদের সম্মুখে যে কর্তব্য উপস্থিত তা হল গড়ার কাজ। দুঃখের আঘাতে ভেঙে না পড়ে তা হতেই প্রেরণা সংগ্রহ করতে হবে, এই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য-সম্পাদনে সাড়া দিতে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কাল-যবনের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায়। তার

দ্বারা মথুরা হতে বিতাড়িত হয়ে যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে দ্বারকায় নূতন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। তাদেরও শ্রীকৃষ্ণের স্থাপিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে হবে—এই হল নাটকের বাণী।

এই নাটকের মঞ্চরূপ দেবার জন্য আমাদের অকল্যাণ্ড রোডের মহাকরণের কর্মীরাও বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সারা দিনের অপিসের কাজের পর সন্ধ্যায় তাঁরা এই নাটকের মহড়া দিতেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ রাত্রি হয়ে যেত তাতেও তাঁদের ভ্রূক্ষেপ থাকত না। অন্তর হতে উৎসারিত প্রেরণার বশে মানুষ যখন কাজ করে তখন এমনি ঘটে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এমন উচ্চ-মানের অভিনয়ের তাঁরা ব্যবস্থা করবেন যাতে আশ্রয় শিবিরে যখন এই নাটক অভিনীত হবে তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে।

উদ্বাস্তুদের মধ্যেও অনুরূপ সাড়া জাগাবার উদ্দেশে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থা হল। বিভিন্ন বড় আশ্রয় শিবিরে অভিনয়ে উদ্বাস্তু ভাইদের সাহায্যেও এই নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। ফলে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাবও সৃষ্টি হয়েছিল। মহাধিকরণের কর্মীরা ভাল অভিনয় করেন কি সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তু শিল্পীদের আয়োজিত অভিনয় ভাল হত তা দেখবার জন্য আশ্রয় শিবিরবাসীরা বিশেষ উৎসুক হল। এইভাবে অনেকগুলি আশ্রয় শিবিরে এই নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল এবং তা দেখে ডাঃ রায় বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিলেন।

(৩)

ভারত সরকার পুর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে তাঁদের নীতি নির্ধারণ করবার পর কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু মন্ত্রক পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তুদের প্রতি সঙ্গত কারণেই বেশি নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। যদিও চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের পুর্ববঙ্গে পরিত্যক্ত বাস্তুভূমিতে ফিরে যেতে উৎসাহ দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাদের যেতে বাধ্য করার কোন প্রশ্ন তোলা হয় নি। সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু মানুষ ফিরে গেলেও বেশির ভাগ মানুষই যে পশ্চিম বাঙলায় থেকে যাবে তাতে সংশয় ছিল না। কাজেই সরকারের উপর নির্ভরশীল উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য আশ্রয় শিবির খোলার দায়িত্ব এসে পড়ে এবং যে পরিবারগুলি এখানে এসেছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব এসে পড়ে। ভারত সরকার এখন এবিষয় মন ঠিক করে ফেলেছেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষভাবে নজর দেবার প্রয়োজন অনুভূত হল।

ইতিপুর্বে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের একটি শাখা কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করবার জন্য স্থাপিত

হয়েছিল। শ্রীমোহনলাল সাকসেনা ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী। তিনি একাধিকবার এখানে এসে নূতন উদ্বাস্তুদের জন্য যে ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে, তা দেখে গিয়েছিলেন। সম্ভবত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুভব করেছিলেন, তাঁর থেকে বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট একজন রাজনৈতিক নেতাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ভার দেওয়া উচিত। তাই দেখা গেল, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের শেষাশেষি শ্রীসাকসেনা মন্ত্রিপদ ত্যাগ করলেন এবং তাঁর পরিত্যক্ত স্থান পূরণের জন্য শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন নিযুক্ত হলেন। তিনি যে বিশেষ কর্মক্ষম ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট এবং দ্রুত কর্তব্যসম্পাদনে উৎসাহী তা অল্প দিনেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

জুন মাসের মাঝামাঝি তিনি পশ্চিম বাঙলায় প্রথম পরিদর্শনে এলেন। আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম বাঙলার সমস্যাটি প্রত্যক্ষ দেখে তার সম্বন্ধে ভাল রকম অবহিত হওয়া। এখানকার উদ্বাস্তু সমস্যা তখন দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার কারণ পশ্চিম-বাঙলায় উদ্বাস্তু সমস্যার এক রকম উদ্ভব হয়েছিল দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথম দিকে যারা আসছিল তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। রাজনীতি সম্বন্ধে তারা অধিক সচেতন ছিল; পাকিস্তানে নিকৃষ্ট নাগরিক শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকতে তারা সম্মত হয় নি বলে চলে আসছিল। তারা প্রাথমিক ত্রাণ বা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করে নি।

কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। হায়দ্রাবাদের নিজামের সমস্যাটা বড় হয়ে দেখা দিল। ভারতের অভ্যন্তর ভাগে থেকেও তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হবার বা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপদে তাঁর রাজ্যকে উন্নীত করবার কথা রীতিমত চিন্তা করছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তা ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী এবং তার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে। সুতরাং ভারত সরকার এ বিষয় আর দীর্ঘকাল উদাসীন থাকতে পারলেন না। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে এক সুপরিকল্পিত দ্রুত সামরিক অভিযান সাফল্যের সহিত চালিয়ে নিজামের রাজ্য অধিকার করা হল। অন্য করদ রাজ্যের শাসকদের মত তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে বিচ্যুত করে ভারত সরকারের বৃত্তিভোগী রাজন্যবর্গের অন্যতমরূপে তাঁকে স্থান দেওয়া হল।

একে উপলক্ষ্য করে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে প্রথম নিরাপত্তার অভাববোধ ঘনীভূত হয়ে উঠল। ভারত সরকারের সহিত নিজামের মনান্তর যত তীব্র হয়ে উঠল, তত তাদের মনে আশঙ্কা জাগল যে তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ওপর মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং হয়ত তার ফলে তাদের নিরাপদে সেখানে বাস করা সম্ভব হবে না। এইভাবেই নিরাপত্তাবোধের অভাব পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের মধ্যে প্রথম ক্রিয়াশীল হল। তার ফলে দেখা যায় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় হতে পূর্ব

বাঙলা হতে পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনে হয় এই নিরাপত্তার অভাববোধ এবার নিম্নস্তরের হিন্দুদের মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তাই দেখা যায় এমন সব পরিবার আসতে আরম্ভ করল যাদের সঙ্গতি যৎসামান্য, যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না। তারা একান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই বাস্তুত্যাগ করে এদেশে চলে এসেছিল।

সুতরাং তাদের জন্য সরকার এবার ব্যাপক হারে আশ্রয় শিবির খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। আতঙ্ক বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। তাই দেখা যায় এই দুই মাস আশ্রয় শিবিরে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা খুব বেশি হয়েছিল। তারপর হায়দ্রাবাদ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার পর ধীরে ধীরে নিরাপত্তাবোধ যেমন পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের মনে ফিরে আসতে লাগল, তেমন আশ্রয়প্রার্থীর হারও কমে আসতে লাগল। এই সময় আশ্রয় শিবিরে কয়েক মাস কি হারে উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করা হয়েছিল সেই পরিসংখ্যান হতে আমাদের প্রতিপাদ্যের সবল সমর্থন মিলবে। এই সময় আশ্রয় শিবিরে ভর্তি উদ্বাস্তুর মাসিক সংখ্যার হার ছিল এই রকম:

	মাস	সংখ্যা
১৯৪৮	জুলাই	৮,৪০৮
	অগাস্ট	১৯,১০৯
	সেপ্টেম্বর	১৮,৬৩৮
	অক্টোবর	৯,১৮২

তারপর ধীরে ধীরে এই সংখ্যা আরও অনেক কমে গিয়েছিল।

এই ভাবেই পশ্চিম-বাঙলায় প্রথম আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর সমস্যা বেড়ে উঠেছিল। এদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। মোটামুটি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে যোগ্যতার ভিত্তিতে ভাগ করে যারা পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তাদের নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানে পাঠান হয়েছিল। আর যে পরিবারগুলি উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে পুনর্বাসনের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গেলে সরকারের তত্ত্বাবধানে তাদের বৃত্তি-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। এই হল মোটামুটি পুরাতন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কিত ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ব্যাপক হারে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এসেছিল তারা। তাদের সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয় ভারত সরকার বেশ কিছুদিন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রথমে

সোজাসুজি বলা হয়েছিল যে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন না, কেবল অস্থায়িভাবে আশ্রয় শিবিরে কিছুকালের জন্য আশ্রয় দেবার দায়িত্ব নেবেন। সে নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। পরে সে নীতি পরিবর্তন করে ঠিক হয়েছিল যে, যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পাকিস্তানে ফিরে যাবে না তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং তখনও তাদের জন্য পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রচনা করবার সময় আসে নি।

নূতন মন্ত্রী শ্রীজৈন কলিকাতায় এসে আমাদের সহিত আলাপ আলোচনা করে সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা প্রথমে করে নিলেন। তারপর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, প্রথম পর্যায়ের উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা দেখে আসবেন। সুতরাং ১৩৷৬৷৪৯ হতে ১৭৷৬৷৪৯ পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে পুরাতন পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের সহিত পরিচিত করাবার ব্যবস্থা হল।

১৩ই জুন ১৯৪৯ তারিখে তাঁকে প্রথম হাবরা-কল্যাণগড় উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাবরা ও বাইগাছিতে যে দুটি বড় আশ্রয় শিবির ছিল তার পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারগুলি সকলে এইখানে পুনর্বাসন নিয়েছিল। এরা ছিল অকৃষিজীবী গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তু। তখনও ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু সমস্যা যে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে তার ধারণা ছিল না। তাছাড়া এটিই সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু উপনিবেশ। সেই জন্য তা পরিকল্পিত হয়েছিল একটু উদারভাবেই। প্রতি পরিবারের জন্য দশ কাঠা জমি বরাদ্দ হয়েছিল যাতে তারা কিছু সবজি উৎপাদন করতে পারে এবং সামর্থ্য হলে ঘরে গরুও রাখতে পারে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবার এখানে পুনর্বাসন নিয়েছিল।

কল্যাণগড় পরিদর্শন করে মনে হয় শ্রীজৈনের খারাপ লাগে নি। পরিবারগুলি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাদের আত্মনির্ভরশীল হবার উদ্যমও বেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঠিক বলতে কি এই কলোনিটির অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল। কল্যাণগড় সার্থক কলোনি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। মনে হয় এই সাফল্যের মূল কারণ, যে-পরিবারগুলি এখানে পুনর্বাসন নিতে এসেছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, কাজেই রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। প্রধানত নিকৃষ্ট নাগরিক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে তারা বাস করতে চায় নি বলে চলে এসেছিল। ফিরে যাবার মতি একেবারে ছিল না। সেই কারণে নূতন করে জীবিকা গড়ে তোলবার জন্য তারা বিশেষ সচেষ্ট ছিল।

পরে ১৭ই জুন তারিখে শ্রীজৈন টিটাগড়ের মেয়েদের আশ্রয় শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। টিটাগড়ে সরকারের স্থাপিত দুটি আশ্রয় শিবির ছিল। একটি

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে মিল এলাকার মধ্যে অবস্থিত, অন্যটি তার সংলগ্ন পূর্ব দিকে। প্রথমটি ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত মেয়েদের আশ্রয় শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয়টি দখল নেওয়া হয় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হবার পরে। তখন ঠিক হয় যে রাস্তার ধারের শিবিরটি কেবল উদ্বাস্তু মেয়েদের আশ্রয় শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হবে। পশ্চিমের শিবিরে যে মেয়েরা ছিল তাদের মিল এলাকায় বাস করা অনুচিত বিবেচিত হওয়ায় এই নূতন শিবিরে তাদের স্থানান্তরিত করা হয়। আর পুরাতন স্থানটিতে বালকদের একটি আবাসিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

শ্রীজৈন এই বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত আশ্রয় শিবিরটি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। সেখানে তখন একান্তই স্থানাভাব। দুটি বড় কারখানা ঘরের মধ্যে মেয়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে ঠাসাঠাসিভাবে বাস করছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র খোলা সম্ভব হয়েছিল। মেয়েদের বৃত্তিমূলক কাজের ব্যবস্থা করা তখনও সম্ভব হয় নি।

১৯শে জুন তারিখে তিনি একটি পৃথক ধরনের উদ্বাস্তু কলোনি দেখতে চেয়েছিলেন। তাই ঠিক হল, আশ্রয় শিবিরবাসী মৎস্যজীবীদের নিয়ে মাঝের চরে যে কলোনি স্থাপিত হয়েছে সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। তা যেখানে কল্যাণী উপনগরী গড়ে উঠেছে তার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথী নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত। কল্যাণী তখনও গড়ে ওঠে নি, সবে কাজ শুরু হয়েছে। অনেকখানি পথ গাড়িতে যাওয়া সম্ভব হলেও কল্যাণী পৌঁছতে অনেকখানি পথ হাঁটতে হয়, কারণ তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবার কোন কাঁচা রাস্তাও ছিল না। থাকলেও ফল হত না, কারণ তখন বর্ষা পড়ে গেছে। তিনি খুশি হয়ে পায়ে হেঁটেই সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেন। এইস্থান উদ্বাস্তু মৎস্যজীবীরা নিজেরাই নির্বাচন করেছিল। তারা ইতিমধ্যে নিজেদের ঘর তুলে ফেলেছে, নৌকা এবং জাল জোগাড় করে মাছ ধরতেও শুরু করে দিয়েছে।

(৪)

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে রীতিমত বর্ষা নামল। সারা পশ্চিমবঙ্গ জলে প্লাবিত হল। উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবিরগুলি তাতে কমবেশি দুর্দশাগ্রস্ত হল। যেখানে পাকা বাড়িতে গুদামঘরে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল সেখানে বর্ষার আক্রমণ তত অসুবিধা সৃষ্টি করল না। কলিকাতার কাছে কাশীপুর বা উল্টাডাঙ্গার অস্থায়ী শিবিরগুলি বা কুপার ক্যাম্পের টিনের বড় ঘরগুলি—এগুলির মেঝে হয় কাঠের, না হয় পাকা, এদের ছাদ টিন দিয়ে ঢাকা কাজেই বৃষ্টির জল হতে আশ্রয়বাসীরা এখানে নিরাপদ। সীমান্তে যে সব নূতন আশ্রয় শিবির নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের দেয়াল ছিল বাঁশ দিয়ে গাড়া এবং ছাদ ছিল টিনের।

সুতরাং এখানেও আশ্রয় শিবিরবাসীরা একরকম বৃষ্টির জল হতে নিরাপদ। তবে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল পরিবারকে থাকবার জন্য আবাসিক স্থান নির্মাণ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। পরে যখন অতি দ্রুত আশ্রয় শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল, তখন বাধ্য হয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাঁবু জল আটকায় তবে অল্প পরিসর জায়গা হওয়ায় বৃষ্টির সময় তার মধ্যে বন্দী থাকতে হয় বলে উদ্বাস্তুদের কষ্ট হত। কিন্তু উপায় ছিল না।

এখন সীমান্ত অঞ্চলে যে আশ্রয় শিবিরগুলি স্থাপিত হয়েছিল, একটি অন্য কারণে বর্ষার আগমনের ফলে সেগুলি দুরবস্থায় পতিত হল। তা নিয়ে একটি সংবাদপত্রে এমন একটি অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারিত হল যা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। যে আশ্রয় শিবিরকে নিয়ে কথা উঠেছিল, তা ট্যাংরায় অবস্থিত। তা সীমান্তের দু-তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত এবং কোন পাকা রাস্তার সহিত সংযুক্ত নয়। বনগাঁ হতে বাগদা পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার সুবিধার জন্য যে নূতন বাঁধান পথটি অতি দ্রুত নির্মিত হয়েছিল তা হতে এটি বিচ্ছিন্ন। আশ্রয় শিবির হতে তার দূরত্ব দেড় মাইলের মত। এই আশ্রয় শিবির নিয়ে খবর প্রচারিত হল যে প্রথম বর্ষণের ফলে সমগ্র আশ্রয় বিশির ভেসে গেছে এবং উদ্বাস্তুরা গাছের ওপরে আশ্রয় নিয়েছে।

বলা বাহুল্য সংবাদটি বেশ অতিরঞ্জিত। যেখানে আশ্রয় শিবির সেটি একটি বিস্তৃত প্রান্তর। তার আশেপাশে সবই খোলা পতিত জমি, গাছ কোথাও নেই। কাজেই বিপন্ন হলে মানুষের গাছে ওঠবার সুবিধা নেই। আসলে প্রান্তরটি ছিল আকারে ঠিক কচ্ছপের খোলার আকৃতির, অর্থাৎ তার কেন্দ্রস্থল ছিল বেশ উঁচু এবং চারিপাশে ঢালু হয়ে গিয়ে তার পরিধি ছিল বেশ নিচু। কাজেই প্রথম বর্ষণের পর সে পরিধির নিচু অংশে জল জমে গিয়ে জায়গাটি আশেপাশের ডাঙ্গা জমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রস্থলে আশ্রয় শিবিরের ঘরগুলি নির্মিত হওয়ায় সেগুলি জলে ডোবে নি। তার নিকটস্থ জমিও জলে ডোবে নি। তবে সংলগ্ন অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সংযোগের পথ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এই অতিরঞ্জিত সংবাদটি প্রকাশিত হবার পর আমার মনে হল আমার নিজে গিয়ে দেখে আসা উচিত এই আশ্রয় শিবিরের দুর্দশার পরিমাণ কতখানি। আমি তাই সেখানে যাবার ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে চাই নি কিন্তু দুজন সহকর্মী আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মনে হয়, আমার প্রতি তাঁরা যে প্রীতি বহন করতেন, তাই তাঁদের আমার সঙ্গী হতে প্রণোদিত করেছিল।

তাঁদের একজন হলেন শ্রীবীরেশ দত্ত। তিনি তখন ছিলেন পুনর্বাসন মহাকরণের ডেপুটি কমিশনার। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পুনর্বাসনের কাজে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে কয়েক বছর পরে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। অপর জন হলেন খ্যাতিমান সমাজসেবক শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি স্বাধীনতার পুর্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দলের সঙ্গে সেচ্ছাসেবকের কাজ করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। বাঙলা বিভাগের পর তিনি উদ্বাস্তুদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজে রীতিমত আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় যখন আমি চব্বিশ পরগনার জেলা-শাসক হিসাবে জয়তারাতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবির দেখতে গিয়েছিলাম। পরে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে যখন পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য ডাঃ রায় একটি কর্মসমিতি স্থাপন করেন তিনি তার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। তখন আমি পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ। এই সূত্রে একসঙ্গে কাজ করে তাঁর সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মোট কথায় কর্মসূত্রে একসঙ্গে কাজ করে দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই কারণেই সেই দুর্গম পথে তাঁরা আমার সহযাত্রী হতে চেয়েছিলেন।

তবে পথের বেশির ভাগ অংশই সহজগম্য ছিল। কলিকাতা হতে মোটর-যোগে যশোহর রোড ধরে বনগাঁ পর্যন্ত প্রাচীন পাকা রাস্তা আছে। তারপর সেখান হতে বাগদা পর্যন্ত যে নূতন পাকা রাস্তা হয়েছে, তা দিয়ে এমন এক জায়গায় যাওয়া যায়, যেখান হতে আশ্রয় শিবিরের দূরত্ব দেড় মাইলের মত। সেখান হতে আশ্রয় শিবির সুন্দর দেখা যায়।

আমরা সেখানে এসে মোটরগাড়ি ত্যাগ করলাম, কারণ এখান হতে পথ দুর্গম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্রয় শিবির পর্যন্ত সামনে সমস্ত পথ জলা জমিতে পরিণত হয়েছে। তার বেশ খানিকটা অংশ জলমগ্ন। সেখানে জলের গভীরতা দেড় ফুট হতে দু ফুট পর্যন্ত হবে। কাজেই মোটরযোগে সেপথে যাওয়া অসম্ভব। নৌকায় যাবার কথাও ওঠে না, কারণ সেখানে নৌকা থাকে না। শীতকালে সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক প্রান্তরে পরিণত হয়। কাজেই জলপথে যাবার স্থায়ী ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন ছিল না। স্থানীয় মহকুমা-শাসক আমাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই দুটি মোষটানা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর ব্যবস্থা খুবই উপযুক্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। গাড়িতে বসলে দেহের কোন অংশকে জলে না ভিজিয়ে আশ্রয় শিবিরে যাওয়া সম্ভব। অপর পক্ষে কাদায় যদি চাকা আটকায় তাকে মুক্ত করবার ক্ষমতা মহিষ-যুগলের রীতিমত আছে, কারণ তারা নিশ্চিত সাধারণ বলদের থেকে বলবান। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমার কিন্তু মোষের গাড়িতে চড়ে যেতে ইচ্ছা করল না। খবর রটেছিল যে এই জলায় নাকি অসংখ্য জোঁক কিলবিল করেছে এবং পায়ে হেঁটে তার মধ্যে দিয়ে যেতে গেলেই তারা ঝাঁকিয়ে গায়ে উঠবে এবং আমাদের রক্ত শোষণ করে

বিপদ সৃষ্টি করবে। এই খবর কলিকাতা অবধি পৌঁছেছিল। তাই দেখা গেল জীবানন্দ ভট্টাচার্য তার জন্য তৈরি হয়ে এসেছেন। তিনি দেখালেন, শিশি ভরে কি-এক ওষুধ এনেছেন যা প্রয়োগ করলে জোঁকের আক্রমণ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে। বোধ হয় এক শিশি নুন আনলেই চলত, কিন্তু তার থেকেও অমোঘ অস্ত্রে তিনি সজ্জিত হয়ে এসেছিলেন।

আমার এই জোঁকের কাহিনীর সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবার বিশেষ ইচ্ছা হয়েছিল। সেই কারণে আমি মোষের গাড়িতে যেতে চাইলাম না এবং পায়ে হেঁটে এই পথ অতিক্রম করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এঁরা দু'জন আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সঙ্কিত হয়ে প্রথমে খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি যখন অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে পায়ে হেঁটে যাবই বললাম, তাঁরা আর প্রতিবাদ করলেন না। তাঁরাও আমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চললেন। তবে শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য জোঁকের প্রতিষেধক ঔষধ সন্তর্পণে পকেটে স্থাপন করে তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

শেষকালে পায়ে হেঁটেই আমরা তিনজনে টেংরা আশ্রয় শিবিরের দিকে এগিয়ে চললাম। জল প্রথমে গোড়ালি পর্যন্ত, তারপর গভীর অঞ্চলে ক্রমশ বেশি হয়ে শেষে হাঁটু পর্যন্ত উঠল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা ঘাসে ঢাকা জমি ছিল বলে তখনও তলায় পাঁক জমে নি। কাজেই কাদায় পা পুঁতে যাবার ভয় ছিল না। তবু জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে চলতে অসুবিধা হয় এবং বেশ সময় লাগে। তাই আমরা ধীরে ধীরেই অগ্রসর হতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা জলে প্লাবিত জায়গা অতিক্রম করে ডাঙ্গা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। তারই কেন্দ্রস্থলে শিবিরটি স্থাপিত। বলা বাহুল্য, আমাদের গায়ে একটিও জোঁক লাগে নি।

সেখানে আশ্রয় শিবিরবাসী পরিবারগুলি আমাদের যেভাবে স্বাগত জানাল তা অভাবনীয়। আমাদের আসতে দেখে তারা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং স্বাগত জানাবার জন্য নানা আয়োজন করতে লাগল। ইতিমধ্যে আশ্রয় শিবিরের অধ্যক্ষের সঙ্গে এবং আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের অসুবিধাগুলির বিষয় অবহিত হয়ে নিলাম।

দেখা গেল, বর্ষার জলে চারিপাশের নিচু জমি ডুবে যাওয়ায় সংলগ্ন ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতেই তাদের যত অসুবিধা হয়েছে। তাদের আশ্রয়ের জন্য যে ঘরগুলি নির্মিত হয়েছিল তাদের কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতি হবার কোন কারণও ছিল না, কারণ সেগুলির ছাদ টিন দিয়ে তৈরি এবং দেয়ালগুলি বাখারি দিয়ে বানান। প্রধানত আশ্রয় শিবিরবাসীদের মধ্যে বিলি করবার জন্য রেশন আনাবার অসুবিধা ঘটেছিল। আগে মোটর-ট্রাকযোগে রেশন আসত। এখন ব্যবস্থা হল পাকা রাস্তা হতে আশ্রয় শিবির পর্যন্ত যে রাস্তাটি

জলে প্লাবিত হয়েছে সে অংশে রেশন পরিবহণের জন্য মোষের গাড়ি ব্যবহার হবে।

আরও ঠিক হল ভবিষ্যতে জায়গাটি যাতে জলপ্লাবিত হয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তার জন্য একটি সংযোগ রক্ষার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। যতদিন বর্ষার জল এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন অবশ্য তা সম্ভব হবে না। তাই ঠিক হল, আগামী শীতকালে মাটি ফেলে একটি রাস্তা বানিয়ে বনগাঁ যাবার পাকা রাস্তার সঙ্গে এই স্থানটি সংযুক্ত করা হবে। এই কাজের দায়িত্ব উদ্বাস্তু নেতারা নিজেরাই নিলেন। উদ্বাস্তু শিবিরবাসীরা নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেদের সমস্যা সমাধান করুক, এই তাঁদের ইচ্ছা। যে দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছিলেন তা পরে পালন করেছিলেন। বর্ষা শেষ হল্লে যখন চারি পাশের নিম্নভূমির জল শুকিয়ে গেল, এই শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা মাটি কেটে কেটে একটি রাস্তা বানিয়ে পাকা রাস্তার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেছিল। সেই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য এক মাইলের ওপর। সুতরাং পরবর্তী বর্ষায় তা আর সংলগ্ন অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন হয় নি।

(৫)

উদ্বাস্তুদের আগমনের হার এপ্রিল ১৯৫০ হতে কমে আসতে আরম্ভ করে। তাহলেও তা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষ কম ছিল না। গড়ে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার মানুষকে আশ্রয় শিবিরে স্থান দিতে হত। অক্টোবর হতে তাদের সংখ্যা বেশ কমে গিয়ে মাসিক দশ হাজারে নেমে গিয়েছিল। যে জুন জুলাই মাসেও শিয়ালদহ স্টেশনে এত ভিড় হত যে প্রতিদিন পর্যন্ত যত উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে জমা হত তাদের সকলকে সেই দিনই আশ্রয় শিবিরে আমাদের পক্ষে পাঠান সম্ভব হত না। কাজেই শিয়ালদহে দু-তিন দিন তাদের পড়ে থাকতে হত।

এই অসন্তোষজনক পরিস্থিতি দূর করবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষ-ভাবে অনুভব করলাম, কিন্তু আমাদের ক্ষমতায় তা সম্ভব হয় নি। নূতন নূতন শিবির খুলেও আমরা প্রতিদিন সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের স্টেশন হতে সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। যত নূতন শিবির খোলা হয়, সেগুলি অল্প দিনের মধ্যেই ভর্তি হয়ে যায়। ফলে যেসকল শিবির ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পুরাতন উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের স্থলে চলে যাবার পর তুলে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আবার খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। এইভাবে নূতন করে শালবনী, ঘুষকরা, রতিবাটি, বাসুদেবপুর, পিয়ারডোবা, নবাবনগর, কাংকসা প্রভৃতি স্থানে নূতন আশ্রয় শিবির খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতেও যখন কুলোয় না তখন নূতন জায়গায় তাঁবুর সাহায্যে আমরা আশ্রয় শিবির খুলেছিলাম, যেমন সালানপুর, ইলমেবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে।

এইভাবে ব্যাপক হারে সকল সম্ভাব্যস্থানে নূতন নূতন আশ্রয় শিবির স্থাপনের ফলে আশ্রয় শিবিরে স্থান দেবার ক্ষমতা আমাদের খুব বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। যদিও তখন উদ্বাস্তু আগমনের হার বেশি ছিল তবু তাদের মধ্যে যারা আশ্রয় শিবিরে থাকতে চায় তাদের সকলকেই আমরা আশ্রয় দেবার ক্ষমতা সঞ্চয় করেছিলাম। সুতরাং এই অনুকূল পরিবেশে ঠিক করা হল শিয়ালদহ স্টেশন হতে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিতে হবে।

এই অভিযান পরিচালনার পূর্বে আমরা একটা পরিকল্পনা গড়ে নিয়েছিলাম। তা সংক্ষেপে ছিল এই : একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ স্টেশনে যত উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে যাবার অপেক্ষায় জমা হয়েছে তাদের সকলকেই আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করতে হবে। হিসাব করে দেখা গেল প্রতিদিন তখন নূতন উদ্বাস্তুদের যে সংখ্যা আশ্রয় শিবিরে স্থান পেতে চায় তাদের গড় সংখ্যা আটশো। আর যারা স্টেশনে শিবিরে-যাবার অপেক্ষায় জমা হয়েছে তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। সুতরাং একই দিনে এই পাঁচ হাজার মানুষকে এক সঙ্গে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যেতে পারলে শিয়ালদহ স্টেশনকে খালি রাখা যায়।

আমাদের তখন একদিনে পাঁচ হাজার মানুষকে আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করবার ক্ষমতা হয়েছিল। কারণ উদ্বাস্তুদের আগমন অনির্দিষ্টকাল বর্ধিত হারে থাকবে আশঙ্কা করে আমরা পশ্চিম বাঙলার নানা স্থানে অনেক আশ্রয় শিবির খুলেছিলাম। একবার খালি করতে পারলে তারপর আমাদের দৈনিক আটশো মানুষকে শিয়ালদহ স্টেশন হতে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাবার সামর্থ্য তখন আমাদের গড়ে উঠেছিল। তাই জন্য ঠিক হল অগাস্টের এক নির্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ স্টেশন হতে সকল উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করা হবে।

কিন্তু এই কাজে আমাদের নানা দিক হতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সেবার কাজে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত ছিল। এক সময় তাদের সংখ্যা ছিল অগণিত এবং তাদের কাজের মধ্যেও বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। তারপর যখন রাজ্যপালকে সভাপতি করে একটি সংযুক্ত সমিতি গড়ে উঠল তখন খানিকটা শৃঙ্খলা এসেছিল। তবু বহু প্রতিষ্ঠান এক রকম পরস্পরের সহিত সংযোগ না রক্ষা করেই সেখানে উপস্থিত থাকত। অপর দিকে শিয়ালদহ স্টেশনের মত খোলা জায়গায় অনির্দিষ্ট-কালের জন্য এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে থাকতে দেওয়া নানা দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়। তাদের ওপর নানা উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে। এবিষয় বিস্তারিতভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু দেখা গেল এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। মৌখিক আপত্তিতে কর্ণপাত না করলে অন্যভাবে বাধা সৃষ্টি হল।

তার একটি উদাহরণ এইখানে দেওয়া যেতে পারে।

যে দিনটি এখান হতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে স্থানান্তরিত করবার জন্য নির্দিষ্ট

হয়েছিল তার দু-এক দিন আগে কোন একটি প্রতিষ্ঠান হতে ঘোষণা করা হল যে ওই দিনের পরদিন উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। বস্ত্র বিতরণ নির্দিষ্ট দিনের আগেও করা যেত, কিন্তু তার পরবর্তী দিনে ধার্য করবার তাৎপর্য দাঁড়ায় কাপড়ের আকর্ষণে তারা আশ্রয় শিবিরে যেতে সম্মত হবে না। এইভাবে কৌশলে তাদের দিক হতে মানসিক বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হল।

কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন, এদের যে নিয়ে যেতে চাইছেন, এদের কি ভাল থাকবার জায়গা দিতে পারবেন?

আমি তার উত্তরে বলেছিলাম যে ভাল জায়গা দেবার ক্ষমতা আমরা সত্যই রাখি না। তবে যেখানে এদের আশ্রয় দেওয়া হবে সেখানে সুখে না থাকলেও এরা স্বস্তিতে থাকবে, স্টেশনের দূষিত পরিবেশ হতে তারা মুক্ত হবে। তার উত্তরে যে ভাল সাড়া পেয়েছিলাম তা বলতে পারব না।

যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে সকাল হতে যখন এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাবার কাজ আরম্ভ হল তখন বিশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি। প্রথমে অনেকের মধ্যে স্টেশন ত্যাগে উৎসাহের অভাব লক্ষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কয়েক দল রওনা হবার পর অন্যদের যাওয়ার উৎসাহ ক্রমশ বেড়ে চলল। কোন দল আগে যাবে দেখতে দেখতে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ফলে সন্ধ্যার মধ্যেই সমগ্র শিয়ালদহ স্টেশন উদ্বাস্তুদের ভিড় হতে মুক্ত হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পরে তা খালি হয়ে যাওয়া এক নূতন অভিজ্ঞতা।

তারপর অনেক মাস শিয়ালদহ স্টেশন খালি রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন যে পরিবারগুলি সরকারের নিকট আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এখানে জমা হত তাদের নিয়মিত আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করা হত। ফলে এখানে আর উদ্বাস্তুদের ভিড় জমত না। সেটা সম্ভব হয়েছিল উদ্বাস্তুদের আগমনের হার ক্রমশ কমে যাওয়ার ফলে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের অকটোবর হতে তাদের মধ্যে যারা আশ্রয়-প্রার্থী হত তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল গড়ে ছ-সাত হাজারের মত। তারপর নূতন করে শিয়ালদহ স্টেশন আবার ভরে যায় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি যখন পাকিস্তান হতে পাসপোর্টের ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। সে কাহিনী যথাস্থানে বলা হবে।

(৬)

সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী আবার পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে এলেন। গতবারে তিনি বিশেষ করে দেখেছিলেন ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবির হতে পুনর্বাসন নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কলোনি গড়েছে তাদের কলোনিগুলি। এবার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। নূতন যারা উদ্বাস্তু এসেছে এবং আসছে তাদের পুনর্বাসনের দিকে নজর দেবার আমাদের এখনও

সময় আসে নি। আমাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য এখন যে বিরাট সংখ্যায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুর্ববঙ্গ ত্যাগ করে এখানে চলে আসছে তাদের প্রাথমিক ত্রাণের ব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে যারা সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাদের আশ্রয় শিবিরে রাখবার ব্যবস্থায় নিযুক্ত। তিনি এবার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরগুলি দেখতে চাইলেন।

সুতরাং তাঁর জন্য ৯ই হতে ১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর আশ্রয় শিবির নির্বাচিত হল। প্রথমে তাঁকে দক্ষিণ কলিকাতার রিজেন্ট পার্কে উদ্বাস্তু বালিকাদের জন্য যে আবাসিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে মেয়েরা লেখাপড়া ছাড়া হাতের কাজও শিখত।

তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কাশীপুর যেখানে আমাদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। এটি কাশীপুরে গান ফাউণ্ড্রী রোডে গঙ্গার ধারে অবস্থিত। বিরাট জায়গা। আগে ছিল পাটের গুদাম। চালান যাবার আগে এখানে পাট গাঁট-বেঁধে মজুত রাখা হত। অনেকগুলি বড় বড় টিনের ছাদযুক্ত ঘর ছিল। তাদের মেজে মাটি থেকে বেশ খানিকটা ওপরে এবং মোটা শালের তক্তা দিয়ে মোড়া। প্রতি পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ এখানে দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পাঠাবার আগে শিয়ালদহ স্টেশন হতে সোজা এখানে এনে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে স্থান দেওয়া হত। এখানে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে শ্রেণী ভাগ করা হত। যারা পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হত তাদের সাধারণ আশ্রয় শিবিরে পাঠান হত। যে পরিবারে বয়স্ক পুরুষ অভিভাবক ছিল না তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পাঠান হত। যাদের পুরুষ অভিভাবক পুনর্বাসনের অযোগ্য তাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

একদিন তাঁকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ার মেয়েদের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে যুদ্ধের সময় একেবারে গঙ্গার কোল ঘেঁষে অনেকগুলি টিনের বড় বড ঘর বানান হয়েছিল, সম্ভবত মাল রাখবার জন্য। জায়গাটি স্বাস্থ্যকর কারণ গঙ্গা পাশ দিয়ে প্রবাহিত। শিল্পাঞ্চল হতে অনেক দূরে অবস্থিত বলে তা জনবিরল বটে। এখানে স্থায়ী দায় হিসাবে বিধবা মেয়েদের তাদের সন্তানসহ রাখা হত। যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য তাদের নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে শক্তিগড় কলোনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ইতিহাসে এই কলোনিটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। পাবনা জেলার কতকগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার বঙ্গ বিভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করবার সঙ্কল্প করে। এমন আরও অসংখ্য পরিবার করেছে, কিন্তু এদের আচরণে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর

নাগরিক হয়ে এঁরা পাকিস্তানে থেকে যেতে চান নি বলেই বাস্তুত্যাগী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত এঁরা এমনি চলে আসেন নি। আসবার আগেই আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবেন ঠিক করে এসেছিলেন। সে ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করবার একটি প্রকল্পও গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা হতেই এই শক্তিগড় কলোনির জন্ম। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই এইভাবে তাঁরা একটি সুন্দর আদর্শ স্থাপন করেছিলেন এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের সমবায় শক্তির ওপর নির্ভর করে পশ্চিম বাঙলার প্রথম উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করেছিলেন। এই ধরনের কলোনি আরও কয়েকটি হয়েছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প। সাধারণ উদ্বাস্তু পরিবারগুলি একক চেষ্টার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করেছে। যারা তা পারে নি তারা সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। এঁরা বিধিসম্মত উপায়ে নিজেদের সমবায় শক্তির ওপর নির্ভর করে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করেছেন।

কলোনিটি দেখে আমাদের ভালই লেগেছিল। নদীয়া জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগর। তা জেলার শাসনকেন্দ্রও বটে। তারই সংলগ্ন অংশে এক বিস্তৃত এলাকায় এই. প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ আপোসে ভূমি ক্রয় করে এই কলোনিটি স্থাপন করেন। কলোনির বিন্যাসও ভাল। মাঝখানে প্রশস্ত খোলা মাঠ এবং চারি পাশে শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন অনেক বাড়ি উঠে গিয়েছিল। একটি বিদ্যালয়গৃহও নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং নির্ভর হয়ে যে পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করা যায় এই কলোনি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এইখানকার কাজ শেষ করে আমরা ফেরির নৌকায় জলাঙ্গী নদী পার হয়ে মোটরগাড়ি করে তারপর শ্রীজৈনকে ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলাম। এটি তখন পশ্চিম বাঙলার সব থেকে বড় আশ্রয় শিবিরে পরিণত হয়েছিল। সেই জন্যই এই শিবির পরিদর্শন করবার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটি জঙ্গি বিমানক্ষেত্র নির্মিত হয়েছিল। সেনানিবাসের জন্য তাই লাইনের দুপাশে অনেক ব্যারাক-এর ধরনের বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় পশ্চিম পাশে বিমানবাহিনীর সৈন্যসহ কর্মচারীরাও বাস করত। পুর্বদিকে ছিল বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। তার ওপর বিমান ওঠা-নামার জন্য এক মাইল লম্বা এবং আন্দাজ তিন শ' ফুট চওড়া এক রানওয়ে ছিল। কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু বাড়ি ছিল। সেখান হতে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হত বলে তার নাম কন্ট্রোল টাওয়ার। যুদ্ধের পর এই বিরাট জায়গাটি খালি হয়ে যায়। হঠাৎ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উদ্বাস্তু আগমনের হার যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন এটির দখল নিয়ে আশ্রয় শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

লাইনের পশ্চিম দিকে যে ব্যারাকগুলি ছিল সেখানে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসনের যোগ্য ছিল না তাদের আশ্রয় শিবিরের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। লাইনের পূর্বদিকে যে বিরাট রানওয়ে পড়ে ছিল সেখানেই পুনর্বাসনের উপযুক্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দীর্ঘ রানওয়ের ছিল দুই প্রান্তে সারবন্দী ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। তাদের টিনের ছাদ ও দরমার বেড়া। প্রতি ঘরে চারটি কামরা এবং সংলগ্ন ছাদযুক্ত খোলা বারাণ্ডা। প্রতি ঘরে একটি করে পরিবারকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বিমান চলাচলের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে উঁচু বাড়িটি ছিল সেখানে আপিস বসান হয়েছিল। আশে পাশে পৃথক বাড়িও কতকগুলি ছিল। সেখানে আশ্রয়বাসী কর্মীদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে প্রায় পঁচাত্তর হাজার মানুষ বাস করছে তাদেরই প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে আপনা হতেই একটি বড় বাজারও গড়ে উঠেছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির জন্য সরকার যে সাপ্তাহিক রেশন দিতেন, তাতে চাল ও ডাল সরকারের ভাণ্ডার হতে সোজা দেওয়া হত এবং অন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনবার জন্য মাথাপিছু টাকা বরাদ্দ হত। অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য তারা এই বাজার হতে কিনত। শুধু তাই নয়, অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিল যাদের অতিরিক্ত অর্থও কিছু ছিল। তারা নিজস্ব অর্থ দিয়েও জিনিস কিনত। অনেক আশ্রয়বাসী উদ্বাস্তু এই সুযোগে সেখানে ছোটখাট বেচাকেনার ব্যবসায়ও শুরু করে দিয়েছিল।

এইভাবে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবির পশ্চিম বাঙলার বৃহত্তম আশ্রয় শিবিরে পরিণত হয়েছিল। সাধারণত আশ্রয় শিবিরগুলি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকত। এই আশ্রয় শিবিরটি আকারে বিরাট হওয়ায় তার তত্ত্বাবধানের জন্য আরও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন কমাণ্ডারকে নিয়োগ করা হয়। এইখানে যাঁকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁর নাম মেজর অধীপ মুখার্জী। তিনি শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সামরিক কাজে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁকে এই গুরু দায়িত্বের ভার দেওয়া হয়েছিল।

সেখানে গিয়ে সেদিন তাঁর যে গুণের পরিচয় পাওয়া গেল তাতে মনে হল তাঁর ওপর দায়িত্ব স্থাপন করে ভালই হয়েছে। তাঁর সংগঠন-শক্তি অসাধারণ বলে মনে হয়েছিল সেদিন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির জীবনে তিনি যে নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা অভাবনীয়। প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারের সক্ষম যুবকদের নিয়ে তিনি একটি কর্মিবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাদের নিয়মিত ড্রিল করিয়ে তিনি তাদের দেহগুলিকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন। তারপর তাদের দিয়ে এখানে একটি বিরাট পুকুর

কাটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীজৈনের আগমন উপলক্ষ্যে তাদের রানওয়ের দীর্ঘ পথটি জুড়ে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের সামনে একটি ঝুড়ি ও কোদাল স্থাপিত হয়েছিল। আপিস এবং শিবিরের অন্য অংশ পরিদর্শনের পর তাঁকে সেই রানওয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আনা হলে তাদের সংঘবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ আরম্ভ হল। মেজর মুখার্জি উচ্চৈঃস্বরে যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছিলেন তারা একযোগে তা পালন করছিল। এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে সে কাজগুলি সম্পাদিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল তারা যেন সেনাবাহিনীরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। শেষে তারা যখন শেষ নির্দেশ পেয়ে কাঁধে নিজ নিজ কোদাল স্থাপন করে এবং হাতে ঝুড়ি নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মেজর মুখার্জির কর্মক্ষমতা দেখে আমরা সেদিন সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেদিন এতখানি তৃপ্তি নিয়ে আমরা যখন ফিরে গিয়েছিলাম তখন ভাবতে পারি নি যে এই ধুবুলিয়া ক্যাম্পেই দিন দশেকের মধ্যে এমন একটি কাণ্ড ঘটবে, যাকে কেন্দ্র করে আশ্রয় শিবিরে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। ব্যাপারটি আরম্ভ হয়েছিল সামান্য ঘটনা থেকে কিন্তু তার পরিণতি নিয়েছিল ভয়াবহ রূপ।

মেজর মুখার্জি আশ্রয় শিবিরের যুবকদের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন। সন্ধ্যার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তিনি যুবকদের নিজ নিজ আশ্রয়স্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করতেন; খোলা জায়গায় যেখানে সেখানে জমা হতে দিতেন না। তিনি অন্য দিনের মত ওই দিন জীপে করে বিরাট এলাকা পরিদর্শন করতে করতে দেখলেন কয়েকটি আশ্রয়বাসী যুবক একটি জায়গায় জটলা করছে। তিনি তাদের জীপে করে তুলে নিয়ে গিয়ে কণ্ট্রোল টাওয়ারের আপিসের মধ্যে আটকে রেখে দিলেন।

এই খবর ক্যাম্পের মধ্যে যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হল। কণ্ট্রোল টাওয়ারের সামনে খালি জায়গা আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুতে ভরে গেল। তারা দাবি জানাল—আবদ্ধ-রাখা উদ্বাস্তুদের মুক্তি দিতে হবে। মেজর মুখার্জি এদিকে ছিলেন দারুণ দুঃসাহসী। তিনি সোজা সেই জনতার মাঝখানে এসে তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তাঁর জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

কণ্ট্রোল টাওয়ারের আপিসের এক অংশে উদ্বাস্তুদের বিলি করবার জন্যে রেশনের চাল থাকত এবং খরচের টাকাও জমা থাকত। সেই কারণে এগুলি সংরক্ষণের জন্য একদল সশস্ত্র পুলিশ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করত। তারা পালা করে এই সরকারী সম্পত্তি পাহারা দিত। কমাণ্ডারকে এইভাবে জনতার মধ্যে বিপন্ন হতে দেখে জনকয়েক সশস্ত্র প্রহরী তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য জনতার মধ্যে ঢুকে গেল। জনতা যদি তাদের বাধা না দিত শৃঙ্খলা সহজেই

ফিরে আসতে পারত। তারা প্রহরীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। হঠাৎ এই পরিবেশে একটি বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল। তার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আর দেখা গেল দুজন উদ্বাস্তু ছেলে আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর নয়, হাতের আঙুলের ওপর দিয়ে একটি অগভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। অন্য ছেলেটির আঘাত খুবই গুরুতর ছিল। তার পেটের ভিতর একটি আট ইঞ্চি গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে সে পরে মারা গিয়েছিল।

এই দুর্ঘটনার খবর আমরা যখন কলিকাতায় পেলাম তখন আমরা শুধু মর্মাহত হই নি, একান্তই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। যাঁর শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতার প্রকট প্রমাণ কয়েকদিন আগে মাত্র দেখে আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলাম তাঁকে কেন্দ্র করে যে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে তা ছিল আমাদের কল্পনাতীত।

খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে মেজর মুখার্জিকে তখনই ওখান হতে স্থানান্তরিত করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমন উত্তেজনা হ্রাস করবার জন্যও প্রয়োজন। কারণ এই দুর্ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত হওয়ার ফলে তাঁকে দেখলেই স্থানীয় উদ্বাস্তুদের উত্তেজিত হবার সম্ভাবনা ছিল। সেই কারণে তখনি কেন্দ্রীয় আপিস হতে শ্রীযশোদাকান্ত রায় আমাদের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে রওনা হয়ে গেলেন। ইনি ছিলেন পুনর্বাসন অধিকারের ডেপুটি কমিশনার। এমন কর্তব্যে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ দেখা যায় না। এদিকে তিনি মৃদুভাষী এবং ভদ্র ; উত্তেজিত হওয়া তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে। কাজেই তিনিই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলেন।

তিনি সেখানে গিয়ে মেজর মুখার্জিকে ওখান হতে সরিয়ে দিলে উত্তেজনা অনেকখানি প্রশমিত হয়ে গেল। যতক্ষণ না নূতন কমাণ্ডাণ্ট নিযুক্ত হন, তিনি প্রশাসনের জন্য একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা করে চলে এসেছিলেন।

ঘটনার দিন দুই পরে আমি ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরের পরিস্থিতি দেখবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের অন্য ডেপুটি কমিশনার মেজর বিমলচন্দ্র ঘোষ গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল না আমি একা যাই। আমি সেখানে গিয়ে দেখি বাহিরে সবাই শান্ত, কিন্তু একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সব কিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এত মানুষের এখানে বাস, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সেদিনের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আশ্রয় শিবিরবাসী একটি যুবক প্রাণ হারিয়েছে। তার ফলে আশ্রয় শিবিরবাসী সকল উদ্বাস্তু পরিবারের মনে একটি দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। মেজর মুখার্জি চলে যাওয়ার ফলে তা খানিকটা স্তিমিত হলেও একটা চাপা আক্রোশ

এবং শোকের মিশ্রিত ভাব যেন এখানকার মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমি আশ্রয় শিবিরে গিয়ে প্রথমেই ইচ্ছা প্রকাশ করলাম যে, যে-ছেলেটি প্রাণ হারিয়েছে তার পরিবারের সহিত দেখা করব। আমি জেনেছিলাম ছেলেটির বাবা ও মা জীবিত এবং এই আশ্রয় শিবিরেই তাঁরা বাস করেন। আপিসের একটি কর্মচারী তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে নিয়ে গেলেন। যে প্রকোষ্ঠে পরিবারটি বাস করে, তার সংলগ্ন বারান্দায় মা ও বাবা বসেছিলেন। সন্তানের সদ্য মৃত্যুর শোক তখনও তাঁদের বিশেষভাবে অভিভূত করে রেখেছে। তার ছাপ তাঁদের মুখে সুস্পষ্ট। বোঝা যায় সেই কারণেই তাঁরা সেখানে চুপ করে বসে ছিলেন।

আমি ওখানে গিয়ে তাঁদের নমস্কার জানালে তাঁরা উভয়েই প্রতিনমস্কার করলেন। আমি আমার পরিচয় দিয়ে তাঁদের জানালাম যে তাঁদের সন্তান হারাবার শোকে সমবেদনা জানাতে আমি তাঁদের কাছে এসেছি।

তার প্রতিক্রিয়া এক অভাবনীয় রূপ নিল। আমার আচরণ মনে হয় তাঁদের মনকে স্পর্শ করে থাকবে। ছেলেটির মা আমার কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কিন্তু আমি যে অতিথি সে কথা ভুললেন না। কাছেই একটা পিঁড়ে ছিল। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম এবং যতক্ষণ না তাঁর শোকের আবেগ কমল অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর যখন একটু প্রকৃতস্থ হলেন, তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

তারপর আপিসে ফিরে এসে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমার একটি কৌতূহল জাগল এবং মনে হল বিষয়টি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ হলে মৃত ছেলেটি আঘাত কিভাবে পেয়েছিল সে বিষয়ে আলোকপাত হয়। এখন ছেলেটির দৈহিক আঘাতের কারণ সম্পর্কে দু-পক্ষের দু'টি বিভিন্ন কাহিনী ছিল। উদ্বাস্তুদের পক্ষের কাহিনী হল—পুলিশরক্ষী ইচ্ছা করে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আঘাত করেছে। অপরপক্ষে যে সেপাইএর বন্দুক ছুটে গিয়েছিল, তার কাহিনী হল সে যখন মেজর মুখার্জিকে উদ্ধার করতে জনতার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন টোটাভরা বন্দুক তার হাত হতে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হয় এবং ধস্তাধস্তির ফলে বন্দুক ছুটে গিয়ে ছেলেটির আঘাত লাগে। সে বলল যে, তার বন্দুকের হাতলের দিকটা ধরেছিল আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা আর তার হাতে ছিল নলের দিকটা। উদ্বাস্তুরা তার হাত হতে বন্দুক ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। দুই দলে টানাটানি করবার সময়ে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের দলটি হাতল থেকে হাত তুলে নেয়।

ঠিক তারপরেই দেখা যায় যে-ছেলেটি মারা গিয়েছিল তার পেটে এক গভীর ক্ষত। সেটা শুরু হয়েছে বুকের তলার অংশে বাঁদিকের পাঁজরের পাশ দিয়ে

এবং বাঁকাভাবে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে ডানদিকে লিভার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ছেলেটির কাছেই যে সেপাইএর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে টানাটানি হচ্ছিল সে কথা ঠিক। কাজেই গুলি ছুটে গিয়ে তার গায়ে লাগবার সম্ভাবনা ছিল বৈকি। কিন্তু আমার মনে সন্দেহের উদয় হল ছু'টি কারণে। প্রথম কথা হল বন্দুক ধস্তাধস্তির সময় ছুটে যাবার ফলে যে গুলি নির্গত হল, তা যদি ছেলেটির দেহে প্রবেশ করে এই জখম সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে সে গুলি গেল কোথায়? দেহ যখন এফোঁড় হয়ে ভেদ হয় নি, তখন গুলি তো দেহের অভ্যন্তরেই পাবার কথা। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ করে দেহের মধ্যে গুলি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয়, আর একটি ছেলের হাতে গুলির জখমের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। এ ছেলেটি ও মৃত ছেলেটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতের আঙুলগুলোর ওপর দিয়ে একটি কঠিন পদার্থ ঘষটে গেলে যেমন জখম সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা, তেমন সেখানে ছিল। সম্ভবতঃ বন্দুকের গুলি তার আঙুলগুলো ঘেষটে চলে গেছল। তা যদি গিয়ে থাকে তাহলে তো আর যে ছেলেটি আঘাতের ফলে মারা গেছে, তার গায়ে তা লাগতে পারে না। একই গুলি পাশাপাশি দু'জন দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের দুজনেরই দেহে লাগতে পারে না।

সুতরাং আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জেগেছিল, যে ছেলেটি আঘাতের ফলে মারা গিয়েছে, সে গুলির আঘাতে মারা যায় নি। সুতরাং অনুমান করতে হয় যে তার পেটে যে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল তা অন্যভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এই সূত্রে যে সিপাইটির হাতে এই বন্দুকটি ছিল তাকে প্রশ্ন করতে করতে আরও কিছু নূতন তথ্য পাওয়া গেল। জানা গেল ঘটনার সময় বন্দুকের আগায় বেয়নেট লাগান ছিল। এই বেয়নেট দুই ধরনের হয়। এক ধরনের বেয়নেট আছে যা চ্যাপ্টা এবং তীক্ষ্ন, অনেকটা সড়কির ধারাল অংশের মত। আর এক ধরনের বেয়নেট থাকে যা তত মারাত্মক নয়। তা ইস্পাতের গোলাকার একটা ছোট লাঠির মত। তার অগ্রভাগ তীক্ষ্ন নয়। এই সেপাই-এর হাতে যে বন্দুক ছিল, তার ডগায় এই দ্বিতীয় ধরনের ভোঁতা গোলাকার বেয়নেট ছিল।

এখন মৃতের দেহে যে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল তা একটি গোলাকার আট ইঞ্চি গভীর ক্ষত। সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না যে যখন দুই পক্ষ বন্দুক নিয়ে দু'দিক থেকে টানাটানি করছিল তখন বন্দুকের শব্দ শুনে যদি হঠাৎ একপক্ষ বন্দুক ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে বিপরীত দিকে তা বেশ বেগে ছুটে যাবে। সবেগে চালিত হলে দেহের নরম অংশের ওপর সজোরে লাগলে তা এমন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

এই অনুমান সত্য কিনা তা পরীক্ষা করবার একটা উপায় ছিল। যে বন্দুকটি ব্যবহৃত হয়েছিল আমি সেটি আনতে বললাম। দেখা গেল তখনও তার সঙ্গে

বেয়নেটটি যুক্ত ছিল। আমি সেই বেয়নেট রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। রাসায়নিক পরীক্ষার ফল আমার অনুমানকে সমর্থন করেছিল। সেই পরীক্ষায় বেয়নেটের গায়ে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল এবং সেই রক্ত মানুষের রক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সুতরাং এই আকস্মিক মৃত্যু যে ইচ্ছাকৃত নয়, একটি দুর্ঘটনার ফল তা প্রমাণ হওয়ায় ঘটনার রূপ খানিকটা পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।

এখন নূতন সমস্যা দাঁড়াল, এই আশ্রয় শিবিরের কমাণ্ডাণ্টের পদ কিভাবে পূরণ করা যাবে। এই বিরাট আশ্রয় শিবিরের জনসংখ্যা বিপুল। তারপর সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার ফলে আশ্রয় শিবিরবাসী মানুষদের মন এমন বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যে অতি বিচক্ষণ একজন অধ্যক্ষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এমন একজন অধ্যক্ষ দরকার যিনি উদ্বাস্তুদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিপরায়ণ হবেন, যিনি সহজেই তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন এবং যাঁর এমন ব্যক্তিত্ব থাকবে যাতে প্রশাসনিক কাজে সহজেই অন্যের সহযোগিতা পাবেন। বলা বাহুল্য এমন মানুষ পাওয়া শক্ত।

কিন্তু ডাঃ রায় তার অতি সহজ সমাধান করে দিয়ে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার সুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। তিনি এক সময়ে ঢাকা জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি তখন নিজেই উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাঙলায় এসেছিলেন। ডাঃ রায় তাঁকেই কমাণ্ডাণ্টের পদে নির্বাচিত করলেন।

জিতেন্দ্র কুশারী সঙ্গে সঙ্গেই কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর রাজনৈতিক কর্মিহিসাবে খ্যাতি থাকায় এবং তিনি নিজে উদ্বাস্তু হওয়ায় আশ্রয়-বাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তিনিও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করে তাদের প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার দিন আগতপ্রায়। ডাঃ রায় তাঁকে উপদেশ দিলেন, সমারোহ করে আশ্রয় শিবিরে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করতে। তার ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাণ্ডার হতে অনেক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সাম্প্রতিক বিক্ষোভের পর দুর্গাপূজার আয়োজন আশ্রয় শিবিরবাসীদের মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

(৭)

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় যখন খুলনা জেলার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ব্যাপক ভাবে উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি আশ্রয় শিবির

খোলা হয়েছিল। কারণ ভারত সরকার তখন এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না। তাদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হবে এবং পূর্ববঙ্গে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে, ধরে নেওয়া হয়েছিল, তারা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবে। অবশ্য এ নীতি পরে জনমতের চাপে পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সেই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আশ্রয় শিবিরগুলি যতখানি সম্ভব সীমান্ত অঞ্চলে স্থাপন করা হবে। কারণ তাহলে আশ্রয়প্রাপ্ত পরিবারগুলির ফিরে যেতে সুবিধা হবে।

এই নীতির অনুসরণে যে কয়টি আশ্রয় শিবির সীমান্ত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল চণ্ডীপুর আশ্রয় শিবির তাদের অন্যতম। এটি চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। যশোহর রোড হতে যে রাস্তা হাবড়ার উত্তর হতে পূর্বদিক বেঁকে মসলন্দপুর রেল স্টেশনের দিকে গেছে সেই রাস্তা ধরে লাইন পার হয়ে পূর্বদিকে অনেকখানি গেলে চণ্ডীপুর পাওয়া যাবে। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, এক প্রাচীন মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ও সেখানে দেখেছি। পাশ দিয়ে যমুনার এক মজা শাখানদী প্রবাহিত। পাকিস্তানের সীমানা হতে তা কয়েক মাইলের মধ্যে। এখানেই আপোসে স্থানীয় ভূম্যধিকারীদের নিকট হতে জমি নিয়ে এই আশ্রয় শিবির খোলা হয়। এই আশ্রয় শিবিরের যিনি অধ্যক্ষ তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন শিবিরটি একবার ঘুরে দেখে আসতে। তাঁর বিবরণ মতে এখানে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি অস্থায়িভাবে স্থান পেয়েছিল তারা ভারি কর্মঠ এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবকরূপে ব্যবহার করে তিনি শিবিরের অনেক উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন। তাদের হাতের কাজ দেখাবার জন্যই তিনি এবং শিবিরের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির প্রতিনিধিরা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

আমি তাঁদের সেই নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলাম। সুতরাং ১০ই অক্টোবর ১৯৫০ তারিখে কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে আমি আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করতে হাজির হয়েছিলাম। গিয়ে যা দেখেছিলাম, তাতে বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম। পরিশ্রমে অনুরাগ থাকলে এবং উপযুক্ত নেতা থাকলে আশ্রয় শিবিরবাসীদেরও যে কতখানি মানসিক পরিবর্তন ঘটান যায় তার এটি সুন্দর উদাহরণ।

আশ্রয় শিবিরটি স্থাপিত হয়েছিল একটি বিস্তৃত ডাঙা জমির উপর। তার একটা প্ল্যান ছিল। খানিক জায়গা অন্তর সারি সারি বাড়ি বসান হয়েছিল। তাদের দেওয়াল বাঁশের এবং ছাদ টিনের। দেওয়াল মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢাকা। প্রতি বাড়িতে চারখানি করে প্রশস্ত ঘর। প্রতি ঘরের সামনে একফালি ঢাকা বারাণ্ডা। উদ্দেশ্য, এক একটি ঘরে একটি করে উদ্বাস্তু পরিবার থাকবে

এবং সামনের বারাণ্ডায় রান্না করবে। বাড়িগুলি লাইন করে সমান্তরাল ভাবে সাজান ছিল। সংলগ্ন স্থানে ফাঁকা জায়গাও অনেক ছিল।

আশ্রয় শিবিরের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে শিবিরবাসীরা এটিকে একটি সুবিন্যস্ত কলোনিতে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী হয়েছিল। সুতরাং দুই সারি বাড়ির মধ্যে তারা রাস্তা কেটেছিল। জল নিকাশের জন্য দুধারে অগভীর নালা কেটে তার মাটি দিয়ে রাস্তা উঁচু করা হয়েছিল। তারপর যে উদ্বৃত্ত খালি জমি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তারা সেখানে যে-যার ইচ্ছামত চাষ করে ফসল উৎপাদন করবে।

যা আমাকে সব থেকে আনন্দ দিয়েছিল তা তাদের এই ছোট ছোট নিজস্ব ক্ষেতগুলি। তখন সবে বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। জল সেচের কোন সমস্যা ছিল না। সকল সম্ভাব্য ফসল সেই ক্ষেতগুলিতে উৎপাদিত হয়ে তাদের শ্রীমণ্ডিত করেছিল। কাটোয়ার ডাঁটা, বরবটি, ঝিঙে, শশা, চিচিঙে প্রভৃতি ফসলে ক্ষেতগুলি ভরে গিয়েছিল। অবসর সময় এইভাবে ব্যয়িত হওয়াতে শুধু পরিবারবর্গের কর্মক্ষম মানুষগুলি আনন্দ পায়নি, নিজ নিজ পরিবারের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যও উৎপাদন করতে পেরেছিল। ফলে তাদের মনের পরিবর্তনও বেশ লক্ষণীয় হয়েছিল। অনিশ্চিত কালের জন্য উদ্বাস্তু পরিবারদের অন্যত্র আশ্রয় শিবিরে বাস করতেও দেখেছি। তাদের মন যেন খানিকটা অবসাদ ক্লিষ্ট। অবশ্য সেটা হওয়া স্বাভাবিক এখানে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এদের মুখে একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ লক্ষিত হয়, সেখানে অবসাদের কোন চিহ্ন ছিল না। এই আশ্রয় শিবিরটিকে পরিপাটি কলোনির রূপ দিতে পেরে তারা যেন দেখাবার মত কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে—এই ধরনের মনোভাব তাদের মনে ক্রিয়া করছিল। তাই এই অনিশ্চিত জীবনের মধ্যেও তারা রসের আস্বাদ পেয়েছিল।

সেই কারণে আমাদের ঘুরিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাদের কাজ দেখিয়ে নিয়ে বেড়ানর আগ্রহের সীমা ছিল না। আমরাও তাদের কাজ দেখে তৃপ্তিবোধ করেছিলাম। তাতে তারা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছিল। পরিদর্শনের শেষে আমাদের যখন বিদায় দেবার সময় এগিয়ে এল তখন এই আশ্রয় শিবিরের ভাইরা এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। তাদের উৎপাদিত ফসল এনে আমাকে উপহার দিতে আরম্ভ করল। আমি যত বলি এত ফসল কে খাবে, আর যেন তোলা না হয়, তত বেশি ফসল ক্ষেত হতে তোলা হতে লাগল। কে শোনে আমার কথা? দেখতে দেখতে ঝিঙে, বরবটি, শশা, চিচিঙের স্তূপ গড়ে উঠল। সব ফসলই বড় আকারের, কারণ শিবিরবাসীরা ভাল চাষী।

এক একটি চিচিঙে পাঁচ-ছ ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল। অগত্যা তখন ঠিক করলাম যে তাদের উৎপাদিত ফসল কলিকাতার আশ্রয় শিবিরে যাবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাব। তাহলে তারা একদিন টাটকা সবজি খাবার আস্বাদ পাবে। আমরা যে জীপে এসেছিলাম, তাতে এত সবজি নিয়ে যাবার জায়গা ছিল না। ক্যাম্পেই একটি ট্রেলার জোগাড় করা গেল। তার মধ্যে সেগুলি স্থাপন করে জীপে জুড়ে আমরা ফিরে এলাম। পথে কাশীপুরের আশ্রয় শিবিরে সবজিগুলি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্যে নামিয়ে দিয়ে আসা হল।

(৮)

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ হতে যে উদ্বাস্তদের স্রোত পূর্ব বাঙলা হতে প্রধানত পশ্চিম বাঙলায় আসতে শুরু করেছে তার বিরাম ছিল না। যারা আসছিল তাদের একটা বড় অংশ সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের জন্য ক্রমাগত নূতন নূতন আশ্রয় শিবির স্থাপন করে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। এপ্রিল মাস হতে তাদের সংখ্যা কমে আসলেও তা বেশ বেশিই ছিল। এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর অবধি এই ছয় মাসে গড়ে আশ্রয় শিবিরে মাসে পঁচিশ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। এখন আর তাদের জন্য মহাযুদ্ধের সময় নির্মিত ব্যারাকবাড়ি পাওয়া যায় না, অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করাও সম্ভব নয়। অত টিন কোথায় পাওয়া যাবে? তাই নূতন ব্যবস্থা হয়েছিল প্রতি পরিবারকে বাস করবার জন্যে একটি তাঁবু দেওয়া হবে। তাতে সুবিধা এই যে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে এরকম জায়গায় বিস্তৃত জমি পাওয়া গেলেই সেখানে নূতন আশ্রয় শিবির খোলা সম্ভব হবে। কেবল প্রস্তুতি হিসাবে পানীয় জলের জন্য নলকূপ এবং উপযুক্ত সংখ্যক স্যানিটারি পায়খানা স্থাপন করলেই তা আশ্রয় শিবির খোলবার উপযুক্ত হয়ে যেত। কোন রকমে একটি থাকবার জায়গা সংগ্রহ করে দিয়ে সাপ্তাহিক ডোলের সাহায্যে এই বিরাট জনসংখ্যার আহারের ব্যবস্থা করতেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের সব সামর্থ্য তখন ব্যয় হয়ে যেত।

অকটোবর মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বাস্তদের আশ্রয় শিবির দেখতে আসতে চাইলেন। এখন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির পদধূলি পড়বার সৌভাগ্য কোন আশ্রয় শিবিরের ঘটবে সেটা ঠিক করা এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিম বাঙলায় তখন শতাধিক আশ্রয় শিবির ছিল। তারা সকলেই এই সম্মান লাভের জন্য উৎসুক। সুতরাং কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে এখানকার সব থেকে দুটি বড় আশ্রয় শিবির তাঁর পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত হক। তখন বৃহত্তম আশ্রয় শিবির ছিল ধুবুলিয়ায় আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত

রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় শিবির। প্রথমটির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর আর দ্বিতীয়টির ভার ছিল ভারত সরকারের ওপর। সুতরাং সেদিক থেকেও এই দুটি আশ্রয় শিবির নির্বাচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল। এইসব বিষয় বিবেচনা করে ঠিক হল ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম বাঙলায় এসে এই দুটি আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করে যাবেন।

৩০শে অকটোবর তাঁর পরিদর্শনের দিন ঠিক হল। দিল্লী হতে তিনি কলিকাতায় এসে রাজভবনে উঠলেন। ডঃ কাটজু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। রাষ্ট্রপতির জন্য যে ভ্রমণসূচী রচিত হল, তাতে ব্যবস্থা ছিল তিনি সকালবেলা স্পেশাল ট্রেনে সোজা ধুবুলিয়া যাবেন। সেখানে পরিদর্শনের পর তিনি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের একটি সভায় ভাষণ দেবেন। তারপর ট্রেণযোগে রাণাঘাটের দিকে রওনা হবেন। পথে গাড়িতেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হবে। অপরাহ্নে তিনি রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের আশ্রয় শিবিরে উপস্থিত হবেন। সেখানেও পরিদর্শনের পর তিনি উদ্বাস্তুদের একটি সভায় ভাষণ দেবেন। আরও ঠিক হয়েছিল তাঁর সঙ্গে যাবেন রাজ্যপাল ডঃ কাটজু, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার, ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রীঅবণীভূষণ চ্যাটার্জি এবং আমি।

নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে আমরা রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ট্রেনে ধুবুলিয়া রওনা হলাম। রেলে তা প্রায় আশি মাইল পথ। ঘণ্টা আড়াই পরে আমরা সোজা ধুবুলিয়া স্টেশনে হাজির হলাম। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানবার জন্য কমাণ্ডাণ্ট শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী এবং আশ্রয় শিবিরের বহু কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জেলা-শাসকও উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত সম্ভাষণের পর ডঃ কাটজু তাঁকে নিয়ে আশ্রয় শিবিরের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। কোথায় হাসপাতাল, কোথায় ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোথায় আপিস—সব ঘুরিয়ে দেখান হল। তারপর যেখানে অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েরা থাকে, সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে অনেকগুলি বর্ষীয়সী মহিলা তাঁদের ঘিরে ফেললেন। তাঁদের বুঝি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছে একটি নিবেদন ছিল। ডঃ কাটজু ছিলেন ভারি প্রত্যুৎপন্নমতি-র মানুষ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনিই তোমাদের অভিযোগ শোনবার জন্য নিযুক্ত, এঁকে যা বলবার আছে বল। তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমি তাঁদের আমার দিকে ডেকে নিলাম। তখন উভয়ে মুক্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। এক অপ্রীতিকর সম্ভাবনা এইভাবে খণ্ডিত হওয়াতে আমি স্বস্তি পেলাম।

এই মহিলাদের যা প্রস্তাব ছিল, তা মোটেই অযুক্তিসঙ্গত নয়। তারা বয়সে বৃদ্ধা এবং সরকারের ওপর ভরণপোষণের জন্য নির্ভরশীল। আত্মীয়দের নিকট

তাঁরা এই দুর্দিনে অবাঞ্ছিত। তাঁরা চেয়েছিলেন, তাঁদের জন্য বারাণসীতে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হক। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাদের এই অতি সঙ্গত ইচ্ছা যাতে পুরণ হয়, তার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তারপর রাষ্ট্রপতির দলে এসে যোগ দিলাম।

এরপরে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেবার পালা। তখন ছিল শরতের শেষ। আকাশ মেঘমুক্ত, রৌদ্রের তাপও বড় প্রখর নয়। তাই কণ্ট্রোল টাওয়ারের সামনে মুক্তপ্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হয়েছিল। আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা তখন প্রায় পঁচাত্তর হাজার। তারা প্রায় সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির বসবার স্থান হয়েছিল কণ্ট্রোল টাওয়ারের সামনের অংশে ছাদের ওপর। সেখান হতে তিনি যখন ভাষণ দিলেন, শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সহিত নীরবে তা শুনছিল। তারা এত নীরব ছিল যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধই সম্ভবত তাদের এই রুচিসম্মত আচরণে প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি বাঙলাতেই ভাষণ দিয়েছিলেন বলে তাদের আরও ভাল লেগেছিল। অবশ্য বাঙলাতে ভাষণ দেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। কারণ তাঁর ছাত্রাবস্থায় তাঁর মাতৃভূমি বিহার বাঙলার সহিত সংযুক্ত হয়ে একই প্রদেশের অংশ ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ইডেন হসটেলের ছাত্রাবাসে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। কাজেই বাঙলা তাঁর মাতৃভাষার সমস্থানীয় ছিল।

তিনি অতি শান্তস্বরে ধীরে ধীরে তাঁর ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি উদ্বাস্তু ভাইদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তাদের সহানুভূতি জানালেন। যারা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবে না, তাদের এখানেই পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মোট কথায় উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারত সরকারের কর্তব্য এবং দায়িত্ব স্পষ্টভাষায় স্বীকার করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

শ্রোতারা ভাষণ খুব আগ্রহভরেই শুনেছিল। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আশ্রয় শিবিরে এসে তাদের সহানুভূতিসূচক কথা শোনাতে এসেছেন, এ তাদের পক্ষে অভাবনীয় গৌরব। তারা ধ্বনি করে তাঁকে অভিবাদন জানাল। দেখে ভাল লাগল যে আশ্রয় শিবিরের আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, আবার শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। সেখানে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে একটি দুর্ঘটনার ফলে এক উদ্বাস্তু বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, সেখানে এখন কোন বিক্ষোভ বা উত্তেজনার লক্ষণ ছিল না।

এখানকার পরিদর্শন শেষ হলে বিশেষ ট্রেনে উঠে রাষ্ট্রপতি কলিকাতার দিকে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য, ফেরবার পথে রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় শিবিরেও ঘুরে আসবেন। পথে যেতে যেতেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হয়ে

গিয়েছিল। সুতরাং রাণাঘাটে ট্রেন যখন থামল, আমরা তখনই আশ্রয় শিবির পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় শিবিরেও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তুমুল সমারোহের মধ্যে স্বাগত সম্ভাষণ করা হল। তার কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে তিনি এখানকার আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে আর একটি ভাষণ দিলেন। এখানেও তিনি বাঙলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণের বিষয়ও অনুরূপ ছিল। সন্ধ্যার দিকে পরিদর্শন কার্য শেষ হলে আমরা বিশেষ ট্রেনযোগে কলিকাতায় রওনা হলাম।

কুপার্স ক্যাম্পের আশ্রয় শিবির এসময় নানাভাবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। প্রথমে আয়তনে এটি ছিল বিরাট, আশ্রায়বাসীর সংখ্যাও ছিল পঞ্চাশ হাজার। বিরাটত্বে ধুবুলিয়ার আশ্রয় শিবিরের পরেই তার স্থান। দ্বিতীয়ত, এই আশ্রয় শিবির ভারত সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছিল। সীমান্ত অঞ্চল হতে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার আসত, তাদের প্রথম দিকে এখান হতেই বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে পাঠান হত। পরে আর তা সম্ভব হয় নি, কারণ বিহার ও উড়িষ্যা সরকার যতগুলি পরিবারের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তা পুরণ হয়ে গেলে অতিরিক্ত উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিতে আর তাঁরা আগ্রহশীল ছিলেন না। কাজেই পরে যাদের পাঠান হত, তারা পুনর্বাসনের অপেক্ষায় এখানেই থেকে যেত।

আর একটি দিক হতেও দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। ঘটনাটি প্রায় এক বছর পরে ঘটে থাকলেও এই প্রসঙ্গে তা বলে নেওয়া যেতে পারে: ব্যাপারটি একটি বিভীষিকার রূপ নিয়েই এসেছিল, এসে আশ্রয় শিবিরবাসীদের জীবনকে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। রোগ নয়, মহামারী নয়, খুনে ডাকাত নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, এক অদৃশ্য উপদ্রব এসে আশ্রয়শিবিরবাসী শিশুদের জীবন রীতিমত বিপন্ন করে তুলেছিল।

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তারিখে উপদ্রবের শুরু। রাত অনুমান একটা হবে। শ্রীমনোরঞ্জন দাস ৪২নং নিসেনহাটে সপরিবারে বাস করে। তার মেয়ে মঞ্জুবালার বয়স বছর পাঁচেক হবে। মা-বাবার কাছেই শুয়েছিল। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে তার আতঙ্কিত চিৎকার তার মা বাবা ও প্রতিবাসীদের জাগিয়ে দিল। তারা জেগে দেখে মেয়ে ঘরে নেই। মেয়ের আর্তরব অনুসরণ করে তারা বাহিরে এসে দেখে কোন একটি জন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তারা পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে প্রতিকার করার কিছু থাকল না।

পরের দিন সকালে অনুসন্ধান করে দেখা গেল—আশ্রয় শিবির হতে কিছু দূরে ছোট আগাছার জঙ্গলের মধ্যে মেয়েটির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তার

পেটের খানিকটা অংশ খাওয়া। কোন্ জন্তু যে এই কাজ করেছে কেউ আন্দাজ করতে পারে না। যারা দেখেছে তারা এইটুকু মাত্র বলতে পারে যে অন্ধকারে তারা অস্পষ্ট একটা কালো মূর্তি দেখেছিল; তা বাঘ কি নেকড়ে বাঘ, কি শেয়াল তারা বলতে পারে না। কাজেই কোন হদিস পাওয়া যায় না।

প্রবাদ আছে শেয়াল অনেক সময় ছোট ছেলে ধরে নিয়ে যায়। আশে পাশে জঙ্গল ছিল। শেয়ালও সেখানে থাকে। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে শেয়ালেই এই কাণ্ড করেছে। সুতরাং আশ্রয় শিবিরবাসী যুবকরা সেই জঙ্গলের ভেতর তন্নতন্ন করে শেয়াল খুঁজে বার করে লাঠি পিটিয়ে মারল। শিশুদের এই অজ্ঞাত শত্রুর নিপাত এই পাইকারী হত্যার ফলে যদি ঘটে তা ঘটুক।

কয়েক সপ্তাহ আর কোন উৎপাত নেই। তার ফলে অনেকে অনুমান করতে লাগল যে এই অপরাধের জন্য শেয়ালই দায়ী। কিন্তু আবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে প্রমাণ করে দিল যে শিশুদের এই শত্রুটি শেয়াল নয়, অন্য জন্তু।

৩৮ নং নিসেনহাটে শ্রীনিবারণ মিস্ত্রি বাস করে। তারিখটা ১০ই অক্টোবরের ১৯৫১। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার পুত্র স্তনন্ধয় শিশু, মা তাকে পাশে শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

হঠাৎ সট্‌কা হাওয়ার মত এসে একটা জন্তু সেই শিশুকে তার মায়ের বুক হতে ছিন্ন করে নিয়ে বাইরে ছুটল। মায়ের আর্তস্বরে পিতা প্রতিবাসী সকলে জেগে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যে জন্তুটি শিশুসহ বাহিরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অজানা জন্তু হিংস্র প্রাণীও হতে পারে। সুতরাং বাইরে তার সন্ধান করতে কারও সাহস হয় না।

দেখতে দেখতে পূর্ব দিকের আকাশের জমাট বাঁধা আঁধার ফিকে হয়ে এল। সেই ফিকেভাব ক্রমশ আকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারের ঘনত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষগুলির মনে সাহসেরও সঞ্চার হল। তারা বাহিরে এসে শিশুটির অনুসন্ধান শুরু করে দিল। শিশুটির মৃতদেহ খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগল না। দেখা গেল, অর্ধভুক্ত অবস্থায় তার দেহ পড়ে রয়েছে।

ফলে আশ্রয় শিবিরবাসীর মনে ত্রাস ও আতঙ্কের যে সঞ্চার হল তা বর্ণনাতীত। রোগ যতই মারাত্মক হোক তা নির্ণয় হয়ে গেলে তার সহিত যুদ্ধ করবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। এখানেও তাই। এই শিশুভক্ষক জন্তুটি কি জানতে পারলে তবু তার অনুসন্ধান করা যায়। তাকে মারবারও একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা, আকারে শেয়ালের থেকে বড় এবং সম্ভবত কালো রঙের জন্তুটি যে কি শ্রেণীর জীব তা সঠিক অনুমান করা যায় না। অন্ধকারে যা নিতান্ত ধবধবে সাদা নয়, তাও চোখে কালো দেখায়।

কাজেই ব্যর্থ আক্রোশে আশ্রয় শিবিরবাসীর মন ক্ষুব্ধ হল। এদিকে শিশুদের বিপদের কথা ভেবে মায়েদের মনও সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। আরও শেয়াল খুঁজে খুঁজে পিটিয়ে মারা হয়।

দু-দুটো ঘটনার পর এই আকস্মিক বিপদের খবর সরকারের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে সকলকে রাত্রে সাবধানে থাকবার উপদেশ দেওয়া হল। এই জন্তুটিকে মারবার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। অনেক প্রসিদ্ধ স্থানীয় শিকারী আমন্ত্রিত হলেন। আশ্রয় শিবিরের আশে পাশে জঙ্গলগুলি তোলপাড় করা হল। অনেক শেয়াল বাহির হল, কয়েকটা বন-বেড়ালও দেখা গেল। তাদের মারাও হল। কিন্তু অজানা শত্রু কি নিপাত হল?

এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই পাওয়া গেল। ১৬ই অক্টোবর তারিখে সবার অজানিতে একটি শিশু অপহৃত হল। এখন আর আততায়ী প্রকাশ্যে আসে না। সে আসে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। সে আসে নিঃশব্দ পদক্ষেপে। সে আসে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত থাকে। যে বয়স্ক শিশু চিৎকার করতে পারে, তাকে সে ধরে না। এখন নিতান্ত অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশু তার শিকার। মায়ের পাশ থেকে এমন নিঃশব্দে তাকে টেনে নিয়ে যায় যে সে কখন এল, কখন গেল টের পাওয়া যায় না। পরের দিন সকালে হারান শিশুর মা আবিষ্কার করে পাশে সন্তান নেই। তখন চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়। শিশুটিকে খোঁজা আরম্ভ হয়। কোন দিন শিশুর দেহের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। কোন দিন বা অনুসন্ধানের ফলে বনে বা ঝোপে অর্ধভুক্ত শিশুর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

যে জন্তুটি এই বীভৎস কর্মের জন্য দায়ী সে কি শয়তানের বুদ্ধি ধারণ করে? বয়স্ক শিশুকে ধরলে সে কাঁদে, তার প্রতিবাসীরা জেগে উঠে বাধা দেয়। তাই কি সে বেছে বেছে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য ক্ষীণপ্রাণ শিশু ধরতে আরম্ভ করল? মায়ের কোল থেকে একবার শিশু কেড়ে নিয়ে সে তাড়া খেয়েছে। তাই কি সে এখন এমন সময় নির্বাচন করে যখন সকলে ঘুমে অচেতন? তাই কি সে এখন ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশে শায়িত শিশুকে বেছে টেনে নিয়ে যায়?

যাই হোক শিকারীদের আসা-যাওয়া এবং সকলের মিলিতভাবে সাবধানতা অবলম্বন বোধ হয় তার বিঘ্ন ঘটাল। তার উপদ্রব তুলনায় কমে গেল। কিন্তু সুযোগ পেলে সে উপদ্রব করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ সে শীঘ্রই দিল।

তারিখটা ছিল ২৯শে ডিসেম্বর। ৫৩ নং নিসেনহাটে শ্রীযতীন সর্দার সপরিবারে বাস করে। তার শিশুছেলে নাম সুধাংশু, গভীর রাতে পায়খানা যেতে চাইল। কাছেই যে জলবাহী ড্রেন ছিল, তাতে ছেলেকে বসান হল; কারণ দূরে যে পায়খানা আছে সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয় বিবেচিত

হল। মা পাশে বসে রইলেন। হঠাৎ একটি জন্তু এসে ছেলেটিকে কামড়ে ধরে টানতে লাগল। কিন্তু মায়ের সজাগ দৃষ্টি প্রহরায় রত। সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য ইতর জন্তুও নিজের প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না। মানুষ মায়ের তো কথাই ওঠে না। এত দিনে এই শিশুপ্রাণ-সংহারকারী শয়তানের সহিত সন্তানগতপ্রাণা মাতৃশক্তির শক্তিপরীক্ষা হল।

চক্ষের নিমেষে মা আক্রমণকারী জন্তুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এক হাত ধরল সন্তানকে জড়িয়ে অপর হাত ধরল জন্তুটার গলা টিপে। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য বোধ হয় সে প্রস্তুত ছিল না। শিশুটিকে ছেড়ে দিয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মাতৃশক্তির কাছে এই বিভীষিকা হার মানল। যুদ্ধ করে এই প্রথম আক্রান্ত শিশুকে জন্তুটার মুখ হতে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হল।

এইভাবে জন্তুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল, যুদ্ধও হয়ে গেল, কিন্তু জন্তুটা যে কি তার মীমাংসা হল না। মা এইটুকু বলতে পারলেন যে জন্তুটার রঙটা কালো এবং তার গায়ে বড় লোম আছে। অন্ধকারে উত্তেজনার মধ্যে আর কিছু তো উপলব্ধি হয় নি। কাজেই এই বিভীষিকাসৃষ্টিকারী জন্তুটি যে কি, সে প্রশ্নের সমাধান সেদিনও হল না। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই ঘটনার পর প্রায় আড়াই মাস ধরে আর কোন উপদ্রব হয় নি। হতে পারে আশ্রয় শিবিরবাসী লোকেরা সাবধান হয়েছিল, সেটা তার কারণ। কিন্তু এও হতে পারে যে প্রথম রীতিমত বাধা পেয়ে জন্তুটা অন্তত কয়েক সপ্তাহের মত তার এই অতি জঘন্য প্রবৃত্তিকে আমল দেবার সাহস পায় নি। এটি অবশ্য অনুমান মাত্র, কিন্তু এটিকেই কারণ ভেবে নেওয়া অসঙ্গত নয়।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি হতেই আবার পুরাতন উৎপাত আরম্ভ হল। আক্রমণের রীতিতে সাবধানতা এখন আরও পরিস্ফুট। নিঃশব্দে গভীর রাত্রে সে আসে। নিতান্ত কচি শিশুকে নিয়ে এমন নীরবে পালায় যে কেউ জাগে না, কেউ টের পায় না। তারপর সকাল হলে আবিষ্কার হয় কোন মায়ের কোল হতে কোন শিশু হারিয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আততায়ী এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে তাকে আর দেখা যায় না। কেবল তার অবারিত দৌরাত্ম্য তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আবার আশ্রয় শিবিরবাসীদের মনে নিষ্ফল আক্রোশের বন্যা বয়ে যায়। আবার আশপাশের জঙ্গল তোলপাড় করা হয়। আবার অনেক শেয়াল মারা পড়ে। সরকারের পুরস্কার ঘোষণায় কোন ফল হয় না। সংবাদপত্রে প্রতিকূল মন্তব্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

এবার সরকারের আমন্ত্রণে অনেক পেশাদার এবং সখের শিকারী এসে

জোটেন। কিন্তু যেখানে আততায়ী যে কে সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক খবর পাওয়া যায় নি, সেখানে শিকারের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায় না। অর্জুন প্রতিবিম্ব দেখে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন। গল্পে আছে রাজা দশরথ শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। কিন্তু যেখানে লক্ষ্য যে কি তা জানা গেল না, বা তার শব্দ শোনা গেল না, তাকে বিদ্ধ করা যাবে কি করে?

যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন শিকারী বিভিন্ন অনুমান করে বসেন। কালো রঙ, বড় বড় লোম এবং আকারে শেয়ালের থেকে বড়—এই তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করে অনেকের ধারণা হয় জন্তুটা সম্ভবত হায়না হবে। কিন্তু এ অঞ্চলে হায়না তো বড় একটা দেখা যায় না। অন্য একদল শিকারী চিতাবাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে অনুমান করেন জন্তুটি সম্ভবত চিতাবাঘ হবে। চিতাবাঘ নরখাদক হয় জানা আছে। এখানে সেটা ঘটা বিচিত্র নয়। যেখানে চিতাবাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে সেখানে মাচা বাঁধা হয়। শিকারী তার অপেক্ষায় রাত্রে সেখানে বসে থাকেন, কিন্তু কোন চিতাবাঘের আবির্ভাব হয় না।

এইভাবে প্রায় দীর্ঘ এক বছর কেটে গেল। এই শিশুহত্যাকারী জন্তুটিকে নিপাত করা দূরে থাক তা কোন শ্রেণীর জীব তাই ঠিক হল না। আশ্রয় শিবির-বাসী আর সরকারের সম্মিলিত চেষ্টা এই জন্তুটির চতুরতার নিকট হার স্বীকার করল। অবশেষে একদিন আশ্রয় শিবিরবাসী বালকদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে একটি ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে এই রহস্য ভেদ হয়ে গেল। ঘটনাটি এই :

২৫শে আগস্ট ১৯৫২ তারিখে আশ্রয় শিবিরবাসী কয়েকটি বালক নজর করল যে একটা শুয়োর একটি ছাগলকে আক্রমণ করেছে। ছাগলটিকে উদ্ধার করবার জন্য তারা ঢিল মেরে শুয়োরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। শুয়োরটা তখন আহত ছাগলটিকে ফেলে পালাতে লাগল। তারাও তার পেছনে ছুটল। শেষে দেখা গেল শুয়োরটা এক জমাদারের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এই জমাদার কুপার ক্যাম্পেরই জমাদার, আর শুয়োরটা তারই পোষা।

এই ঘটনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুয়োর নিরামিষাশী জীব, ফলমূল খেয়ে সে জীবনধারণ করে। আমাদের সাধারণ জ্ঞান তো এই কথা বলে। এখানে কিন্তু একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল যে শুয়োর ছাগলকে খাবার জন্য আক্রমণ করেছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতিগত স্বভাব ত্যাগ করে সে অন্য জন্তুকে হত্যা করতে উদ্যত। তবে কি এই জন্তুটা মাংসাশী হয়ে দাঁড়িয়েছে? এ প্রশ্নের তো সমাধান এখানেই হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত হয়ে ছাগলটি তো ইতিমধ্যে মরে পড়ে রয়েছে।

সুতরাং মৃত ছাগলটির দেহ এনে এই শুয়োরটার কাছে স্থাপিত হল। এদিকে মালিক যেমন তাকে বন্ধনমুক্ত করল, সে তখনই ছাগলটির দেহের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে নিতান্ত পেটুকের মত তার মাংস গিলতে লাগল। সুতরাং হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল, এই শুয়োর তার স্বভাবকে অতিক্রম করে জীব-হত্যাকারী এবং মাংসাশী জীবে পরিণত হয়েছে।

তবে কি শিশুদের হত্যা করে সমগ্র আশ্রয় শিবিরে যে জন্তুটি ত্রাস সঞ্চার করেছে, এ সেই জন্তু? ছাগলের দেহের ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে দেখলে হয় তো আলোকপাত হবে। শুয়োরটাকে সরিয়ে দিয়ে অর্ধভুক্ত ছাগলের দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল তার গায়ে যে ধরণের ক্ষতচিহ্ন বর্তমান, অর্ধভুক্ত যে সব শিশুর দেহ পাওয়া গিয়েছিল তাদের দেহেও অনুরূপ ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।

মাংসাশী জীবের চারটি শ্বাদন্ত বেশ বড় হয়। ফলে তাদের ভুক্তাবশিষ্ট দেহে যে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয় তা এক বিশেষ ধরনের হয়। আঘাতের চারটি স্থানে শ্বাদন্ত বড় হওয়ায় ক্ষত অপেক্ষাকৃত গভীর হয়। এখানে কিন্তু ক্ষতচিহ্ন সে ধরনের ছিল না, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটলে যেমন হয়, ক্ষতটা অনেকখানি সেই ধরনের। সুতরাং শিশুদের যে জন্তু হত্যা করেছে, তা শ্বাদন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র পশু নয়।

কাজেই অনুমান করা যায় এই শুয়োরটাই শিশুদের হত্যাকারী। কিন্তু তার মালিক সেকথা স্বীকার করতে চায় না। শুধু তো ক্ষতের চিহ্ন নয়, আরও যে প্রমাণ আছে তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে সুধাংশুর মা যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গেও তো মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন জন্তুটার রঙ কালো এবং গায়ে বড় বড লোম। এই শুয়োরের আকৃতির সঙ্গে তা মিলে যায়। তবু মালিক সে কথা মানতে রাজি নয়। যাই হোক তার ওপর সন্দেহটা এই নূতন ঘটনার ফলে বদ্ধমূল হয়ে রইল। মালিক হাতেনাতে প্রমাণ চায়, কিন্তু তা পাওয়া যায় কি করে?

কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ পরদিনই অভাবনীয়ভাবে মিলে গেল। পরদিন সকালে একটি নলকূপের নিকট কতকগুলি মানুষ স্নান করছিল। কাছেই একটি তিন বছরের শিশু খেলা করছিল। হঠাৎ একটি শুয়োর এসে তাকে আক্রমণ করল। শিশুটিকে উদ্ধার করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধী শুয়োরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। এবার মালিকের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই তাকে হত্যা করা হল।

এইভাবে এই রহস্যের এতদিন পরে মীমাংসা হয়ে গেল। আশ্রয় শিবির পরিষ্কার রাখবার জন্য অনেক জমাদার নিযুক্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ শুয়োর পোষে এবং পালন করে। তাদেরই একটি শুয়োর যে এইরূপ হিংস্র শিশুখাদক জীবে পরিণত হবে তা অভাবনীয়। শুধু তাই? তার আচরণ কি চতুরতাপূর্ণ! আশ্রয় শিবিরেই তার বাস। যাদের ভক্ষ্য হিসাবে সে নির্বাচন করেছিল তারাও তো তার সামনেই দিনের বেলা খেলা করত। অথচ তখন সে তাদের আক্রমণ করত না। সে তাদের আক্রমণ করত অন্ধকারের আবরণে

আত্মগোপন করে। যত বাধা পেয়েছে তত চতুর হয়েছে, তত সাবধান হয়েছে। আশ্রয় শিবিরের মধ্যে বাস করেই আশ্রয় শিবিরের বিভীষিকা হয়ে সে দীর্ঘ এক বছর ধরে তার অত্যাচার চালিয়েছে। এই সব কথা ভাবলে আশ্চর্যের অবধি থাকে না।

(৯)

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে টিটাগড় যেতে পূর্বদিকে অনেকগুলি ফ্যাক্টরীর ছাউনি যেমন হয় সেই ধরনের অনেকগুলি বড় বড় টিনের ছাদযুক্ত ঘর দেখা যায়। এগুলি টেস্টবেঞ্চ বলে বিখ্যাত ছিল। শোনা যায়, যুদ্ধের সময় এখানে যুদ্ধে ব্যবহার্য নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চলত। যুদ্ধের পর সেগুলি খালি পড়ে ছিল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে যখন উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন এগুলি দখল নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে সবগুলি শেডই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে আশ্রয় শিবিরের সংখ্যা বর্ধিত হলে এখান হতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তার কারণ এই সময় এই জায়গাটিকে অন্যভাবে ব্যবহার করবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

যেভাবে এই প্রস্তাবটির উদ্ভব হয়েছিল, তার ইতিহাস একটু বিচিত্র। ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য নানা কুটীর শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন। কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত মালের প্রধান সমস্যা হল তার বিপণনের সমস্যা। তা যত কম মূল্যের পণ্য উৎপাদন করতে পারবে ততই তার বাজারে চাহিদা বাড়বে। এই পথে অনুসন্ধানের ফলে ভারত সরকার একটি জাপানী যন্ত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন যার সাহায্যে পুরাতন কাপড় বা দরজির কাছে পাওয়া ছাঁটা কাপড়ের টুকরোকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করে নূতন সুতো উৎপাদন করা যায় এবং তা ব্যবহার করে নানা পণ্যদ্রব্যও উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

এই যন্ত্রটির নাম ছিল গারাবো যন্ত্র। তার বিভিন্ন অংশে যে কাজ হত তার উদ্দেশ্য হল ছেড়া কাপড় বা দরজির দোকানের অব্যবহার্য ছাঁটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে তাকে তুলোয় পরিণত করা। তারপর সেই তুলো পেঁজে তকলির সাহায্যে তাকে সুতোয় রূপান্তরিত করা যায়। এই যন্ত্রে যে সুতো উৎপাদিত হয় তা বেশ মোটা। তা হতে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তার মধ্যে পড়ে সতরঞ্চি, কার্পেট আসন প্রভৃতি। ঠিক বলতে কি এটি একটি ছোট-খাট কারখানার সামিল।

ভারত সরকার এই যন্ত্রটি কিনে ফেলেছিলেন। এখন এটি আমাদের দান করতে চাইলেন উদ্বাস্তুদের আর্থিক পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহারের জন্য। আমরা এটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কারণ কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে আমরা অনেক

আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল্যাম যাদের এই ধরনের একটি কারখানা খুললে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। টিটাগড়ের শেডগুলি এই কারখানার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে বলে বিবেচিত হয়েছিল। কারণ এখানে রেলপথে এবং রাস্তায় যোগাযোগের ভাল ব্যবস্থা ছিল এবং এ অঞ্চলে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের কাজ দেওয়ার সুবিধা ছিল। কিন্তু সবগুলি শেড দরকার না হওয়ায় ঠিক হল রাস্তার সামনের শেডগুলি এই প্রস্তাবিত কারখানার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং পেছনের শেডগুলিতে অভিভাবক-হীনা মেয়েদের একটি আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হবে।

এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে যাঁর তত্ত্বাবধানে বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ হয়েছিল, তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল অভাবনীয়ভাবে। শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্যের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তিনি সমাজকর্মী ছিলেন। নানাভাবে আমাদের পুনর্বাসনের কাজে তাঁর সহায়তা পাওয়া গেছে। তাঁর উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ এবং প্রচুর কর্মক্ষমতা দেখে ডাঃ রায় তাঁকে পুনর্বাসন বিভাগে বেতনভোগী কর্মী হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে তিনি সরকারী কাজ গ্রহণ করেন। কাজে যোগ দেবার পর তাঁর নানা কুটীর শিল্পের প্রবর্তনের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই কারণে এই পরীক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা তাঁর তত্ত্বাবধানে এই নূতন কারখানার কাজ বেশ ভালভাবেই চলেছিল।

যন্ত্রগুলিকে ঠিকমত সাজানোর জন্য দু'জন জাপানী বিশেষজ্ঞ আনান হয়েছিল। সেগুলি যথাস্থানে স্থাপিত হলে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিযোগে চালানর ব্যবস্থা হলে আরও কয়েক মাস তাঁদের রাখা হয়েছিল যাতে তাঁদের তত্ত্বাবধানে এই যন্ত্রকে চালাতে স্থানীয় কারিগরগণ শিখে নিতে পারে। শিক্ষাপর্ব শেষ হলে তাঁরা চলে যাবার পর স্থানীয় উদ্বাস্তুরাই কারখানাটিকে চালু রেখেছিল।

এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল, যে-বস্তু ফেলে দেওয়া হয়েছে তা হতে নূতন কাঁচা মাল উৎপাদন করা যায়। ছেঁড়া কাপড় বা ন্যাকড়া ফেলে দেওয়া হয়, কোন কাজে লাগে না। সেই রকম দরজির দোকানে জামা বানাতে কাপড়ের টুকরো অনেক ছাঁটা অবস্থায় পাওয়া যায়। তাও কাজে লাগে না। এগুলোকে নূতন করে পিঁজে এই যন্ত্রের সাহায্যে তুলোতে পরিণত করা যায়। তারপর তাকে তকলির সাহায্যে সুতোয় রূপান্তরিত করা যায়। এই পর্যন্ত কাজ যন্ত্র করে। কিন্তু যে সুতো উৎপাদিত হল তা তো ভোগ্যপণ্য নয়, তা উৎপাদক পণ্য। তাকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করতে নূতন ব্যবস্থার দরকার। তবে তো তা বাজারে বিক্রীত হবে। এখানে তাই তার জন্যে অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হল। যে-ধরনের সুতো এই কলে উৎপাদিত হয়, তাতে সূক্ষ্ম কিছু করা যায় না, কিন্তু এর সাহায্যে সতরঞ্চি, কার্পেট, আসন এবং বিছানা ঢাকা দেবার চাদর উৎপাদন

করা যায়। সুতরাং এই পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের তাঁত আনা হল। উদ্বাস্তু যুবকদের বিভিন্ন তাঁতগুলি কেমন করে চালাতে হয় তার শিক্ষা দেওয়া হল। তারপর সেইসব তাঁতে এইসব পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হল। এই পণ্যগুলির বাজারে বেশ কাটতি হয়েছিল।

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য কাজে মেতে গেলেন। তিনি আরও নানা ধরনের কুটীর শিল্প স্থাপন করে তাতে উদ্বাস্তু যুবকদের শিক্ষা দেবার জন্য উৎসাহী হলেন। ফলে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হল। উদ্বাস্তু বালকদের নানা কুটীর শিল্পে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেবার জন্য এখানে নানা শিল্প স্থাপন হল, যেমন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করা, কাঠের কাজ, কামারের কাজ, ছাপাখানার কাজ ইত্যাদি। এতে দু'দিক হতে সুবিধা আছে। যারা এখানে ছাত্রহিসাবে শিক্ষা পেত তারা শিক্ষানবিশীর সময় একটি বৃত্তি পেত। পরে কাজ শিখলে আশেপাশে নানা কারখানায় তার কাজ জুটিয়ে নিত। যতদিন না কাজ মিলত, এখানের উৎপাদন কেন্দ্রেই বেকার বসে না থেকে তারা কাজ করতে পারত।

উদ্বাস্তু পরিবারদের আশ্রয় শিবিরের সমস্যা প্রথমে সমাধান হ'ত সৈন্যদের পরিত্যক্ত ব্যারাক জাতীয় বাড়ি ব্যবহার করে। সেগুলি যখন দুর্লভ হয়ে উঠল তখন স্থায়ী ঘর নির্মাণ করে তাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা কিছুকাল সম্ভব হয়েছিল। তাতেও যখন আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হল না, তখন নূতন নীতি গৃহীত হল। পাইকারী হারে ছোট ছোট তাঁবু কেনা হল এবং খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে তাতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হল। একটি ছোট তাঁবুতে তিন-চার জন শুতে পারে। পরিবার বড় হলে, একাধিক তাঁবু ব্যবহার করতে পারে। আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের আগমন দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকায় তাদের জন্য প্রতি বছর অনেক তাঁবুর দরকার হত। তারপর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যাবার সময়ও তাদের সঙ্গে তাঁবু দিতে হত। কারণ ঘর বানিয়ে তাতে উঠে যাবার আগে পর্যন্ত তাদের এই তাঁবুতেই বাস করতে হত। এইভাবে তাঁবুর জন্য একটা বড় চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল এই টিটাগড় শিল্প কেন্দ্রে তাঁবু উৎপাদন করা যায় না? তাহলে দু'দিক থেকে সুবিধা হয়, প্রথম, নিজেরা উৎপাদন করতে পারলে সস্তায় তাঁবু পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই উৎপাদনের কাজে অনেক উদ্বাস্তু যুবকদের নিয়োগ করা যায়। সুতরাং তাঁবু উৎপাদনের কেন্দ্রও এখানে একটা খোলা হল। তা খুবই সফলতার সঙ্গে চালান সম্ভব হয়েছিল ; কারণ এখানে একটি তৃতীয় সুবিধা ছিল এই যে এর বিপণন সমস্যা বলে কিছু ছিল না। যত তাঁবু উৎপাদন হত, তা আশ্রয় শিবিরের ব্যবহারের জন্য কেনা হয়ে যেত।

এই শিল্পকেন্দ্রকে আরও নানাভাবে উদ্বাস্তুদের সেবায় লাগানর চেষ্টা হয়েছিল। গারাবো যন্ত্রের সাহায্যে যেমন ব্যবহারের অযোগ্য কাপড় হতে

তুলো উদ্ধার করে একটি শিল্প চালান সম্ভব সেই পথে অন্য একটি শিল্প স্থাপন করা সম্ভব মনে হয়েছিল। রেশম উৎপাদন করে গুটি পোকা। কীট অবস্থা হতে পতঙ্গ অবস্থায় পরিণত হবার পূর্বে প্রস্তুতি হিসাবে সে নিজেকে নিজের উৎপাদিত রেশমী সুতোর কুণ্ডলীর মধ্যে ঢেকে ফেলে। তারপর যখন তার পতঙ্গ রূপে পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়, সেই কুণ্ডলীকে কেটে সে বেরিয়ে আসে। যে কুণ্ডলী এইভাবে কাটা হয়ে যায়, তা আর রেশমের বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না। তাই পতঙ্গ অবস্থায় পরিণত হবার আগে গরম জলে তাকে ফেলে তার প্রাণ নাশ করে তার কুণ্ডলীর সুতো সংগ্রহ হয় রেশমের বস্ত্র উৎপাদন করবার জন্য। মানুষের পরকে বঞ্চিত করে বিনাশ করে তার সম্পদ এইভাবে অপহরণ করাই রীতি। কিন্তু এই কীটের ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য যারা রেশম শিল্প চালায় তাদের কিছু সংখ্যক কীটকে পরিণত রূপে বেরিয়ে আসতে দিতে হয়। তারা পরিণত রূপে বেরিয়ে এস ডিম পাড়বে তবেই তো নূতন রেশম উৎপাদক কীট সৃষ্টি হবে।

যত কীট রেশমে নিজেদের আবৃত করে রেশমের কুণ্ডলী সৃষ্টি করে, তাদের এক ভগ্নাংশ মাত্র পরিণত রূপে সেই কুণ্ডলী কেটে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পায়। এই কাটা কুণ্ডলীগুলি রেশম উৎপাদকের কোন কাজে লাগে না। তাদের ইংরেজিতে ওয়েস্ট সিল্ক বলে। এর থেকে চরকার সাহায্যে এক ধরনের রেশমের সুতো বানান যায়। তার থেকে যে থান বোনা হয়, তা নানা পোশাকের জন্য ব্যবহার করা যায়, যেমন পাঞ্জাবি, কোট, ব্লাউজ ইত্যাদি। সুতরাং এই কাটা রেশমের সুতায় বোনা থানের চাহিদা আছে। এখানে কাটা রেশমকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রথমে তা হতে সুতো উৎপাদন এবং তারপর তা হতে থান উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এরও বিপণনের কোন সমস্যা ছিল না।

কুটীর শিল্পের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য আর একদিকেও নজর দেওয়া হয়েছিল। চরকা অতি প্রাচীনকালের জিনিস হলেও এখনও তা জীবিত আছে। বড় বড় মহীরুহের পাশে যেমন ছোট ছোট গাছ টিকে থাকে, এও তেমনি। যন্ত্রচালিত কলে উৎপাদিত সুতোর সঙ্গে তা কখনই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তবু তার একটা সীমিত চাহিদা আছে। হাতে কাটা সুতোয় তাঁতে কাপড় বুনলে তাও বাজারে কাটে। গান্ধীজীর চরকাকে নৈতিক সমর্থন প্রদান এবং খদ্দরের কাপড় ও জামার ওপর মর্যাদা আরোপ তার চাহিদাকে খানিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই অবসর সময়ে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করলে কিছু পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ দরিদ্র পরিবারের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। যারা একান্তই দুর্দশাগ্রস্ত তাদের নিকট সামান্য অতিরিক্ত অর্থেরও বিশেষ মূল্য আছে। এই হল মোটামুটি চরকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য।

এখন চরকার মূল্য আরও বাড়ান যায় যদি তার যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। এই পথে চিন্তার ফলেই পরে অম্বর চরকার উদ্ভাবন হয়েছিল এবং খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় তার প্রচলনও গ্রামাঞ্চলে কিছু হয়েছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করবার জন্য চরকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় কিনা তার একটা প্রশ্ন উঠেছিল। শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই টিটাগড় শিল্পকেন্দ্রে তা নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীহরিশ মিস্ত্রি। তিনি পাকিস্তান হতে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসেন এবং এই কেন্দ্রের কর্মচারী নিযুক্ত হন। তার দক্ষতা ছিল অনন্যসাধারণ। বাষ্পচালিত ক্ষুদ্র আকারের রেল ইঞ্জিন তিনি তৈরি করতে পারতেন। নানাভাবে পরীক্ষা করে তিনি নূতন ধরনের একটি চরকাও উদ্ভাবন করেন। তার উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ চরকার কয়েকগুণ বেশি। তার বৈশিষ্ট্য হল পা দিয়ে তাকে ঘোরান যায়। সুতরাং সুতো উৎপাদনের কাজে প্রয়োজন হলে দুটি হাতই ব্যবহার করা যায়। পা দিয়ে দ্রুতগতিতে চালান সহজ এবং দীর্ঘকাল ধরে সম্ভব। এই দুই কারণে তার উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই চরকার নাম দেওয়া হয়েছিল পুনর্বাসন চরকা। বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে এই চরকা নির্মাণ ক'রে পাঠান হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই শিল্পকেন্দ্রের কাজ দেখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি বিশিষ্ট অতিথি আসলে এই কেন্দ্রটি তাঁদের দেখতে পাঠাতেন। একবার স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে তিনি এই শিল্পকেন্দ্রটি দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তা পরিদর্শন করে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এর জন্য কৃতিত্ব প্রধানত শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মীদের।

(১০)

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বেশ কমে যেতে থাকে। যারা সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আশ্রয়প্রার্থী হত তাদের মাসিক আগমনের হার হতে তা বেশ বোঝা যায়। অক্টোবর ১৯৫০ হতে মার্চ ১৯৫১ অবধি আশ্রয় শিবিরে যত সংখ্যক উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ নিচের তালিকায় পাওয়া যাবে।

মাস		উদ্বাস্তুর সংখ্যা
অক্টোবর	১৯৫০	৮,৭৫৪
নভেম্বর	”	৯,৫৪৩
ডিসেম্বর	”	৬,৫৪৯

মাস		উদ্বাস্তুর সংখ্যা
জানুয়ারি	১৯৫১	৪,৩৯৯
ফেব্রুয়ারি	"	৪,২১৫
মার্চ	"	৫,১১৭

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আশ্রয় শিবিরে পাঠান হয়েছিল ৭৫,৫৯৬ জনকে এবং পরবর্তী ছয় মাসে প্রতিমাসে গড়ে ২৫,৫০০ জনকে পাঠান হয়েছিল। কাজেই এতদিন নূতন আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ এবং নূতন আশ্রয় শিবির খোলার কাজেই উদ্বাস্তু বিভাগের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হত। অকটোবর মাস হতে ত্রাণের কাজ হালকা হয়ে আসায় পুনর্বাসনের কাজে নজর দেওয়া হল।

ওদিকে ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীজৈনও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সে প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল। কারণ যত দীর্ঘকাল আশ্রিত হিসাবে আশ্রয় শিবিরে সক্ষম উদ্বাস্তুদের রাখা হবে ততই তারা পুনর্বাসনের অনুপযুক্ত হবে। প্রথমত দীর্ঘকাল অনিশ্চিত অবস্থায় থাকলে মনের বল ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত পরনির্ভরশীল হয়ে দিনযাপন করা অভ্যাস হয়ে গেলে আত্মনির্ভরশীল হবার ইচ্ছা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। সুতরাং এই প্রস্তাব ডাঃ রায় সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন এবং আমাদের ওপর নির্দেশ এল দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবার। সুতরাং ঠিক হল, ৩০শে এপ্রিল ১৯৫১ তারিখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে যত আশ্রয় শিবির আছে, তার সক্ষম উদ্বাস্তুদের সপরিবারে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

পুনর্বাসন সমস্যাটা এবার বিরাট আকার ধারণ করেছে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। তখন পুনর্বাসনযোগ্য আশ্রয় শিবিরবাসীর সংখ্যা ছিল ৬২,৫০০। প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচটি মানুষ ধরে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৫০০। এবার যে দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা পূর্বের দায়িত্বের অনেকগুণ বড়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২,৫২,০০০ জন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ মানুষ পুনর্বাসনের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল, কারণ তাদের পরিবারের প্রধান হয় বৃদ্ধ বা পঙ্গু পুরুষ বা বিধবা নারী। তাদের বাদ দিলে মোট পুনর্বাসনযোগ্য মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,২২,৪০০। তার অর্থ দাঁড়াল মোট ৪৪,৪৮০টি পরিবারের পুনর্বাসনের ভার আমাদের নিতে হবে। গতবারের তুলনায় তা সাড়ে তিনগুণ বেশি। এদিকে পুনর্বাসনের কাজ তুলনায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সীমাবদ্ধ পরিমাণ যেটুকু উদ্বৃত্ত জমি ছিল তার একটা বড় অংশ পূর্বে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে

গেছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে তখনও পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর সহানুভূতি গভীর ছিল। তাই আমাদের কাজের প্রধান অবলম্বন।

কাজেই আগের বার যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার অতিরিক্ত ব্যবস্থাও এবার করতে হয়েছিল। আগে আমাদের প্রধান নির্ভর ছিল দুটি ব্যবস্থা: প্রথম, খাসমহলের খাস জমিতে পুনর্বাসন এবং দ্বিতীয়, সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা জমিতে পুনর্বাসন। প্রধানত জলপাইগুড়ি জেলাতেই খাসমহলের জমি বেশি ছিল কারণ সেখানে সমগ্র জেলাই ছিল খাস-মহলের অধীন। উত্তরবঙ্গে যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ছিল তার মানুষ এখানে পুনর্বাসন পেয়েছিল।

গতবারের হুকুমদখল করা জমি সংগ্রহে খুব পরিশ্রম করতে হয় নি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হুকুমদখল করা জমি আমাদের অধিকারে ছিল এবং তা হতেই আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় জমি জুটে গিয়েছিল।

হাবড়ার দুটি বড় কলোনি এবং চাঁদমারী অঞ্চলের গয়েশপুর কলোনি আমাদের প্রায় তিন-চতুর্থ জমির প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কেবল চাকদহের সংলগ্ন স্থানে কিছু জমি হুকুমদখল করতে হয়েছিল। এবার কিন্তু আগে হতে হুকুমদখল করা জমি বিশেষ ছিল না। পুনর্বাসনের জন্য নূতন জমি হুকুমদখল করে তবে তাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং নূতন জমি সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শুধু এই কাজের জন্যই পুনর্বাসন বিভাগে একজন ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে যাঁর ওপর এই কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন এক অতি যোগ্য কর্মী। সারা পশ্চিম বাঙলায় কোথায় পতিত জমি পড়ে আছে, তার সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন জেলায় আইন অনুসারে জমি হুকুমদখলের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এই শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ীর উদ্যমে এবং তাঁর সহকারী শ্রীঅবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভূমি সংগ্রহের কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। তার ফলে এই রীতিতেও অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল।

জমির চাহিদা এইভাবে কৃত্রিম কারণে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় জমির মূল্য বাড়বারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সরকার এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং এই সম্ভাবনা নিরোধের জন্য তাঁরা একটি নূতন বিধি বিধান সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এটির নাম পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিধান।[১] এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, জমির দামের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ

১ West Bengal Land Development and Planning Act.
(Act XXI of 1948)

করা এবং দ্বিতীয়, জমি হুকুমদখলের কাজ ত্বরান্বিত করা। প্রথম উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা ছিল যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বা উন্নয়নের কাজে যদি জমি সংগ্রহ করা হয়, তা হলে তার ক্ষতিপূরণ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত মূল্য দিলে চলবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতে তাড়াতাড়ি জমি দখল দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

এই আইনটি প্রয়োগ করবার জন্য একটি বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা ছিল। সে বোর্ডের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী, রাজস্ব বোর্ডের মেম্বার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ প্রভৃতি। এই আইনের বলে সরকারী কাজে ভূমি সংগ্রহের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন বিভাগ এই বোর্ডের নিকট প্রস্তাব স্থাপন করত। সেগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল কিনা বিবেচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার এই বোর্ডের সভা ডাকা হত। ডাঃ রায়ের নির্দেশমত তার কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নি এবং তিনি প্রতি সভায় উপস্থিত থাকতেন। এমনি অক্লান্ত কর্মী মানুষ ছিলেন তিনি।

এখন উদ্বাস্তু বিভাগের জমির ক্ষুধার সীমা ছিল না, কারণ তার প্রয়োজনের শেষ নেই। সুতরাং প্রতি সভাতেই আমাদের বিভাগ হতে অনেকগুলি প্রস্তাব আসত, অর্থাৎ আমাদের বিভাগের প্রস্তাবই তার প্রধানত কাজ জোগাত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এই রকম ঘটেছে। স্বভাবতই তাই নজর করে একটি সভায় প্রশ্ন উঠেছিল আমাদের বিভাগ হতে এত প্রস্তাব আসে কেন। তার উত্তর অবশ্যই বিভাগীয় সচিব হিসাবে আমাকেই দিতে হয়েছিল।

আমি উত্তরে সংক্ষেপে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমাদের প্রয়োজন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব হেতু প্রথমত অত্যন্ত বেশি। দ্বিতীয়ত যতগুলি প্রস্তাব দেওয়া হয় তার অনেকগুলি শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় বাধা খেয়ে পরিত্যক্ত হয়। যে সব পক্ষের স্বার্থে আঘাত পড়ে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে তাদের সম্পত্তিকে এই আইনের আকর্ষণ হতে মুক্ত করতে। প্রভাবশালী পক্ষ হলে তো কথাই নেই, না হলেও নানাভাবে বাধা উপস্থিত হয়।

আমার বক্তব্যকে জোরদার করবার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছিলাম। বলেছিলাম, এ যেন আমের মুকুলের মত, যতগুলি মুকুল ধরে তার এক ভগ্নাংশ মাত্র গুটি অবস্থায় পৌঁছায়; তার পরেও কত আম ঝরে পড়ে যায়; মুকুলের তুলনায় পাকা আম পাওয়া যায় ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ মাত্র।

আমার এই উপমা শুনে ডাঃ রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে কৌতুক করে বললেন, ছেলের কথা শোন একবার। এ যে একেবারে কবির মত কথা হয়ে গেল।

তাঁর কৌতুক বোধ ছিল অসাধারণ। আপিসের নীরস কাজের পরিবেশেও তা এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের কাজের বোঝাকে সহনীয় করে তুলত। এই প্রসঙ্গে আর এক দিনের একটি অনুরূপ কৌতুকপূর্ণ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঠিক প্রকল্পটির কথা আমার মনে নেই তবে যে পরিবেশে উক্তিটি তিনি করেছিলেন তা বেশ মনে পড়ে। রাজস্ব বিভাগ হতেই একটি আদর্শ পল্লী গঠনের প্রস্তাব এসেছিল। তাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেবার এত অতিরিক্ত ব্যবস্থা হয়েছিল যে জমি উন্নীত হয়ে বিলি করবার সময় তার দাম শুধু অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াত না, তাতে এমন কতকগুলি ব্যবস্থার পরিকল্পনা ছিল যা গ্রহণ করলে বার্ষিক পৌনঃপুনিক একটা আর্থিক খরচও এসে পড়ত।

এই প্রকল্পটি আলোচনার জন্য যখন বোর্ডে আসে ডাঃ রায় বলেছিলেন, দেখ বাপু, এমন ভাল ব্যবস্থা কোরো না যা তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। একটা গল্প বলি, শোন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে গল্পটি আমাদের বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই রকম: দুই শরিকের বাড়ি পাশাপাশি। এক শরিকের অবস্থা এখনও ভাল আছে, অন্য শরিকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। যে শরিকের অবস্থা ভাল, তার পুকুরে একদিন জাল ফেলে মাছ ধরা হল। পাশেই শরিক বাস করে। কাজেই তাকেও তো একটা মাছ উপহার দিতে হয়। বাড়ির কর্তার নজর বড়, তাই বেছে বেছে সব থেকে বড় মাছটা পাঠিয়ে দিলেন। অত বড় মাছ পেয়ে শরিকের গৃহিণী গেলেন চটে, কারণ তা ভাজতে যে তেল পুড়বে তা তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত।

ডাঃ রায় গল্পটি শেষ করলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে গ্রাম্য গৃহিণীর নিজস্বভাষা প্রয়োগ করে এই বলে: তখন গিন্নী কি বললে জান। বললে, মিনসের কাণ্ড দেখ। বেছে বেছে এত বড় একটা মাছ আমাকে পাঠাল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই আইনের বলে জমির দখল নিতে আমাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হত। কারণ সরকারের এই বিশেষ আইন প্রয়োগ হলে জমির ক্ষতিপূরণের হার বাজার মূল্য থেকে কম হবে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সেই ক্ষতিপূরণ স্বীকার করা মালিকের পক্ষে শক্ত হত। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও দেখা যায় নি যে তা নয়। তবে এমন মালিকের সংখ্যা নগণ্য। সাধারণ মালিক আইনের আশ্রয় নিয়ে বা শক্তিমান মানুষের সাহায্য নিয়ে নানাভাবে তদ্বির করে জমিকে মুক্ত করতে চেষ্টা করত।

এই সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই চলবে। চব্বিশ পরগণার সদরে সোনারপুর থানার লস্করপুর গ্রামে অনেক পতিত জমি পড়েছিল যেখানে মাটি কেটে ইট বানান হত। এখন আমাদের বিবেচনায় মনে হয়েছিল ইট আরও

দূরে উৎপাদন করলেও চলবে কিন্তু যারা অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু তাদের জন্য কলিকাতার সংলগ্ন অঞ্চলে জমি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ সেখানে পুনর্বাসন পেলে তাদের জীবিকার সমাধান সহজ হয়ে যায়। এই যুক্তির ভিত্তিতেই এখানকার ইটের জন্য ব্যবহৃত জমি হুকুমদখলের জন্য বোর্ড হতে আদেশ বাহির করা হয়েছিল। জমির মালিক যে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন তা সঙ্গেসঙ্গেই প্রমাণ হল। বাধাটা এল আইনগতভাবে আদালত হতে নয়, তদ্বিরের পথে। এমন প্রবল বাধা আমরা খুব কম ক্ষেত্রেই পেয়েছি।

আমার বেশ মনে পড়ে অন্তত কম পক্ষে ছ-বার এই জমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ হতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আপত্তি উত্থাপিত হল। তাঁদের মধ্যে একাধিক জন মন্ত্রী ছিলেন, একজন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। প্রতিবারেই বিভাগীয় সচিব হিসাবে আমার নিকট নির্দেশ আসত বিবরণ দিয়ে একটি নোট দেবার জন্য। বিবরণ দীর্ঘও হয়ে পড়ত। নোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিতেন হুকুমদখলের কাজ অব্যাহত থাক। ফলে আবার কিছুদিন পরে নূতন মহল হতে আপত্তি আসত। আবার আমার নোট দিতে হত। এই অভিনয় অনেক মাস ধরে চলেছিল। শেষকালে মালিকের সূক্ষ্মবুদ্ধির কাছে আমাদের হার মানতে হল। এবার আপত্তি এল নূতন ধরনের যুক্তি দিয়ে। মালিক নাকি খুব প্রগতিশীল মানুষ। তিনি পশ্চিম হতে আমদানি নূতন নূতন প্রক্রিয়ার দ্বারা ইট উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এই জমি হুকুমদখল হলে এই উন্নত প্রক্রিয়ার ইট উৎপাদনের প্রকল্প বানচাল হয়ে যায়। একটি নূতন সম্ভাব্য শিল্পের অঙ্কুরে বিনাশের সম্ভাবনা যুক্তি হিসাবে এমন প্রবল হল যে এইবার তাঁদের আপত্তি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলাম।

সুতরাং মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হুকুমদখল করে পুনর্বাসনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগল। কেবল যেখানে মালিকের সম্মতি আছে সেখানেই এই নূতন আইন প্রয়োগ করে জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল।

সেইজন্য অন্য উপায়ে পুনর্বাসনের কথা ভাবতে হয়েছিল। এমন কোন ব্যবস্থা যদি করা যায়, যেখানে হুকুমদখলের প্রশ্ন উঠবে না এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের ওপর না রেখে স্থানীয় প্রতিনিধির ওপর দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত পুনর্বাসনের কাজ সহজ হয়ে যায়।

এই পথে চিন্তা হতেই ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনার জন্ম হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ছিল এবং প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় পনর-ষোলটি গ্রাম ছিল। এখন প্রতিটি ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের মানুষও যদি সহযোগিতা করে তাহলে দশ হাজার গ্রাম মেলে। প্রতি গ্রাম যদি দুটি পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে কুড়ি হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের

ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই সম্ভাবনা তাকে একটি আকর্ষণীয় পরিকল্পনা করে তুলেছিল। সুতরাং তাকে রূপ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উদ্বাস্তু পরিবারগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার ওপর। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের কাছে হওয়ায় চব্বিশ পরগণার আকর্ষণ। নদীয়া জেলায় ব্যাপক হারে মুসলমান পরিবারদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পড়ে ছিল বলে নদীয়ার প্রতি আকর্ষণ। এই কারণে এই দুই জেলা বাদ দিয়ে অন্য জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের সহানুভূতি ও সভ্যদের সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক ছিল। যেখানে বাস করবার জায়গা সংগ্রহ করবার দায়িত্ব এঁরা গ্রহণ করতেন সেখানেই উদ্বাস্তু পরিবারদের পাঠান হত। এইভাবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পুর্বে উল্লিখিত চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া বাদে বাকি সব জেলাতেই ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। মোট ১৪,০০০ পরিবার এই পরিকল্পনায় পুনর্বাসনের সুবিধা পেয়েছিল। তবে গ্রামগুলি ছড়িয়ে অবস্থিত হওয়ায় এবং পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পুনর্বাসন বিভাগের সংযোগ রাখা শক্ত হওয়ায় অনেক পরিবার পুনর্বাসনের ক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পরে এই পরিকল্পনা অনুসারে আর পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয় নি।

আশ্রয় শিবির হতে দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা সহজ করবার জন্য এই ধরনের আর একটি পরিকল্পনা এই সময়ে গৃহীত হয়েছিল। আইন প্রয়োগ করে জমি হুকুমদখল করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সংহতি হারায়। কাজেই একযোগে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে না। সুতরাং আর এক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল যা এই দুটি দুর্বলতা হতে পুনর্বাসনকে মুক্ত রাখবে। এমন অনেক ভূমির মালিক আছেন যাঁদের অধিকারে এক লপ্তে অনেকখানি জমি আছে। সেই জায়গা যদি উদ্বাস্তুদের পছন্দ হয় তাহলে তারা সোজাসুজি জমির মালিকের কাছ হতে বন্দোবস্ত নিতে পারে। ফলে হুকুমদখলের প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয়ত একসঙ্গে অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন যেমন সম্ভব হয় তেমন আশ্রয় শিবির হতে দ্রুত পরিবারগুলির অপসারণ সম্ভব হয়।

তবে সরকারের দিক থেকে কতকগুলি কর্তব্য এসে পড়ে। এই ধরনের পরিকল্পনা অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের উপযোগী। যারা ব্যবসায় বা শিল্পের ওপর নির্ভর করে তারা এইভাবে পুনর্বাসনের সুবিধা নিতে পারে। সুতরাং ঠিক বলতে কি, এগুলি একটি ছোট উপনগরী পরিকল্পনার সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই জমি সাধারণভাবে সরকারের পক্ষ হতে অনুমোদিত হলে জমির মালিককে

বলা হত আশ্রয় শিবিরে গিয়ে উদ্বাস্তু পরিবারদের কাছে তাঁর প্রস্তাব স্থাপন করতে। উদ্বাস্তুদের নেতারা তখন সেই জমি দেখতে আসত। দেখে পছন্দ হলে সরকার মালিকের স্বত্ব সম্বন্ধে দলিল পরীক্ষা করে দেখতেন। স্বত্ব সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবার পর সরকার একটি নগর পরিকল্পনা রচনা করিয়ে তা অনুমোদন করে দিতেন। তাতে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা, সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য খালি জায়গা, খেলার মাঠ প্রভৃতি রাখবার ব্যবস্থা হত। এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হবার পর নির্বাচিত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুনর্বাসনের স্থানে চলে যেত এবং সরকারের প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে মালিকের কাছ হতে জমির জন্য কোবালা সম্পাদন করিয়ে নিত।

এই পরিকল্পনা অনুসারে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়, চব্বিশ-পরগণা জেলার মেদিয়া অঞ্চলে ও রামচন্দ্রপুরে এবং নদীয়া জেলার তাহেরপুরে আট হাজার পরিবার পুনর্বাসন নিয়েছিল। এদের মধ্যে তাহেরপুর উপনগরী সর্বাপেক্ষা আকারে বড়। এখানে পুনর্বাসনের কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায় নানা আন্দোলনে পরিবারগুলি জড়িয়ে পড়েছিল। সরকারেরও তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করবার জন্য অতিরিক্তভাবে নানা শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সুতরাং এই পরিকল্পনার ফল সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় পরে আর তার ব্যবহার করা হয় নি।

এইভাবে বিভিন্ন পরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকার এই সময় আর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবিরে বাস না করে নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চায় তাদের জন্যও বাস্তুজমি ক্রয়ের ঋণ এবং বাস্তু নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন দেখা গেল তারা অনেকেই এই ঋণের সাহায্যে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিচ্ছে। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ক্ষমতা রাখে। তাদের এদিকে উৎসাহ দিলে ফল ভাল হবে মনে হয়েছিল। তাই এই পরিকল্পনায় আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদেরও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হত তা হল এই: আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের কর্তার ওপরেই এখানে পুনর্বাসনের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করত। কোথায় পুনর্বাসন নেওয়া হবে তা নিজেদেরই ঠিক করতে হত। মালিকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা এবং জমি দখল ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিজের করতে হত। এই পরিকল্পনা সাধারণত কৃষিজীবী আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং জমি নির্বাচিত হয়ে মালিকের সঙ্গে জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা পাকা হলে মালিককে একটি বায়নানামা সম্পাদন করে দিতে হত। স্থানীয় পুনর্বাসন আপিসে সেটি স্থাপিত হলে জমির মালিকের

স্বত্ব পরীক্ষা করা হত। সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে জমি কেনবার ঋণ দেওয়া হত। এসব ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত পরিবার পোষণের জন্য একটি বৃত্তিও দেওয়া হত। এক বছর পরে জমির ফসলের ওপর পরিবারটি জীবিকার জন্য নির্ভর করতে পারবে ধরে নেওয়া হত। এই পরিকল্পনায় মালিকের দেওয়া বায়নানামা দিয়ে কাজ শুরু হত বলে এটির নাম দাঁড়িয়েছিল বায়নানামা পরিকল্পনা। এটির জনপ্রিয়তা আশ্রয়বাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে দিনে দিনে বর্ধিত হয়েছিল। অন্য পরিকল্পনায় পুনর্বাসন যত শক্ত হতে লাগল, বাধ্য হয়েই পরিবারগুলির আকর্ষণ এর প্রতি বাড়তে লাগল।

আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে যারা পুনর্বাসনযোগ্য তাদের পুনর্বাসনের জমিতে পাঠিয়ে দেবার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট হয় ৩০শে এপ্রিল ১৯৫১। অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির ছাড়া অন্য সব উদ্বাস্তু শিবির হতেও উদ্বাস্তু পরিবারদের স্থানান্তরিত করে সেগুলি তুলে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওপরে যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাহায্যে এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ আশ্রয় শিবিরে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হয় নি, তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আর বাকি পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যে ব্যবস্থা তারা নির্বাচন করে নিয়েছিল সেই ব্যবস্থা অনুসারে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কেবল মার্চের শেষ দিকে একটি শ্রেণী উদ্বাস্তু প্রচলিত প্রকল্প অনুসারে পুনর্বাসন নিতে অস্বীকার করেছিল। তারা হল বারুজীবী শ্রেণীর উদ্বাস্তু।

পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের এই সময় দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী শ্রেণী। তার কারণ কৃষিজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হত। কৃষিজীবী পরিবারের শুধু গৃহনির্মাণের জন্য বাস্তু-জমি হলেই চলত না, অতিরিক্তভাবে চাষের জমির প্রয়োজন হত। শুধু তাই নয়, প্রথমবার ফসল উৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত তার চাষের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করা সম্ভব ছিল না। তাই কৃষিজীবী পরিবারের জন্য বাস্তুজমির অতিরিক্ত চাষের জমি দেবার ব্যবস্থা থাকত। পরিবারের কর্তা নিজের চেষ্টায় চাষের জমি সংগ্রহ করলে এই জমি কেনবার ঋণ দেওয়া হত। আশ্রয় শিবির ত্যাগ করবার পর ছয় মাসের খোরাকি দেওয়া হত।

যারা অকৃষিজীবী তাদের জন্য চাষের জমি বা বলদ কেনবার প্রয়োজন থাকত না। তার পরিবর্তে তারা ব্যবসায় ঋণ পেত এবং আশ্রয় শিবির ত্যাগ করবার পর এক মাসের খোরাকি দেওয়া হত। মূলধন খাটিয়ে তারপর তাদের উপার্জন থেকে তারা সংসার চালিয়ে নেবে এই রকম আশা করা হত। গ্রামাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ অল্প ছিল। শহর অঞ্চলে পুনর্বাসন পেলে ব্যবসায়ে ঋণ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হত। সেই রকম শহর অঞ্চলে গৃহনির্মাণ ঋণও বর্ধিত হারে পাওয়া যেত।

অকৃষিজীবীদের মধ্যে বারুজীবীরা পড়ত, কিন্তু তারা ঠিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তারা পান গাছের বরজে পান উৎপাদন করে তা বিক্রয় করে প্রধানতঃ জীবিকা অর্জন করত। পূর্ববঙ্গ হতে যেসব পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় শিবিরে স্থান নিয়েছিল তাদের সংখ্যা তুলনায় অল্প হলেও বেশ কয়েকশত ছিল। তারা বরজের জন্য বাস্তুজমির সংলগ্ন আরও জমি দাবি করেছিল। তারা দলে ভারি না হলেও বেশ সংঘবদ্ধ। তাদের নেতা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্তের নেতা হবার উপযুক্ত অনেক গুণ ছিল। সরকার বরজের জমি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তারা তার থেকে বেশি চেয়েছিল। এক অবস্থায় বরোজের জমির পরিমাণ কত হবে এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা কখনও বিশৃঙ্খল আকার ধারণ করে নি। তিনি নিজেও কিছু দিন এই দাবিকে জোরদার করবার জন্য উপবাস করে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। তবে তিনি যুক্তি-সম্মত প্রস্তাবে সম্মতি দিতে আপত্তি করতেন না। তাঁরই নেতৃত্বে বারুজীবী উদ্বাস্তুরা আশ্রয় শিবির ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে এবং বরজের জন্য বাস্তু-ভূমির সহিত সংযুক্ত অতিরিক্ত জমি দাবি করে।

শেষে এই সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয়ে যায়। কৃষিজীবীদের মত তাদের পরিমাণে বেশি চাষের জমির প্রয়োজন না হলেও পান উৎপাদনের জন্য তো কিছু জমি প্রয়োজন। শেষে ঠিক হয় যে তাদের জন্য বাস্তুজমির অতিরিক্ত আরও দেড় বিঘা জমি বরজ করবার জন্য দেওয়া হবে। এই শর্তে মীমাংসা হয়ে যাবার পরে তারা সরকারের হুকুমদখল করা জমিতে নিজেদের পছন্দমত স্থানে পুনর্বাসন নিয়েছিল। এই জায়গাগুলি প্রধানতঃ নদীয়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত। এইভাবে পুনর্বাসনের শেষ বাধা অপসারিত হবার ফলে নির্দিষ্ট তারিখ ৩০শে এপ্রিল ১৯৫১-এর মধ্যেই পুনর্বাসনযোগ্য প্রায় সকল উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের স্থানে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু রাণাঘাটের কুপারস ক্যাম্প আশ্রয় শিবির তার বড় ব্যতিক্রম। তার কারণ সেখানে যারা আশ্রয় পেত তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর ন্যস্ত ছিল।

এইভাবে পুনর্বাসনের জন্য যত পরিবার কলোনীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল তাদের সকলেই যে সেখানে স্থায়িভাবে বাস করে প্রকৃতভাবে পুনরায় গৃহী হয়েছিল তা নয়। তাদের অনেকের যেখানে পাঠান হয়েছিল সে জায়গা পছন্দ হয় নি বলে চলে এসেছিল। অনেকে চেষ্টা করেও স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করে উঠতে পারে নি বলে পুনরায় উদ্বাস্তু হয়েছিল। মোটামুটি এটা দেখা গিয়েছিল যে যারা কৃষিজীবী তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত হতে পেরেছিল। কিন্তু যারা অকৃষিজীবী তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অর্থনৈতিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে বা যেখানে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার

হয়েছে সে অঞ্চলে অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুরা জীবিকা সংগ্রহ করতে পেরেছিল এবং সে-সব অঞ্চলে পুনর্বাসন স্থান হতে উদ্বাস্তু পরিবার নূতন করে চলে আসে নি।

মনে হয়, পুনর্বাসনে সাফল্য একাধিক জিনিসের ওপর নির্ভর করে। খানিকটা নির্ভর করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ওপর। যেমন চাষীদের ক্ষেত্রে কৃষিযোগ্য জমি এবং অকৃষিজীবীর ক্ষেত্রে ঘনবসতিপুর্ণ শিল্পাঞ্চল যেখানে জীবিকার সহজ সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত খানিকটা নির্ভর করে উদ্বাস্তুর নিজের মনের বলের ওপর। আত্মনির্ভরশীল হবার ক্ষমতা যার আছে, তার পক্ষে আশ্রয় শিবিরের বাহিরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ। যাদের আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস বেশি, তারা আশ্রয় শিবিরে না গিয়েও নিজেকে পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্ষমতা যে রাখে, তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপর পক্ষে যাদের মনে মানসিক বলের অভাব তারা দুর্ভাগ্যকে জয় করবার মত কেউ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না, বাধার সম্মুখীন হলেই নতি স্বীকার করে।

আরও একটা জিনিসের ওপর পুনর্বাসনের সাফল্য নির্ভর করে। সেটা হল পশ্চিমবঙ্গে স্থায়িভাবে বাস করবার ইচ্ছা। এটিও মনোভাবের কথা। যে পরিবার পাকিস্তান ত্যাগ করে এসেছে ফিরে যাবে না এই মনোভাব নিয়ে সে পরিবার যে কোন উপায়ে জীবিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। সেই জন্য আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে সকল অকৃষিজীবী পরিবার আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হলে তা ত্যাগ করে যায় নি। সেখানে তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। তার মূল কারণ হল তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে উৎখাত হয়ে প্রাণভয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করে নি। তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর নিকৃষ্ট নাগরিকরূপে তারা পাকিস্তানে বাস করতে চায় নি বলেই চলে এসেছিল। সেই জন্যেই তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা সফল হয়েছিল। হাবড়ায় কল্যাণগড় কলোনি তার ভাল উদাহরণ।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গার ফলে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেকেরই কিন্তু সে মনোভাব ছিল না। প্রতিকূল ঘটনার চাপে পড়েই তারা চলে এসেছিল, পুর্বপুরুষের ভিটা একেবারে ত্যাগ করবে বলে আসে নি। তারপর যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং উভয় দেশেই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল তখন তাদের দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তার ওপর যখন জওহরলাল নেহেরু ও লিয়াকত আলি খাঁর মধ্যে চুক্তি হল যে উভয় রাষ্ট্রের নীতি হবে উদ্বাস্তুদের যে যার নিজের দেশে ফিরে যেতে উৎসাহ দেওয়া হবে তখন অন্তত রাজনৈতিক দিক হতে ফিরে যাবার পথ সহজ হয়ে গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফিরে পাবার আশ্বাস দেশে ফিরে যাওয়াকে আরও আকর্ষণীয়

করে তুলল। সুতরাং দাঙ্গা যখন চলছিল তখন যদি এ বিষয়ে মন ঠিক না হয়ে থাকে অনেকেরই এই নূতন পরিস্থিতির ফলে ফিরে যাবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠল।

ওদিকে সরকার যারা পশ্চিম বাঙলায় স্থায়িভাবে বাস করতে চায়, তাদের পুনর্বাসনের ঋণ দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং পুনর্বাসনের সুযোগগুলি নিয়ে তারপর দেশে চলে যাবার আকর্ষণও তীব্র হয়ে উঠল। মনে হয় অনেক আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর মনে এই ধরনের মনোভাব ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এটা না ধরে নিলে একটি ঘটনার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না।

অনেক জায়গায় দেখা গেছে আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে পুনর্বাসনের স্থানে চলে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জায়গা ত্যাগ করে চলে গেছে, তাদের কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় না। যাবার আগে তারা কম করে গৃহনির্মাণ ঋণ ও ব্যবসা ঋণ হিসাবে এক হাজার টাকার মত পেয়েছে। গৃহনির্মাণের চেষ্টার কোন চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, অথচ তারা নিরুদ্দেশ হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা সঙ্গত যে তারা সরকারের কাছে উদ্বাস্তু হিসাবে প্রাপ্য আর্থিক সাহায্যগুলি আদায় করে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে গেছে। এখানে থাকবার ইচ্ছা থাকলে পুনর্বাসনে অসফল হলেও তাদের অন্তত ছয় মাস কাল যে আর্থিক সাহায্য তাদের হস্তগত হয়েছে, তারই ওপর নির্ভর করে বাস করা যেত।

এই প্রতিপাদ্যের একটি ভাল সমর্থন মেলে রামচন্দ্রপুর কলোনি হতে। এটি চব্বিশ পরগণার উত্তর অঞ্চলে গাইঘাটা থানায় অবস্থিত। এখানে জমি সংগ্রহ করে আট শ' উদ্বাস্তু পরিবারকে পাঠান হয়েছিল। তারা এই স্থান নিজেরাই নির্বাচন করে নিয়েছিল। অথচ দেখা যায় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবার কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাপক হারে তারা কলোনি পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তারা ঘর তোলবার কোন চেষ্টা করে নি। মাত্র পঞ্চাশটি পরিবার ছাড়া আর সকলেই চলে গিয়েছিল। তাদের আচরণ থেকেই অনুমান করা যায় তারা পুনর্বাসনের জন্য প্রাপ্য টাকা আদায় করবার জন্যেই এখানে এসেছিল। সম্ভবত রামচন্দ্রপুর এই শ্রেণীর মানুষের এত প্রিয় হবার কারণ, তা প্রায় সীমানায় অবস্থিত এবং এই পথে বনগাঁ হয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া খুব সহজ। ফলে রামচন্দ্রপুরের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বিশেষভাবে অখ্যাতির কলঙ্কে লিপ্ত হয়েছিল।

(১১)

১৭ই মার্চ ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ—একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন ত্রিশটি উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামান পুনর্বাসনের জন্য রওনা হয়েছিল। জাহাজঘাটে তাদের বিদায় দেবার জন্যে আমরা হাজির ছিলাম। একদা হয়ত বাঙালী সুদূর সিংহলে গিয়ে

উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। নূতন পরিবেশে বাঙালীর আবার নূতন বাসস্থান সংগ্রহ করতে সমুদ্রযাত্রা করতে হল।

ক্ষুদ্র বাঙলা দেশে পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত সকল উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব নয়, এবিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম হতেই অবহিত ছিলেন। অন্তত পশ্চিম বাঙলার বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্ভব হলে তার সুযোগ যে সম্পূর্ণ নেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। তাতে পুনর্বাসন ত্বরান্বিত হয় না, সরকারের পুনর্বাসন দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিম বাঙলার বাইরে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পাঠানর কিন্তু একটা প্রবল বাধা ছিল। তা উদ্বাস্তুদেরই মনের বাধা। এবিষয় তাদের মনোভাব খানিকটা যে বোঝা যায় না, তা নয়। বাঙালী নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন। তাই প্রবাসে গিয়ে বাস করলেও তার বাঙালী হিসাবে যে বৈশিষ্ট্য তাকে সে ধরে রাখতে চায়। বিহারের কথা ছেড়েই দিলাম। তা অনেক বাঙালীর নিজস্ব মাতৃভূমি, কাজেই সেটা প্রবাস নয়। ইংরেজদের সাম্রাজ্য যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাঙালী ভাগ্যান্বেষণে সেদিকে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। সরকারী কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক—তাঁরা প্রধানত ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার প্রথম যুগে বাঙালী ছিলেন। যে বাঙালী পরিবারগুলি এইভাবে প্রবাসী হয়ে রয়েছে তারা পুরুষাণুক্রমে বিদেশে বাস করেও বাঙালীত্ব হারায় নি। ঘরে বাঙলা ভাষায় কথা হয়, সামাজিক রীতিনীতি আগের মত অক্ষুণ্ণ, বিবাহ বড় একটা অন্য জাতির সঙ্গে হয় না। বাঙলা সাহিত্যের চর্চার জন্য একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানও থাকে। আর নিশ্চিত থাকে একটি কালীবাড়ি। তাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ধর্মজীবন এবং সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা চলে। এবিষয় বাঙালী অনেকটা ইহুদী জাতির মত।

মূলত এই মনোভাবই বাঙালী উদ্বাস্তুর মনে ক্রিয়াশীল হয় বলে তারা পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসন পেতে এত উদ্‌গ্রীব এবং বাহিরে যেতে চায় না। অবস্থার প্রতিকূলতায় বাধ্য হয়ে যদি বাহিরে যায়, তার মন পড়ে থাকে পশ্চিম বাঙলায়। একটু সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করলেই তারা পশ্চিম বাঙলায় ফিরে আসে। অপরিচিত সমাজে অল্প সংখ্যায় গিয়ে স্থায়িভাবে বাস করতে তারা ভরসা পায় না। সেই পরিবেশে তাদের সংস্কৃতিকে তারা বিশুদ্ধ রাখতে পারবে না, এই আশঙ্কা তাদের মনকে পীড়িত করে। মূলত এই কারণে বিহার, উড়িষ্যা বা ভারতের পশ্চিমে অন্য অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

তার ব্যতিক্রম মাত্র দুটি জায়গায় লক্ষিত হয়েছে। এক, উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল জেলা, এবং দুই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। প্রথমটির সাফল্যের কারণ সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর প্রদেশ সরকার হিমালয়ের পাদদেশে

অবস্থিত তরাই অঞ্চলকে অরণ্যমুক্ত করে কৃষিযোগ্য করবার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তরাই অঞ্চলের পরিবেশের সহিত বাঙালী পরিচিত। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অংশ তার অন্তর্ভুক্ত। তার বৈশিষ্ট্য হল সেখানে বারিপাত খুব বেশি। কিন্তু জলনিকাশের ব্যবস্থা করলে নানা ফসল উৎপাদন করা যায়। পাট এই ফসলের অন্যতম।

সুতরাং উত্তর প্রদেশ সরকার এই অঞ্চলে পাট চাষের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু পাট এমন একটি ফসল যার উৎপাদন রীতি বাঙালী, বিশেষ পূর্ব বাঙলার চাষীই ভাল করে জানে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে সব থেকে ভাল পাট উৎপাদন হত পূর্ব বাঙলায়। সেইজন্য উত্তর প্রদেশ সরকার পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তু পাটচাষীদের এখানে নিয়ে গিয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করতে উৎসুক হলেন। আমাদের আশ্রয় শিবিরে এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুর অভাব ছিল না। সুতরাং এবিষয়ে তাঁদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

উত্তর প্রদেশ সরকার যে প্রকল্প রচনা করেছিলেন তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। যেখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের বসান হল সেখানে কেবল বাঙালী পরিবারেরই পুনর্বাসন হল। প্রথম দফায় তাঁরা পাঁচশ উদ্বাস্তু চাষী পরিবারকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় আরও পাঁচশ গেল। সুতরাং এক হাজার পরিবারের একটি বাঙালী উপনিবেশ গড়ে উঠল। বিদেশ হলেও এই ব্যবস্থার গুণে একটি ছোট বাঙালী সমাজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল। এই পরিবেশে বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রইল না। মনে হয় এই কারণেই এখানে যারা পুনর্বাসন পেল তারা রয়ে গেল। নৈনিতাল জেলার কিচ্ছা গ্রামে এইভাবে একটি নূতন বাঙালী উপনিবেশ জন্ম নিল।

আন্দামানে উপনিবেশ গড়ে তোলার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল ছিল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ২০৪টি দ্বীপের সমষ্টি। তাদের মধ্যে তিনটি দ্বীপ বড়—নাম উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান ও দক্ষিণ আন্দামান। ইংরেজদের আমলে উত্তর ও মধ্য আন্দামান দ্বীপ দুটি অরণ্যে আবৃত ছিল। সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের কোন চেষ্টা হয় নি। কেবল দক্ষিণ আন্দামানেই একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এখানেই পোর্ট ব্লেয়ার অবস্থিত। দ্বীপান্তরিত আসামীদের এখানে পাঠান হত বলেই তার অখ্যাতি। কিন্তু ইংরেজদের আমলেই দ্বীপান্তরিত আসামীদের সেখানে পাঠানর রীতি উঠে গিয়েছিল। তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় জেলেই মেয়াদী সময় অতিবাহিত করত।

আন্দামান বিষুব রেখার নিকট অবস্থিত হওয়ায় গ্রীষ্মাঞ্চলে পড়ে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র থাকায় সেখানে খুব গরমও পড়ে না, শীতও পড়ে না। মৌসুমী

অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বারিপাত খুব বেশি। দ্বীপগুলিতে নিচু পাহাড়ও আছে সমতল ভূমির উপত্যকাও আছে। অরণ্য সম্পদ প্রচুর। কোন হিংস্র বন্যজন্তু নেই। কেবল অজস্র হরিণ ও টিয়া পাখী আছে। এখানে যারা আদিম অধিবাসী তাদের জারোয়া বলে। আকার খর্ব, রঙ কালো এবং মাথার চুল কুঞ্চিত। সুতরাং তারা আফ্রিকার নিগ্রোদের, বিশেষ করে পিগমিদের সগোত্র। সংস্কৃতির দিক হতে তারা একেবারেই অনগ্রসর। খাদ্য উৎপাদন করতে তারা জানে না। ফলমূল সংগ্রহ করে, মাছ ধরে এবং পশু শিকার করে তারা জীবন ধারণ করে। শিকার করতে তারা তীর ধনুক ব্যবহার করে। অর্থাৎ সংক্ষেপে এরা এখনও প্রস্তর যুগেই রয়ে গেছে। এরা সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। জঙ্গলে থাকে। এদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে এদের জন্য রক্ষিত এলাকা নির্দিষ্ট করা আছে।

স্বাধীন ভারত সরকার দক্ষিণ আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারের সংলগ্ন এলাকায় নূতন বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের এখানে পুনর্বাসনের সুবিধা দেবার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে প্রায় দুশো উদ্বাস্তু পরিবার এখানে পুনর্বাসনের জন্য প্রথম প্রেরিত হয়। সে দলে যেমন আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু ছিল, তেমন বাহিরের উদ্বাস্তুও ছিল। অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের অকৃষিজীবীও ছিল। প্রথম পুনর্বাসনের চেষ্টা দূর দেশে সাফল্যমণ্ডিত না হলে ভবিষ্যতের চেষ্টায় বাধা পড়ে থাকে। সুতরাং নির্বাচন এমন পরিবারকে করা উচিত ছিল যারা দূরদেশে পুনর্বাসনের উপযুক্ত। আন্দামানে শিল্প গড়ে ওঠে নি, জনসংখ্যাও সামান্য। সুতরাং মধ্যবিত্ত বা অকৃষিজীবী পরিবারের পুনর্বাসন সেখানে সম্ভব ছিল না। মনে হয় পরিবার নির্বাচনে সে দিকটায় ভাল করে নজর দেওয়া হয় নি। তাই পরিণতিতে ফলও আশানুরূপ হয় নি।

এখানে প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য জমি যা বরাদ্দ হয়েছিল তার পরিমাণ সন্তোষজনক। গড়ে দশ একর করে প্রতি পরিবার জমি পেয়েছিল। তবু কিছু অংশ দেওয়া হত নিচে সমতল ভূমিতে, আর কিছু অংশ পাহাড়ের ঢালু গায়ে। নিচু অংশে চাষ করে শস্য উৎপাদন করা যায়। আর উঁচু অংশে ফল গাছ লাগিয়ে ফল হতে একটা আয় করা যায়। কিন্তু জায়গা জঙ্গলাকীর্ণ। সুতরাং রীতিমত কায়িক পরিশ্রম করে জমি পরিষ্কার করে না নিলে তাকে চাষের উপযুক্ত করা যায় না। দ্বিতীয়ত এখানে জীবিকার প্রধান অবলম্বন হবে চাষ করে শস্য উৎপাদন। যারা কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ এই প্রথম অবস্থায় তাদের জীবিকা অর্জনের সম্ভাব্য উপায় বিশেষ ছিল না। বরং উপনিবেশ গড়ে ওঠবার পর দোকান দিয়ে বা শিক্ষকতার কাজ নিয়ে কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষের স্থান হতে পারে। সুতরাং প্রথম দলে অধিক সংখ্যক কায়িক শ্রমে

অনভ্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ পাঠান ভুল হয়েছিল। ফলে অনেকগুলি পরিবার পরে পুনর্বাসনের স্থান ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় চলে এসেছিল। তাদের সংখ্যা প্রায় দেড় শ' জনের মত ছিল। যারা কৃষিজীবী ছিল তারা কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্থায়িভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগী হয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে আমরা যখন ভারত সরকারের কাছে আরও উদ্বাস্তু পাঠাবার অনুমতি চাইলাম, ভাল সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁরা প্রথমে আপত্তি তুললেন প্রথম দলে যারা গিয়েছিল তাদের অনেকে ফিরে আসায় আর পাঠান উচিত হবে না; তা প্রমাণ করে যে বাঙালী উদ্বাস্তুরা অত দূরদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলবার ক্ষমতা রাখে না। উত্তরে যখন বলা হল যারা ফিরে এসেছে তারা কায়িক পরিশ্রমে অপটু এবং নির্বাচনের ভুলের জন্যই এটি ঘটেছে এবং তাতে প্রমাণিত হয় না যে সকল শ্রেণীর উদ্বাস্তুই আন্দামানে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবার অযোগ্য। এ যুক্তিকে তাঁরা একেবারে ঠেলতে পারলেন না এবং উদ্বাস্তুদের আবার আন্দামানে পাঠাতে সম্মত হলেন। কিন্তু যে শর্ত আরোপ করলেন তা আমাদের রীতিমত ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাঁরা বললেন, উদ্বাস্তুদের নিজেদের অর্থে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, ভারত সরকার তাদের এর জন্য কোন আর্থিক সাহায্য করবেন না।

এর উত্তরে কাজেই আমাদের লিখতে হয়েছিল যে ভারত সরকারের মনোভাব যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা সম্ভব নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব বৎসর যতগুলি উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানে গিয়েছিল তাদের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছে। তবে একথাও সত্য যে বেশি সংখ্যক পরিবার রয়ে গিয়েছে। যারা ফিরে এসেছে তারা এই দেশে কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হবার ক্ষমতা রাখত না। সুতরাং নির্বাচনের দোষেই এমন ঘটেছে। কাজেই এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রধানত কঠোর কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত কৃষিজীবী পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখলে যারা যাবে তারা ফিরে আসবে না। যে ত্রুটি ধরা পড়েছে, তা সংশোধন করা সম্ভব।

অপর পক্ষে ভারত সরকার যদি বলেন যে যারা ওখানে যাবে তাদের নিজের অর্থে পুনর্বাসন নিতে হবে তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাঁরা চান না যে ওখানে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তু গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করুক। কারণ, যারা নিজেদের বাসভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সরকারের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, তারা যে নিজেদের অর্থে দূরদেশে গিয়ে পুনর্বাসনের ক্ষমতা রাখে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

এই কঠোর যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ফল ভালই হয়েছিল। ভারত সরকার আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওখানে পুনর্বাসনের আর্থিক ব্যয় বহন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তার ফলে ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা

হতে আন্দামানে যে জাহাজ যাবার কথা ছিল তাতে ৭২টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পাঠাবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হত দক্ষিণ আন্দামানেই। এখানে পোর্ট ব্লেয়ারে এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একদল ছিল যারা এখানে দ্বীপান্তরিত হয়ে মেয়াদ শেষ হবার পর দেশে ফিরে না এসে এখানেই স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেছিল। এখানে আন্দামানের উন্নয়ন ও তার সম্পদের ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার এখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পুনর্বাসনের কাজ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং তার একটি প্রস্তুতিপর্বও আছে। প্রথমত যেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হবে, সেই জায়গা নির্বাচন করা প্রয়োজন। তারপর তার সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ারের সংযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন। তারপর মজুর লাগিয়ে নির্বাচিত স্থান হতে গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই প্রাথমিক কাজ শেষ হলে তবেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। অবশ্য পরে এই নীতি সামান্য পরিবর্তিত হয়েছিল এবং নির্বাচিত জমি তৈরি হবার আগেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হত।

দক্ষিণ আন্দামানে কিন্তু এইভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ সীমাবদ্ধ আকারে বর্তমান ছিল। কারণ আগে হতেই ত্রিশ হাজার মানুষ এখানে বাস করত। তারপর এখানকার আদিম অধিবাসী জারাওয়াদের জন্য একটি অঞ্চল সংরক্ষিত রাখতে হয়েছিল। তাই বেশি সংখ্যায় উদ্বাস্তুদের এখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই কারণেই ফেব্রুয়ারিতে যে দল যায় তাদের সংখ্যা ৭২টি পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। মার্চে যে দল যায়, তাদের সংখ্যা ছিল আরও কম, মাত্র ৩০টি পরিবার।

এর পর ভারত সরকার ব্যাপক হারে উপনিবেশ স্থাপনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপে আর নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা হবে না। উত্তর আন্দামান দ্বীপ সংরক্ষিত বন হিসাবে রাখা হবে। কেবল মধ্য আন্দামানের জঙ্গল কাটিয়ে সেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। এই নূতন দ্বীপে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যখন এগিয়ে এল তখন বেশি সংখ্যায় উদ্বাস্তুদের পাঠান সম্ভব হয়েছিল। তার আগে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত ছোট ছোট দলে যেমন জমি তৈরি হত উদ্বাস্তু পরিবারদের দক্ষিণ আন্দামানের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হত। এই সময়ের মধ্যে আটটি দলে মোট ৩৮৪টি পরিবার এখানে পুনর্বাসন পেয়েছিল।

উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে যেদিন জাহাজঘাটে এনে জাহাজে তুলে দেওয়া হত সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিনে পরিগণিত হত। প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারের কাগজপত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের নিয়ে যাবার জন্য আন্দামানের কমিশনারের

পক্ষ হতে দু-তিন জন অফিসার আসতেন। তাঁরা আমাদের বিভাগের ভার-প্রাপ্ত অফিসারদের নিকট হতে পরিবারগুলির কাগজপত্রসহ তাদের ভার গ্রহণ করতেন। তারপরে ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাদের জাহাজে উঠান হত। জাহাজে ওঠার পর আমরা জাহাজের মধ্যে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখাশোনা করে আসতাম। সঙ্গে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির যারা নেতা তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আসতাম।

এই পরিবারগুলিকে বিদায় দেবার আগে তারা যাতে পুনর্বাসনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ছাড়া তাদের সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও দিয়ে দেওয়া হত। এবিষয় আমরা নির্ভর করতাম প্রধানত আমাদের সহকর্মী শ্রীযশোদাকান্ত রায়ের ওপর। প্রথম যে দল উদ্বাস্তু ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে আন্দামানে গিয়েছিল, তিনি তাদের সঙ্গে গিয়ে কয়েকমাস সেখানে বাস করে এসেছিলেন। সুতরাং তাদের কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে বিষয় তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন এবং তার প্রতিকারের জন্য কি করা দরকার সে বিষয় সব থেকে ভাল উপদেশ দেবার ক্ষমতা রাখতেন।

তাঁর সুপারিশ অনুসারে জঙ্গল পরিষ্কার করবার এবং চাষ করবার উপযোগী একপ্রস্থ যন্ত্র প্রতি পরিবারের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত। যেমন কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল ইত্যাদি। কিছু বাসনপত্রও দেওয়া হত, যেমন বালতি, ঝুড়ি, থালা ইত্যাদি। নূতন এক প্রস্থ করে জামা কাপড় দেওয়া হত। যেসব ফসল গ্রামের গৃহস্থরা বাড়ির উঠানে উৎপাদন করে তার কিছু কিছু বীজ প্রতি পরিবারকে দেওয়া হত। যেমন নানা ধরনের শাক, কুমড়ো, লাউ, ঢেঁড়স, লঙ্কা, বেগুন প্রভৃতির বীজ। তিনি প্রতি সমর্থ মানুষের জন্য একজোড়া ক্যাম্বিশের জুতো সুপারিশ করেছিলেন। এগুলি দান হিসাবে বাটা কোম্পানির কাছ হতে পাওয়া যেত। উদ্দেশ্য এই জুতো পরে তারা জঙ্গল সাফ করতে যাবে। তা না হলে কাঁটা ফুটে পা জখম হবার সম্ভাবনা ছিল।

আরও একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা অভিনব এবং মানসিক বল রক্ষার খুবই সহায়ক। এরা স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে এমন একটি দ্বীপে পুনর্বাসন নিতে যা মাতৃভূমি হতে হাজার মাইল দূরে। দেশের জন্য এক্ষেত্রে মন কেমন করা যেমন স্বাভাবিক তেমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানসিক বল ভেঙ্গে পড়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় এমন কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন যা একাধারে তাদের অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনে সাহায্য করবে এবং মানসিক বল সঞ্চয় করে দেবে। এর জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পিছু একটি খোল এবং এক জোড়া করতাল দেওয়া হবে। শুধু এই সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে কীর্তন করে তারা চিত্ত বিনোদন করতেও পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্তন করে মানসিক বলও আহরণ

করতে পারবে। পুনর্বাসনের সাফল্যের জন্য এটিও যে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার তা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি।

আন্দামানের পুনর্বাসন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর পরে যতবার আন্দামান হতে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তু পরিবারদের পাঠাতে বলা হয়েছে, কোনবারই নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবার পাঠাতে অসুবিধা হয় নি। দেশ হতে অনেক দূরে সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের তার প্রতি আকর্ষণ পশ্চিম বাঙলা ব্যতীত ভারতের অন্য যে কোন রাজ্য হতে বেশি। তার কতকগুলি কারণ ছিল।

প্রথম, যেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন হচ্ছে, সেখানে মানুষের বাস প্রথম আরম্ভ হচ্ছে। সুতরাং সেখানে যারা যাবে তারাই সমাজ গড়ে তুলবে। সে সমাজ নিজেদেরই সমাজ। সুতরাং এতো বিদেশে গিয়ে অন্য মানুষদের সমাজের মধ্যে বাস করা নয়, এ হল নূতন স্বদেশ ও সমাজ গড়ে তোলা। এতে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পুনর্বাসনের অনুকূল হয়, তেমন, নিজের হাতে গড়া নূতন সমাজের মধ্যে বাস করাও তার পক্ষে স্বদেশে বাস করার সমস্থানীয় হয়।

দ্বিতীয়, আন্দামানের যা পরিবেশ তা একাধিক দিক হতে পূর্ব বাঙলার অনুরূপ। সমুদ্রের মাঝখানে মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। কাজেই আমন ধান উৎপাদন করা সহজ। তারপর টিলা আর সমতল ভূমির একত্র সমাবেশ পুর্ব বাঙলারও কোন কোন অঞ্চলে আছে, যেমন চট্টগ্রাম জেলা। সীলেট জেলাতেও অনুরূপ অঞ্চল আছে। এই দুটি স্থানের সঙ্গে আন্দামানের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য প্রচুর। সুতরাং এখানে মন বসবার তা আর এক কারণ।

তৃতীয়, এখানকার জমি উর্বর। দীর্ঘকাল অনাবাদী থাকার ফলে তার শস্য উৎপাদন শক্তি প্রচুর। সুতরাং ধানের ফলন ভালই হয়। অপর পক্ষে জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় সমগ্র জমি চাষ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে আমরা পরে দেখেছি যে, যে-উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে শস্য উৎপাদন করে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের অনেকে নিজেদের জমিতে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করবার জন্য আশ্রয় শিবিরে এসে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্ধান করে গেছে। তাদের প্রতিনিধি জাহাজের সঙ্গে চলে এসে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির হতে বেসরকারীভাবে অনেক উদ্বাস্তু পরিবারকে নিজেদের জমিতে বসাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেছে। ভাগ্য খুব অনুকূল হলে জ্ঞাতি মিলে গেছে, তা না মিললে এক গ্রামের মানুষ মিলেছে, তাও না মিললে অপরিচিত কৃষক পরিবারকে নিতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে নি। এইভাবে বেসরকারী রীতিতেও অনেক উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামান স্বেচ্ছায় গিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছে। তারা সরকারের নিকট এ বিষয় কোন সাহায্যের অপেক্ষায় থাকে নি।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের চেষ্টায় পুনর্বাসনের যোগ্য বড় আকারের কৃষিযোগ্য জমি পশ্চিম বাঙলায় বড় একটা রইল না। যে-জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে, তাকে সংস্কার করে চাষের উপযোগী করে যদি জমি পাওয়া যায় তবেই তা সম্ভব হয়। তা হতে পারে দু'টি উপায়ে। প্রথম সেচের সাহায্যে জলমগ্ন জমি হতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে তাকে উদ্ধার করা। তার সম্ভাবনা ছিল সীমাবদ্ধ। চব্বিশ পরগণার কিছু অংশে মাত্র এমন জমি ছিল। আর এক সম্ভাবনা অনাবাদী ডাঙ্গা জমিকে উদ্ধার করে পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা। এর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর; কারণ বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে, বীরভূম জেলায় ও বাঁকুড়া জেলায় এমন ধরনের প্রচুর অনাবাদী জমি পড়ে আছে। তাদের যদি সংস্কার করে চাষের উপযোগী করা যায় ভূমির সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় পথেই সমস্যা সমাধানের কথা আমাদের প্রথমে মনে হয়েছিল। কারণ, সে পথ যদি সফল হয় তা হলে পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আরও ব্যাপক হারে সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে এমন একজন উদ্বাস্তু দরদী জন-নেতা যাঁর পরামর্শ নির্ভরযোগ্য হবে তাঁর উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।

এই সময়ে ভাগ্যক্রমে আমরা এমন একটি বিস্তৃত জমির সন্ধান পেয়ে গেলাম যা অনাবাদী পড়ে রয়েছে। জমির মালিকও আমাদের সে জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জায়গাটির অবস্থিতিও এক দিক হতে পুনর্বাসনের অনুকূল ছিল। আসানসোল মহকুমার উত্তর-পূর্ব দিকে এই জায়গাটি অবস্থিত। গ্রামের নাম সালানপুর। চিত্তরঞ্জনের আগের রেল স্টেশন রূপনারায়ণপুর হতে দু' মাইলের মধ্যে। কাজেই যোগাযোগের ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু তার মূল আকর্ষণ হল কাছেই বিরাট চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন উৎপাদনের কারখানা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে পশ্চিম বাঙলার এই প্রান্তে ভারত সরকার এই কারখানাটি স্থাপন করেছিলেন। এখানে সহস্র সহস্র কর্মী বাস করবে। সুতরাং ক্ষেতের ফসল উৎপাদন করলে বা গরু পালন করলে বা হাঁস মুরগী পুষে ডিম উৎপাদন করলে, তার বিপণনের এখানে কোন সমস্যা থাকবে না।

চিত্তরঞ্জনের ঠিক পাশেই ভারত সরকারের আর একটি বড় কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেটি হল বার্তা প্রেরণের তার উৎপাদন করার কারখানা। তার ফলে জায়গাটি অদূর ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা ছিল।

তৃতীয়তঃ জায়গাটির আর এক বড় আকর্ষণ হল এখানকার স্বাস্থ্য ভাল। আমরা জানি যে জায়গাটিতে এখন রেল ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপিত হয়ে দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশের স্মরণে চিত্তরঞ্জন নাম রাখা হয়েছে, সেই জায়গাটির পূর্বের নাম ছিল কর্মাটোর। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে তার খ্যাতি ছিল এবং মধুপুর গিরিডির মত এখানেও বিত্তবান মানুষ বায়ু পরিবর্তন করতে আসত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই স্থানটি ভারি প্রিয় ছিল। এখানে বাস করবার জন্য তিনি একটি বাগানবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্রামের প্রয়োজন হলে এখানে তিনি চলে আসতেন। এই কারণেই কতকগুলি উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত পরিবার এই জায়গাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রান্তপল্লী নাম দিয়ে একটি কলোনি স্থাপন করেছিলেন।

যে জায়গাটি আমরা পেয়েছিলাম তা এই দু'টি কারখানার সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার জমিতে মৃত্তিকার অংশ এমন ক্ষয় হয়ে গেছে যে এক পলাশ গাছ ছাড়া আর কোন গাছই জন্মায় না। যে নদীটি এই অঞ্চলে প্রবাহিত তা মাটির ওপর গভীর খাদ কেটে ক্রমশ নিচে নেমে গেছে। তার সংলগ্ন অপ্রশস্ত তীরে কিছু পলিমাটি পড়ায় সেখানে কিছু কিছু ধান উৎপাদন হয়। অন্য জায়গায় কোন ফসল উৎপাদন হয় না। জমি পাথরের কুচি, বালি আর রাঙা মাটি দিয়ে ভরা। বর্ষাকালে তার ওপর যে ঘাস জন্মায়, শীত এবং গ্রীষ্মকালে তা পুড়ে গিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করে। বর্ষার সময় জল পেয়ে তা সবুজ রঙ ফিরে পায়।

এই ধরনের জমিকে উদ্ধার করে যে চাষের উপযোগী করা যায় না কৃষি-বিশেষজ্ঞ সে কথা বলেন না। তাঁদের মতে তা করা যায়, তবে তা ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। এদিকে আমাদের যখন সহজে চাষ করা যায় এমন জমি পশ্চিম বাঙলায় পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে, তখন ব্যয়সাধ্য হলেও তা ফেলে দেবার মত জিনিস নয়। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়শিবিরে তো দীর্ঘকাল কিছু কাজ না দিয়ে সাধারণত বসিয়ে রাখা হয়। তাদের দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে যদি এই জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহলে খানিক ব্যয়ের অংশ উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণের জন্য যে আর্থিক বরাদ্দ আছে তা হতে নির্বাহ হতে পারে। সেটাও একটা আকর্ষণ।

উদ্বাস্তু দরদী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। তার বিভিন্ন সমস্যা এবং তার কাজে অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত থাকবার জন্য তিনি ডাঃ রায়ের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করতেন। কলিকাতায় আসলে আমার সঙ্গেও তিনি এবিষয় আলোচনা করতেন। আলোচনার বিষয় বেশি থাকলে তাঁর বাড়িতে গিয়েই আলোচনা করে আসতাম। এই বিষয়টি নিয়েও তাঁর সহিত আলোচনা করে এসেছিলাম। তিনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করে আমাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে যখন এদিকে সম্ভাবনা আছে অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করে দেখা একান্তই

উচিত। যদি পরীক্ষা সফল হয় পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্র অনেক বিস্তার লাভ করবে।

বলা বাহুল্য প্রস্তাবটি যখন ডাঃ রায়ের নিকট স্থাপিত হল তিনি তার অনুমোদন করলেন। তাঁর মত হল পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চয় সালানপুরের জমি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে কৃষিযোগ্য করবার ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং এবিষয় আমরা কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞের সাহায্যে পরিকল্পনা রচনার ভার নিলাম।

এখানকার জমির দোষ হল দু'টি। প্রথমত এ জমিতে বালির ভাগ বেশি থাকায় তা জল ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়ত তাতে উদ্ভিদের দু'টি মূল খাদ্য নাইট্রোজেন এবং ফসফেট উপযুক্ত পরিমাণে নেই। সুতরাং তাকে কৃষির উপযোগী করতে হলে তার এই দুটি দোষ খণ্ডনের ব্যবস্থা করতে হয়।

সুতরাং কৃষি বিশেষজ্ঞ যে পরিকল্পনা রচনা করলেন তাতে এই দু'টি বিষয়ে জোর দেওয়া হল বেশি। জমির জল ধরে রাখবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমগ্র জায়গার উচ্চনীচতার ভিত্তিতে একবার জরিপ (যাকে বলা হয় কনটুর সার্ভে) করে নেওয়া হল। তারপর বিভিন্ন উচ্চতম স্থানকে কেন্দ্র করে তার চারি-পাশের জমি কেটে সমান স্তরে আনা হল এবং এইভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ির আকারে সমতলভূমি বানান হল। এর ফলে সিঁড়ি ভাঙা চাষ (যাকে বলা হয় টেরাস কালটিভেশন তা) সম্ভব হবে। প্রতি থাক জমির প্রান্তে একটি করে বাঁধ দেওয়া হল। একে ইংরাজি পরিভাষায় বলে কনটুর বাণ্ডিং। এর উদ্দেশ্য জমিতে যে বৃষ্টির জল পড়বে বা সেচের জল দেওয়া হবে তা এই প্রান্তিক বাঁধ ধরে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে উপযুক্ত স্থানে পুকুর কাটার ব্যবস্থা হল, যাতে বর্ষার জল তাতে ধরে রেখে শীতের সময় তা হতে সেচের জল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

এইভাবে জমিকে চাষের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে এবং মাটিতে জল ধরে রাখবার ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হল। উদ্ভিদের যে খাদ্যের প্রধানত অভাব হয় তা হল নাইট্রোজেন ও ফসফেট। ভূমিতে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করবার সহজ উপায় হল এমন কতকগুলি ফসল উৎপাদন করা যারা নাইট্রোজেনকে জমিতে সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা রাখে। এক শ্রেণীর উদ্ভিদের সে ক্ষমতা আছে। তারা হল সুটি জাতীয় উদ্ভিদ। এদের ফল কড়াইসুটির ধরনের হয়। ধনচে, শন, এই শ্রেণীর গাছ। মাটির তলায় এদের শিকড়ে জীবাণু নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে রাখতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জমিতে বুনে তা যখন বড় হবে তাকে যদি লাঙল দিয়ে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা দু'ভাবে তার উর্বরতা বৃদ্ধির সাহায্য করতে পারে। প্রথমতঃ তার শিকড়ে যে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হয় তা জমিকে উর্বর করবে। দ্বিতীয়ত, ওই গাছগুলির

দেহ পচে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে অনুরূপভাবে মাটির পুষ্টিসাধন করবে। একে তাই সবুজ সার বলা হয়। এই প্রথাগুলি প্রয়োগ করেই এই ধরনের অনুর্বর বালুকাময় জমিকে শস্য উৎপাদনযোগ্য করা যায়।

এখানে সেই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছিল। যে জমি কেটে সমান করে সীমানায় বাঁধ দিয়ে চাষের উপযুক্ত করা হয়েছিল তাতে প্রথমতঃ ধনচে এবং শন গাছ উৎপাদন করা হয়েছিল। সেই গাছগুলি খানিকটা বাড়ার পর লাঙল দিয়ে চষে তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর প্রকৃত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পরীক্ষামূলক চেষ্টায় দেখা গিয়েছিল যে এখানে বর্ষায় যেমন ফসল উৎপাদন করা যায় তেমন শীতকালেও বিলাতি সবজি উৎপাদন করা যায়। এখানে এইভাবে কপি ও আলু উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছিল।

ডাঃ রায় এই পরীক্ষায় বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং এর সম্বন্ধে সব সময় খবর নিতেন। কারণ এই পরীক্ষার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী ছিল। যদি এই ভাবে অনুর্বর জমিকে কৃষিযোগ্য করা যায় তাহলে শুধু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহজ হয় না, খাদ্য সমস্যারও আংশিক সমাধান হয়। একবার তিনি নিজে গিয়ে ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থার কাজ দেখে এসেছিলেন। এমন কি পুকুর খোঁড়ার কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষের কাছ হতে বুলডোজার ধার করে এনে এই কাজে লাগিয়েছিলেন।

এই পরীক্ষামূলক কাজে শ্রমিক হিসাবে কেবল আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদেরই ব্যবহার করা হয়েছিল। এর আগে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় যেসব সুস্থদেহ বয়স্ক পুরুষ আশ্রয় শিবিরে অপেক্ষা করত তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সাপ্তাহিক ডোলের ব্যবস্থা ছিল। তাদের কোন কায়িক পরিশ্রম করবার দায়িত্ব ছিল না। এই পরিকল্পনায় এই ধরনের সমর্থ উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করা দুই কারণে প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল। প্রথমত সমর্থ হয়েও বসে না থেকে কায়িক পরিশ্রম করে তারা উপার্জন করবার সুযোগ পাবে এবং ফলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বাড়বে। দ্বিতীয়ত যে জমি কায়িক পরিশ্রম করে নিজেরা চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলবে সে জমির প্রতি আকর্ষণও তাদের বাড়বে। পুনর্বাসনের পর কলোনি ত্যাগ করে চলে আসবার ইচ্ছা হবে না। তাদের কায়িক পরিশ্রমের প্রতি আকর্ষণ বাড়াবার জন্য এমন ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে শুধু ডোলের ওপর যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত, কায়িক পরিশ্রম করলে তার থেকে আয় বেশি হত। বেশি পরিশ্রম করতে পারলে আরও বেশি আয়ের সম্ভাবনার পথও খুলে রাখা হয়েছিল।

একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ করে এই অনাবাদী পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম,

অপর দিকে যাদের এখানে এসে ভূমি উন্নয়নের কাজে লাগান হয়েছিল, তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিরাশ করেছিল। উদ্বাস্তু কৃষিজীবীরা গতানুগতিক পথে পরিচিত পরিবেশে কাজ করতেই অভ্যস্ত, কিন্তু পরিবেশ অপরিচিত হলে বা নূতন রীতি প্রয়োগ করতে হলে, একটা মানসিক অসহযোগিতার ভাব তাদের আচরণে ফুটে উঠত। কালনা, কাটোয়া অঞ্চলে পতিত ডাঙ্গা জমিতে এই উদ্বাস্তুরাই সাফল্যের সঙ্গে পাট উৎপাদন করে আমাদের দেশের পাটের চাহিদা পূরণ করেছিল। কারণ, সে ধরনের জমি এবং পরিবেশের সঙ্গে তারা পরিচিত এবং পাটচাষের রীতিও তাদের অভ্যস্ত। এখানকার পরিবেশ ভিন্ন রকমের হাওয়ায় তাদের এখানে মন বসত না। প্রথমত জমি এখানে সমতল নয়, উন্নত অবনমিত ঢেউ খেলান জমি। দ্বিতীয়ত, এ জমিতে পলিমাটির অংশ কম, বালি আর রাঙা মাটির অংশ বেশি। তৃতীয়ত, এদেশের আবহাওয়া ভিন্ন। পূর্ব বাঙলার প্রচুর বৃষ্টি এবং বারিকণামিশ্রিত স্যাঁতসেঁতে বাতাস এখানে মিলবে না। এখানে গরমের দিনে বাতাস শুকনো এবং ঘাম বড় একটা হয় না। এর জন্য তারা অস্বস্তিবোধ করত। সুতরাং এখানে পুনর্বাসন নিয়ে স্থায়িভাবে বাস করতে তারা চাইত না।

তারপরে যে রীতিতে উর্বর জমিতে চাষ করতে তারা অভ্যস্ত সে রীতি প্রয়োগ করা চলবে না। জমিকে চাষের উপযুক্ত করে নিতে এবং জল ধরে রাখতে অনেক অপরিচিত রীতি অবলম্বন করতে হয়। তাতেও তাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যেত না। কাজেই কোন চাষী পরিবারকে এখানে পুনর্বাসন গ্রহণ করতে সম্মত করান যায় নি। কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি অকৃষিজীবী পরিবার নিকটবর্তী বড় কারখানা দুটিতে কাজ পাবার আশায় এখানে রয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে প্রধানত উদ্বাস্তুদের মানসিক অসহযোগিতার কারণে এই পরীক্ষা সফল হয় নি। সুতরাং এই পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা আমরা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই জমিকে পরে প্রধানতঃ আশ্রয়শিবির হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এই পরীক্ষা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তা স্পষ্ট-ভাবে দেখিয়ে দিল যে পরিচিত অভ্যস্তপথেই উদ্বাস্তু কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন সম্ভব, অপরিচিত পথে নয়।

(১৩)

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে যে সব উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিম বাঙলা সরকার পরিচালিত আশ্রয় শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যে পুনর্বাসনের স্থানে পাঠানোর প্রতিক্রিয়া পশ্চিম বাঙলায় নূতন সমস্যা সৃষ্টি করল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে যখন ব্যাপক হারে উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হয়, তখন ভারত সরকারের অনুরোধে উড়িষ্যা ও

বিহার সরকার যথাক্রমে পঁচিশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তুর আশ্রয় শিবিরে স্থান দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে যখন ভারত সরকার এই সকল আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, এই দুই সরকারেরও তাঁদের তত্ত্বাবধানে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ছিল তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। কিন্তু ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের মে অবধি এ বিষয় কোন ব্যবস্থা হয় নি।

অপর পক্ষে পশ্চিম বাঙলা সরকারের আশ্রয় শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ৩০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে স্থানান্তরিত হল। এই খবর মানুষের মুখে বা চিঠিতে ওই দুই রাজ্যের শিবিরগুলিতে প্রচারিত হবার ফলে, ওখানকার উদ্বাস্তুদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ওখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বিলম্বিত হবার ফলে, পশ্চিম বাঙলায় ফিরে গেলে পশ্চিম বাঙলা সরকার তাদের ভার নিতে বাধ্য হবে এবং ফলে তাদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত হবে। অপর কারণেও সম্ভবত পশ্চিম বাঙলায় প্রত্যাবর্তন তাদের নিকট আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তার ফলে তারা সম্ভবত পশ্চিম বাঙলাতেই পুনর্বাসন পেয়ে যাবে এবং তাহলে বিহার বা উড়িষ্যা রাজ্যে অপরিচিত মানুষের মধ্যে তাদের বাস করতে হবে না এমন কথাও তাদের মনে উদয় হয়ে থাকবে।

এই মনোভাবের পেছনে আরও একটা কারণ আছে। সেটি বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণের সাহায্যে সেটি বোঝাতে চেষ্টা করা যেতে পারে। অনেক সময় এমন ঘটে যে একই পরিবারে দুই ভাই আছে। তারা বড় হয়ে, ধরা যাক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। পরে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের একজনের চাকুরি যায়, সে বাধ্য হয়ে অপর ভায়ের আশ্রয় নেয়। সে ভাই-এর একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এই ধারণা এখানে সক্রিয় থাকে। এখন যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হল সে ভাইএর যদি আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হয়, সে বলতে পারে তুলনায় যদি দূর সম্পর্কের কোন অবস্থাপন্ন ভাই থাকে তার কাছে আশ্রয় নিতে। যে ভাইএর চাকরি গেছে, সে হয় তো প্রথমে রাজী হবে না, কিন্তু বেশি পীড়াপীড়ি করলে যাবে। সেখানে গিয়ে সেই দূর সম্পর্কের ভাইএর কাছে যদি এতটুকু অবহেলা পায়, সে কিন্তু তার আশ্রয় ত্যাগ করে সোজা আপন ভাইএর কাছে চলে আসবে। অপর পক্ষে নিজের ভাইএর আশ্রয়ে গঞ্জনা সহ্য করেও সে থাকতে প্রস্তুত আছে, কারণ তার বিবেচনায় সেখানে থাকা তার অনেকটা জন্মগত অধিকারের সমস্থানীয়।

মনে হয় উদ্বাস্তু ভাইদের মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব ক্রিয়াশীল। পশ্চিম বাঙলার মানুষকে তারা নিজেদের ভাইএর মত মনে করে, আর উড়িষ্যা আর বিহারের মানুষকে দূর সম্পর্কের ভাইএর মত দেখে। সুতরাং পশ্চিম বাঙলায়

পুনর্বাসনের প্রতি তাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এখানকার সরকারের তাদের প্রতি ঔদাসীন্য বা এখানকার মানুষের তাদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ তাদের পশ্চিম বাঙলার প্রতি আকর্ষণকে শিথিল করে না। উড়িষ্যা বা বিহারে তারা পাঠালে যায় এবং পুনর্বাসনের সুযোগ দিলে তার ব্যবহার করতে প্রস্তুতও থাকে, কিন্তু এতটুকু ঔদাসীন্য বা অবহেলা দেখলে তাদের মন ভেঙে পড়ে এবং সোজা পশ্চিম বাঙলায় ফিরে আসতে চায়।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি এই মনোভাব উদ্বাস্তুদের অন্য রাজ্য হতে ব্যাপক হারে ফিরে আসার মুখ্য কারণ। পরে উড়িষ্যা বা বিহার সরকার তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করেন নি তা নয়। তবু সামান্য ভুল বা ত্রুটি লক্ষিত হলেই উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাঙলায় ফিরে এসেছে। অথচ পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসনের ত্রুটি হলে সাধারণত তারা উপনিবেশ ত্যাগ করে না, আন্দোলন করে ত্রুটি সংশোধন করিয়ে নেয়। অন্য রাজ্য ছেড়ে যারা চলে এসেছে তাদের দলপতিদের কেন চলে এসেছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়, ওরা যে আমাদের চায় না। এক রকম অভিমান করেই তারা চলে আসে।

যদি বলা হয়, পশ্চিম বাঙলায় যেমন তাদের পুনর্বাসনের অধিকার আছে, অন্য রাজ্যেও আছে, কারণ সব দেশই তো ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, তারা সোজা উত্তর দেয় ওরা তো আমাদের আপন ভাইএর মত নয়।

সুতরাং এইভাবে নানা কারণে পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবির হতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে খবর রটবার ফলে, ওই দুই রাজ্যে অবস্থিত উদ্বাস্তু শিবিরগুলির উদ্বাস্তুদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। তারা দলে দলে আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে রেলপথে পশ্চিম বাঙলায় রওনা হল। ফলে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হল; হাওড়া স্টেশন আশ্রয় শিবির-ত্যাগকারী উদ্বাস্তু পরিবারে ভরে গেল। এদিকে পশ্চিম বাঙলা সরকার এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে বসে থাকতে পারেন না। এই পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁদের এগিয়ে যেতে হয়।

যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ফিরে এসে সরকারের ওপর নির্ভর করতে চায় নি, তাদের সম্পর্কে কোন সমস্যা ছিল না। যারা সরকারের আশ্রয় চায় তারা হাওড়া স্টেশনে অস্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করল। না খেতে দিলে তারা উপবাসে মরবে। সুতরাং কিছু করতে হয়। ডাঃ রায় তাদের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করলেন। তাদের সাময়িক সাহায্যের ব্যবস্থার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করলেন। সুতরাং সেখানে যত উদ্বাস্তু পরিবার জমা হল, তাদের একটা হিসাব নেওয়া হল। তারা প্রকৃত উদ্বাস্তু কিনা, তারা কোন আশ্রয় শিবির হতে চলে এসেছে—এই সব খবর সংগ্রহ করার পর তাদের মধ্যে সাপ্তাহিক হারে ডোল দেবার ব্যবস্থা হল। এ বিষয় ভারত সরকারের পূর্ব

হতে সম্মতি নিতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। ততদিন তো এদের উপবাসে রাখা যায় না। সুতরাং পশ্চিম বাঙলা সরকার নিজেদের দায়িত্বেই এই ব্যবস্থা করলেন।

পরে এদের সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তার প্রশ্ন উঠল। হাওড়া স্টেশনে তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের ফেলে রাখা যায় না। অনেক আলাপ আলোচনার পর ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত করলেন যে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় তাদের একটি পৃথক আশ্রয় শিবিরে স্থান দেওয়া হবে এবং যেহেতু তারা আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে এসেছে, তাদের জন্য ডোলের পরিমাণ শাস্তি হিসাবে কিছু কমিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় এদের আপত্তি ছিল না। পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসনের সুযোগ লাভের জন্য তারা কিছু মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল।

পশ্চিম বাঙলার আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পাঠানর যে প্রতিক্রিয়া এইভাবে উড়িষ্যা ও বিহারের উদ্বাস্তুদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, পশ্চিম বাঙলায় অবস্থিত কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়ে পড়ল। এই আশ্রয় শিবিরটি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁদের নিজস্ব পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তবে এই রকম একটা বোঝাপড়া ছিল যে অন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যে পশ্চিম বাঙলার বাহিরে এখানকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হবে। এই উদ্দেশ্যেই এখানকার উদ্বাস্তুদের উড়িষ্যা ও বিহারের আশ্রয় শিবিরে পাঠানর ব্যবস্থা ছিল।

এখন এখানকার উদ্বাস্তুরাও পুনর্বাসনের জন্য তাগিদ দিতে লাগল। এই জন্য তারা আন্দোলন করবারও ব্যবস্থা করল। কিন্তু এ আন্দোলন তো ঠিক পশ্চিম বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে করা যায় না, কারণ তাদের সম্বন্ধে তো সে সরকারের কোন দায়িত্ব সোজাসুজি ছিল না। এ আন্দোলন এমনভাবে করতে হবে যাতে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। শেষকালে নাটকীয়ভাবে সে আন্দোলন এক অভাবিতপূর্ব রূপ নিল।

সেদিন ছিল ২৭শে জুন ১৯৫৪। আমি গাড়ি করে বেথুয়াডহরি যাচ্ছিলাম। সেখানে পুনর্বাসনে ব্যবহারের যোগ্য কিছু জমি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ক্যারু কোম্পানী এই অঞ্চলে কয়েক শত একর জমি কিনে একটি আখের খামার বানিয়েছিল। এখান থেকে আখ উৎপাদন করে তারা বেলডাঙ্গার চিনির কলে চালান দিত। সেই চিনির কল উঠে যাওয়ায় আখের চাষও তুলে দিতে হয়েছিল। ফলে তাদের সে জমি অনাবাদী পড়েছিল। এদিকে সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য জমি দরকার। একই ক্রেতার কাছে সমগ্র জমি বিক্রয় করতে পারলে তাদের পক্ষেও অনেক সুবিধা। সেই জমি বিক্রয়ের জন্য আমাদের কাছে প্রস্তাব আসে। তাই তা পরিদর্শনের জন্য আমি মোটরযোগে যাচ্ছিলাম।

রাণাঘাটের লেবেল ক্রসিংএর কাছ থেকে রাণাঘাট স্টেশন দেখা যায়। সেখান হতে স্টেশনের দূরত্ব তিন ফার্লংও হবে না। সেখানে দেখলাম অনেক মানুষ জমা হয়েছে, এমনকি রেল লাইনের ওপরও অনেক মানুষ বসে আছে। আমি তাই গাড়ি ঘুরিয়ে রেল স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানে গিয়ে শুনি কুপার্স ক্যাম্পের আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তরা লাইনে বসে রেলগাড়ি আটকেছে। সত্যই দেখলাম কলিকাতাগামী একখানা ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সামনে ছুটো লাইন জুড়ে আশ্রয় শিবিরের শত শত মানুষ বসে আছে। ফলে রেলগাড়ি আটকে পড়েছে। ছুধারের প্ল্যাটফর্মও মানুষে ভর্তি। সেখানে যেমন যাত্রী আছে, তেমন উদ্বাস্তও আছে। তাদের মধ্যে যারা এই অবরোধের ব্যবস্থা করেছিল তাদের নেতারাও আছেন। কেন লাইনে বসে গাড়ি আটকান হয়েছে জানতে চাইলে তাঁরা বললেন পুনর্বাসনের দাবীতে তাঁরা এইভাবে সরকারের ওপর চাপ দেবেন ঠিক করেছেন। পশ্চিম বাঙলার জন্য আশ্রয় শিবিরগুলিতে যারা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে এসেছিল তারা সকলেই ইতিমধ্যে পুনর্বাসনের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, অথচ এদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয় নি—এই ছিল তাদের অভিযোগ। এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকারের। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর চাপ পড়ে এমন কোন আন্দোলনে তারা যোগ দেয়নি। তারা বেছে বেছে রেলগাড়ি আটকাবার রীতি নির্বাচন করে নিয়েছে এই যুক্তিতে যে তার ফলে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।

ভারত সরকারকে এ বিষয় অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ পুনর্বাসনে ব্যবহারের জন্য তাঁদের নিজস্ব কোন জমি নেই। কাজেই রাজ্য সরকারগুলির ওপর পুনর্বাসনের জন্য নির্ভর করতে হয়। ভারত সরকার কেবলমাত্র পুনর্বাসন ব্যয় বহন করবার ক্ষমতা রাখেন। রাণাঘাটের আশ্রয় শিবিরে যারা আসত, ঠিক হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন হবে উড়িষ্যা ও বিহারের আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করবার পর ওই ছুই রাজ্যে। কিন্তু এই ছুই সরকারের আশ্রয় শিবিরে ইতিমধ্যে যাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তাদেরই পুনর্বাসনের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি। কাজেই রাণাঘাটে যারা এখনও পড়ে আছে তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন তো ওঠেই না। ওদিকে এই অচল অবস্থা দেখে হতাশ হয়েই ক্ষোভে আশ্রয় শিবিরবাসীরা এই নূতন প্রথায় আন্দোলনের ব্যবস্থা করেছিল।

আমাকে এখানকার অনেক স্থানীয় নেতা চিনতেন; ওখানকার উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। তাই আমাকে অনুরোধ করা হল রেলগাড়ি অবরোধ ত্যাগ করবার জন্য উদ্বাস্তু ভাইদের অনুরোধ করতে। আমি তাদের নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম

তাদের দাবী ভারত সরকারের নিকট সহানুভূতির সহিত বিবেচনার জন্য স্থাপন করব। কিন্তু তাতে ফল হল না। আমি আরও বললাম, ব্যক্তিগতভাবে তাদের পুনর্বাসন যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য চেষ্টা করব। তার বেশি তো আমি সেখানে উপরের স্তরে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে দায়িত্ব নিতে পারি না। তাতেও খুব ফল হল বলে মনে হল না। অবরোধ ত্যাগ করতে তারা ইতস্তত করছিল। অগত্যা আমি সেখান হতে বেথুয়াডহরি রওনা হয়ে গেলাম।

বেথুয়াডহরিতে ক্যান্স কোম্পানির জমি পরিদর্শনের পর ফেরবার পথে আবার রাণাঘাটে এলাম। তখন দেখি অবরোধ উঠে গেছে। সম্ভবত উদ্বাস্তু ভাইরা দেখতে চায় সকালের আন্দোলনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ওপর মহলে কি প্রতিক্রিয়া হয়। তারাঁও একান্ত জিদের বসে অন্যের অসুবিধা করতে চায় না।

আমি তখন রাণাঘাট ত্যাগ করে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যে পথ বারাসাত হতে উত্তরে জাগুলি পার হয়ে রাণাঘাট গেছে তার যে অংশটা রাণাঘাট ও জাগুলির মধ্যে অবস্থিত তা তখন একরকম বসতিহীন ছিল। মাইলের পর মাইল দুধারে কেবল মাঠ। কোথাও জনপদের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন ছিল বর্ষা কাল। কাজেই আকাশ মেঘে ঢাকা। রাত্রি তার কালো রূপ নিয়ে পূর্ণ মহিমায় সেখানে বিরাজিত। যতদূর চোখ যায় গৃহস্থ ঘরের কোন প্রদীপের আলোও চোখে পড়ে না। পথে চলতে মোটর গাড়ির হেড লাইট রাস্তার সামনের যে ফালিটুকু অন্ধকারের বুক চিরে আলোকিত করছিল, শুধু সেইটুকুই দেখা যায়, আর সব নিরেট অন্ধকারে ঢাকা।

রাস্তার ঠিক এই অংশের মাঝপথে আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। যাত্রী ছিলাম আমি আর গাড়ির ড্রাইভার। গাড়ির বনেট খুলে টর্চের বাতির সাহায্যে গাড়িকে সচল করবার চেষ্টা হল, কিন্তু কোন ফল হল না। ড্রাইভার হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। তখন রাত্রি ৮টা। আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই। প্রয়োজন হলে কোথাও যে আশ্রয় মিলবে তারও সম্ভাবনা নেই। এই পথে গাড়িও বড় একটা যাতায়াত করে না। কাজেই সারারাত সম্পূর্ণ উপবাস করে পথেই কাটিয়ে দেবার সম্ভাবনা দেখা দিল। করবার কিছু ছিল না। জাগুলি বা রাণাঘাট দুইই হাঁটাপথে দশ মাইলের ওপর হবে। কাজেই সে চেষ্টা বৃথা। অগত্যা আমরা ঠিক করলাম ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই করতে হবে। যদি পথ দিয়ে কোন গাড়ি যায় তাকে থামিয়ে একটা কিছু করবার চেষ্টা হবে।

আমরা মন খারাপ করে বসে আছি। এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু-ঘণ্টা কেটে গেল, গাড়ির আসার কোন চিহ্ন নেই। রাত যখন সাড়ে দশটা তখন

রাস্তার উত্তর দিকে একটা মটর গাড়ির হেড লাইটের আলো দেখা গেল। তার মানে রাণাঘাটের দিক হতে সে গাড়ি আসছে এবং সম্ভবত কলিকাতায় যাবে। গাড়িটা যখন কাছে এল, আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে তাকে থামতে ইশারা করলাম। কি ভাগ্য, গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থামাল। তেমন মতি হলে আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সোজা চালিয়ে যেতে পারত। সম্ভবত রাস্তার পাশে আমাদের গাড়িখানা আটকে পড়ে আছে দেখে তারা আমাদের দুরবস্থা অনুমান করে গাড়ি থামাল।

দেখা গেল সেটি ছিল একটি ট্রাক। তা ছিল পটলে বোঝাই। শান্তিপুর অঞ্চল হতে পটল নিয়ে সে গাড়ি যাচ্ছিল পটলডাঙ্গার বাজারে পাইকারদের কাছে বেচবার জন্য। গাড়িতে দুজন মাত্র আরোহী, স্বয়ং ড্রাইভার এবং তার এক সহকারী। তাদের পাশে গাড়ির সামনে যে জায়গা ছিল তাতে আর একজনের জায়গা হল। অভাবনীয়ভাবে যখন সাহায্য এল তার সুযোগ নিতে হয়।

তখন আমার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল আমাদের অচল গাড়ি পাহারা দিবার জন্যে সে সেখানে রয়ে যাবে এবং এই পটলের ট্রাকে করে কলিকাতায় গিয়ে অফিস হতে তাকে গাড়িসহ নিয়ে যাবার জন্য অন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেব। হিসাব করে দেখা গেল গাড়ি সময়মত কলিকাতা পৌছালে রাত দেড়টার মধ্যে অফিস হতে অচল গাড়িকে ফিরিয়ে নেবার গাড়ি ওখানে পৌছে যেতেও পারে।

সুতরাং ট্রাকে উঠে বসলাম। ইংরেজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে ভাগ্য প্রতিকূল হলে মানুষ বারে বারে দুর্ভোগে ভোগে। আমার ভাগ্যেও তাই ঘটল। সকালে যাবার পথে রাণাঘাটে একবার বাধা পেয়েছিলাম। ফেরার পথে গাড়ি এসে বিকল হল যে তাকে আর চালান গেল না। তাও বিকল হল এমন জায়গায় যেখানে না আছে মানুষের বসতি না রেল স্টেশন। যখন হতাশ হয়ে সারারাত জনশূন্য মাঠে কাটাবার আশঙ্কায় বসে আছি, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে যদিও রাতের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তাও আবার ভাগ্যের প্রতিকূলতায় বিপর্যস্ত হবার যোগাড় হল।

পটল বোঝাই ট্রাক মাইল দশেক চলবার পর আমরা জাগুলি পার হলাম। তারপর আর তিন-চার মাইল অতিক্রম করে গাড়ি হঠাৎ আমডাঙ্গায় এসে থেমে গেল। জানতে পারলাম পেট্রল ফুরিয়ে গেছে বলে গাড়ি থেমে গেল। হায় ভগবান, যে ট্রাক শান্তিপুর হতে রওনা হয়েছে সোজা কলিকাতায় যাবে বলে তার চালকের এমন হিসাবের ভুল যে গন্তব্যস্থানে পৌছবার অনেক আগেই পেট্রল ফুরিয়ে গেল! এখন উপায়? কাছে কোথাও পেট্রলের দোকান ছিল না। সব থেকে নিকটতম স্থান যেখানে পেট্রল পাওয়া যায়, তা হল বারাসাত। তাও অন্তত পাঁচ মাইল দূরে।

যে মানুষটি ড্রাইভারের সঙ্গী ছিল সে কিন্তু দমবার পাত্র নয়। গাড়ির ভিতর থেকে একটা পেট্রলের টিন বার করে নিয়ে সে বলল যে পেট্রল সংগ্রহ করতে সে পায়ে হেঁটেই বারাসাত রওনা হয়ে যাবে। অবশ্য যদি রাস্তায় গাড়ি জোটে তা ব্যবহার করবে। এই বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন পেট্রলের জন্য ক'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় বলা যায় না। যেতে আসতে এবং পেট্রল যোগাড় করতে কম করে আড়াই ঘণ্টা লাগতে পারে। ড্রাইভারও আমাকে গাড়িতে রেখে বেরিয়ে গেল। আমডাঙ্গায় দোকানপাট আছে, হয়ত খাবারের সন্ধানে গেল। আমার উপায়ন্তর ছিল না। ধৈর্য ধরে গাড়িতেই বসে রইলাম।

আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হটাৎ একটা গাড়ি থামার শব্দে জেগে উঠলাম। দেখলাম, আমাদের ট্রাকের পাশে একটা ট্রাক থেমেছে এবং তা হতে আমাদের ড্রাইভারের সহকর্মী নেমে আসছে, হাতে পেট্রলের টিন। তার অর্থ হল বারাসাতে গিয়ে সে তেল সংগ্রহ করেছে এবং আসবার পথে একটি ট্রাক পেয়ে তাতে চড়ে এখানে চলে এসেছে।

গাড়ির ট্যাঙ্কে সেই তেল ঢালা হল। তারপর গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। আমরা যখন শিয়ালদহ স্টেশনের উল্টা দিকে বাজারের সামনে থামলাম, ট্রাকের মানুষদের ধন্যবাদ দিয়ে আর কিছু পারিতোষিক দিয়ে নেমে পলড়াম। কাছেই ট্যাকসি পাওয়া গেল। তাতে চড়ে বাড়ি এলাম। তখন রাত তিনটা। দেখি বারাণ্ডায় গৃহিণী দাঁড়িয়ে রয়েছেন উদ্বিগ্ন চিত্তে আমার আসবার অপেক্ষায়। এইভাবে এই দিনটির দুর্ভোগের সমাপ্তি ঘটেছিল। পরে আপিস হতে গাড়ি পাঠিয়ে ভোরের দিকে অচল গাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

রাণাঘাট কুপার ক্যাম্প আশ্রয় শিবিরবাসীর সেদিনকার আন্দোলনের পরিণতি কি হয়েছিল এইখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। রাণাঘাট স্টেশনে রেলগাড়ি আটকানর ফলে তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি রীতিমত আকৃষ্ট হয়েছিল। উভয় সরকারের মধ্যে উচ্চতম মহলে অল্প আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এরপর রাণাঘাট আশ্রয় শিবিরটির তত্ত্বাবধানের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করবেন। ফলে এখানে যারা আশ্রয় পেয়েছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্বও তাঁদের ওপর এসে পড়বে।

(১৪)

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি হতে আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তুদের ভর্তির সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল। তখন মাসিক গড়ে ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৮০০ এর মত। যে অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলি ছিল তাতেই তাদের স্থান হয়ে যেত।

কিন্তু ওই বছরে জুন মাস থেকে পাকিস্তান হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের সংখ্যা বেড়ে গেল। পূর্ব বছরের তুলনায় সামান্য হলেও তা আমাদের ভাবিয়ে তুলল। ওই বছর জুন মাসে ৯,৮০০ মানুষকে আশ্রয় শিবিরে স্থান দিতে হয়েছিল। অর্থাৎ আগের পাঁচ মাসের গড় মাসিক সংখ্যার দ্বিগুণ। জুলাই মাসে তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৯৯০ তে দাঁড়াল।

এই আকস্মিক উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধির কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। এসময় পূর্ব পাকিস্তানে কোন অশান্তি ঘটে নি। আসল কারণ হল অর্থনৈতিক। এই বছর পাকিস্তানে ভাল ফসল হয় নি। ফলে দরিদ্র মানুষের অভাব অনটন বেড়েছিল। সরকারী সাহায্যে তাদের সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা হিন্দুরা দেখল না। তাই নিতান্তই অনাহারক্লিষ্ট হয়ে অন্নাভাবে তারা পশ্চিম বাঙলায় চলে আসতে লাগল। মনে হয় খুলনা জেলাতেই এই আর্থিক অভাবের চাপ বেশি অনুভূত হয়ে থাকবে। কারণ, উদ্বাস্তুর স্রোত ওইদিক হতে ইটিণ্ডা ঘাটে ইচ্ছামতী নদী পার হয়ে পায়ে হেঁটে পশ্চিম বাঙলায় আসতে লাগল। সুতরাং আমাদের বাধ্য হয়ে প্রাথমিক ত্রাণের জন্য ইটিণ্ডা ঘাটেই আপিস খুলতে হয়েছিল। অনাহারে পীড়িত হয়েই যে তারা আসছিল, তা উদ্বাস্তুদের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের নূতন নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় অনশনক্লিষ্ট মানুষের দৈহিক বিকার কেমন হয় তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছে। বিশেষ করে শিশু ও বালকদের চেহারা আরও ভালভাবে প্রমাণ করেছিল যে শস্যহানি হেতু ক্ষুধার তাড়নায় তারা পাকিস্তান ত্যাগ করেছে।

নূতন উদ্বাস্তুদের এই আগমন আমাদের দুভাবে ভাবিয়ে তুলল। প্রথমত, যত আশ্রয় শিবির ছিল সেখান হতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছিল। কেবল রাখা হয়েছিল বৃদ্ধ বা পঙ্গু বা যে পরিবারের প্রধান বিধবা নারী তাদের জন্য রক্ষিত আশ্রয় শিবিরগুলি। তাদের স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করবার জন্য 'হোম' নাম দেওয়া হয়েছিল। আর ছিল কলিকাতার সংলগ্ন অস্থায়ী তিনটি আশ্রয় শিবির। বর্ধিত হারে উদ্বাস্তু আসলে সেই অস্থায়ী শিবিরগুলি ভরে যাবে এবং তখন নূতন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না—ঐ আশঙ্কা আমাদের ভাবিয়ে তুলল।

দ্বিতীয়ত, এবার যারা আসছিল অনশনের ফলে তাদের শিশুদের প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ফলে কাশীপুর বা উল্টাডাঙ্গার আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেবার পর তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটতে লাগল। ডাক্তারের মতে অনাহারজনিত দুর্বলতাই এর মূল কারণ। পূর্বে এখানে সহস্র সহস্র শিশু আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু কখনও এদের মড়ক লাগে নি। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির খবর যখন সংবাদপত্রে প্রচারিত হল তখন রাজনৈতিক দলের নেতাদের তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অনেকেই এসম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য

প্রশ্ন করতে লাগলেন। অনেকে আশ্রয় শিবিরের অবস্থা দেখতে চাইলেন। তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হল। যাঁরা আশ্রয় শিবির দেখতে গিয়েছিলেন, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাদের এ বিষয় প্রতিষেধক কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে প্রশ্ন নিয়ে আমার সহিত আলোচনাও করেছিলেন।

পুষ্টির অভাবে যে মড়ক লাগে তাকে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ করা যায় না। ধীরে ধীরে খাদ্য হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে শরীরে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হলে আপনি তা প্রতিরোধ হয়। তবে অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে কলিকাতার বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে গাদাগাদি করে এ অবস্থায় থাকা যে বাঞ্ছনীয় নয় সে কথা বেশ বোঝা যায়। এই অনাহারক্লিষ্ট সদ্য আগত পরিবারগুলিকে যদি মুক্ত স্থানে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাদের স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি উদ্ধার হতে পারে। কিন্তু বাহিরের আশ্রয় শিবিরগুলি উঠে যাওয়ায় সে পথও বন্ধ।

এই অপ্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ আমি আমন্ত্রণ পেলাম উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় গড়া একটি উপনিবেশ পরিদর্শন করবার। সেটি গড়ে উঠেছিল কলিকাতার নিকটেই। বারাসাত লাইনে বিরাটি স্টেশনের কাছে লাইনের দুধারে আপোসে জমি কিনে এই নূতন উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। তার কথা আমি শ্রীযশোদাকান্ত রায়ের নিকট ইতিপূর্বে কিছু শুনেছিলাম। সরকারের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের চেষ্টায় উপনিবেশ গড়ে পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই পথে অন্য অনেক পরিবার নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল। তবে তাদের রীতি অনেক সময় বিধিসম্মত ছিল না। অপরের জমি দখল করে ব্যাপকহারে কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বহু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। তাঁরাও পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানে স্বাবলম্বিতা গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কলোনি সেগুলি হতে পৃথক, কারণ মালিকের নিকট হতে জমি আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তরিত করবার পর এখানকার উদ্বাস্তুরা নিজেদের উপনিবেশ গড়েছিল। তাই এই কলোনিটি দেখবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

সুতরাং এই নূতন উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ বিশ্বাস মহাশয়ের আমন্ত্রণে ১৮ই জুলাই ১৯৫১ তারিখে ওখানে সারাদিনটি কাটিয়ে এসেছিলাম। যা দেখেছিলাম তাতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর জন্মকাহিনী সত্যই রোমাঞ্চকর। খুলনা জেলায় বারাকপুর নামে একটি বর্ধিষ্ণু হিন্দুপ্রধান গ্রাম ছিল। শ্রীহরিপদ বিশ্বাস ছিলেন সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। তিনি কাজ করতেন কলিকাতায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের আপিসে। কিন্তু জন্মভূমির ওপরে আকর্ষণ তাঁর শিথিল হয় নি। তাই প্রতি রবিবার এবং ছুটির দিনে গ্রামে যেতেন। তিনি নিশ্চয় সেখানে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তা না হলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবেন কেন? দেশ বিভাগের পর এই বারাকপুর

গ্রামের অনেক মানুষ পশ্চিম বাঙলায় চলে এসেছিল। সরকারী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিতে তাদের রুচি হয় নি। কোনো আশ্রয়স্থল না পেয়ে মাসুন্দা আর আহরমপুর নামে দুটি গ্রামের পতিত জমির গাছ তলায় তারা আশ্রয় নিয়েছিল।

এই অবস্থায় ভূতপুর্ব নেতা হরিপদ বিশ্বাসকে তারা স্মরণ করেছিল। এই নূতন পরিস্থিতিতে তাদের নূতন সমস্যার সমাধানে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন কি? তিনি সে আহ্বানে অন্তর হতেই সাড়া দিয়েছিলেন। গঠনমূলক কর্মের এমন পবিত্র আহ্বান তাঁকে যে অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি দিয়েছিল তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় তা এই নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। এর বিস্তার কয়েক বর্গমাইল জুড়ে। যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তাতে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের স্থান হয়। প্রধানত তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, কিছু কারিগর ও কিছু কৃষিজীবীও আছে। মোট কথা পুর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সমগ্র বারাকপুর গ্রামখানিকে যেন স্থানান্তরিত করে এখানে আনা হয়েছিল।

তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল নব-বারাকপুর। বারাকপুরে যে স্থায়ী কালী বিগ্রহ ছিলেন তাঁকেও উপনিবেশের কেন্দ্রস্থলে একটি মন্দিরে স্থাপন করে নূতন করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। পুরাতন গ্রামে কয়েক ঘর বিশেষ শ্রেণীর কারিগর ছিল যাদের পেশা ছিল ছাতার বাঁট নির্মাণ করা। তারাও নূতন পরিবেশে আশ্রয় পেয়ে এই গ্রামীণ শিল্পকে এখানে পুর্ণমর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সমগ্র পরিকল্পনাটি পরিচালিত হয়েছিল সমবায় রীতিতে। একটি সমবায় সমিতি গঠিত করে তাকে রেজিস্টার করবার পর তার সাধারণ সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি এই উপনিবেশটির পরিকল্পনা রচনা করে তাকে রূপ দিয়েছিল। পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল উপনগরীরূপে কলোনিটিকে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং পাকা রাস্তা, নলকূপ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে মুক্ত জায়গা রাখবার ব্যবস্থা ছিল। তাকে নানা দিক হতে স্বয়ংনির্ভক করবার উদ্দেশ্যে সেখানে বালক এবং বালিকাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল এবং সভাসমিতির জন্য হলঘরের ব্যবস্থা ছিল। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। সমবায় শক্তির ওপর নির্ভর করে কত বিরাট পরিকল্পনার রূপ দেওয়া যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নব-বারাকপুর।

এই সুন্দর উপনিবেশটির ক্রমিক উন্নয়ন বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি। এখন তা একটি নগরীর রূপ নিয়েছে, তার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পৌর সমিতিও গঠিত হয়েছে। তার বর্তমান জনসংখ্যা ৩৫,০০০-এর মত। সেখানে এখন অনেকগুলি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামের দ্বারা তা চিহ্নিত। সম্প্রতি একটি শিক্ষক

শিক্ষণ কলেজও স্থাপিত হয়েছে। শ্রীহরিপদ বিশ্বাস প্রথম পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। বয়স অনেক হলেও তাঁর কর্মক্ষমতা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি, এখনও তাঁহার মধ্যে যুবকসুলভ প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

এখানে উদ্বাস্তু নেতাদের কর্মক্ষমতার এই সুন্দর পরিচয় পেয়ে আমি আশান্বিত হলাম। যাঁরা হাজার হাজার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন, তাদের অধিক দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চয় আছে। সুতরাং যে বিশেষ সমস্যা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছিল সে সম্বন্ধে এঁদের সাহায্য নিলে হয় না? গত জুন মাস হতে আশ্রয় শিবিরে যেসব উদ্বাস্তু আসছে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে অথচ পুরাতন স্থায়ী শিবিরগুলি উঠে গেছে। এদিকে এবার যারা এসেছে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মড়ক লেগেছে। এক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি তাদের কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে সম্ভবত তাদের ব্যাপক হারে মড়কও নিবারণ হয়। চেষ্টা করেও ঠিক এই সময় কোনো পুনর্বাসনের জায়গা সংগ্রহ করা আমাদের সম্ভব হয় নি। এখন এঁদের ওপর ভার দিলে কেমন হয়?

তাঁদের যোগ্যতার এমন স্পষ্ট পরিচয় পাবার পর তাঁদের কাছে এই প্রস্তাব না করে পারলাম না। আমি প্রস্তাব দিলাম এই কলোনিতেই যদি তাঁরা এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ভার নেন, তাহলে আমাদের বর্তমান সমস্যার একটি আশু সমাধান হয়ে যায়। এই পরিবারগুলির জন্য যে জমি দখল করা দরকার হবে তা সরকার নিজের পয়সায় হুকুমদখল করে দেবেন। তাছাড়া যেসব উদ্বাস্তু পরিবার এখানে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হবে তারা বিভিন্নখাতে যে পুনর্বাসন ঋণ পাবে তা হতে এই কলোনির সদস্যভুক্ত হতে যে চাঁদা দিতে হয় তা কুলিয়ে যাবে।

সৌভাগ্যক্রমে হরিপদবাবু এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তিনি আরও সাহায্য করলেন। যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত করবার জন্য তাঁদের কলোনিতে যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে তাঁবু ফেলে তাদের বসতে দিলেন। ফলে এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে তখনি নির্বাচিত করে কলিকাতার অস্থায়ী আশ্রয় শিবির হতে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে উদ্বাস্তু শিশুদের মড়কের বিরুদ্ধে একটি প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছিল।

(১৫)

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে দুর্ভাগ্য দল বেঁধে আসে। আমাদের এই সময়টা ঠিক সেই দুর্দশা ঘটেছিল। একদিকে উড়িষ্যা ও বিহার হতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পশ্চিম বাঙলায় এসে আশ্রয় ও পুনর্বাসনের দাবী করেছিল;

অপর দিকে জুন মাস থেকে পুর্ব পাকিস্তান হতে উদ্বাস্তুদের একটি নূতন স্রোত বইতে শুরু করেছিল। ফলে আশ্রয় শিবিরগুলি তুলে দিতে না দিতে আবার নূতন আশ্রয় শিবির খোলবার সমস্যার উদয় হল। এদিকে মন দিতে না দিতে আবার আর এক সমস্যার উদয় হল।

যেসব উদ্বাস্তু পরিবার নূতন উপনিবেশে গেছে, দু তিন মাস যেতে না যেতে তাদের নিজেদের নানা সমস্যা দেখা দিল। সে বিষয় মীমাংসার জন্য তারা নানাভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যত দিন যেতে লাগল ততই বড় বড় উপনিবেশে এই ধরনের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পর যারা এসেছিল তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বসানর পর আমাদের এই ধরনের আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয় নি। হাবড়ার কল্যাণগড় কলোনি তার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এখানে যারা পুনর্বাসন চেয়েছিল তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে চেয়েছিল। তাদের নেতারা আমাদের কাছে আসতেন আমাদের কেবল কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতে। হয়ত নূতন স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, ডাক পড়ল। কলোনিতে প্রথম দুর্গাপূজার ব্যবস্থা হয়েছে, ডাক পড়ল।

এই সব দেখে মনে হয় এবার যারা আশ্রয় শিবিরে এসেছিল তাদের মনের বল এবং আত্মনির্ভরশীল হবার ক্ষমতা তুলনায় কম ছিল। তাই অসুবিধায় পড়লে সরকারের নিকট নূতন সাহায্য আদায় করবার চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ অন্দোলনের পথ বেছে নিত। বোধহয় দোষটা সম্পূর্ণ তাদের নয়। যারা কৃষিজীবী, দেখা গেছে তাদের পুনর্বাসন তুলনায় সহজ। যারা বিশেষ বিশেষ শিল্পে দক্ষ তারাও একটা অনুকূল পরিবেশ পেলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, যেমন তাঁতিরা। তারা দলে দলে নদীয়া জেলায় পুনর্বাসন নিয়েছিল। তাদের কাঁচা মাল যোগাড় করে দিলে, কিম্বা কিছু মূলধন দিতে পারলে চালিয়ে নিত। কিন্তু যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, তারাই সব থেকে অসুবিধায় পড়ত। এদের এক মাসের খোরাকি ও কিছু মূলধন দেওয়া হত; কিন্তু দেখা যেত কয়েক মাসের মধ্যে মূলধন ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ তা হতে মুনাফা অর্জন করে সংসার চালানর ক্ষমতা হয় নি। কাজেই মূলধনই সংসার চালানোর কাজে ব্যয়িত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দোকান দিয়ে বা রিক্সাসাইকেল চালক হয়ে বা ফড়িয়াগিরি করে নিজেদের সংসার চালিয়ে নিত, কিন্তু একটা বড় দল তা পারত না।

তার মূল কারণ হল তারা কোন জীবিকার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণে অভ্যস্ত নয়। পূর্ব বাঙলায় দেশ বিভাগের পূর্বে মধ্যবিত্ত হিন্দু ঘরের সন্তানদের অর্থনৈতিক বিন্যাস যা ছিল তার সঙ্গে তারা সঙ্গতি রেখে এক রকম চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু দেশ বিভাগের পর বাস্তুত্যাগ করার ফলে সে অর্থনৈতিক

বিন্যাস সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তা আর সম্ভব হল না। এই ধরনের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে কিছু চাষের জমি থাকত। তা বর্গাদারের সাহায্যে হক বা মজুর লাগিয়ে হক যে ধান উৎপাদিত হত তাতে এক রকম অন্ন সংস্থান হয়ে যেত। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে কিছু সবজি, পুকুরে কিছু মাছ এবং গাছের কিছু ফলও তাদের ভোগে আসত। অধিকন্তু বাড়ির কোন ছেলে যদি পড়াশোনায় ভাল হয়ে দু-একটা পাশ করত, তা হলে মফঃস্বল শহরে বা কলিকাতায় চাকুরী পেত। তাদের আয়ের একটা অংশ এই অর্ধ-বেকার সরিকদের ভোগে আসত। এইভাবেই তাদের সংসার চলত।

এরাই যখন পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তু হয়ে এল, তাদের অক্ষমতা প্রথমে পরীক্ষিত হবার সুযোগ ঘটে নি; কারণ সরকারের আশ্রিত হিসাবে তারা স্থান পেল। যখন তারা ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থাপিত হল তখনি তাদের পরীক্ষার সময় এল। সে পরীক্ষায় তারা ফেল করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ পাশ করবার উপযুক্ত গুণ তাদের ছিল না। তারা এক রকম পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। সুতরাং এদের পুনর্বাসন করতে হলে এদের এমন কোন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে এরা চাকুরি পেতে পারে বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। এই পথেই যে তাদের সমস্যার সমাধান তা আমরা ঠেকে শিখেছিলাম। অবশ্য উদ্বাস্তু তরুণরা সব থেকে পছন্দ করত চাকুরি। অনেকে সোজা বলত, কোন পুনর্বাসন ঋণ চাই না স্যার, একটা চাকরি দিন।

এই কারণেই উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য ব্যাপক হারে চাকুরির পথ খোলবার চেষ্টা হয়েছিল। টিটাগড়ে নানা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি দিয়ে উদ্বাস্তু তরুণদের শিক্ষানবিশ রাখা হত, যাতে দক্ষতা অর্জন করলে সেখানেই তারা কাজ পেয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগ এই সময় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এদের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হয়েছিল যে উদ্বাস্তু বিভাগ হতে তাদের বাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য ঋণ দেওয়া হবে এবং পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে তারা আমাদের মনোনীত উদ্বাস্তুদের চাকরি দেবে। কলিকাতার সংলগ্ন যেসব স্থানে আশ্রয় শিবির হতে উদ্বাস্তু পরিবার বসান হয়েছিল সেখান হতে নির্বাচন করে এইভাবে শত শত উদ্বাস্তু যুবকের জন্য চাকুরি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

যে কলোনি কলকাতা হতে দূরে অবস্থিত সেখানকার যুবকদের এই সুবিধাগুলি দেওয়া সম্ভব হত না। সেই কারণে সেখানেই নূতন শিল্প গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই কারণেই দেখা যায় যে কলিকাতার শিল্প অঞ্চল হতে দূরে অবস্থিত নূতন অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের কলোনিতে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই

তারা নানাভাবে আন্দোলন করে তাদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করত।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চব্বিশ পরগণার হাবড়া থানার অন্তর্গত মেদিয়া গ্রামে কয়েক শত অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারকে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাঠান হয়েছিল। এই জায়গাটির একটু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালটির অতি নিকটে তা অবস্থিত। তবে একটি প্রাকৃতিক ব্যবধান তাকে এক রকম এই শহর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এর তিন দিক ঘিরে একটি জলের বেষ্টনী। তা বেশ চওড়া এবং গভীর। এই বেষ্টনীর পূর্ব পাড়ে মেদিয়া ও পশ্চিম পাড়ে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালটির অন্তর্ভুক্ত খাঁটুরা মৌজা। এই প্রাকৃতিক ব্যবধান হেতুই মেদিয়া ঠিক নগরের মর্যাদা পায় নি। অথচ জায়গাটি কলিকাতা হতে রেলযোগে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে। কলিকাতার সহিত সোজা পাকা রাস্তারও সংযোগ আছে।

দ্বিতীয়ার চাঁদের আকারের এই জলের বেষ্টনীর নাম বামোড়। এই বিশেষ আকৃতির ব্যাখ্যা নিয়ে এঅঞ্চলে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মেদিয়া নাকি এককালে কোন রাজার রাজধানী ছিল। তাকে সুরক্ষিত করবার জন্যই নাকি এই জলের বেষ্টনী কৃত্রিমভাবে কেটে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে প্রবাদ কিন্তু তথ্য দিয়ে সমর্থন করা যায় না। কোন পাকা বাড়ি বা প্রাসাদের চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এই জলধারাটি নিকটে প্রবহমান যমুনা নদীর সহিত সংযুক্ত। এই সব দেখে মনে হয় সম্ভবত এটি এককালে যমুনা নদীরই অঙ্গ ছিল এবং পরে নদীর স্রোতের পথ পরিবর্তিত হওয়ায় এটি হ্রদের আকার ধারণ করেছে। বনগাঁ অঞ্চলে এই ধরনের আরও দ্বিতীয়ার চাঁদের আকারের জলাধার পাওয়া যায়।

বামোড়ের যে পাড় খাঁটুয়ার সংলগ্ন সেখানে একটি ভাল বাঁধান ঘাট আছে। এক জোড়া শিবমন্দিরও আছে। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট সন্তান শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য এগুলি নির্মাণ করেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট ভায়ের সহপাঠী ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে আইনদ্বারা বিধবা বিবাহ সিদ্ধ হবার পর বিধবা বিবাহ করে সমাজ সংস্কারের সহায়ক একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এই মেদিয়া কলোনীতে যাদের পুনর্বাসনে পাঠান হয়েছিল তাদের অনেকেরই অন্নসংস্থানে অসুবিধা হচ্ছিল। কলিকাতার এত নিকটে থেকেও এই বলয়াকার জলাধারের বেষ্টনীর জন্য তারা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের এই অসুবিধাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সুতরাং তারা জুনের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনে দল বেঁধে এসে লাইনের ওপর বসে

রেলগাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিল। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের দৃষ্টান্তের তারা এইভাবে অনুসরণ করে বসল।

এই অচল অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে রেলের কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি আমার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করে এই সংবাদ আমাকে দিলেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন।

এখানে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদের নেতার নাম ছিল শ্রীমুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব হতে পুনর্বাসন সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রে তাঁর সহিত আমার পরিচয় ছিল। অনুমানে ধরে নিলাম তিনি স্টেশনেই আছেন এবং স্টেশনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম তাঁকে ফোনে ডেকে দিতে যাতে এ বিষয় তাঁর সঙ্গে তখনি আলাপ করতে পারি।

একটুখানি অপেক্ষা করবার পর তাঁকে পাওয়া গেল। তাঁকে রেলগাড়ি অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করলে তিনি প্রস্তাব করে বসলেন, আমি যদি মেদিয়াতে এসে তাঁদের অবস্থা নিজে দেখে যাবার প্রতিশ্রুতি দিই, তিনি তখনি অবরোধ তুলে নিতে রাজি আছেন। প্রস্তাবটি অসঙ্গত মনে হল না, সুতরাং আমি তখনি রাজি হয়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম, ২৫শে জুলাই তারিখে তাদের কলোনি পরিদর্শন করতে যাব। অবরোধ সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেওয়া হল।

সুতরাং ২৫শে জুলাই তারিখের সকালেই আমি ওখানে হাজির হলাম। বর্ষাকাল হলেও সেদিন বৃষ্টি ছিল না। কাজেই সেদিক থেকে একটা সুবিধা ছিল। বামোড়ের ঘাটে যখন হাজির হলাম, দেখি ওপারে মেদিয়া কলোনিতে নিয়ে যাবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীমুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। নৌকা এদিকের ঘাটে লাগান যায় না, কারণ সেখানে জল অগভীর। কাজেই নৌকা ঘাট থেকে হাত তিনেক দূরে রইল। এই অংশটুকু পার হবার জন্য উদ্বাস্তু ভাইরা এক নাতিপ্রশস্ত আমগাছের ডাল কেটে এনে স্থাপন করেছিল। তার এক প্রান্ত রাখা হল নৌকার ওপর, অপর প্রান্ত ঘাটের ওপর।

তার ওপর দিয়ে আমাকে নৌকায় উঠতে অনুরোধ করা হল। ব্যাপারটা আমার পক্ষে অনেকটা সার্কাসের দড়ির ওপর হাঁটার মত। কারণ নৌকা জলের ওপর আছে, ডালে পা দিলেই তা নড়ে উঠবে এবং ফলে ভারসাম্য রাখা কঠিন হবে। সুতরাং গাছের ডাল অবলম্বন করে নৌকায় উঠতে পারব কিনা আমার সন্দেহ ছিল, অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা ছিল না। তবু সাহস দেখাতে গিয়ে এক বিভ্রাট সৃষ্টি করে এক হাস্যকর পরিবেশ রচনা করে বসলাম। ঘাট হতে যেমন ডালে পা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভেবেছিলাম, নৌকা গেল নড়ে এবং আমি ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে জলে পড়ে গেলাম। সেখানে

পড়লাম সেখানে জল খুব গভীর ছিল না। যখন পায়ে মাটি ঠেকল তখন দেখলাম আমার কোমর অবধি জলে ডুবে গেছে। এখন আর সোজা নৌকায় উঠতে বাধা কি, ঘাটে ফিরে না এসে সেই অবস্থাতেই জল হতে নৌকায় উঠে পড়লাম। এখানে পোশাক বদলাবার কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ দ্বিতীয় পোশাক সঙ্গে ছিল না। সুতরাং ভেজা কাপড় নিয়ে কলোনি পরিদর্শনের প্রস্তাব করলাম। ওঁরা প্রথমে একটু অপ্রতিভ হলেও পরে আর আপত্তি করলেন না। কলোনিতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা বুঝলাম এদের অনেকেরই জীবিকার অবলম্বন প্রয়োজন। সেটা সম্ভব হয় এখানে কিছু কুটীর শিল্প স্থাপন করলে। সুতরাং তার ব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখানে যে অসুবিধাটি সব থেকে বেশি অনুভূত হয় তা হল যোগাযোগের অসুবিধা। নৌকাযোগে ফেরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় এবং দ্বিতীয়ত ব্যয়সাপেক্ষ। বামোড়ের ওপর দিয়ে একটা সেতু নির্মাণ করতে পারলে যাতায়াতের সুবিধার সঙ্গে অর্থনৈতিক সুবিধাও এসে পড়ে। সুতরাং সেটাও বিবেচনার বিষয় ছিল। সেতু নির্মাণের ব্যবস্থার প্রাথমিক কাজে হাত দেবার আগেই আমি ওই বিভাগ হতে চলে এসেছিলাম।

(১৬)

আগস্ট মাসের শেষে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতায় এলেন। এবার বেশ কয়েক মাস পরে এসেছিলেন। এবার আর তিনি কলিকাতার বাহিরে উদ্বাস্তু কলোনি পরিদর্শনে উৎসাহ দেখালেন না। যে সমস্যাগুলি সম্প্রতি আমাদের কাজ ব্যহত করছিল, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেবার জন্যই এসেছিলেন। যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন উড়িষ্যা ও বিহার হতে যেসব উদ্বাস্তু হাওড়া স্টেশনে এসে জমা হয়েছে এবং বাঙলা দেশে পুনর্বাসন চাইছে, তাদের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়ত কুপার্স ক্যাম্পের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয়ত খুলনা অঞ্চল হতে যে নূতন উদ্বাস্তুরা আসছে, তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে। এইসব বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেবার জন্য তিনি এবার কলিকাতায় এসেছিলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন একাধারে মুখ্যমন্ত্রী এবং উদ্বাস্তু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিরাট। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর মহলে তাঁর দারুণ প্রতিপত্তি। সুতরাং তাঁর সহিত পরামর্শ করেই এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সুতরাং এঁদের দুজনের মধ্যে একটি আলোচনার ব্যবস্থা হল। রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন সচিব হিসাবে আমি ডাঃ রায়কে সাহায্য করবার জন্য উপস্থিত ছিলাম এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতার স্থানীয় অফিসের

ভারপ্রাপ্ত যুক্তসচিব শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীজৈনকে উপদেশ দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে কুপার্স ক্যাম্পের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন সমস্যার কথা উঠল। সাম্প্রতিক রাণাঘাট স্টেশনে রেলগাড়ি অবরোধের পর তাদের সমস্যার প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তাব এল আমাদের সরকার এই আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের ভার গ্রহণ করার। তার প্রধান যুক্তি হল তাঁদের নিজেদের জমি সংগ্রহ করবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং রাজ্য সরকারেরই তাদের ভার গ্রহণ করা প্রশস্ত। ডাঃ রায় স্বভাবতই উদারচিত্ত এবং দায়িত্ব নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। সুতরাং সে প্রস্তাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিলেন। পুনর্বাসনের ভার যখন আমাদের হাতে পড়ল, কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় শিবির তত্ত্বাবধানের ভার ভারত সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হল তার তত্ত্বাবধানের ভার আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠল উড়িষ্যা ও বিহার সরকার পুনর্বাসনের কাজের কিছু ভার কেন গ্রহণ করবেন না। নৈতিক দিক হতে বিবেচনা করলে এবিষয়ে তাঁদেরও তো দায়িত্ব আছে। এ সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করবার জন্য একটা প্রস্তাবও তো করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের যুক্তসচিব খুব জোর দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন এমন অনুরোধ করে কোন ফল লাভ হবে বলে মনে করলেন না। তবু সম্মত হয়ে গেলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন উড়িষ্যা সরকারকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য স্থান-নির্বাচন করতে অনুরোধ করবার। এবিষয় আরও ঠিক হল, কেন্দ্রীয় যুক্ত সচিবের সঙ্গে গিয়ে আমি নির্বাচিত জায়গাগুলি দেখে আসব এবং যদি আমাদের মতে সেগুলি পুনর্বাসনের ব্যবহারের যোগ্য বিবেচিত হয় তবেই সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে পরিণতিতে কি দাঁড়িয়েছিল তা এইখানেই বলে নেওয়া যেতে পারে। যথাসময় উড়িষ্যা সরকার আমাদের দু'জনকে তাঁদের নির্বাচিত জমি দেখতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, দুটি বিভিন্ন স্থানে জমি দেখান হয়েছিল। একটি দেখান হয়েছিল ঢেংকানলে। স্বাধীনতার পূর্বে তা একটি সামন্ত রাজার রাজ্য ছিল। জায়গাটি খুবই অনুন্নত এবং জঙ্গলাকীর্ণ। যে জায়গাটি আমাদের দেখান হয়েছিল তা গভীর জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত। সেখানে পুনর্বাসন খুব ব্যয়সাধ্য এবং জঙ্গলের অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত ছিল বলে উদ্বাস্তরা পছন্দ করবে কিনা, সে বিষয় বেশ সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয় জায়গাটি কটক জেলায় অবস্থিত। সেটা ছিল বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে স্থাপিত উঁচু ডাঙ্গা জমি। উর্বর বলে মনে হল না, কারণ সেখানে কোন

গাছ ছিল না, স্থানে স্থানে ছোট জাতের বাঁশ ঝাড় ছিল। তাও পুনর্বাসনের অনুপযুক্ত বলে মনে হল। সুতরাং এ পথে আমাদের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণতি লাভ করল।

তারপরের প্রশ্ন হল, নূতন আশ্রয় শিবির খোলা হবে কিনা। পূর্বে যেসব আশ্রয়শিবির খোলা হয়েছিল, সেগুলি আশ্রিত উদ্বাস্তু পরিবারদের পুনর্বাসনের স্থানে নিয়ে যাবার পর তুলে দেওয়া হয়েছিল। কেবল নূতন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার জন্য কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনটি অস্থায়ী শিবির রাখা হয়েছিল। জুন মাস হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বৃদ্ধি পাবার ফলে এই অস্থায়ী শিবিরে তাদের জায়গা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এক্ষেত্রে নূতন আশ্রয় শিবির খোলা হবে কিনা?

খানিক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে পূর্বের মত আর স্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হবে না। এখন হতে সোজা পুনর্বাসনের স্থানে জায়গা দখল নেবার পরই উদ্বাস্তুদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জায়গার উন্নয়ন করে তা বিলি করবার উপযুক্ত হলে, তখন উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পুনর্বাসনের কাজ সেখানেই আরম্ভ হবে। অন্য আশ্রয় শিবির হতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার জন্য তাদের নাম দেওয়া হবে ক্যাম্পকলোনি। তা হতেই তাহলে তাদের প্রকৃতি কি তা অনুমান করে নেওয়া যাবে। নব-বারাকপুরে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে কলিকাতার সংলগ্ন আশ্রয় শিবিরগুলি হতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তা এই নূতন নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে।

সভার শেষে যে প্রশ্ন উঠেছিল তা বিশেষ বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন হল উড়িষ্যা ও বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে যেসব আশ্রয় শিবির ছিল সেখান হতে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় ফিরে এসে হাওড়া স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব হল যেহেতু তারা আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে চলে এসেছে, সেখানেই তারা ফিরে যাক; তাহলে পুনরায় জীবিকার জন্য ডোল পাবে। ডাঃ রায়ের ইচ্ছা বিষয়টি আরও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হক। যদি তারা ফিরে যায় তো ভালই, অপর পক্ষে পশ্চিম বাঙলার প্রতি আকর্ষণ যদি তাদের খুব তীব্র হয়, তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করে লাভ নেই, কারণ তাদের এই বিশেষ মনোভাবের জন্য তারা পশ্চিম বাঙলার বাহিরে পুনর্বাসনের অযোগ্য। অথচ একথাও ঠিক যে এখানে আশ্রয় শিবিরে যদি স্থান দেওয়া হয় এবং প্রচলিত হারে আর্থিক সাহায্য করা হয়, তা এক খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং এখনও যারা উড়িষ্যা ও বিহারের আশ্রয় শিবিরে আছে তাদের শিবির ত্যাগে উৎসাহ দেওয়া হবে। এইসব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত হল যে এদের মধ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গে সরকারের আশ্রয় চায় তাদের ক্যাম্পকলোনিতে

পাঠান হবে এবং তারা যে সাপ্তাহিক আর্থিক সাহায্য পাবে তা নির্ধারিত হারের থেকে কম হবে। বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ পেয়ে তারা অসন্তুষ্ট হয় নি, কম হারে ডোল পেয়েও এরা পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিতে রাজি হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি বিষয় উত্থাপিত হল যা বিশেষ বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়াল। বিষয়টি আমিই উত্থাপন করেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে উড়িষ্যা ও বিহার হতে যেসব উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সঙ্গতি ফুরিয়ে গেলে অনশনের সম্মুখীন হতে হয়। তখন বাধ্য হয়েই ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের মধ্যে ডোল দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি প্রস্তাব করলাম, সে ডোলের খরচ ভারত সরকার বহন করুন। ওপক্ষ হতে কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্মসচিব আপত্তি করলেন, কারণ, তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের দায়িত্বে যখন ডোল দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এবিষয় দায়িত্ব নেই।

এ বিষয়ে বিতর্কটা কিন্তু বেশি অগ্রসর হতে পারল না। ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্ব তার সহজ মীমাংসা করে দিয়ে মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন, 'এ খরচ অবিশ্যি ভারত সরকারকে দিতে হবে। ভারত সরকারের টাকা তো আর অজিতপ্রসাদ জৈনের শ্বশুরের টাকা নয়, যে তিনি তা আগলে বসে থাকবেন।'

অবশ্য কথাটা তিনি ইংরাজিতে বলেছিলেন। তার বাঙলা অনুবাদ ওপরে দেওয়া হল। তার ফল হল নাটকীয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয় ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে সোজা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

(১৭)

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখের দিনটি আমার স্মৃতিপটে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে। কারণ তা এমন একটি ঘটনা দ্বারা চিহ্নিত যে তাকে ভোলা যায় না। ব্যাপারটি হয়ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধানে কোন সাহায্যই করে না। সেদিক হতে দেখতে গেলে তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবু তার একটা তাৎপর্য রয়েছে যা তাকে মহিমামণ্ডিত করে। যারা এমন দুরবস্থাগ্রস্ত যে পুনর্বাসনেরও অযোগ্য, যারা সবার অধম, সবার অবহেলার বস্তু, ওই দিন যে ব্যবস্থাটি হয়েছিল, তা তাদের জীবনকে আনন্দসিক্ত করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে যার মূল্য অন্যের কাছে যৎসামান্য, তা এদের কাছে সব থেকে আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং পুনর্বাসন দপ্তর সেটা আদায় করে দিতে পারায় অন্তত একটি বিষয় তৃপ্তি পাবার মত কিছু করতে পেরেছিল।

আশ্রয় শিবিরে যে শ্রেণীর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তাদের স্থায়িভাবে রাখার ব্যবস্থা ছিল। তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। এক ধরনের উদ্বাস্তু পরিবার ছিল যাদের কর্তা বৃদ্ধ বা অসমর্থ বা পঙ্গু।

পরিবারের অন্য মানুষ হয় নারী, না হয় নাবালক শিশু। এদের জন্য স্বতন্ত্র আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, আর এক শ্রেণীর পরিবার ছিল যাদের পুরুষ অভিভাবক ছিল না, কতকগুলি নাবালক সন্তানের বিধবা মা নিয়ে তা গঠিত। এখানে বিধবা মা কর্তৃস্থানীয়া। আরও এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যারা স্থায়িভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল, তারা একাই একটি পরিবার, তাদের পরিবারে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। এরা ছিল বৃদ্ধা বিধবা। কেউ হয়ত নিঃসন্তান। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের আশ্রিতা হয়ে তার জীবন কাটত। কারও হয়ত সন্তান ছিল, কিন্তু তারা এখন বড় হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সেই ছেলেমেয়েরা হয়ত তাকে আশ্রয় দিত, কিন্তু উদ্বাস্তু অবস্থায় তাকে আশ্রয় দেবার সামর্থ্য তারা রাখত না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে সরকারের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করত। মহিলা অফিসারের তত্ত্বাবধানে আছে এমন আশ্রয় শিবিরেই তারা বাস করত। তবে বেলুড়ে ভাগীরথী নদীর ধারে তাদের জন্য একটি পৃথক আশ্রয় শিবিরও করে দেওয়া হয়েছিল। তাতে তাদের এই মানসিক তৃপ্তি ছিল যে বার্ধক্যে তারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করার সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু এখানে বেশি মানুষের স্থান হত না। এই শ্রেণীর আশ্রিতাদের প্রধান দলটি বাস করত ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরের সেই অংশে যেখানে স্থায়িভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ধুবুলিয়া আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করতে যান তখন এই বৃদ্ধা মেয়েরা একটি আবেদন জানিয়েছিল যে তাদের বারাণসীতে বাস করবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হক। সেখানে বাস করতে তাদের কেন এত আগ্রহ তা ভাল করেই বোঝা যায়। এরা বার্ধক্যে জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেচে। দেশ বিভাগের ফলে শুধু তারা পৈতৃক গৃহ হতে ভ্রষ্ট হয় নি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতেও বিযুক্ত হয়েছে। সংসারে তাদের আকর্ষণের বস্তু কিছু নেই। হিন্দুর মেয়ে হিসাবে তারা এই সংস্কারে একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ যে বারাণসীতে গিয়ে দেহরক্ষা করতে পারা একটি বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। এদের এই ভাগ্যহত জীবনের কাছে সুতরাং তাই হল সব থেকে বড় আকর্ষণের বস্তু। তাই তারা বারাণসীতে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই ইচ্ছা পূরণ করবার ভার আমার ওপর পড়েছিল।

কিছু দিন পরে ডাঃ রায়ের কাছে যখন এবিষয় লিখিত প্রস্তাব দিলাম তিনি উৎসাহভরে তা গ্রহণ করলেন। ব্যবস্থাটি যে এই বৃদ্ধা নারীদের কাছে কি তীব্র আকর্ষণের বস্তু তাঁর বুঝতে দেরী হল না। তাঁর করুণাসিক্ত মন তাই এই প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করতে তৎপর হয়ে উঠল। তিনি সোজা তদানীন্তন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে এবিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে

সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন। বারাণসীতে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা হিন্দু বৃদ্ধা নারীর কত আকর্ষণের বস্তু তার উল্লেখ করে বারাণসীতে তাদের জন্য আশ্রয় স্থান স্থাপন করবার অনুরোধ জানালেন। পন্থজী ছিলেন কাজের মানুষ। মাস দু'য়ের মধ্যেই উত্তর এল, যে এই বৃদ্ধা নারীদের বারাণসীতে বাসের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য ব্যয়ভার বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার, কারণ উদ্বাস্তু সমস্যা তাদেরই বিশেষ দায়। এদের জন্য ব্যবস্থা এবং দেখাশোনার ভার নেবেন উত্তর প্রদেশ সরকার। কয়েক শত উদ্বাস্তু বিধবা নারীর এইভাবে বারাণসীতে থাকবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। এখন আমাদের কাছে অনুরোধ এল তাদের পাঠিয়ে দিতে।

যাদের পাঠান হবে তাদের নির্বাচনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থায়ী আশ্রয় শিবিরের বৃদ্ধা মহিলারা উৎসাহী হয়ে বারাণসী যাবার আবেদন জানালেন। এইভাবে প্রায় শ' পাঁচেক মহিলা যাবার জন্য নির্বাচিত হলেন। তাঁদের যাবার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হল। যাবার তারিখ ঠিক হল ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়। তাই বলেছিলাম, এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন। যাঁরা এই স্পেশাল ট্রেনে সেদিন বারাণসী গেলেন, তা তাঁদের কাছে যেমন অভাবনীয়, তেমনি সর্বাত্মকভাবে তৃপ্তিদায়ক। জীবনের প্রান্তে এসে যখন জীবনের সকল বন্ধন, সকল আকর্ষণ শিথিল হয়ে এসেছে, সে অবস্থায় সেকালের আদর্শে মানুষ, হিন্দু বৃদ্ধার চোখে এর থেকে বড় আকর্ষণের বস্তু আর কিছু থাকতে পারে না।

এঁদের গাড়িতে তুলে দেবার জন্য পুনর্বাসন বিভাগের অনেক কর্মী সেদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন। বিষয়টির অভিনবত্বর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিলেন।

আমরা প্রতি গাড়িতে ঘুরে ঘুরে এই বৃদ্ধা মহিলাদের সঙ্গে দেখা করেছি। পাথেয় হিসাবে তাঁদের সকলকে নূতন কাপড়চোপড় বিতরণ করা হয়েছে। এক রাত্রের পথ। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রত্যেককে কয়েকটি কমলা লেবু দেওয়া হয়েছে। আমরা যাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছি, বারাণসী যেতে কেমন লাগছে, তিনিই উৎসাহভরে উত্তর দিয়েছেন, খুব ভাল লাগছে। তা যে শুধু মুখের কথা নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার কথা, তার সাক্ষ্য তাঁদের মুখের প্রসন্নতা সুন্দর বহন করছে।

গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে এল। প্রথম ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। এখন বিদায় নেবার পালা। আমি যে গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তার দরজার কাছে যে মহিলা যাত্রীটি বসেছিলেন, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, একবার কাছে এস বাবা।

তাঁর কাছে গেলে তাঁর পাশে যে কমলালেবুগুলি ছিল, তার একটি তুলে নিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে বললেন, এটা নাও।

তা যে তাঁর স্নেহের দান, তা বুঝতে আমার দেরী হল না।

আমি সেই দান একান্ত শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলাম।

তারপর তিনি বললেন, দেখ বাবা, তুমি আমার উপযুক্ত ছেলের কাজ করেছ। তুমি আমায় কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলে। প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। এই বলে আরও কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

তারপর যা করে বসলেন, তা অভাবনীয়। আমার প্রতি উচ্ছলিত স্নেহের উচ্ছ্বাসে আবেগের বসে আমার মুখখানা হাত দিয়ে ধরে চুমা খেলেন। তাঁর সেই স্নেহের অভিব্যক্তি আমাকে অভিভূত করল। চোখের জল নিরোধ করতে আমার রীতিমত কষ্ট পেতে হয়েছিল।

এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে আমার সেদিন মনে হয়েছিল, উদ্বাস্তু বিভাগ আর্তত্রাণের জন্য যা কিছু কাজ করেছে, তার মধ্যে এর মত তৃপ্তিদায়ক আর কোন কাজ বোধহয় হয় নি।

পাঁচ

এই বছর ১৪ই মার্চ আমি হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলাম। অসুখের একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। জ্বরের থেকে শরীরের অবসাদবোধই বেশি প্রকট লক্ষণ। জ্বর সাত-আট দিন পরে ছেড়ে গেল, কিন্তু অবসাদবোধ কাটল না। সমস্ত শরীর কি রকম হালকা মনে হয়, মাথা ঘোরে, শিরদাঁড়া দিয়ে প্রকট অস্বস্তিকর শিহরণ তরঙ্গায়িত হয়। আমি কাজ করবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম।

ডাক্তার বললেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য ও ভাইটামিনের ব্যবস্থা দিলেন। অগত্যা আমার ৩১শে মে পর্যন্ত ছুটি নিতে হল। স্বাস্থ্য এক রকম ভেঙে যাওয়ার জন্য আমার শরীরকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। প্রায় তিন বছর ধরে যেভাবে অবিরাম কাজ করতে হত, তাতে স্বাস্থ্যের বিরূপ হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক ঘুমের সময় ছাড়া সকল সময় আমার আপিস সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকতে হত। নিজের অবসর সময় বলে কিছু ছিল না। একসঙ্গে উদ্বাস্তু সচিব এবং পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষের দায়িত্ব সম্পাদন করতে আমার রোজ দুটি অফিসে যেতে হত। রাইটার্স বিল্ডিংএ সচিবের কাজ শেষ করতে আমার প্রায় ছ'টা বেজে যেত। তারপর অকল্যাণ্ড রোডে পুনর্বাসন মহাকরণে গিয়ে ওখানকার ফাইলগুলির ওপর নির্দেশ দিতে হত। ফলে বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হয়ে যেত। এই রকম বছরের পর বছর চললে শরীর না ভাঙাই আশ্চর্য।

সৌভাগ্যক্রমে মে মাসের শেষে আমার শরীর আবার সুস্থ হয়ে উঠল। শেষ সপ্তাহে রাইটার্স বিল্ডিংএ ডাঃ রায়ের সহিত দেখা করতে গেলাম এই কথা জানাতে যে আমি কাজ করার ক্ষমতা আবার ফিরে পেয়েছি।

আমাকে সুস্থ দেখে তিনি খুশি হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন বিভাগে কাজ করবে বল।

আমি উত্তরে জানালাম, আমার এ বিষয় কিছু বলবার নেই, তিনি যে বিভাগে কাজ দেবেন, সেখানেই কাজ করতে প্রস্তুত আছি।

তিনি তখন বললেন, তাহলে তুমি পুরানো কাজেই ফিরে যাও।

সুস্থ হবার পর এইভাবে আমি আবার পুনর্বাসন বিভাগের কাজ নূতন করে গ্রহণ করলাম। আমার অসুখের সময় শ্রীনির্মলকান্তি রায়চৌধুরী আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন। আমি ফিরে আসার পরও তিনি আমাদের বিভাগে অতিরিক্ত সচিব এবং অতিরিক্ত মহাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হলেন। ফলে আমার কাজের খানিক অংশ তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। আমিও আংশিকভাবে ভারমুক্ত হলাম।

এই সময়ে তাহেরপুরের উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক বছরের ওপর তারা পুনর্বাসন পেয়েছে। এ জায়গাটি উপনগরী হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় এখানে যারা পুনর্বাসন পেয়েছিল, তাদের পুনর্বাসনের ঋণের পরিমাণ বেশি ছিল। গৃহনির্মাণ ঋণের হার ছিল স্যানিটারি পায়খানার খরচ সমেত ১৪৫০্ টাকা। ফলে অনেকে দুখানা ছোট ঘরের পাকা বাড়ি করতে পেরেছিল। ব্যবসায় ঋণ হিসাবে প্রতি পরিবার ৭৫০্ টাকা পেয়েছিল। এরা যে আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করে নি তা নয়। এদের অনেকে ঘোড়া কিনে গাড়ি চালিয়ে ভাড়া খাটাত। অনেকে দোকান দিয়েছিল। প্রতি নূতন কলোনিতেই জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি খরচে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হত। তার শিক্ষক হিসাবে কিছু মানুষ কাজ পেত। কিন্তু এদের একটা বড় অংশ কোন রকম ব্যবসায়ের সাহায্যে স্বাবলম্বী হবার ক্ষমতা রাখত না। কাজেই ব্যবসায় ঋণ সংসারের খরচ চালানয় ব্যয়িত হয়ে তারা দুরবস্থায় পড়েছিল।

এ অবস্থায় তারা নূতন করে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল ; কিন্তু তার ব্যবস্থা না থাকায় দেওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে তারা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এসে দল বেঁধে দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়েছিল। এখানে আন্দোলন চালানর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি কাছে থাকায় সহজেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। এই কলোনির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল জয়েণ্ট কমিশনার বিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপুর ; কিন্তু তিনি এদের জন্য কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। ফলে এদের বিক্ষোভ থামল না।

ঠিক এই সময়ে পুনর্বাসনের কাজে সহায়তার জন্য একাধিক বেসরকারি কর্মীকে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে তিন জনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কারণ, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তাঁদের বিষয় পরেও উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শ্রীনিখিল সেন। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। একদা অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা এখানেই অর্জিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি নাকি ইতালিতে যুদ্ধবন্দীদের আশ্রয় শিবির তত্ত্বাবধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। পরে সাংবাদিকের কাজ করতেন। ইনি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ নিয়ে এখানে কাজ পেয়েছিলেন। ভদ্রলোকের কর্মক্ষমতা যে খুব ছিল বলা যায় না, তবে আচরণে অতিশয় ভদ্র ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের আশ্রয় শিবিরের তত্ত্বাবধান করতেন।

দ্বিতীয় নূতন নিযুক্ত অফিসার ছিলেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস। ইনি উচ্চশিক্ষিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। কংগ্রেস মহলে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তৃতীয় অফিসারের নাম শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি রাজনৈতিক কর্মী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ডঃ কেশকারের পরিচয়পত্র নিয়ে কংগ্রেস নেতা শ্রীরেণুকা রায়ের সুপারিশে উদ্বাস্তু বিভাগে কাজ পেয়েছিলেন। এঁদের দুজনেরই কর্মক্ষমতা ছিল, তবে আমরা তাঁদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পারতাম না।

তাহেরপুরের উদ্বাস্তুদের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আন্দোলন যখন খুব বাড়তে লাগল তখন শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস সোজা ডাঃ রায়ের কাছে প্রস্তাব করলেন তিনি তাদের তত্ত্বাবধানের ভার পেলে তাদের আন্দোলন হতে নিরস্ত করতে পারেন। ডাঃ রায় তাঁকে সেই ভার দিয়েছিলেন এবং তাদের সহিত তাঁর আলাপ-আলোচনার ফলে এ আন্দোলন উঠে গিয়েছিল।

তাহেরপুরের ব্যাধি কিন্তু দুরারোগ্য ছিল এবং পরেও এখানকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে আন্দোলন চলেছিল। এর মূল কারণ হল এখানে একটা বড় দল আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে নি। এদের আর্থিক উন্নতির জন্য পরে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি এখানকার নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন এবং যতখানি সম্ভব তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করতে চেষ্টা করতেন।

এখানকার মূল সমস্যা ছিল বেকার সমস্যা। তার নানাভাবে সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। প্রথমত চাকুরি দিয়ে সাহায্য করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত এখানে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে নানা কারিগরি শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে শেখান হয়েছিল। মেয়েদের জন্য জামা তৈরির কাজের ব্যস্থা হয়েছিল। শিক্ষার শেষে কাজে নিযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এখানে উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। উৎপাদিত জামাগুলি বিপণনে অসুবিধা হত না; কারণ উদ্বাস্তু বিভাগই সেগুলি কিনে নিয়ে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলি করত। পুরুষদের জন্য এখানে একটি কাঠের কাজের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এই উপনগরীর উন্নয়নের জন্য রাস্তার মাটি কাটা বা পুকুর কাটার কাজে এদের নিয়োগ করা হয়েছিল। একটি কাপড়ের কল স্থাপনেরও চেষ্টা হয়েছিল। তবে তা শেষ পর্যন্ত কাজে রূপায়িত হয় নি। নিকটবর্তী উপনগরী ফুলিয়াতে অবশ্য একটি কাপড়ের কল স্থাপন করা হয়েছিল। পরে এখানে অম্বর চরকা ব্যবহার করে একটি সূতা উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে এখানকার উদ্বাস্তুরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিল।

(৩)

কলিকাতার সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে যে অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সব থেকে সহজ তা আমরা বুঝেছিলাম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাহেরপুরের

পুনর্বাসনের সমস্যা সে কথা আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি সরকারের ওপর পুনর্বাসনের জন্য নির্ভরশীল ছিল না তারা আপনা হতেই সে কথা বুঝেছিল।

যারা চাষ করে খায় তারা জীবিকার জন্য কৃষি সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, যদি তাদের চাষের উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করে দেওয়া যায়। এই কারণেই দেখা গিয়েছে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা এক দিকে সহজ। বরং তারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। যারা মৎস্যজীবী তাদের সম্পর্কেও সেকথা খাটে। মাছ ধরবার সুবিধা আছে এমন স্থানে বসতে পারলে, তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে। যারা পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক তাদের সম্পর্কেও সেকথা খাটে। এ শ্রেণীতে প্রধানত পড়ে তাঁতি সম্প্রদায়। তারাও তাঁত পেলে আর কাপড় বোনবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সুতো পেলে বস্ত্র উৎপাদন করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। কারণ আমাদের দেশে এখনও তাঁতের কাপড়ের প্রচুর চাহিদা আছে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদের পুনর্বাসনের সোজা পথ চাকুরি। যারা অল্প শিক্ষিত তাদের কোন পথ খোলা নেই। কোন কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করলে হয়ত একটা নূতন পথ খুলে যায়। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করবার সময় কোথায়? এক্ষেত্রে তারা যে সহজ পথ বেছে নিল, তা হল অপটু হয়েও কায়িক পরিশ্রমের কাজে যোগ দেওয়া। সেটা সম্ভব হয় কারখানা অঞ্চলে। সেখানে কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা না থাকলেও শ্রমিক হিসাবে কাজ যোগাড় করে নেওয়া যায়। আর একটা উপায় আছে। নানা পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা করেও অল্প মূলধনে জীবিকা অর্জন করা যায়। সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতার দক্ষিণে রবীন্দ্র সরোবরে কত উদ্বাস্তু যুবক খালি ছোলা আর বাদামভাজা বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করে তা দেখবার মত। কিন্তু এ দুটো সম্ভব হয় কেবল ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে। অর্থাৎ কলিকাতার সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে বা কলিকাতায় বাস করলে সেটা সম্ভব হয়। সেই কারণেই এই শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বৃহত্তর কলিকাতার মধ্যেই বাস করতে চেয়েছিল।

কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহ করতে পারলে জীবিকা নির্বাহের পথ খুলে যায় এই বোধ মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে এই কারণে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু বৈধ উপায়ে তো অল্প ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যেখানে সম্ভব হয় সেখানেও তো তা ব্যয়সাপেক্ষ। সেই অর্থব্যয় করবার মত সামর্থ্য এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের মধ্যে খুব কম মানুষেরই আছে। অপর পক্ষে কলিকাতার আশেপাশে অনেক খালি জমি পড়ে আছে যেখানে কলোনি স্থাপন করা যায়। সাধারণত এই জমির মালিক কোন

অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি। সম্ভবত তিনি এই জমি ফেলে রেখেদিয়েছেন মূল্য বাড়লে পরে বিক্রয় করে ভাল লাভ করবেন এই আশায়। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে তো এই ধরনের জমি প্রচুর ছিল; যেখানে লাভের উদ্দেশ্যেই মালিক বিস্তৃত জমি কিনে ফেলে রেখে দিতেন। অবশ্য ছোট ছোট খণ্ড জমিও তার মধ্যে ছিল যা কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আর্থিক সঙ্গতি হলে পরে বাড়ি করবার জন্য কিনে রেখে দিয়েছিলেন। তবে তাদের সংখ্যা তুলনায় কম।

এই পরিস্থিতি হতেই জবরদখল কলোনি গড়ে তোলবার প্রেরণা এসেছিল। একদিকে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাবোধ, অপর দিকে অনধিকৃত খালি জমির ছড়াছড়ি। খালি জমি দখল করলেও তা অনধিকার প্রবেশ হয় এবং আইন লঙ্ঘন করার সামিল হয়। কিন্তু যে অস্বাভাবিক পরিবেশে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তখন এদেশে এসেছিল তাতে এই নৈতিক বাধার শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপৎকালে মানুষের নীতিবোধ শিথিল হয়ে যায়। অপর পক্ষে অনেক মানুষের একই ধরনের প্রয়োজনবোধ তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। ফলে আইনসঙ্গত নয় এমন কাজ করতেও তাদের বাধা থাকে না। দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষেও এ অবস্থায় জবরদখলের চেষ্টায় বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না; বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবিষয়ে সহানুভূতিশীল হতে হয়। কাজেই সব দিক হতে পরিস্থিতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে ব্যাপক হারে কলিকাতার সংলগ্ন এলাকায় খালি জমি জবরদখল করে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলবার উৎসাহ মিলে যায়।

এইভাবেই জবরদখল কলোনি সৃষ্টি হয়। যাদবপুর বিজয়গড় কলোনি ঠিক এ পর্যায়ে পড়ে না। এবিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তা গড়ে উঠেছিল গত মহাযুদ্ধে হুকুমদখল করা সরকারি জমির ওপর সরকারের মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে। এই অঞ্চলে ঠিক তারপরেই খালি জমি জবরদখল করে অনেকগুলি কলোনি স্থাপিত হয়েছিল। গান্ধী কলোনি এবং নেহেরু কলোনি তাদের অন্যতম। একবার ডঃ কাটজু ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই পথ পরিত্যক্ত হয়। সে বিষয়ও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব নয় বলে তা সফল হয় নি।

তারপর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে যখন ব্যাপক হারে উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাঙলায় আগমন শুরু হল, তখন জবরদখল কলোনী অতি দ্রুত নানা স্থানে গড়ে উঠতে লাগল। এ ব্যাপারে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি খুব তৎপরতার সহিত কাজ করত। আজ যে মাঠ খালি পড়ে আছে কাল ভোরে দেখা গেল সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার তাদের মালপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। এর পেছনে যে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকত তা অনুমান করে নেওয়া যায়। স্থানটি আগে নিশ্চয় জরিপ করা হয়ে গিয়ে থাকবে। তারপর এক প্ল্যানও প্রস্তুত হয়ে থাকবে। কারণ, জমি দখল

নেবার সঙ্গে সঙ্গেই জরিপ করে বিভিন্ন দাগে তা খুঁটির সাহায্যে চিহ্নিত হয়ে ভাগ হয়ে যেত। বিভিন্ন পরিবার নিজ নিজ দাগ দখল পাবার সঙ্গেই চারখানি খুঁটি পুঁতে জায়গাটি হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে সেখানেই বাস করতে আরম্ভ করত। তারপর ধীরে ধীরে সেখানে পরিবারের সাধ্যমত স্থায়ী বাড়ি তোলা হত। সাধারণত তার দেয়াল হত দরমার এবং ছাদ টালির। কারণ, যারা জবরদখল করে কলোনি গড়ত, তাদের আর্থিক সঙ্গতি যৎসামান্যই।

এইভাবে অতি দ্রুত গতিতে জমি দখল হয়ে এক রকম রাতারাতি উদ্বাস্তু কলোনিতে পরিবর্তিত হওয়ায় মালিকের বাধা দেবার সুযোগই আসত না। জানলেও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া সম্ভব হত না। পরে অবশ্য দেওয়ানি মকদ্দমা আনা যেত, কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রদ হতে পারত না। এতগুলি পরিবার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের মকদ্দমার পক্ষভুক্ত করাই তো এক কঠিন বাধা। সরকারও এই দুঃসময়ে মালিকের স্বার্থে উদ্বাস্তুদের বাধা দেবার কোন জোরাল যুক্তি পান নি।

এইভাবেই ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে যা শুরু হয় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তা ব্যপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যতগুলি জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল, সে-সবই ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। এর পর আর নূতন কলোনি গড়ে উঠেছে বলে আমার জানা নেই। তার কারণ যত সম্ভাব্য জমি খালি অবস্থায় পড়েছিল তা এর মধ্যে সবই দখল হয়ে যায়। তারপর আর বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে জবরদখল কলোনি গড়বার জন্য জমি ছিল না।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের অকটোবরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে জবরদখল কলোনিগুলির একটি তালিকা সরজমিনে তদন্তের পর রচিত হয়। তাতে দেখা যায় বৃহত্তর কলিকাতায় সবশুদ্ধ ১৩৩টি জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল। তাতে মোট দু' হাজার একর জমি জবরদখল করে ২১,৩৭৭টি পরিবারের বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। কলোনিগুলি ছিল নানা আকারের। ছোট কলোনির পরিবারসংখ্যা ৪০ হত এবং বড় কলোনির পরিবারসংখ্যা কোথাও কোথাও এক হাজারের ওপর হত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিরাট আকারের কলোনির নাম করা যেতে পারে:—

শহিদ যতীন দাস কলোনি, বেলঘরিয়া অবস্থিত; পরিবার সংখ্যা ৪৩১৫
বিজয়নগর কলোনি, নৈহাটিতে অবস্থিত; পরিবার সংখ্যা ৪১২৩
নেতাজীনগর কলোনি, যাদবপুর অঞ্চল বাদে রায়পুরে অবস্থিত; পরিবার সংখ্যা ৪৪২৩
বিবেকনগর কলোনি, যাদবপুরের নিকটে অবস্থিত; পরিবারসংখ্যা ২৭৫৭

এইসব কলোনিগুলি একটি পরিকল্পনা অনুসারে গড়া হয়েছিল। রাস্তার জন্য জমি রাখা হয়েছিল, দুঃখের বিষয় চওড়া রাস্তার সাধারণত ব্যবস্থা রাখা হয় নি।

সম্ভবত লক্ষ্য ছিল যত বেশি পরিবারকে জায়গা দেওয়া যায় তার দিকে। খেলার মাঠের ব্যবস্থা ছিল এবং বড় বড় কলোনিতে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি রাখা হয়েছিল।

সুতরাং এইভাবে এতখানি গড়ার কাজ এগিয়ে গেলে কতকগুলি মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের ভাঙার কথা ভাবা যায় না। অপর দিকে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে এইভাবে অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবরদখল করে বসতি স্থাপন ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নীতির দিক হতে দেখলে তাকে আইনানুমোদিত না হলেও সমর্থন না করা শক্ত হয়ে পড়ে। যারা জমি সংগ্রহ করে ফেলে রেখেছিল, তাদের প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল লাভ করবার। কলিকাতার জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাড়ি করবার প্রয়োজন হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতার বিস্তার ঘটবে। তখন জমির সেই কারণে চাহিদা বাড়বে এবং অধিক মূল্যে জমি বিক্রয় হলে মোটা মুনাফা মালিকের ঘরে আসবে। এই জমি জবরদখল করার ফলে মালিকের দিকে ক্ষতি সামান্যই। সে কেবল স্বাভাবিক নিয়মে জমির মূল্যবৃদ্ধিহেতু যে লাভটা উপার্জন না করে পেত, তা হতে বঞ্চিত হবে।

অপর পক্ষে যে অগণিত মানুষ ভাগ্যদ্বারা বিড়ম্বিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে আশ্রয়ের জন্য এদেশে এল, তারা একটি স্থায়ী আশ্রয় লাভ করল। শুধু কি আশ্রয়? বাসস্থানের অবস্থিতির গুণে পরিবারের ভরণপোষণের পথ সহজ হয়ে গেল। ফলে এতগুলি পরিবার প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণভাবে নূতন পরিবেশে পুনর্বাসন পেল। অল্প মানুষকে অনুপার্জিত লাভ হতে বঞ্চিত করে এতগুলি মানুষের এতখানি কল্যাণ-সাধন যে কাজে সম্ভব, নীতির দিক হতে তাকে সমর্থন না করে উপায় থাকে না।

এদিকে সরকারের পক্ষ হতে দেখতে গেলে তা এই দুঃসময়ে সরকারকে দায়িত্বের এক বিরাট বোঝা হতে মুক্ত করেছিল। এই পরিবারগুলি যদি অন্যের জমি দখল করে নিজেরাই জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে আত্মনির্ভরশীল না হয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকত, তাহলে সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বেড়ে যেত। হিসেব করে দেখা গেছে ২১,০০০ এর বেশি পরিবার জবরদখল কলোনিতে আশ্রয় পেয়ে জীবিকার পথ খুঁজে নিতে পেরেছিল। সুতরাং এতগুলি পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করতে হত। উপরন্তু এতগুলি পরিবারের জন্য জমি সংগ্রহ করে পুনর্বাসন ঋণ দিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল হবার ব্যবস্থা করতে হত। সুতরাং সামান্য আইনবিরোধী কাজ করে তারা সরকারকে কত বড় দায়িত্ব হতে মুক্তি দিয়েছে। ফলে সরকারের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য এবং অর্থশক্তি, যারা নিতান্তই সরকারের ওপর নির্ভরশীল তাদের জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

আর একটা দিক এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যে জমি জবরদখল হল তার মালিকের এই বে-আইনী কাজে যে ক্ষতি হল তা সীমাবদ্ধ। মালিক এই জমি কিনেছিল অল্পমূল্যে, এই আশায় যে জমির মূল্য যখন আশানুরূপ বাড়বে তখন বিক্রয় করে একটা লাভ করবে। এক্ষেত্রে লাভের অংশ বাদ দিয়ে তাদের জমির ন্যায্য মূল্য যদি তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাদের আর কোন ক্ষতির প্রশ্ন থাকে না। অপর পক্ষে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি জবরদখল করেছে, তাদের দিক থেকে একটা মস্তবড় সুবিধা হয়। তারা যে জমি দখল করেছে তার ওপর তারা টাকা খরচ করে বাড়ি তুলেছে। অথচ জমির ওপর তাদের কোন স্বত্ব নেই। তারা একটা অনিশ্চিত অবস্থায় শুধু পড়ে না, তাদের সম্পত্তিরও বাজারে বিশেষ মূল্য থাকে না। প্রয়োজন হলে সেই বাড়ি বন্ধক রেখে তারা ঋণ তুলতে পারবে না। সুতরাং জমির মালিকদের ন্যায্য মূল্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে যদি তা উদ্বাস্তুদের অর্পণ করা যায়, তাহলে সব দিক হতেই সুবিধা হয়। কাজেই সকল দিক হতেই জবরদখল কলোনিগুলিকে বৈধী-করণ করা আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবেই জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনিগুলির বৈধীকরণের প্রশ্নটি সরকারি মহলে এসেছিল। এবিষয়ে কিছু করতে হলে সরকারেরই অগ্রণী হয়ে করতে হয়। অর্থাৎ সহজ এবং আইনসিদ্ধ পথ হল জবরদখল কলোনিগুলিকে প্রথম পর্যায়ে হুকুমদখল করে মালিকদের ক্ষতি পূরণ দেওয়া। তার ফলে জমির ওপর মালিকদের স্বত্ব লোপ হবে এবং সরকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর সরকার জবরদখলকারী পরিবারকে তার উদ্বাস্তু অবস্থার প্রমাণ দিতে পারলে তার দখলী জমি অর্পণ করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল সরকার এবিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি না?

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা একদিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে উঠে পড়ল। তিনি আমাকে বললেন, সরকারের এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং তার সপক্ষে একটি জোরালো যুক্তি দিলেন। তিনি সংক্ষেপে বললেন, এই পরিবারগুলি যদি পুনর্বাসনের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হত, তাহলে তো তাদের জমি কেনার এবং গৃহ নির্মাণের ঋণ এবং ব্যবসায় ঋণ বাবদ বেশ কিছু টাকা সরকারের খরচ করতে হত। এখন যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান করেছে, তাই এদের ওপর কিছু খরচ করতে হয় নি। নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে তাদের জবরদখলকে বিধিসম্মত করতে এইটুকু সাহায্য কি করা উচিত নয়?

এমন সবল যুক্তির কাছে নতি-স্বীকার না করে উপায় নেই। ডাঃ রায়ের কাছে যখন এই প্রস্তাব স্থাপিত হল তিনি তা গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নীতি গ্রহণ করান শক্ত হল না।

এখন হিসাব করে দেখা গেল যে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের কম পক্ষে যে টাকা দেওয়া হয় তার পরিমাণ ১২৫০ টাকা। এখন এই পরিমাণ টাকা অন্ততঃ জবরদখল জমি বৈধীকরণের জন্য খরচ করা যেতে পারে। এখন দেখা গেল প্রতি পরিবারের রাস্তার জন্য জমি সমেত গড়ে চার কাঠা মত জমি লাগে।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিধি অনুসারে সরকার জমির জন্য বাজারমূল্য দিতে বাধ্য নন; ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে অর্থাৎ দেশবিভাগের ঠিক আগে যে মূল্য ছিল, তাই দিতে বাধ্য। তাতে দেখা গেল ২১,০০০ পরিবারের মধ্যে ১০,৫০০ পরিবারকে পরিবারপিছু ১২৫০ টাকা জবরদখল জমির ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় করে বৈধভাবে দখল দেওয়া যায়। সুতরাং প্রথম অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে কলোনিগুলি পরিবারপ্রতি ১২৫০ টাকা পর্যন্ত খরচ করে বৈধ করা যায়, তাদের আগে নেওয়া হক।

এই সঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে পরে পরিবারপিছু ব্যয়ের হার বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছিল।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে তিনটি কলোনির বৈধীকরণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল নৈহাটির নিকটে অবস্থিত বিজয়নগর কলোনি এবং উত্তর কলিকাতার নিকট অবস্থিত দেশপ্রিয়নগর কলোনি এবং শহিদ যতীন দাস কলোনি। এগুলি বৃহত্তম কলোনির শ্রেণীতে পড়ে। শ্রীনিখিল সেনকে এই কাজের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

(৪)

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতে নূতন সংবিধানের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। পশ্চিম বাঙলায় কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ওপর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ভার পড়ল। এতদিন তিনিই পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসাবে আমাদের দপ্তরের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। নূতন নির্বাচনের পর পুনর্বাসন বিভাগের সহিত আর তিনি সংযোগ রাখলেন না। শ্রীরেণুকা রায়কে মন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁর ওপর পুনর্বাসন দপ্তরের ভার দিলেন। অধিকন্তু তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তিনি দু'জন উপমন্ত্রী পেলেন—শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন ও শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায়। সুতরাং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি হতে আমাদের এই নূতন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজ করা শুরু হল।

নূতন মন্ত্রী শুরুতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে পুনর্বাসন সমস্যার নানা জটিল দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিলেন। তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর কলোনি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই সূত্রেই ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তাঁর চৌহাটা কলোনি পরিদর্শনের ব্যবস্থা হল।

এই কলোনিটির একটি বিশেষত্ব ছিল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোলমালের সময় যত তাঁতি উদ্বাস্তু পরিবার সরকারের আশ্রয় শিবিরে স্থান নিয়েছিল; তাদের মধ্যে একটা বড় দল এখানে পুনর্বাসন নিয়েছিল। আর একটি ক্ষুদ্রতর দল পুনর্বাসন নিয়েছিল বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার নিকটবর্তী গ্রাম মুড়াদিহিতে। চৌহাটা কলিকাতার কাছেই যে পথ দক্ষিণে গড়িয়া হয়ে মথুরাপুরের দিকে চলে গেছে তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রাজপুর মিউনিসিপালটি পার হয়েই আমরা চৌহাটা পাই। জায়গাটি ঠিক সমতল নয়। তার একটি ভৌগোলিক কারণ আছে। ভাগীরথী এখন যে পথে প্রবাহিত কয়েক শত বৎসর আগে নাকি তা সে পথে প্রবাহিত ছিল না। আদি গঙ্গা যেখান দিয়ে একটু দক্ষিণ-পূর্ব ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে ওই পথেই নাকি তা প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর বোড়াল গ্রামের কাছ হতে তা দক্ষিণমুখে প্রবাহিত ছিল। পরে কোন বিশেষ কারণে নদীর পথ পরিবর্তিত হলে ভাগীরথীর এই অংশ নাকি মজে যায়। এখানে যে সম্ভবত এককালে একটি নদী প্রবাহিত ছিল তা এখানকার ভূমির আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। গড়িয়া ছেড়ে যে রাস্তা জয়নগরের দিকে চলে গেছে তার পশ্চিম ধার বরাবর সমান্তরালভাবে একটি আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত নিচু জমি দেখা যায়। তার দুই পাশের জমি তার থেকে বেশ খানিকটা উঁচু এবং কোন কোন স্থানে খাড়াভাবে উঁচু। এইসব দেখে মনে হয় এখানে যেন এককালে একটি নদী প্রবাহিত ছিল এবং তা শুকিয়ে গিয়ে এই খাদ সৃষ্টি হয়েছে।

এই খাদের ওপর চৌহাটা অবস্থিত। তাই তা সমতলভূমি নয়। তার কোন অংশ নিচু, কোন অংশ উঁচু। এই কারণে ভূমির আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে কলোনিটি চারটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। একই সমতল অংশে যতগুলি পরিবারের স্থান দেওয়া যায় তাই নিয়ে একটা পাড়া গড়ে উঠেছে। তাতে সমগ্র কলোনিতেই কেবল তাঁতি পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তার একট কারণ ছিল। দক্ষ কারিগর হিসাবে তাদের জীবিকার একটা উপায় ছিল। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি স্থানের যেখান হতে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র সহজেই বিক্রয় হতে পারে। এখন পশ্চিম বাঙলায় তাঁতের কাপড়ের সব থেকে বড় পাইকারি হাট হল হাওড়া ময়দানের হাট। এখানে ফরাসডাঙ্গার শাড়ি বা ধনিয়াখালির শাড়ি পর্যন্ত পাইকারদের কাছে বিক্রয়ের জন্য তাঁতিরা আমদানি করে। জায়গাটা হাওড়া হাটের খুব কাছে বলেই তাঁতিদের তার প্রতি এত আকর্ষণ।

বিশেষ ধরনের কলোনি দেখবার জন্যই নূতন মন্ত্রী মহোদয়ার এখানে আসবার আগ্রহ। কলোনি দেখে মনে হয়েছিল এখানে যারা পুনর্বাসন নিয়েছে তারা খানিকটা দাঁড়িয়ে গেছে। সেটা তাদের আচরণ হতেই বোঝা যায়। নূতন মন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য তাদের প্রচুর উৎসাহ। বিভিন্ন পল্লীতে ঘরে

ঘরে তাঁকে নিয়ে যাবার আগ্রহ। প্রতি পরিবারের ঘরেই তাঁত বসান। তাতে কত ধরনের কাপড় বোনা হচ্ছে তা দেখাবার জন্য তাঁকে নিয়ে টানা-টানি পড়ে গেল।

তখন বর্ষাকাল। কাজেই পথ কর্দমাক্ত। কাজেই তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি বাড়ি যেতে রীতিমত পরিশ্রম হয়। এক পল্লী শেষ হল ত আর এক পল্লীতে নিয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। আমার মনে হচ্ছিল এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাই তাঁকে বেশি টানাটানি না করতে পল্লী-বাসীদের অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি শুনলেন না; তাদের খুশি করবার জন্য মনে মনে তিনি দৈহিক কষ্ট মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব আমার ভালই লাগল। যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের অবস্থা অসন্তোষজনক নয় দেখে সেদিন তিনি তৃপ্ত হয়ে ফিরেছিলেন।

এর পরেই যে ব্যাপারটি তাঁর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল তাহেরপুরের পুনর্বাসন ব্যাপার। তাহেরপুরের মানুষের আথিক দুরবস্থার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তা নিয়ে যখন ডাঃ রায়ের বাড়ীর সামনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তাহেরপুরের উদ্বাস্তুরা আন্দোলন চালায় তখন নূতন নিযুক্ত উদ্বাস্তু বিভাগের কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ এবিষয়ে মধ্যস্থতা করবার ভার নিয়েছিলেন। মন্ত্রী পরিষদ পরিবর্তনের পর শ্রীরেণুকা রায় যখন পুনর্বাসন বিভাগের ভার পেলেন স্বভাবতই তাহেরপুরের সমস্যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি কলোনি দেখাশোনার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের পরিবর্তে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদের সহিত সংযোগ রক্ষার ভার দিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। তারপর থেকে একরকম সোজাসুজি শ্রীমতী রায়ের নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর কাজ সম্পাদিত হতে লাগল।

(৫)

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে পূর্বপাকিস্তানে ফসল ভাল না হওয়ায় তার কতকগুলি জেলায়, বিশেষ করে খুলনায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই অনটনের অবস্থায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বাস্তুত্যাগের ইচ্ছা ক্রীয়াশীল হয়। তাদের অনুযোগ হল তাদের দুর্দশায় সরকারের পক্ষ হতে উপযুক্ত ত্রাণমূলক ব্যবস্থা করা হয় নি এবং সেই কারণেই বাধ্য হয়ে অনশনে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য তারা দেশত্যাগী হয়েছে। এ ধরনের কারণ আগে কোন দিন দেখান হয় নি, তবে একথাও ঠিক যে তা দেশবিভাগের আনুষঙ্গিক ফল। এই কারণে এই বছরের মাঝামাঝি হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার আবার ক্রমশ বেড়ে যায়। নূতন ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদের আগমনের

হার কমে যায়। তাই দেখা যায়, ওই বছর ডিসেম্বর মাসে আশ্রয় শিবিরে নূতন আগত উদ্বাস্তর সংখ্যা নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১২৬২তে। এই অবস্থাঘটিত প্রমাণই ইঙ্গিত করে যে সত্যই এই বছর উদ্বাস্তদের আগমনের হার বৃদ্ধির কারণ অন্য কিছু নয়, শস্যহানি।

উদ্বাস্তদের আগমনের হার কমায় উদ্বাস্তু বিভাগ একটু স্বস্তিবোধ করছিল। ত্রাণের কাজ হতে পুনর্বাসনের কাজে ভাল করে মন দেওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু নূতন মন্ত্রীর ভাগ্যে এই অনুকূল অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। এবার একটা সম্পূর্ণ নূতন কারণে উদ্বাস্তদের আগমনের হার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

কারণটা হল পাকিস্তান সরকারের পাসপোর্ট চালু করার সিদ্ধান্ত। পাঁচ বছর দেশ বিভাগ হয়ে গিয়েছে। পুরাতন ব্রিটিশ ভারত ভেঙে দুটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। তবু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত করতে রাষ্ট্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। যখন যার খুশি উভয় রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারত। এখন পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত করলেন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত পাসপোর্ট বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। বাধ্য হয়ে ভারত-সরকারও অনুরূপ বিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে ভারতনিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কোন আশঙ্কা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের মধ্যে একটা তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হল। এই উত্তেজনার কারণ হল এই আতঙ্ক যে পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তনের পর পাকিস্তান ইচ্ছামত ত্যাগ করা যাবে না এবং ভারতে প্রবেশের পথ বিচ্ছিন্ন হবে। এই নূতন নিয়ম প্রবর্তনের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৫ই অক্টোবর ১৯৫২। কিন্তু তার কয়েক মাস আগে হতেই তা ক্রীয়াশীল হয়ে উদ্বাস্তদের আগমনের হার বেশ পরিবর্ধিত করে। ক্রমশ তা বাড়তে বাড়তে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিরাট আকার ধারণ করে। তখন কিছুদিনের মত তা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকের দারুণ দুঃসময়ের দিনগুলির সহিত তুলনীয় হয়েছিল।

এই নূতন কারণে উদ্বাস্তদের আগমনের হার কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছিল তা এই সময় বিভিন্ন মাসে কত উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তা দেখলে বেশ বোঝা যাবে। এই দিক থেকে দেখলে আশ্রয় শিবিরে ভর্তির হার যেন স্বয়ংচালিত ব্যারোমিটারের মত কাজ করে। উদ্বাস্তু সংক্রান্ত অবস্থার কখন কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে তার সুন্দর পরিচয় দেয়।

এই বৎসর জানুয়ারী হতে জুন এই ছয় মাসে আশ্রয় শিবিরে মাসিক গড়ে ভর্তির সংখ্যা ২০৬২ জন ছিল। তা জুলাই মাস হতে কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে গেল এবং পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তিত হবার তারিখ উত্তীর্ণ হলে কেমন হঠাৎ রীতিমত কমে গেল, তা আশ্রয় শিবিরে এই কয় মাসে উদ্বাস্তদের

ভর্তির হার সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেবে। এই কয় মাসের ভর্তির হার হল এই :

মাস	ভর্তির সংখ্যা
জুলাই ১৯৫২	১১,৬০০ জন
অগাস্ট	৭,৮০০ "
সেপটেম্বর	১০,৬৫৪ "
অকটোবর	৩১,৭৫৩ "
নভেম্বর	১,৭১৫ "
ডিসেম্বর	৭৫৫ "

অকটোবর মাসের ১৫ই তারিখ হতে নূতন পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তিত হয়। তাই দেখা যায় এই মাসের ১৫ দিনেই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবিরে ভর্তির সংখ্যা ৩১,৭৫৩ জন। তা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মার্চের সংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়। সে মাসে আশ্রয় শিবিরে মোট ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৫,৫৯৬। এটা ৩১ দিনের হিসাব। আর আলোচ্য হিসাবটি ১৫ দিনের। সুতরাং অল্প দিনের জন্য উদ্বাস্তু আগমনের হার ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগমনের হার হঠাৎ কি রকম নভেম্বর মাসে রীতিমত পড়ে গিয়েছিল তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। তা প্রমাণ করে পাসপোর্টের আতঙ্কই এবার হারবৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

অকটোবরের প্রথম দুই সপ্তাহের অবস্থা অনেকটা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গার পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। এবারেও নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করবার তাড়ায় মানুষ নানা পথে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলা হতে তারা পায়ে হেঁটে সীমানা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত জেলাগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। দক্ষিণে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার সীমানা অনেক উদ্বাস্তু পায়ে হেঁটে পার হয়েছিল। দেখা যায় এই নূতন কারণে মোট ১,২৭,০০০ নূতন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৫৬,০০০ মানুষ সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল।

উদ্বাস্তুদের আগমন হঠাৎ এরকম বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন মন্ত্রী বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের পুরাতন অভিজ্ঞতা এ সময়ে খুব কাজে লেগেছিল। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলাম ত্রাণের কাজে আমাদের সহকর্মীরা বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সেই কারণে বেশি উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। দর্শনায় উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার জন্য আমাদের যে কেন্দ্রটি ছিল তাতে কর্মিসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সেখান হতে ১০ই অকটোবর তারিখে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন চালাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবু তিনি মনে স্বস্তি পান নি। শিয়ালদহ স্টেশনের অবস্থা দেখবার জন্য তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন রাত্রে সেখানে গিয়েছিলেন। দর্শনায় যাতে ব্যবস্থা

ঠিক মত চলে সে বিষয় তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না দেখে আমাদের এবিষয় দক্ষতম সহকর্মী মেজর পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে রাত্রে দর্শনায় গিয়ে ত্রাণকার্য তত্ত্বাবধান করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি গিয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের ফলে সেখানকার ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়েছিল। রাত্রে যত উদ্বাস্তু জমা হয়েছিল তাদের স্পেশাল ট্রেনে করে সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এবার আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্য বেশ তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব হয়েছিল। তার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত পূর্বের অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সহকর্মীরা এবিষয় দক্ষতা সঞ্চয় করেছিলেন। দ্বিতীয়ত আগমনের হার বেশি হলেও তা স্থায়ী হয় নি, একটি নির্দিষ্ট দিনের পর তা বেশ কমে গিয়েছিল। ফলে দশ দিনের মধ্যেই যে সকল উদ্বাস্তু সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল তাদের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এই নূতন উদ্বাস্তুদের জন্য ডোল দেওয়া সম্পর্কে একটি নূতন নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। আগে নিয়ম ছিল, যে পরিবারগুলি পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হবে তাদের আশ্রয় শিবিরে অস্থায়ী কালের জন্য বসিয়ে রেখে ডোল দেওয়া হবে। এখন পুনর্বাসনের সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ায় তাদের এই অপেক্ষা করবার সময় দীর্ঘতর হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অথচ সমর্থ মানুষদের দীর্ঘকাল ধরে বসিয়ে রেখে ডোল দিলে তাদের কাজ করবার শক্তি ক্ষুণ্ণ হবার এবং আত্মমর্যাদাবোধ লোপ পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেই কারণেই এই নূতন নীতি গ্রহণের দরকার হয়ে পড়েছিল।

ঠিক হয়েছিল দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা রাখে এমন উদ্বাস্তুদের সরাসরি পুনর্বাসনের স্থানে নিয়ে যাওয়া না সম্ভব হলে তাদের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হবে না। পরিবর্তে সুবিধামত কর্মকেন্দ্রের নিকটে তাদের তাঁবুতে বাস করতে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে কাজ দেওয়া হবে। এরকম ব্যবস্থা করার সে সময় অসুবিধা ছিল না। কারণ, তখন প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। নানা প্রকল্প অনুসারে কোথাও রাস্তা তৈরির কাজ, কোথাও বাঁধ বাঁধার কাজ, কোথাও খাল কাটার কাজ চলেছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পুনর্বাসন বিভাগ মাটির কাজের ভার নিয়ে তাতে এদের কাজে লাগাত। কর্মকেন্দ্রের নিকটেই এদের আশ্রয়-শিবির স্থাপন করা হত বলে এই শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প। যারা কাজ করত তাদের কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হত এবং তাছাড়া পরিবারে অন্য মানুষের জন্য ডোলের

ব্যবস্থা ছিল। এই নিয়ম অনুসারে যে বেশি কাজ করত সে বেশি উপার্জন করত। ফলে তারা কাজ করত উৎসাহ পেত এবং নিজের কায়িক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে খানিক পরিমাণ আত্মনির্ভরশীল হতে পারত।

(৬)

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আবার বাংলা দেশে পুনর্বাসনের কাজ দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এবার তিনি কলিকাতা হতে দূর-বর্তী জেলাগুলিতে কেমন কাজ হচ্ছে দেখতে চাইলেন। সেই কারণে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর্ধমান জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন কলোনি পরিদর্শনের ব্যবস্থা হল। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব এবং আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

১৬ই অকটোবর ১৯৫২ তারিখে তিনি রেলপথে আসানসোল গিয়ে নামলেন। আমরা সেখানে আগে হতেই উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে স্টেশনে স্বাগত জানাবার পর ব্যবস্থা হল তিনি এই জেলার দুটি স্থান পরিদর্শন করবেন। প্রথম, আসানসোল শহরের সংলগ্ন স্থানে নূতন স্থাপিত মহীশীলা কলোনি এবং দ্বিতীয়, সালানপুরের ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প।

মহীশীলা কলোনিটি স্থাপিত হয়েছিল অকৃষিজীবী আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্য। জায়গাটি শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় কলিকাতা অঞ্চলে পুনর্বাসনের যে সুবিধা এখানেও তা বর্তমান ছিল। অধিকন্তু আসানসোলের মত বড় শহরের সংলগ্ন হওয়ায় আশ্রয় শিবিরবাসী নয় এমন মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারেরও তার প্রতি বিলক্ষণ আকর্ষণ ছিল। তাদের ইচ্ছামত এই শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারদেরও এখানে জমি দেওয়া হয়েছিল।

এই কলোনি পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অসন্তুষ্ট হবার মত কোন কারণ ঘটে নি। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা বাস্তু জমি ছাড়া গৃহ নির্মাণের জন্য ১৪৫০ টাকা ঋণ পেয়েছিল, কারণ এটিকে উপনগরী হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রতি খণ্ড জমির পরিমাণ ছিল চার কাঠা। দেখা গেল এখানে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত পরিবারগুলি এই ঋণের সদ্ব্যবহার করেছে। সকলেই দুখানা ঘরের ইটের বাড়ি করেছে এবং শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় জীবিকা অর্জনের পথ করে নিতে তাদের খুব অসুবিধা হয় নি। তাদের আচরণে অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। বরং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয়কে যথোচিত সম্মান সহ-কারে তারা স্বাগত জানিয়েছিল।

এখান হতে তাঁকে সালানপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগ পথই পাকা ছিল; তাই নিয়ে যেতে কষ্ট হয় নি। মোটরযোগে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সীতারামপুর হয়ে আমরা বরাকর নদীর ধার দিয়ে মাইথন হয়ে রূপনারায়ণ-

পুর গেলাম। সেখান হতে ঢেউ খেলান মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও গাড়ি যেতে অসুবিধা ছিল না, কারণ পাথর আর কাঁকড় দিয়ে ভরা বলে মাটি বেশ শক্ত ছিল। এ অঞ্চলে সেই কারণে বৃষ্টি হলেও কাদা জমে না।

সালানপুর পরিকল্পনার কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প। উদ্দেশ্য ছিল পতিত ডাঙ্গা জমিকে কৃষিযোগ্য করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব কিনা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ জমি যে কৃষিযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু পুনর্বাসন সফল করতে আরও অতিরিক্ত প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথম, কৃষিযোগ্য করতে যে অতিরিক্ত খরচ পড়বে তা বহন করা সম্ভব কিনা। দ্বিতীয়, আরো বড় প্রশ্ন যারা এখানে পুনর্বাসন নেবে এবিষয়ে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা। অপর পক্ষে এই পরীক্ষা সফল হলে পশ্চিম বাঙলার মধ্যেই অনেক উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। কারণ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চলে এই রকম প্রচুর ডাঙ্গা জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ পরীক্ষা যে উদ্বাস্তুদের সহযোগিতার অভাবে সফল হয় নি, তা আগেই বলা হয়েছে।

তবে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন যখন পরিদর্শনে আসেন তখনও পরীক্ষা সফল হয়েছে কিনা এবিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় আসে নি। কারণ তখনও পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ তখনও চলছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষামূলক কাজটি সম্বন্ধে তাঁকে ভাল করে অবহিত করা। সুতরাং এ প্রকল্পটির তাৎপর্য এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার পর কৃষি বিশেষজ্ঞ তাঁকে বোঝালেন কি পদ্ধতিতে এই ধরনের জমিকে কৃষিযোগ্য করা যায়। এ বিষয়েও আগে বলা হয়েছে। তারপর সেই রীতি অনুসারে কিভাবে কাজ হচ্ছে দেখান হল।

উঁচু জমিগুলিকে কিভাবে থাকে থাকে কেটে সমতল করা হয়েছে, কিভাবে জমিতে জল ধরে রাখার জন্য তার প্রান্তভাগে বাঁধ দেওয়া হয়েছে—এসব তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখান হল। তারপর জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্য শোন ও ধঞ্চে গাছ বোনা হয়েছে, তাও দেখলেন। এইভাবে কৃষিযোগ্য করে জমি প্রস্তুত হবার পর তাতে যে ভিন্ন ভিন্ন ফসল হচ্ছে তাও দেখলেন। কাজেই তখনও নিরাশ হবার অবস্থা আসে নি। পরীক্ষামূলক কাজ কিভাবে চলছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত হয়ে গেলেন।

পরের দুদিন তিনি কলিকাতায় কাটিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসের কাজ পরিদর্শন করলেন এবং ডাঃ রায় এবং আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায়ের সহিত

বিভিন্ন পুনর্বাসন সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলেন। ঠিক হল ১৯শে অকটোবর তারিখে রেলযোগে মুর্শিদাবাদ জেলায় গিয়ে সেখানকার পুনর্বাসনের কাজ তাঁকে দেখান হবে।

শ্রীযতীশচন্দ্র তালুকদার তখন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ছিলেন। তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের বিভিন্ন কলোনি পরিদর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা প্রথমে গেলাম বেলডাঙ্গাতে। মুর্শিদাবাদ জেলার এটি একটি বর্ধিষ্ণু স্থান। এখানে আগে একটি চিনির কল ছিল, কিন্তু তখন তা উঠে গিয়েছে। অথচ যন্ত্রপাতি বাড়িঘর সবই যেমন ছিল তেমন পড়ে আছে। কলটিকে আবার নূতনভাবে চালু করতে পারলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। সুতরাং পরিদর্শনের সময় সে প্রশ্নও উঠল। আমাদের কলোনি স্থাপিত হয়েছিল কলের নিকটবর্তী অঞ্চলে বড় রাস্তার ওপর। তা পরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উন্নীত হয়েছে। এখানকার উপনগরী পরিকল্পনায় অকৃষিজীবী আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। অবস্থা অসন্তোষজনক ছিল না।

এরপর জেলা শাসক আমাদের নিয়ে গেলেন ব্যাঙ্গোটিয়া কলোনিতে। জায়গাটি জেলার শাসনকেন্দ্রে বহরমপুর শহরের সংলগ্ন, ঠিক বলতে তা কাসিমবাজার ও বহরমপুরের মাঝখানে অবস্থিত। এখানে মহারাজের একটি বিরাট বাগানবাড়ি আছে। এখানেও উপনগরী পরিকল্পনা রচনা করে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু বসান হয়েছিল। কাছেই কাসিমবাজারে কিছুদিন আগে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল। এখানে যারা পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদের অবস্থা বেলডাঙ্গা কলোনির পরিবারগুলির অনুরূপ। স্থানটির ওপর তাদের আকর্ষণ আছে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

আমরা সব থেকে আনন্দ পেয়েছিলাম আয়েশবাগ কলোনি দেখে। বহরমপুর হতে যে রাস্তা রেল লাইনের পূর্ব দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে তার ওপর কলোনিটি অবস্থিত। এখানে কেবলমাত্র বারুজীবী পরিবারদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রেণীর পরিবারগুলি প্রথম অবস্থায় আমাদের শর্তে পুনর্বাসন নিতে অস্বীকার করেছিল। তারা চেয়েছিল বাস্তুভূমি সংলগ্ন চাষের জমি সমেত তাদের পরিবারপিছু দু বিঘা আট কাঠা জমি দেওয়া হক। শেষ পর্যন্ত এই শর্তে পশ্চিবঙ্গ সরকার রাজি হয়েছিলেন। তাদের নিজেদের পছন্দমত জমিতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

আয়েশবাগ কলোনি দেখে বোঝা গেল বারুজীবী পরিবারগুলি নিজেদের পুনর্বাসনের কাজ কত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছে। বাস করবার ঘরছাড়া প্রতি পরিবার একটি করে পানের বরোজ গড়ে তুলেছে। বাঁশের কাঠামোর ওপর পাটকাঠি দিয়ে তার বেড়া ও ছাদ করা হয়েছে। তারই ভিতরে ছায়ার মধ্যে পান গাছের লতাগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজান। ভিতরে মাটি অত্যন্ত

পরিচ্ছন্ন। পানের বরোজ তাদের জীবিকার অবলম্বন হওয়ায় তাকে বারুজীবীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। সেই কারণে তার ভিতরে জুতো পায়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না।

অবশ্য তারা যে জমি চাষের জন্য পেয়েছে তার একটি অংশে মাত্র বরোজ স্থাপন করেছে। বাকি অংশ তারা ফেলে রাখে নি। সেখানে নানা সবজি উৎপাদন করে সমস্ত জায়গাটার সদ্ব্যবহার করেছে। সমগ্র জমি নিষ্ঠার সঙ্গে চাষ করবার ফলে তাদের আর্থিক পুনর্বাসন বেশ সন্তোষজনকভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। তাদের নিজেদের পুনর্বাসনের কাজে উৎসাহ ও উদ্যমের যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছে তা অন্য শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের অনুসরণযোগ্য।

তারা যে নিজেদের সাফল্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছে, তা তাদের আচরণ হতে বেশ বোঝা গিয়েছিল। কে কেমন বাড়ি বানিয়েছে, কেমন পরিপাটি বরোজ গড়ে তুলেছে, উদ্বৃত্ত জমিতে কেমন গাছ লাগিয়েছে, কেমন লাউ কুমড়া প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করেছে তা দেখবার জন্য সকলেই মন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল। তাদের মুখে অসন্তোষের কোন চিহ্ন ছিল না। সাফল্যের তৃপ্তিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল। এই সব দেখে আমরা সত্যই সেদিন ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বাগডহর কলোনিতে। তা আরও উত্তরে অবস্থিত, প্রায় জিয়াগঞ্জের কাছে। তখনকার অবস্থা দেখে আমরা খুশি হতে পারি নি। আশ্রয় শিবিরবাসী অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। যারা এসেছিল তাদের অনেকে কলোনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যারা ছিল তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব। জীবনের যুদ্ধে যে তারা জয়ী হতে পারছে না, হেরে যাচ্ছে, তা তাদের আলাপ আচরণ হতে বেশ বোঝা যায়।

(৭)

দক্ষিণ কলিকাতায় বজবজ লাইন ও সাদার্ন এভেনিউর মধ্যবর্তী অঞ্চল এখন রবীন্দ্র সরোবর নামে খ্যাত। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার সে নাম ছিল না, শুধু লেক অঞ্চল নামেই তা পরিচিত ছিল। তার উত্তর পাশ দিয়ে যে চওড়া রাস্তাখানি গড়িয়াহাট রোডের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ রোডকে সংযুক্ত করেছে তার দক্ষিণ পাশের সমস্ত জায়গা জুড়েই লেক অঞ্চল বিস্তৃত। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যখন বালিগঞ্জ অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন তখনই এই লেক অঞ্চলের পরিকল্পনা রচিত হয়। উন্নয়ন সংস্থার অধিকর্তা তখন ছিলেন বম্পাস নামে এক ইংরেজ সিভিলিয়ান। সেই কারণে এক সময়ে এই অঞ্চল বম্পাস লেক নামেও পরিচিত ছিল। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই

এখন যে রাজপথ দুটি রাসবিহারী এভনিউ এবং সাদার্ণ এভনিউ নামে পরিচিত তাদের প্রকল্প রচিত হয়।

খুব বেশি দিনের কথা নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এ অঞ্চলের চেহারা একেবারে অন্য রকম ছিল। গড়িয়াহাট রোড ছাড়া এ অঞ্চলে বড় রাস্তা ছিল না। আর যা রাস্তা ছিল, যেমন কাঁকুলিয়া রোড বা ফার্ন রোড বা কেয়াতলা লেন—সেগুলি ছিল আঁকাবাকা সরু গলি। তাদের দুপাশে খানা ছিল। রাস্তাগুলি ভাঙা ইটের খোয়া আর রাবিশ দিয়ে বানান আর তাদের দুধারে ছিল ধান ক্ষেত বা সবজি ক্ষেত। কাঁকুলিয়া রোডের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল কেবল কপির ক্ষেত। গড়িয়াহাট রোডের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল। সেটাকে রাজার বাগান বলত। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শেষে কলিকাতায় যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ আসেন তখনও কলিকাতা ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানে তাঁর সম্মানে শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামন্তরাজ্য অনেক হাতী পাঠিয়েছিল। এই বাগানটি এত বড় ছিল এবং এত বড় বড় গাছে ভরা ছিল যে এই একটা বাগানেই কয়েক শত হাতীর স্থান ও আহার্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

এই অঞ্চলে অনেক খানা, ডোবা, পুকুর ছিল। উন্নয়নের জন্য সেগুলি ভরাট করা দরকার। এখন তার জন্য মাটি কোথা হতে জুটবে? এই সমস্যা সমাধান করতেই এ অঞ্চলে লেক স্থাপনের পরিকল্পনা। এই জন্য এখানে তিনটি বড় দীঘি কাটা হয় এবং তার চারপাশে সংলগ্ন জমিতে উদ্যান রচনা করা হয়। যে দুটি বড় দীঘি দক্ষিণে বজবজের লাইন ঘেঁষে অবস্থিত তার উত্তরে অনেক খোলা জায়গা লেক কাটার পর পড়ে ছিল। সেখানে নানা গাছ রোপণ করে তাকে উদ্যানের রূপ দেওয়া হয়েছিল। তার উত্তরে যে এভনিউটি নির্মিত হয় তার উত্তর অঞ্চলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক জায়গা খালি অবস্থায় পড়ে ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে যখন জাপান যুদ্ধে নেমে বর্মা অধিকার করে বসল, তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে যায়। এখানে অনেক ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। বিমান আক্রমণের থেকে কলিকাতা মহানগরীকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত রেড রোড বন্ধ করে দিয়ে জঙ্গি বিমানের রানওয়েতে তাকে রূপান্তরিত করা হয়। এই সম্পর্কেই দক্ষিণে সদ্য উন্নয়নপ্রাপ্ত খোলা জায়গাগুলির প্রতিও প্রতিরক্ষা বিভাগের নজর পড়ে। সুতরাং সমগ্র লেক অঞ্চলের সব খোলা জায়গা তারা দখল করে বসে।

এর মধ্যে যেখানে এখন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার অবস্থিত সেখানে যুদ্ধে ব্যবহার্য ট্রাকের গ্যারাজ খোলা হয়। সাদার্ণ এভনিউর উত্তর

দিকে মাঝামাঝি জায়গায় যে বিস্তৃত খোলা জায়গা ছিল সেখানে একটি বড় হাসপাতাল খোলা হয়। সে হাসপাতাল যুদ্ধের শেষেও কিছু দিন ছিল। তারপর উঠে যায়। যেখানে তা অবস্থিত ছিল সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের থাকবার জন্য অনেক ফ্ল্যাট হয়েছে। আর যেখানে এখন স্টেডিয়াম সেখান হতে ছোট ছেলেদের জন্য সংরক্ষিত যে লেক আছে সেই পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণ পাশে যে খোলা জায়গা ছিল, সেখানে সৈন্যদের বাস করবার জন্য অসংখ্য ব্যারাক স্থাপিত হয়েছিল।

এই ব্যারাকগুলির মধ্যে যেগুলি সবার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল সেগুলির সরকার দখল পান অনেক আগে, সম্ভবত ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে। তখনও ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের উদ্বাস্তুদের বড় স্রোত প্রবাহিত হয় নি। পুরাতন যে ত্রাণ বিভাগ ছিল তাই উদ্বাস্তুদের সমস্যার দেখাশোনা করত। এই সময় সরকার কিছু আশ্রয় শিবির স্থাপন করা ছাড়া আর একভাবে পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন অনেক পরিবার ছিল যারা আশ্রয় শিবিরে থেকে সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে চাইত না। তারা কলিকাতায় একটা বাসস্থান সংগ্রহ করতে পারলে নিজেদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারত। এদের মধ্যে আবার একদল এমন অবস্থাপন্ন ছিল যে বাড়ি ভাড়া করে দিলে তারা বাড়িভাড়া দেবার সঙ্গতি রাখে। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ত্রাণ বিভাগ দু'রকম ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম হ'ল বাড়ি হুকুমদখল করে তাকে ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বিভক্ত করে যারা ভাড়া দেবার ক্ষমতা রাখে তাদের ভাড়া দেওয়া। তাকে 'এ' টাইপ ক্যাম্প বলা হত। দ্বিতীয় হল বাড়ি বা ব্যারাক হুকুমদখল করে সেগুলিতে বিভিন্ন পরিবারকে বিনাভাড়ায় থাকতে দেওয়া। এদের 'বি' টাইপ ক্যাম্প বলা হত। আর যেগুলি রীতিমত আশ্রয় শিবির ছিল সেখানে তারা বিনা ভাড়ায় থাকতে পেত অধিকন্তু খাবার জন্য ডোল পেত। এদের পুরাতন পরিভাষায় 'সি' টাইপ ক্যাম্প বলা হত।

এখন লেকের পূর্বদিক ঘেঁষে যে ব্যারাকগুলি সরকার সবার প্রথম দখল পেয়েছিলেন, সেগুলিকে 'বি' টাইপ ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে উদ্বাস্তু পরিবারদের বিনা ভাড়ায় থাকতে দেওয়া হত মাত্র। তারপর যেমন পশ্চিম দিকের ব্যারাকগুলি আস্তে আস্তে খালি হতে আরম্ভ করল, সেগুলি কলিকাতাবাসী উদ্বাস্তুদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এগুলি দখল করতে পারলে তাদের আবাসিক সমস্যা তখনই সমাধান হয়ে যায় বলে তাদের এগুলি জবরদখল করে নেবার ইচ্ছা দুর্বার হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তারা এগুলি একে একে দলবদ্ধ হয়ে দখল করে নিল। এ সবই সংঘটিত হয়েছিল ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক হারে বাস্তুত্যাগ ঘটবার আগে।

এখানে যারা এইভাবে বাস করতে আরম্ভ করল তারা নানা কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। কলিকাতার মধ্যে বাস করার ফলে তাদের কাজ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত ছিল না। যে তা না পারত, সে অন্তত ফেরিওয়ালার কাজ করতে পারত।

এখন এই ব্যারাকগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার জন্য তৈরি হয় নি। অবশ্য তাদের দেয়াল ছিল ইটের; কিন্তু ছাদ ছিল টালির। এগুলি নির্মিত হয়েছিল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং বছর দশেক বাদে টালির ছাদ যে কাঠের কড়ি বরগার ওপর স্থাপিত ছিল সেগুলি জরাজীর্ণ হয়ে বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল। এদিকে নানাভাবে সরকারের সাহায্যে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের সাহায্য পেতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে তাদেরও পুনর্বাসন নিয়ে নিজস্ব ঘর বাঁধবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।

এই পরিবেশে লেক ব্যারাকবাসী উদ্বাস্তুদের নেতা শ্রীবিভূতি ঘোষ আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন ব্যারাকগুলি পরিদর্শন করতে যেতে। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং ঠিক হল ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখে আমি সেখানে যাব।

ব্যারাকে গিয়ে যা দেখলাম তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ব্যারাকগুলি লম্বায় একশ' ফুটের ওপর হবে। চওড়াতেও ত্রিশ ফুটের কম হবে না। এই রকম অনেক ব্যারাক সাদার্ণ এভনিউর দক্ষিণ দিকে লেক অঞ্চলের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওই রাস্তার উত্তরেও কিছু ব্যারাক ছিল, তবে তাদের সংখ্যা তুলনায় অল্প। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, প্রতি ব্যারাকের ভিতর অংশ চট দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথ চলে গিয়েছে। তাতে একটি মানুষ যেতে পারে এমন চওড়া। আর তার দুধারে চট দিয়ে ভাগ করে করে ছোট ছোট কামরায় সমগ্র ব্যারাকটি ভাগ করা হয়েছে। প্রতি কামরার পরিসর সম্ভবত এক'শ বর্গফুট বা আর কিছু বেশি হবে। সাধারণত একটি পরিবার এই রকম একটি ঘর নিয়ে আছে। কোথাও বড় পরিবার হলে একাধিক ঘর পেয়েছে। এভাবে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকা যায়, বাস করা যায় না। কিভাবে এমন বন্দোবস্ত গড়ে উঠল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কলিকাতার ভিতরেই থাকবার ইচ্ছা হেতু বোধ করি। পরিবারগুলি অসুবিধা সত্বেও এমন গাদাগাদি করে থাকতে সম্মত হয়েছিল।

কিন্তু এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করলে তার মূল্য তো না দিয়ে উপায় নেই। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে দেখলাম। অবশ্য জীবিকানির্বাহের সন্তোষজনক ব্যবস্থা এদের অনেকেই করতে পারে নি অনুমান করে নেওয়া যায়। কারণ, তা না হলে এমন অবস্থার মধ্যে বাস করতে তারা বাধ্য হবে কেন? এবং তার জন্য আয়ের অল্পতা হেতু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও ক্ষয় রোগের কারণ হতে পারে। তাহলেও এত মানুষের একসঙ্গে থাকার ফলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ

মানুষকেও রোগী করে তোলে নিশ্চিত। যা আমাকে অত্যন্ত বেদনা দিল তা এই ক্ষয় রোগীর আধিক্য। প্রতি ব্যারাকেই কয়েকটি ক্ষয় রোগী শায়িত অবস্থায় রয়েছে দেখতে পেলাম।

এরা আমার কাছে প্রস্তাব করল এই অবস্থা হতে মুক্ত হবার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ এরা চায় পুনর্বাসনের সুযোগ। খুবই স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং তা যত শীঘ্র পূরণ করা যায় ততই ভাল। এখন এদের পুনর্বাসনের জায়গা যে কোন স্থানে হলে চলবে না। এরা কলিকাতা মহানগরীর অভ্যন্তরেই কয়েক বৎসর বাস করছে। ফলে তার অর্থনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই নিজের জীবিকা একটা নির্বাচন করে নিয়েছে। কাজেই এদের পুনর্বাসন দিতে হয় এমন জায়গায় যেখান থেকে এদের জীবিকার জন্য কলিকাতার সহিত সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

এখন মুস্কিল হল এই যে এই ধরনের জমি ঠিক এই সময় বৃহত্তর কলিকাতার এলাকায়ও পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার প্রধান কারণ, যত সম্ভাব্য খালি জমি পড়ে ছিল সবই অন্য উদ্বাস্তু পরিবার জবরদখল করে নিজেদের কলোনি গড়ে তুলেছে। এইভাবে ছোট ও বড় মিলিয়ে একশ তেত্রিশটি কলোনি গড়ে উঠেছিল। উত্তরে নৈহাটি হতে আরম্ভ করে দক্ষিণে টালির নালা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে যেখানে যত খালি জমি পড়ে ছিল সবই এইভাবে জবরদখল হয়ে গেছে। সুতরাং জমি পাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল এই ব্যারাকগুলিতে মোট বার শ' পরিবার বাস করছে। এখন এতগুলি পরিবারের জন্য বাস্তুজমি কি করে জোগাড় হয়?

ঠিক এই সময়ে কিছু জমি যাদবপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল। গড়িয়াহাট রোড ধরে দক্ষিণে গেলে যাদবপুরের যক্ষা হাসপাতাল বাঁয়ে রেখে আরও কিছু এগিয়ে ডান দিকে একখণ্ড বেশ পাঁচিল ঘেরা জমি ছিল এবং পাহাবা দেবার জন্য দারোয়ান ছিল বলেই সম্ভবত তা জবরদখল হয় নি। এ জায়গাটি গাঙ্গুলিবাগান নামে পরিচিত ছিল। এই জমিটি যে ভদ্রলোক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর পদবী গাঙ্গুলি ছিল বলেই নাকি এই নাম। তিনি এই সম্পত্তি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমকে দান করেছিলেন। সঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডে আরও অনেক জমি তাঁর এই অঞ্চলে ছিল যা আকারে ছোট বলে জবরদখল কলোনির উপযুক্ত বিবেচিত হয় নি। এই সব জমিসহ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ গাঙ্গুলিবাগানের জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগকে বিক্রয় করবার প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য সরকার তাতে সম্মত হন এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রচলিত মূল্যে তা কেনা হয়। এর মধ্যে পাঁচিল ঘেরা প্রশস্ত জমিটি একটি বিশেষ প্রকল্প রচনার জন্য চিহ্নিত ছিল। বাকি খণ্ড খণ্ড জমিগুলি ভাগ করে ছোট ছোট প্লটে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু তাতে বড় জোর একশত পরিবারের স্থান হতে পারে। তাতে তো লেক ব্যারাকের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার ভগ্নাংশ মাত্র সমাধান হতে পারে। তাহলে অন্যদের জন্য কি করা যায়? কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে জমি সংগ্রহ না করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হয় না। এই কারণেই নূতন করে জমির সন্ধানে আমাদের ঘুরতে হয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে জমির সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল। সোদপুরে যে রাস্তা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আশ্রমের উত্তর দিয়ে গিয়ে পশ্চিমে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সহিত পুর্বে সোদপুর স্টেশনের সংযোগ স্থাপন করেছে, তা লাইন পার হয়ে পূর্ব দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। মাইল দেড়েক পরে তা উত্তর-মুখী হয়ে আবার মাইল দুই বাদে পুর্বমুখী হয়ে মধ্যমগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে যশোহর রোডের সহিত সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং দুটি মূল রাস্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করে এটি এই জায়গাটিকে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত করে দিয়েছে। সোদপুর স্টেশনের আধ মাইল পরে রাস্তার দুই দিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খালি জমি পড়ে ছিল। এই জমিগুলি নিচু ছিল, কিন্তু এত নিচু নয় যে সেখানে ভাল ধান চাষ হয়। যে বছর বর্ষা ভাল হত না, তা অনাবাদী পড়ে থাকত। আর যে বছর বর্ষা ভাল হত, সে বছর এ জমিতে আমন ধান ফলান হত। তবে জমি বেশি জল ধরে রাখতে পারত না বলে ভাল ফসল হত না।

এই বিস্তৃত এলাকা সরকারের সাহায্যে হুকুমদখল করে একটি উপনগরী পরিকল্পনা রচনা করেন দুই বন্ধুতে মিলে। তাঁদের একজনের নাম 'হ' দিয়ে আরম্ভ এবং অপর জনের নাম 'ব' দিয়ে আরম্ভ। পরিকল্পনা রচনার কাজ যখন বেশ এগিয়ে গেল, তখন তাঁরা একটি সমিতি করে তার ওপর উপনগরী গড়ে তোলবার ভার দিলেন। তার সভাপতি ছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এখন উপনগরীর নামকরণের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এক অভিনব উপায়ে। যেহেতু দুই বন্ধুতে মিলে এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তাঁদের নামের আদি অক্ষর জুড়ে এর নাম গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত হল। এইভাবেই এই উপনগরীর নাম হল এইচ-বি টাউন। অভিনব নামকরণ-রীতি, সন্দেহ নেই।

এই পরিকল্পনায় রাস্তা, ইস্কুল, পার্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। এঁদের কাছে প্রস্তাব করলাম এঁরা এই পরিকল্পনায় কয়েক শত উদ্বাস্তু পরিবারকে স্থান দিন। তাঁরা সম্মত হলেন। তখন লেক ব্যারাকের উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের জায়গা দেখে আসতে বলা হল। যদি জায়গা তাঁদের পছন্দ হয়, তাহলে সেখানকার উদ্বাস্তু পরিবারদের এখানে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হতে পারে। প্রতিনিধিরা জায়গা দেখে পছন্দ করলেন। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কতগুলি পরিবারকে তাঁরা জায়গা দিতে পারেন, তা হিসেব করতে বলা হল।

রাস্তা যেখানে উত্তরমুখী হয়েছে, তারই নিকটে ওই রাস্তার পশ্চিম দিকে এঁরা জমি উন্নয়ন করে আট শ' পরিবারকে জায়গা দিতে সম্মত হলেন। এই অঞ্চল নব বারাকপুর কলোনির বেশ নিকট। প্রতি পরিবারের জন্য জমির যে মূল্য নির্ধারিত হল, তা সরকার হতে সোজা দেবার ব্যবস্থা হল। অতিরিক্তভাবে, পরিকল্পনাটিকে উপনগরী পরিকল্পনা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। ফলে নগর এলাকায় গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের যে উচ্চ হারের ব্যবস্থা ছিল, এই পরিবারগুলি তা পাবার অধিকারী হল। কমপক্ষে সে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৫০৲ টাকা। এইভাবে লেক ব্যারাক হতে আট শ' পরিবার এখানে এসে কলোনি গড়েছিল। তারা চলে আসার ফলে যে ব্যারাকগুলি খালি হয়েছিল, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এখানকার এক বিস্তৃত অঞ্চল ব্যারাকমুক্ত হয়েছিল। তবে সমগ্র এলাকা হতে সকল উদ্বাস্তু পরিবারকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি।

(৮)

যে সব উদ্বাস্তু পরিবার সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আশ্রয় শিবিরে বাস করত তাদের যেমন খাওয়ার জন্য ডোল দেবার ব্যবস্থা ছিল, তেমন পরার জন্য বস্ত্রাদি দেবার ব্যবস্থা ছিল। কি হারে বস্ত্রাদি দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশ ছিল: মোটামুটি প্রতি পরিবারের প্রতি মানুষের জন্য বছরে দুবার এক প্রস্থ করে জামা ও কাপড় দেবার ব্যবস্থা ছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ নিচের তালিকায় দেওয়া হল:

শ্রেণী		বরাদ্দের পরিমাণ
বয়স্ক পুরুষদের জন্য	···	দুখানি ধুতি ও দুখানি জামা
বয়স্ক মেয়েদের জন্য	···	দুখানি শাড়ি, দুখানি সায়া ও দুখানি ব্লাউজ
বালকদের জন্য	···	দুখানি হাফ-প্যাণ্ট ও দুখানি শার্ট
বালিকাদের জন্য	···	দুখানি ফ্রক ও দুখানি অধোবাস

এই ব্যবস্থার ফলে জামা, হাফ-প্যাণ্ট, ফ্রক প্রভৃতির চাহিদা বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং সেগুলি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া হত। ফলে অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের পরোক্ষভাবে এই উপায়ে কাজ দিয়ে জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা হত।

এগুলি বিতরণের নির্ধারিত কোন দিন ছিল না। সাধারণত ছ' মাস অন্তর বছরে দু'বার করে এগুলি বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বিলি করা হত। সাধারণত আর্থিক বছরের গোড়ায় অর্থাৎ এপ্রিল মাসে একবার আর ছ' মাস পরে অক্টোবরে একবার বিলি হত। এই ব্যবস্থাটিকে অতিরিক্তভাবে অন্য কোন কাজে লাগানর কথা আমাদের বুদ্ধিতে এতকাল আসে নি।

নূতন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় কিন্তু এ বিষয়ে একটি নূতন চিন্তা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বললেন এই বস্ত্রাদি বিতরণের কাজটি মামুলি প্রথায় সম্পাদন না করে একটি উৎসবের মধ্য দিয়ে করলে একটা অতিরিক্ত লাভ আছে। তার ফলে উদ্বাস্তুদের আনন্দহীন জীবনে আনন্দের স্পর্শ লাগবে। বছরে যখন দুবার দুটি বড় জাতীয় উৎসবের ব্যবস্থা আছে, তার সঙ্গে যদি একে যুক্ত করা যায়, তা হলে আরও অতিরিক্ত লাভ আছে। আমরা বছরে জাতীয় উৎসব হিসাবে দুটি দিন পালন করি। প্রথম উৎসব পালিত হয় ১৫ই অগাস্ট তারিখে। ওই দিন আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম বলে আমরা তাকে স্বাধীনতা উৎসব বলি। দ্বিতীয় উৎসবটি পালিত হয় ২৬শে জানুয়ারি তারিখে।

এই দ্বিতীয় দিনটিকে বিশেষভাবে উৎসবের জন্য নির্বাচন করার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ওই তারিখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সর্বপ্রথম এই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হবে ব্রিটিশ অধীনতা হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তারপর হতে জাতীয় আন্দোলন ওই লক্ষ্য সাধনের পথেই পরিচালিত হয়েছে। ফলে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে, কিন্তু তা এসেছে অন্য তারিখে। কিন্তু এই দিনটিও তো জাতির জীবনে স্মরণ রাখার যোগ্য, কারণ তখন হতেই আমরা নূতন লক্ষ্য সাধনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। তাই আমাদের যখন নূতন সংবিধান রচিত হয়ে গেল, ওই দিনেই তা প্রবর্তন করার ব্যবস্থা হল। আমাদের সংবিধানে আমরা যে রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করেছি তা হল গণতন্ত্র। তাই ওই দিনটি আমরা গণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

শ্রীরেণুকা রায় নির্দেশ দিলেন আমাদের আশ্রয় শিবিরগুলিতে যথাসম্ভব সমারোহের সহিত স্বাধীনতা দিবস এবং গণতন্ত্র দিবস পালিত হোক। এই সেই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই দুটি দিনে জামা কাপড় ইত্যাদি আশ্রয় শিবির উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। তাঁর এই পরিকল্পনাটি সব দিক হতেই সমর্থনযোগ্য এবং এর জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দিত হবার অধিকারী—এই কথাটি আমার তখন মনে হয়েছিল। তা সমর্থনযোগ্য এই কারণে যে যে-দেশে এসে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়েছে, সেই দেশের সহিত রাজনৈতিক যোগসূত্রে তাদের সংযুক্ত হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক একাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে এই দুটি উৎসব নিশ্চিত সহায়তা করবে। আমাদের জাতীয় উৎসবে তাদের সমান অধিকার আছে, এই বোধ প্রথমত তাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে। তারপর জাতীয় পতাকা এই দুই উৎসবে মিলিতভাবে উত্তোলন করে তাকে কেন্দ্র করে উৎসব করলে তাদের মধ্যে জাতীয় সংহতি পরিস্ফুট হবে। অতিরিক্তভাবে উৎসবের আনন্দ তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য রঞ্জিত করে তুলবে। এই সঙ্গে কাপড় ও জামা

বিতরণের ফলে উৎসব আরও নিরেট আকার ধারণ করবে, অথচ তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। সুতরাং সব দিক থেকেই পরিকল্পনাটি সন্তোষজনক।

এই নূতন নির্দেশ অনুসারে প্রথম কাজ হয় ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে। ব্যবস্থা হল আমাদের তত্ত্বাবধানে যত আশ্রয় শিবির আছে সেখানে এই উৎসব পালিত হবে এবং ওই দিন প্রতি উদ্বাস্তুকে কাপড়-জামা বিতরণ করা হবে। আরও ঠিক হল, বড় বড় আশ্রয় শিবিরগুলিতে উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য কলিকাতার সদর অফিস থেকে মন্ত্রী ও অফিসারগণ যাবেন। আর যেখানে তা সম্ভব হবে না, সেখানে পুনর্বাসন বিভাগের স্থানীয় অফিসারগণ উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন। আমাদের তখন ছিলেন, একজন মন্ত্রী ও দুজন উপমন্ত্রী। তাঁরা এক-একটি বড় আশ্রয় শিবিরের উৎসবে যোগ দিতে গেলেন। আমার ওপর ভার পড়ল হাওড়া জেলায় ঘুষুড়ি অঞ্চলে অবস্থিত যে বিরাট ঘুষুড়ি আশ্রয় শিবির ছিল তার উৎসবে পৌরোহিত্য করা।

এইভাবে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আমার একটি অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হল। আমি দেখে খুশি হলাম যে এই পরিকল্পনা যেভাবে ক্রিয়াশীল হবে অনুমান করা হয়েছিল কার্যত তাই ঘটল। সকল মানুষের মধ্যেই উৎসব করবার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। কোন উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করতে পারলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তা আত্মপ্রকাশ করে। আমি যখন উৎসব আরম্ভ করতে সকালবেলা আশ্রয় শিবিরে হাজির হলাম, দেখি সকলের মধ্যেই একটা সাড়া পড়ে গেছে। স্নান করে যতখানি সামর্থ্যে কুলায় পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরে সকলে পতাকাকে যেখানে অভিবাদন জানান হবে, তার কাছে সমবেত হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে উৎসব শুরু হল। তারপর পতাকা উত্তোলিত হবার পর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে তাকে অভিবাদন জানান হল। আমি গণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি ছোট ভাষণ দিলাম এবং কাপড়-জামা বিলি করা হল। সভার শেষে আশ্রয় শিবিরবাসী বালক-বালিকাদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফলে তাদের নিরানন্দ জীবনে সেদিন খুশির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল।

তারপর হতে এই দুটি জাতীয় উৎসব নিষ্ঠার সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার আশ্রয় শিবিরগুলিতে পালিত হত। তা সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ছিল বলে সকল পক্ষের এবং সকল স্তরে তাকে সফল করবার কাজে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যেত। পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীরা যেমন উৎসাহের সঙ্গে তার আয়োজন করতেন আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারগুলিও তেমন তাতে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়ে উৎসবকে স্বার্থকতামণ্ডিত করে তুলত।

উদ্বাস্তু বিভাগে কাজ করবার সময়ে আমি মাঝে মাঝে আপিস ছেড়ে মোটরগাড়ি করে বেরিয়ে পড়তাম। সকালে যেতাম সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম। সাধারণত গাড়ির চালক এবং আমিই একমাত্র আরোহী থাকতাম। কখনো কখনো সহকর্মীও সঙ্গে থাকতেন। তার পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। সারা পশ্চিম বাঙলা জুড়ে নানা স্থানে নানা উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছে। কোনটি সরকার কর্তৃক স্থাপিত, কোনটি উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল এই সব কলোনিগুলি দেখা, তাদের অভাব অভিযোগ শোনা, প্রয়োজন হলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কোথাও কোন অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে কিনা দেখা। আর সম্ভব হলে তার দখল নেওয়া যাতে সেখানে পুনর্বাসনের জন্য কলোনি স্থাপন করা যায় কিম্বা জরুরী অবস্থায় আশ্রয় শিবির স্থাপন করা যায়। এই রকম অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই অনেক সরকার কর্তৃক স্থাপিত কলোনির ইতিহাস শুরু হয়। এই সম্পর্কে একদিন এমন একটি অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল যা স্মরণ করবার যোগ্য। নানা দিক হতে তা গভীরভাবে মনে রেখাপাত করেছিল। তাই সে দিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

তারিখটা ছিল ৯ই মে ১৯৫৩। সেদিন বাঙলা তারিখ ২৫শে বৈশাখ এবং তাই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পড়েছিল। কাজেই ছুটি ছিল। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। সুতরাং তাঁর জন্মদিবসে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল সেদিন ছুটির সুযোগ নিয়ে কালনা অঞ্চলটা দেখে আসি। ওদিকে তত কলোনি বসে নি, তবে নিজের চেষ্টায় অনেক আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু এই অঞ্চলে পুনর্বাসন নিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা কৃষিজীবী তারা এখানে পাট চাষ করেছে। অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের কলোনি যে স্থাপিত হয় নি, তা নয়। কাছে জিরাটে একটি সরকারী কলোনি স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসন পেয়েছিল তাদের একটি বড় অংশ ছিল তন্তুবায় শ্রেণীর। সম্প্রতি কালনা শহরের উপকণ্ঠে দুটি উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তা দেখে আসাই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পাণ্ডুয়া অতিক্রম করবার পর সেখানে যে ডাকবাংলো আছে তার কাছ হতে একটি রাস্তা পূর্বদিকে বেরিয়ে গেছে। সেটি হল কালনা যাবার পথ। প্রাচীন রাস্তা এঁকেবেঁকে শেষে কালনা গিয়ে হাজির হয়েছে। তারপর ভাগীরথীর পশ্চিম তীর বরাবর উত্তরমুখী হয়ে কাটোয়াতে পৌঁচেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়বার পরেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা হল রাস্তার দু পাশের আম গাছের সারি। গাছগুলির বয়স বুঝিয়ে দেয় রাস্তাটি প্রাচীন। সমান

ব্যবধানে সারিবদ্ধভাবে তারা সাজানো। ডালে পাতায় পরিপুষ্ট তাদের নিটোল দেহ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দু পাশের গাছের ডাল রাস্তার ওপরে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তাকে ছায়াবৃত করে রেখেছে। রাস্তা দিয়ে মোটর গেলে মনে হয় যেন আমরা একটি তোরণ শোভিত পথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মের তাপ সেখানে পৌঁছাতে পারে না। এদিক হতে কালনা যাবার পথটি সত্যই মনোরম।

কালনা এসে যে দুটি কলোনি স্থাপনের কাজ চলছিল তার কাজ দেখলাম। তারপর স্থানীয় উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ করলাম। এখানে তখন যিনি মহকুমা শাসক ছিলেন তাঁর নাম শ্রীঅমলকুমার মজুমদার। নবনিযুক্ত আই. এ. এস. অফিসার, বয়সে তরুণ। তিনি আতিথেয়তার জন্য আমাকে তাঁর বাঙলোতে নিয়ে গেলেন। পাণ্ডুয়া হতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বর্ধমান জেলার পুনর্বাসন আধিকারিক। তিনিও সঙ্গে ছিলেন। মহকুমা শাসকের বাঙলোটি ভাগীরথী নদীর ঠিক পাড়ে অবস্থিত। এখানে নদীর খাদ খুব গভীর। তখন গ্রীষ্মকাল বলে জল একেবারে তলায় নেমে গিয়েছিল। তাই মনে হচ্ছিল বাঙলোটি অনেক ওপরে অবস্থিত। ঠিক অপর পাড়েই শান্তিপুরের ফেরিঘাট। তার সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে এক বিরাট চর ছিল। সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন নিয়েছিল। তাদের কলোনিটি এপার হতে ছবির মত দেখাচ্ছিল।

পাঁচটা প্রায় বাজতে চলল। নদীর পাড় হতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘন কালো মেঘে ভরে গিয়েছে। কালবৈশাখীর প্রস্তুতিপর্ব আর কি। আমরা তখন কলিকাতা হতে ষাট মাইলেরও বেশি দূরে। সুতরাং তখনি ফিরে যাওয়া উচিত মনে হল, কারণ ঝড় কি বাধা সৃষ্টি করবে জানা ছিল না। তাই মহকুমাশাসকের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা কলিকাতার পথে যাত্রা করলাম।

সে বছর কালবৈশাখী অনেক দিন হয় নি। কে জানে কি মূর্তি নিয়ে তা আবির্ভাব হবে? ওদিকে আকাশে উত্তর-পশ্চিম কোণে যে ঘনঘটা জাঁকিয়ে উঠেছে তা দেখে মনে হল আজকের তাণ্ডব নিশ্চয়ই উচ্চতালে অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং মনে আশঙ্কা নিয়ে আমরা ফিরতি পথে যাত্রা করলাম। পথে যেতে যেতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ঝড়ের রাজার মত উদ্ধত দ্যুতি যেমন মনকে মাতায়, তেমন আশঙ্কাও জাগায়। দেখতে দেখতে ঝড় এল সামনে ধুলো উড়িয়ে। আমরা তবু এগিয়ে চললাম। তা ছাড়া আর গতি ছিল না। কি জানি রাস্তার দুধারে যে ঘন সন্নিবিষ্ট আম গাছের সারি আছে তাদের কেউ যদি ধরাশায়ী হয়, আমরা পথে আটকে যাব। ওদিকে দুপাশের মাঠ জলে কর্দমাক্ত হয়ে যাবে। ফলে এইখানেই পথের মধ্যে আমাদের রাত কাটাতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে ঝড়ের তীব্রতা বাড়লেও কালনা হতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত যে পথ গিয়েছে তার ওপর কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হল না। কোন গাছ পড়ে বা ডাল ভেঙে কোথাও পথে আটকে পড়তে হয় নি। পাণ্ডুয়ায় এসে বর্ধমানের জেলা পুনর্বাসন আধিকারিককে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে আমরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। গাড়িতে আরোহী তখন আমরা দুজন মাত্র, আমি আর আমার ড্রাইভার শ্রীসুরেশ নাগ। খানিক দূরে যেতে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এসে যোগ দিল। এমন মুষলধারে বৃষ্টি যে পথে কিছু দেখা যায় না। হেডলাইট জ্বেলে আমাদের ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে যেতে হল। সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম এই দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কলিকাতায় পৌছতে পারব তো? তাঁর মনে খুব সাহস; তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, নিশ্চয় পারব, স্যার।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। ঝড়ের ও বৃষ্টির তুমুল শব্দকে ভেদ করে মাঝে মাঝে বজ্রনির্ঘোষের শব্দও কানকে বিদীর্ণ করছিল। তবু গাছগুলি আন্দোলিত হলেও ভেঙে পড়ল না। তাই কোন রকমে আমরা এগিয়ে চলতে পারছিলাম। দেখতে দেখতে রাত্রি হয়ে এল। এদিকে ঝড়ের বেগও কমে আসতে লাগল। বৃষ্টিও ধরে এল। আমরা ভাবলাম দুর্যোগ বুঝি কেটে গেল।

ইতিমধ্যে আমরা শেওড়াফুলি অবধি এসে গেছি। কিন্তু তখনও জানতাম না যে আমাদের বিপদ কাটে নি; তা সামনে পুঞ্জীভূত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে। আসলে হয়েছিল কি, ঝড় আমরা যে অঞ্চল দিয়ে এলাম সে অঞ্চলেও প্রবাহিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার তীব্রতা সেখানে ছিল তুলনায় কম। তাই গাছ ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে অসহায় ভাবে দুলেছে কিন্তু মাটিতে লুটোয় নি। এ অঞ্চলে কিন্তু একটি সংকীর্ণ পথে ঘূর্ণি ঝড়ের আকার নিয়ে তা তীব্রতর গতিতে বয়ে গিয়েছে। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড় দিয়ে খানিক পথ গিয়ে তারপর নদী পার হয়ে পুর্ব দিকে চলে গেছে। তার ফলে এ অঞ্চলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুদিকে ঘূর্ণির তাণ্ডবের দাপটে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ঝড়ের তীব্রতার প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। খবরের কাগজে পরে জেনেছিলাম এই ঘূর্ণি ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯৬ মাইল। সুতরাং যা দেখেছিলাম তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

এ অঞ্চলে রাস্তার দুপাশে যে গাছগুলি ছিল সেগুলি প্রায় সব মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে রাস্তার পাশে ঝোলান বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চালনের তারগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে পড়েছে। সাধারণত দেখা যায় নারিকেল গাছ বড় একটা ঝড়ে পড়ে না এবং বড় বড় ঝড়কে অবজ্ঞা দেখিয়ে বছরের পর বছর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখলাম। তারাও রক্ষা পায় নি। একটা দৈত্য যেন তাদের মটকে ভেঙে মাটিতে ফেলে দিয়ে গেছে। ফলে পথ

অন্ধকার ; উৎপাটিত গাছ এখানে ওখানে পড়ে রাস্তার ওপর যেন অবরোধ সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। শ্রীসুরেশ নাগকে বললাম, কলকাতায় পৌছতে পারব তো ? তিনি আবার বিশ্বাসে অটল থেকে আশ্বাস দিয়ে বললেন নিশ্চয় পারব।

এখন আমাদের গাড়ি চলল ভাঙা গাছের ডালপালা এড়িয়ে এঁকে বেঁকে যেখানে একটু ফাঁক পাওয়া যায় সেই পথে। এ যেন গোলক ধাঁধায় চলা। তারপর এমন একটা জায়গায় এসে পড়লাম সেখানে রাস্তার এপাশ হতে ওপাশ পর্যন্ত একটা বিরাট গাছ পড়ে সমস্ত রাস্তাকে অবরোধ করেছে। গাছ কেটে না সরালে সে পথ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আটকে পড়লাম। গাছ তো রাতারাতি কাটা সম্ভব নয়। তার সাজসরঞ্জাম চাই, তার জন্য জনবল চাই। সুতরাং তার অপেক্ষায় থাকতে গেলে একটা সমগ্র দিন কেটে যাবে। এদিকে দেখতে দেখতে দুদিক হতে যত গাড়ি এসে পড়ে ভিড় জমাচ্ছে। ওখানে বেশিক্ষণ থাকলেও গাড়ির ভিড়ে আমাদের গতি রোধ হতে পারে।

এই খানেই আমার সারথির মানসিক বল এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দিল। অন্য গাড়ি পিছন থেকে এসে পথ রোধ করবার আগেই তিনি গাড়ি একটু পিছন দিকে হটিয়ে নিয়ে গিয়ে নিকটতম যে বাঁ দিকের রাস্তা পেলেন তাতে গাড়ি ঢুকিয়ে রাখলেন। যদি এই অবরোধ হতে আজ রাতে মুক্তি মেলে তো এই পথেই মিলবে। সুরেশবাবু তারপর গাড়ি হতে নেমে পড়ে স্থানীয় মানুষদের কাছে খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন অলিগলির পথ দিয়ে গিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ওঠা যায় কিনা। এখন এদিকটা সবই শহর অঞ্চল। পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং পূর্বে ভাগীরথী নদীর মাঝখানের অংশটা সবই ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে ছোট ছোট এমন অনেক রাস্তা আছে যা সমান্তরালভাবে নদী আর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখান দিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে বড় রাস্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছে। এই খবর সংগ্রহ করে আমরা এবার গলির পথে নির্গমনের চেষ্টা করতে লাগলাম। দক্ষিণমুখী পথে যেতে যেতে এমন একটা রাস্তা পেলাম যা পশ্চিমে বেঁকে বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। তখন আর আমাদের পায় কে ? আমরা অবাধে কলিকাতার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

এতগুলি বাধা অতিক্রম করে আসতে আমাদের অনেক সময় লেগে গেল। আমরা যখন বাড়ি পৌছলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। অর্থাৎ যে পথ অতিক্রম করতে আমাদের আড়াই ঘণ্টা লাগে সেই পথই পার হতে আমাদের পাঁচ ঘণ্টা লেগেছে। গিয়েই কি নিবৃত্তি আছে ? বাড়ি ফিরেই শুনি পুনর্বাসন বিভাগের আশ্রয় শিবিরের ভারপ্রাপ্ত আমার সহকর্মী আমার সঙ্গে জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য ফোনে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তখনি তাঁকে ফোনে স্মরণ করতে হল।

তিনি যা বললেন, তা আমাকে এক নূতন সমস্যায় ফেলল। তিনি জানালেন, সন্ধ্যার মুখে এক তীব্র ঘূর্ণি ঝড় টিটাগড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এবং ফলে ছেলেদের সেখানে যে আশ্রয় শিবির ছিল, তা ভূমিসাৎ হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি জানালেন, কোন প্রাণহানি হয় নি এবং যা প্রাথমিক কর্তব্য তা নিজেই সম্পাদন করেছেন। তখন গ্রীষ্মের অবকাশ চলছিল। তাই স্কুলগুলি বন্ধ ছিল। দুর্যোগের খবর পাবামাত্রই তিনি টিটাগড মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আশ্রয় শিবিরবাসী বালকদের অস্থায়ী-ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন কর্মকুশল সহকর্মী পাওয়া সৌভাগ্য। ঠিক হল পরের দিন ভোরে সরজমিনে গিয়ে আমরা দুজনে এই নূতন সমস্যার একটি সমাধান করব।

কি আশ্চর্য কাণ্ড! এইখানেই সেইদিনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব আশ্রয় শিবিরবাসী বালকগণ আড়ম্বরসহ পালন করেছিল। আমরাও পূর্বদিন কেমন প্রস্তুতি চলছে দেখতে গিয়েছিলাম। যে বড় ঘরটি পড়াশোনার জন্য সংরক্ষিত ছিল সেটি সুন্দর করে তারা সাজিয়েছিল। পরে শুনেছি যে আশ্রয় শিবির ঝড়ে উড়ে যাওয়ায় আশ্রয় শিবিরবাসী বালকগণ তত ক্ষুব্ধ হয় নি, যত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিসহ সাজান ঘরখানি বিপর্যস্ত হওয়ায়।

সুতরাং পরের দিন ভোরে আমরা টিটাগড় গেলাম। প্রথমে আশ্রয় শিবিরে গেলাম। তা বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমে নদীর তীরে অবস্থিত। এটি আগে সৈন্যদের ব্যারাক হিসাবে ব্যবহৃত হত। সুতরাং সেখানে ছিল অনেক-গুলি বড় বড় হল ঘর। তাদের দেয়াল ছিল ইট দিয়ে গাঁথা আর ছাদ ছিল করোগেট টিনের। বোঝাই গেল, যে ঝড় ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে গত সন্ধ্যায় শত গাছ ফেলে দিয়েছিল, তাই নদী পার হয়ে এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। ঝড় টিনের ছাদগুলি উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছিল বলে এখানে যে ছেলেরা বাস করত, তাদের কোন আঘাত লাগে নি।

তারপর যে স্কুলগৃহে ছেলেরা রাত্রের মত আশ্রয় পেয়েছিল, সেখানে গেলাম। এই ঘটনার ফলে তাদের নিয়মিত জীবনযাত্রা প্রণালী বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের সময়মত খাবার পাওয়া সম্ভব হয় নি, শোবার অসুবিধা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করে নি। এখন সমস্যা হল তাদের স্থায়ী আশ্রয়ের কি ব্যবস্থা করা যায়।

আমাদের একটা সুবিধা ছিল; আন্দুলে যাবার রাস্তায় শালিমারের রেল লাইন পার হয়ে একটি বড় জায়গা আমাদের দখলে ছিল। সম্ভবত সেখানে আগে একটা কারখানা ছিল। অনেকখানি জায়গা উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে একটি দোতলা বাড়ি। সেটি সম্ভবত আপিস হিসাবে ব্যবহৃত হত। আর ছিল একটি প্রকাণ্ড করোগেট টিনের শেড। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা

পুকুরও ছিল। আমরা ইতিমধ্যেই আশ্রয় শিবিরবাসী বালকদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় খুলেছিলাম। টিটাগড়েও এই রকম একটি আবাসিক বিদ্যালয় ছিল। পূর্ব দিনের ঝড়ে তা ভেঙে যাওয়ায় সেখানে আশ্রিত ছেলেরা এখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ সমস্যার সহজ সমাধান হল টিটাগড়ের ছেলেদের আন্দুল রোডের হোম-এ স্থানান্তরিত করা। আপাতত হয়ত তাদের ভিড় করে থাকতে হবে, কিন্তু সেখানে যখন অনেকখানি খালি জায়গা আছে, সস্তায় অতিরিক্ত ঘর বানিয়ে দিলে সে সমস্যার অল্প দিনেই সমাধান করা যাবে। সুতরাং সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সেদিনকার কালবৈশাখীর ঝড় নানাভাবে আমাদের স্মরণযোগ্য হয়েছিল। প্রথমত কালনা হতে ফিরবার পথে তা গাছ ভেঙে পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়ত, তা টিটাগড়ের ছেলেদের আবাসিক কেন্দ্র উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পণ্ড করেছিল। পরিণতিতে টিটাগড়ের আবাসিক কেন্দ্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে আন্দুল রোডের আবাসিক কেন্দ্রকে পরিবর্ধন করতে হয়েছিল। কাজেই তা আশ্রয় শিবিরবাসী ছেলেদের বৃহত্তম আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এই ঝড়টাই তার আয়তন বৃদ্ধির কারণ।

(১০)

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন এই বছর জুন মাসের শেষে একটি নূতন প্রস্তাব করলেন। অন্যবার তিনি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ দেখতে আসেন; কতদিন থাকবেন বুঝে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের স্থানীয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর ভ্রমণপঞ্জি ঠিক করে দিয়ে থাকি। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম হল। তিনি সোজা জানালেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। উদ্দেশ্য হল নদীয়া জেলা পরিদর্শন করে দেখবেন যে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে যে মুসলমান পরিবারগুলি পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল এবং পরে ফিরে এসেছিল তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের প্রত্যর্পণ করার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

সুতরাং বোঝা যায় তাঁর এ প্রস্তাব স্বতঃপ্রণোদিত নয়। অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে নিশ্চয় অনুযোগ হয়েছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে পরিবারগুলি ফিরে এসেছে তারা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফিরে পায় নি। নিশ্চয়ই প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে এবং সম্ভবত তিনি এ বিষয় অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর নির্ভর করতে চান নি। তাই দিল্লীর মন্ত্রীকে দিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আচরণ আমাদের ক্ষুণ্ণ করেছিল। কিন্তু

উপায় কি? ওপর হতে নির্দেশ আসলে তা বিনা প্রতিবাদে পালন করতে হবে।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উভয় বঙ্গে ব্যাপক দাঙ্গার ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষের যে স্রোত বয়েছিল তা উভয়মুখী ছিল। যেমন পূর্ববঙ্গ হতে হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে চলে এসেছে, তেমন ব্যাপক হারে পশ্চিম বঙ্গ হতে মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। পশ্চিম বাঙলার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যারা এখানে চলে এসেছিল তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আনুষঙ্গিক-ভাবে যারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের সম্পত্তি নিয়েও একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। সে সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই উভয়মুখী স্রোত যখন চলছিল তখন আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলিয়াকত আলি খাঁর একটি চুক্তি হয়। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার মূলনীতি হল, যারা দেশত্যাগী হয়ে বাস্তুত্যাগ করে চলে গেছে তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসতে উৎসাহিত করা হক এবং ফিরে আসলে তাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে তার দখল দেওয়া হক। তাতে আরও নির্দেশ ছিল যে এই চুক্তিতে যে শর্তগুলি গৃহীত হয়েছে, তাদের প্রয়োগ করবার সুবিধার জন্য তাদের বিধিসম্মত আইনে রূপান্তরিত করতে হবে।

এই নির্দেশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশত্যাগীদের সম্পত্তি সম্পর্কে একটি অর্ডিনান্স পাশ করান। পরে তাকে পশ্চিমবঙ্গ পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন নাম দিয়ে (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পাঁচ নম্বর আইন) বিধান সভায় গ্রহণ করে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাতে যে ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগের জন্য গৃহীত হয়েছিল তা সংক্ষেপে এই :

পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগী মুসলমান পরিবার যদি ৩১শে মার্চ ১৯৫১ তারিখের মধ্যে ফিরে আসে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল পাবার অধিকারী হবে। জেলা আধিকারিকদের কর্তব্য হবে সম্পত্তি উদ্ধার করে তাকে দখল বুঝিয়ে দেওয়া। তিনি যদি তা করতে অক্ষম হন, ওপর মহলে জানাবেন। ওপর মহল যদি মনে করেন, সম্পত্তি দখল দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তার পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক যদি না ফিরে আসে, তাহলে তার সম্পত্তি একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতির হেফাজতে আসবে।

কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সমিতির ক্ষমতা একবারেই সীমাবদ্ধ। এই সম্পত্তি তার হস্তান্তর করবার ক্ষমতা নেই। কেবল এইটুকু মাত্র অধিকার আছে যে সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে থাকলে একবছর পর্যন্ত মেয়াদে তার বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে।

অথচ জমির মালিকের অধিকার সংরক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সে যদি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৩ এর মধ্যে ফিরে আসে, সে সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার দাবী করতে পারবে; কারণ এ অবস্থায় খাস দখল পাওয়া নাও সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া সম্পত্তি ইজারা লওয়া ব্যতীত অন্য যে কোনভাবে হস্তান্তরিত করতে পারে। অর্থাৎ তা বিক্রয় করতে পারে, অন্য জমির সঙ্গে বিনিময় করতে পারে ইত্যাদি।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গার পর ইতিমধ্যে প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। হাঙ্গামার মুখে সম্পত্তির মালিক পূর্ববঙ্গে চলে গেলে অনেক সদ্য আগত উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবার তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে নিজেদের আশ্রয় স্থান সংগ্রহের সমস্যার সমাধান করে নিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে মুসলমান উদ্বাস্তু পরিবার পাকিস্তানত্যাগী হিন্দুর সম্পত্তি গ্রহণ করেছে। এমনও হয়েছে যে এই দুঃসময়ে অসঙ্গত উপায়ে লাভবান হবার আকর্ষণ অনেক লোভী মানুষ নামমাত্র মূল্যে মালিকের কাছে জমি কিনে নিয়ে তা অপরের কাছে বেশী মুল্যে বিক্রয় করেছে। আবার এও হয়েছে যে বকেয়া খাজনার নালিশ করে জমিদার ডিক্রি জারী করে জমির খাস দখল নিয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক চাষের ও বাসের জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকেছে।

সুতরাং এই রকম অনিশ্চিত অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ঠিক অবস্থা কি তা বাহির করা শক্ত। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সরকারের সংগৃহীত এক তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে মোট ৪৪,৬৬১টি পরিবার নদীয়া জেলা ত্যাগ করে দাঙ্গার সময় পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল। আর জানা যায় যে তাদের মধ্যে ২৩,৭৫৫টি পরিবার ফিরে এসে সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য আবেদন করেছিল এবং তাদের মোট এক লক্ষ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গড়ে যদি ধরা যায় একটি চাষী পরিবারের দশ বিঘা জমি ছিল, তাহলে এই বিবরণ হতে অনুমান করা যায় যে প্রায় সকলেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফেরত পেয়েছে।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের শেষে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের নির্দেশে যে তথ্যসন্ধানী সমিতি স্থাপিত হয়েছিল তার অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ অনেক চেষ্টা করে কেবল চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলা সম্পর্কে এ বিষয় কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক সব থেকে ব্যাপক হারে বাস্তত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল নদীয়া জেলা হতে। তার পরেই তাদের সংখ্যা বেশি ছিল চব্বিশ পরগণা জেলায়। অবশ্য উত্তরের জেলাগুলি হতেও এই সম্প্রদায়ের অনেক পরিবার বাস্তত্যাগী

হয়েছিল ; কিন্তু তাদের সংখ্যা তুলনায় কম ছিল। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই দুই জেলা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা এদের চোদ্দ আনা অংশ সম্পর্কে খবর দিতে পারে।

এই দুই জেলা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত হল :

চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত জমির মোট পরিমাণ—২ লক্ষ ৬ হাজার একর।

তার মধ্যে যত জমির মালিককে পুনরায় দখল দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ—১ লক্ষ ৪ হাজার একর।

যে জমি বিনিময়ের ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হয়েছে, তার পরিমাণ—১৬ হাজার ৮শ একর।

যে জমি পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু পরিবারের জবরদখলে আছে, তার পরিমাণ—৫৯ হাজার একর।

যে জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তার পরিমাণ—২৬ হাজার একর।

মোটামুটি এই হল অবস্থা।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ঠিক করেছিলেন ২২শে ও ২৩শে জুন তারিখে তিনি নদীয়া জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে পাকিস্তানের সহিত চুক্তি কিভাবে পালিত হচ্ছে তা দেখবেন। সুতরাং তাঁর কৃষ্ণ-নগরের সার্কিট হাউসে এ দুদিনের জন্য থাকবার ব্যবস্থা হল। তাঁর পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতাস্থিত শাখার ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীএ. এম. বাস তাঁর সঙ্গে থাকবেন ঠিক হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায়ের থাকা উচিত ছিল, কিন্তু জেলার অভ্যন্তরে মোটরযোগে দীর্ঘ পথ যাতায়াত এবং জনতার সঙ্গে মোকাবিলা তাঁর তখনকার স্বাস্থ্যের অবস্থায় অনুচিত হবে বিবেচনায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর স্থানে শ্রমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে প্রতিনিধিত্ব করতে অনুরোধ করলেন। বিভাগীয় সচিব হিসাবে আমিও তাঁর সঙ্গে থাকলাম। ২২শে তারিখে সকালেই আমরা তেহট্ট ও করিমপুর অঞ্চলে রওনা হয়ে গেলাম ; কারণ ওই দুই থানাই পাকিস্তানের সংলগ্ন এবং ওখানেই ব্যাপক হারে ১৯৫০-এর দাঙ্গার সময়ে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশত্যাগী হয়েছিল।

সে বছর শুরু হতেই প্রকৃতি বাঙলা দেশের ওপর সদয় ছিলেন। কাল-বৈশাখী ঠিক সময়ে হাজির হয়েছিল এবং নিয়মিতভাবে ঝড়ের মুখে বারিবর্ষণ করে আউস ধান আর পাটের চাষের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এ অঞ্চলে ততটা পাট হয় না, কিন্তু ব্যাপকভাবে আউস ধান ফলে। অনুকূল পরিবেশ

পেয়ে গাছগুলি বেশ সতেজ হয়ে উঠেছিল। সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিরক্ষার তাগিদে ইতিমধ্যে পথঘাট সব পাকা হয়ে গেছে। তখন আবার বর্ষা নেমে গিয়েছে। আকাশ সেদিন মেঘে ঢাকা ছিল। বৃষ্টিও পড়ছিল, তবে প্রবল ধারায় নয়, ঝিরঝির করে, মাঝে মাঝে ধরেও যাচ্ছিল। এ ধরনের বৃষ্টি ততটা জামা-কাপড় ভিজিয়ে দেয় না যতটা দেহকে শীতল স্পর্শ দিয়ে স্নিগ্ধ করে।

সুতরাং পথচলা আমাদের সংঘটিত হয়েছিল মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে। দুধারে মাঠ আউস ধানে ভরে গিয়েছে, আর তার মাঝ দিয়ে কালো ফিতের মত রাস্তা চলে গিয়েছে। বাংলা দেশের প্রকৃতির সেই শস্যশ্যামল রূপ শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈনের মত কাজের মানুষকেও মুগ্ধ করল। তিনি বললেন, তোমাদের দেশ কি সুন্দর, কি উর্বর তার মাটি!

কথাটা খানিক সত্য বৈকি! শীতের শেষে বা গরমের শুরুতে পশ্চিমের মাটি পুড়ে ধূসর হয়ে যায়। মাঠে সবুজের চিহ্ন থাকে না। আমাদের বাঙলা দেশে মাঠের ঘাস তখনও সবুজ থাকে। গরমের দিনে কালবৈশাখীর অনুকম্পা থাকলে দু'এক পশলা বৃষ্টির পর নূতন ঘাসে মাঠ ঢেকে যায়। তবে একথা ঠিক যে তিনি যে রূপে তাকে দেখলেন, তা তার শ্রেষ্ঠ রূপ, বলা যায় ভরা যৌবনের রূপ।

এ অঞ্চলে আবাদী জমির মাঝে মাঝে বিস্তৃত তৃণভূমিও দেখা যায়। তা উলুঘাসে ঢাকা। বর্ষার জল পেয়ে তাও সতেজে বেড়ে উঠে পাশের ধান ক্ষেতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। আমার মন খালি ঘোরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কোথায় উদ্বৃত্ত জমি আছে তার সন্ধানে। সুতরাং আমার মনে হল এই অনাবাদী জমিগুলি পুনর্বাসনের কাজে লাগান যায় কিনা। আমি সে বিষয় প্রশ্নও উত্থাপন করলাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় নেতারা। তাঁরা আমার ভ্রান্তি সংশোধন করে দিলেন। তাঁরা বললেন এই জমিগুলি যে অনাবাদী পড়ে রয়েছে তা নয়। এখানে যে ছন ঘাস উৎপাদিত হচ্ছে, তার একটি অর্থনৈতিক মূল্য আছে, তা পণ্য হিসাবে বিক্রয় হয়। এ অঞ্চলে গ্রামের মানুষ ছন দিয়ে বাড়ির ছাদ বানায়। বর্ষার জল পেয়ে ঘাস বড় হলে বর্ষার শেষে এগুলি কেটে খড়ের মত বিক্রয় করা হয়। কাজেই জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা উচিত হবে না।

অনেকখানি পথ চলার পর আমরা গিয়ে এক জায়গায় থামলাম। সেখানে অনেক মানুষ জড় হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের কেউ এসেছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে, কেউ এসেছিল তাঁর তদন্তের বিষয় তাঁর কাছে তথ্য স্থাপন করতে। দু'একজন রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। ওই অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে এসেছিলেন। কংগ্রেস পক্ষের নেতারাও হাজির ছিলেন।

আমরা তাঁদের সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে আশ্চর্য হই নি। কারণ তদন্তকে সফল করবার জন্য উভয় পক্ষের কথাই তো নেতাদের সাহায্যে তাঁর নিকট স্থাপিত হওয়া উচিত। আমরা সরকারী কর্মচারীরা কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য হয়েছিলাম শ্রীজিওন সিংকে সেখানে দেখে। তিনি সেখানে এক জীপে চড়ে এসে হাজির হলেন। তাঁর পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। নোয়াখালির দাঙ্গার পর যেসব উদ্বাস্তু দেশত্যাগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল তিনি তাদের দেশে ফিরিয়ে দেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেছিলেন। তার জন্য তিনি কলিকাতার নিকটে সন্তোষপুরে এক পরিত্যক্ত ছাউনিতে আশ্রম খুলেছিলেন এবং তার জন্য যথেষ্ট কেন্দ্রীয় সাহায্য পেতেন। এখন সেই কাজের সঙ্গে তাঁর বর্তমান তদন্তে উপস্থিত হবার কোনো যুক্তিসম্মত সংযোগসূত্র খুঁজে পাওয় যায় না।

তাঁর আচরণ হতে কিন্তু তখনি পরিষ্কার হয়ে গেল তিনি কি কারণে এখানে এসেছেন। সত্যই পূর্বের কাজের সঙ্গে তাঁর বর্তমান আচরণের কোনো সংযোগ ছিল না। তিনি এসেছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করতে। অর্থাৎ সম্প্রতি সংখ্যালঘু-প্রীতি তাঁর হৃদয়টিকে দখল করে বসেছে। আমাদের জানা ছিল, তাঁর দিল্লীর উপর মহলে, বিশেষ করে খোদ প্রধান-মন্ত্রীর কাছে যাবার অবাধ অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের অনুমান করা শক্ত হল না, সম্ভবত এই মহল হতেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে দায়িত্ব পালনে শিথিলতার অভিযোগ পৌঁচেছে। এক সম্প্রদায় হতে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর প্রীতি বা অনুরাগ স্থানান্তরিত হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কোন দোষ ধরা যেতে পারে না স্বীকার্য। কিন্তু স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ওঠে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কি সত্যই মানবিকতাবোধ-প্রণোদিত না অন্য উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত?

সেদিন আরও দুতিন জায়গায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয় পরিদর্শন এবং তদন্ত করবার জন্য থামলেন এবং স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধিদের মুখে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য শুনলেন। যে সব পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তু এদের সম্পত্তি জবরদখল করেছিল, তাদের কথাও শুনলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যারা পাকিস্তান হতে ফিরে এসে সম্পত্তির পুনরায় দখল চেয়েছিল তাদের অভিযোগের কথাও শুনলেন। এতে অনেক সময় গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকালের দিকে দিন এগিয়ে গেল। আমরা অগত্যা কৃষ্ণনগরে ফিরে সার্কিট হাউসে আহার ও বিশ্রামাদি করতে এলাম।

সন্ধ্যার সময় সার্কিট হাউসে মন্ত্রীমহাশয় এক সভা ডাকলেন। তাতে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধি তো ছিলেনই, অতিরিক্তভাবে স্থানীয় জেলা-শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত ছিলেন। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত

সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সম্পর্কে তো আলোচনা হলই, অতিরিক্তভাবে আর একটি আলোচনায়ও আমরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। সেটা হল এই জেলায় অবস্থিত তাহেরপুর কলোনির পুনর্বাসন সমস্যা। এবিষয় আগেই আলোচনা হয়েছে। তাদের মধ্যে বেকার সমস্যা তখনও বড় আকারে বিদ্যমান ছিল। তাই পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত সাহায্য আদায় করতে তারা আন্দোলন চালাচ্ছিল।

এবারকার আন্দোলন নূতন রূপ ধারণ করেছিল। তাহেরপুরের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির প্রতিনিধিরা দল বেঁধে কৃষ্ণনগর শহরে এসে জেলা-শাসকের বাড়ির প্রাঙ্গণ এবং সার্কিট হাউসের প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই আন্দোলনে হিংসাত্মক কাজের কিন্তু স্পর্শমাত্র ছিল না। অত্যন্ত নিকটে বাস করে নিজেদের প্রয়োজনের কথা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ধর্মঘটকারী উদ্বাস্তুরা সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে অবস্থান করলেও জেলা-শাসকের যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করে নি। সার্কিট হাউসে যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রিসহ আমরা অবস্থান করছিলাম আমাদেরও গতিবিধিতে কোন বাধা দেওয়া হয় নি। আজকালকার ঘেরাও এর যুগে সেটা বোধ হয় অভাবনীয়। কিন্তু ভাগ্য কর্তৃক নিপীড়িত হলেও এদের মধ্যে শালীনতাবোধ নষ্ট হয় নি। ফলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধৈর্য পরীক্ষার ব্যাপার। ধর্মঘটকারীরাই বা কতদিন এইভাবে বসে থাকতে পারে আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষই বা কতদিন মেজাজ না খারাপ করে এই উৎপাত সহ্য করতে পারে। উভয় পক্ষই মনে হয় এই ধৈর্য পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল। জেলা-শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্তের আচরণে ধৈর্যচ্যুতির কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি।

ভাগ্যক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন তাদের ধর্মঘটের স্থানেই এসে এইভাবে হাজির তাদের সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ভালভাবেই হয়ে গেল। সেই জন্য সেদিন সন্ধ্যার আলোচনা সভায় শুধু পরিত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকল না, তাহেরপুরে পুনর্বাসন-প্রাপ্ত উদ্বাস্তু পরিবারদের সমস্যাও আলোচিত হল। এ বিষয় স্থানীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শ্রীফজলুর রহমান। তিনি তাহেরপুরের উদ্বাস্তুদের পক্ষ হয়ে অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তাদের সমস্যার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য তাদের বিশেষ সমস্যা হল জীবিকার সমস্যা। এখানে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন বা একটা বড় কারখানা স্থাপন করা ছাড়া তার উপযুক্ত সমাধান সম্ভব নয়। সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছিল।

পরের দিন সকালে আবার আমরা নদীয়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত গ্রামগুলি পরিদর্শনে বাহির হলাম। উদ্দেশ্য একই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

দাঙ্গার সময় যে সম্পত্তি ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত পাকিস্তান সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল, তা কতখানি পালিত হচ্ছে তা দেখা। পরিদর্শনের এবং তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর উপর ন্যাস্ত। আমরা সঙ্গে ছিলাম এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। এই দিনও পরিদর্শনের কাজ শেষ করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কাজ শেষ করে যখন কৃষ্ণনগরে ফিরলাম, তখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ঘটনাচক্রে দিনটি অন্যভাবেও এক গভীর বেদনাদায়ক সংবাদের সহিত সংযুক্ত হয়ে বিশেষ স্মরণযোগ্য হয়েছিল। ওই দিনই দুপুরের আহারের সময় সার্কিট হাউসে রেডিও যোগে আমরা খবর পেলাম শ্রীনগরে অন্তরীণ অবস্থায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। এই আকস্মিক দুঃসংবাদ আমাদের সকলেরই মনের ওপর দারুণ আঘাত হেনেছিল। বিশেষ করে তাঁর মত উদ্বাস্তু দরদী মানুষ তো বড় একটা দেখি নি। পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তুদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহিত যে কঠোর বাদানুবাদ করেছিলেন তা কারও অবিদিত নয়। প্রধানমন্ত্রীকে নিজের প্রস্তাবিত নীতি গ্রহণ করাতে পারেন নি বলে তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেছিলেন। তারপর লোকসভায় বিরোধী সদস্যের ভূমিকায় কতবার যে পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে তুমুল বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীর সহিত জড়িত হয়েছিলেন লোকসভার অধিবেশনের লিখিত বিবরণে তার প্রচুর সাক্ষ্য মিলবে। পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য তিনি কি ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ রক্ষা করতেন তা আমি জানি। আমাকেও এসম্পর্কে মাঝে মাঝে কত উপদেশ দিতেন। উদ্বাস্তুদের পরমহিতৈষী সেই বন্ধু আজ চলে গেলেন। উদ্বাস্তুদের তথা পশ্চিমবঙ্গের সে দিনটি সত্যই একান্ত দুর্ভাগ্যের।

এই দিন বিকালের দিকে শ্রীজৈনের শরীর একটু খারাপ হয়ে পড়েছিল। পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরে যাবার কথা ছিল। তাঁর শরীরের অবস্থা এমন খারাপ ছিল না যে তিনি ফিরে যেতে পারবেন না। সুতরাং আমরা সকলেই সেদিন পূর্ব ব্যবস্থা মত ফিরে এসেছিলাম। এই তদন্তের ফলে তিনি কি সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা তখন জানবার কথা নয়। তার পরে এর পরিণতি কি হয়েছিল তা সংক্ষেপে এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত জমি সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ আগে দিয়েছি তা হতে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি হয়েছিল তাতে নির্দেশ ছিল যে যারা ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চের মধ্যে ফিরে আসবে তারা সম্পত্তির খাসদখল দাবী করতে পারবে। হিসাবে দেখা যায় যারা এই দাবী করেছিল তাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হয়েছিল। বাকি যে

জমি ছিল, তা ইজারা ছাড়া অন্য যে কোন ভাবে মালিকের হস্তান্তর করবার ক্ষমতা ছিল। এই জমির এক অংশ পশ্চিম বাঙলায় আগত উদ্বাস্তুদের জবর-দখলে ছিল। তার পরিমাণ ছিল ৫৯,০০০ একরের মত। আর যে অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল, তার পরিমাণ ছিল ২৬,০০০ একরের মত।

এখন প্রশ্ন উঠেছিল এই জমিগুলির যখন যারা মালিক, তাদের কাজে লাগছে না তখন এগুলি পশ্চিম বাঙলায় আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ব্যবহার করা যায় কিনা। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিকল্প প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

প্রথম প্রস্তাবে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্পত্তিগুলি হুকুমদখল করতে অনুমতি দেওয়া হক। তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকের স্বত্ব লোপ পেয়ে সরকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে সরকার সে জমিগুলি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। অপরপক্ষে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকেরও কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এর জন্য জমির মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ সমেত অতিরিক্ত টাকাও দেওয়া হয়ে থাকে। সেই টাকা মালিকের নামে জমা থাকবে এবং সুবিধামত সে তা তুলে নিতে পারবে।

এই প্রস্তাবটি গৃহীত হলে উদ্বাস্তুদের দিক হতে সব থেকে ভাল হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর যে তথ্যসন্ধানী সমিতি নিয়োগ করেছিলেন, তা এই প্রস্তাবটি আলোচনা করেছিল, কিন্তু তা গ্রহণের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবিষয়ে বিকল্প প্রস্তাব ছিল এই: যে সব পরিত্যক্ত সম্পত্তির খাসদখল মালিককে দেওয়া হয় নি, তাদের সম্পর্কে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তার ক্ষমতা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। তার একমাত্র ক্ষমতা ছিল এক বছর পর্যন্ত মেয়াদে ইজারা দেবার। কিন্তু এত অল্প মেয়াদের ভিত্তিতে স্থায়িভাবে পুনর্বাসন সম্ভব হয় না। তাই প্রস্তাব করা হয়েছিল এই সমিতিকে দীর্ঘকালের ইজারা দেবার ক্ষমতা দেওয়া হক। এই প্রস্তাবটি তথ্যানুসন্ধানী সমিতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

(১১)

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে একদল ছাত্র এবং ছাত্রী ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁদেরই একজন অধ্যাপিকা, নাম ছিল গাম্বার। এঁরা শুধু দেশ ভ্রমণে আসেন নি, এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশতেও এসেছিলেন। তাই কলকাতায় আসবার পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের

জন্য সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এদেশের মানুষের নিজেদের হাতে কিছু সেবা করবার ইচ্ছাও তাঁরা প্রকাশ করে ছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

আমার কাছে ওঁরা পরামর্শ চেয়েছিলেন, তাঁদের কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁরা কিভাবে এই কল্যাণকর্ম সাধনের ইচ্ছা পুরণ করতে পারেন। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে আমার উদ্বাস্তু ভাইদের কথা মনে হয়েছিল। কারণ তখন আমাদের দেশে এই হতভাগ্যরা তো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সবার অধম দীনের হতে দীন'। কাজেই বিদেশীর হাতে সেবা পাবার যোগ্যতা এবং অগ্রাধিকার তাদেরই। তাই আমি প্রস্তাব করেছিলাম, তাঁরা কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে, সাধারণের কাজে ব্যবহার করা যায় এমন একটি ঘর বানিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। এরপর কি উদ্দেশ্যে ঘর তোলা হবে তা ঠিক করা শক্ত হল না। যেখানেই কোন কলোনি গড়ে ওঠে সেখানেই অন্তত একটা স্কুল ঘরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে ঘর তোলা হবে, তা বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার হবে ঠিক হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হ'ল কোন্ কলোনি এই কাজের জন্য নির্বাচন করা যায়। কলিকাতা হতে বেশি দূরে হলে চলবে না, কারণ যাঁরা ঘর নির্মাণ করবেন তাঁরা কলিকাতায় হোটেলে থাকেন। সেখান হতে গিয়ে ঘরের কাজ করে আবার বিকেলে ফিরে আসতে পারেন এমন দূরত্বের মধ্যে হওয়া উচিত। এই সব বিবেচনা করে ঠিক হল, নন্দননগর কলোনিতেই তাঁরা ঘর বানাবেন।

এই প্রসঙ্গে নন্দননগর কলোনির কিছু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কলোনি গড়বার উপযুক্ত জমির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এই জায়গাটি আবিষ্কার করি। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে উত্তরে যেতে বরানগর পার হয়ে পড়ে বেলঘরিয়া। তার পূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণের জন্য যে বাস-এর কারখানা ও আপিস আছে তার পাশ দিয়ে যে রাস্তা বেলঘরিয়া স্টেশন অভিমুখে চলে গেছে লাইনের অপর পারে তার ওপরেই এই জায়গা অবস্থিত। লাইনের পুবে লাইন ঘেঁষে মোহিনী মিলের কারখানা অবস্থিত। ঠিক তার পেছনেই এই নন্দননগর কলোনি।

এককালে রেলকর্তৃপক্ষ লাইনে মাটি ফেলবার জন্য এই জমি ইজারা নিয়েছিলেন। মাটি কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল তিনটি সমান্তরাল জায়গা হতে। প্রতিটি পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মত চওড়া। দুটির মাঝখানে কুড়ি ফুটের মত ব্যবধান। সম্ভবত এইখান দিয়ে মাটি চালান দেবার জন্য গাড়ি যাতায়াতের সুবিধার জন্য মাঝের জায়গাটি আর কাটা হয় নি। ওদিকে কাটবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটি কুড়ি পঁচিশ ফুট গভীর করে সোজা উত্তর দিকে বরাবর কাটা হয়ে গেছে। ফলে জায়গাটিতে তিনটি লম্বা ধরনের দীঘি পাশাপাশি সমান্তরালে

অবস্থিত অবস্থায় কাটা হয়ে গেছে। দৈর্ঘ্যে তারা এক একটি প্রায় আধ মাইল লম্বা হবে। উত্তর অংশে সেগুলি পানায় ভর্তি হয়ে গিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। দক্ষিণের অংশগুলি পরিষ্কার। সেদিকের জল দীঘির জলের মতই স্বচ্ছ। এই জায়গার দক্ষিণ অংশ কিন্তু নিরেট জমি।

জায়গাটির যাঁরা মালিক তাঁদের একজন সরিকের উপাধি ছিল নন্দন। তারই অনুসরণে বড় বড় অক্ষরে ফটকের ওপরের নাম লেখা ছিল নন্দননগর। সম্ভবত মালিক এখানে কোন দিন একটি পল্লী গঠন করবেন উদ্দেশ্য ছিল। যাই হক, এই নাম হতেই উদ্বাস্তুদের এই কলোনির নাম হয়েছিল নন্দননগর কলোনি।

জায়গাটি আপোসে হুকুমদখল করা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের ভাগ্যক্রমে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই এতখানি জমি পাওয়া গিয়েছিল যা জবরদখল হয়ে যায় নি। আশেপাশে অনেক জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছে, কিন্তু এ জমি কি কারণে জানা নেই মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কলিকাতার অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এখানে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সহজ। অথচ একই কারণে যারা আশ্রয় শিবিরবাসী নয়, এমন অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারেরও এ জমির প্রতি আকর্ষণ খুব বেশি। সামনের খালি অংশে যেখানে খুব উঁচু জমি ছিল সেখানে একটি পরিকল্পনা করে প্রায় সাড়ে চারশ' চার-কাঠার প্লট হয়েছিল।

আশ্রয় শিবিরবাসী এবং বাহিরের উদ্বাস্তুদের পক্ষে এটি সমান আকর্ষণীয় হওয়ায় ঠিক হয়েছিল দু'শ পরিবার আশ্রয় শিবির হতে এনে এখানে জায়গা দেওয়া হবে। অন্য কারণেও তাদের এখানে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখানে কলোনি হবে এই খবর প্রচার হলে এ জায়গাটিও রাতারাতি জবরদখল হবার সম্ভাবনা ছিল। অথচ আশ্রয় শিবির হতে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিলে তারা জায়গাটি দখলে রাখতে পারবে। সেই কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করে আশ্রয় শিবিরবাসী অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের তাঁবু দিয়ে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে গৃহনির্মাণ ঋণ নিয়ে তারা নিজেদের বাড়ি করে নিয়েছিল।

যারা আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু নয় তাদের মধ্যে জমি বিলি করা এবং তাদের পক্ষে দখল নেওয়া এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। আবেদনকারীদের যোগ্যতা বিবেচনা করে নির্বাচন করতে হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ বিশেষ পরিবারকে জমির দখল দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও দীর্ঘকাল জমি খালি পড়ে থাকে। তারপর সুবিধামত সময়ে বাড়ি উঠলে তবে তারা বাস করতে আসে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই কলোনিটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে এখানে অনেক বিশিষ্ট মানুষ পুনর্বাসনের জন্য জমি

নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বেশ মনে পড়ে। একজন হলেন বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ সোমেশচন্দ্র বসু। এঁর অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য ইনি বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। মুখে মুখে বড় বড় সংখ্যার গুণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে করে দিতে পারতেন। অপর ব্যক্তির নাম জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। ইনি রাজসাহী জেলার মানুষ। স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয়ে অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী অবলম্বন করে তিনি বই লিখেছেন। এঁর অন্যতম 'নমামি' নামে গ্রন্থখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এইখানেই মার্কিন দেশের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতে একখানি-ঘর-বিশিষ্ট একটি বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কলিকাতায় পড়েন এমন কয়েকজন কলেজের ছাত্রছাত্রীও তাদের সঙ্গে এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল ইটের গাঁথুনির ভিতের ওপর মাটির মেঝে হবে, দর্মার বেড়ার দেয়াল হবে এবং ছাদ হবে টিনের। মাল যা লাগবে তা তাঁরা নিজেদের অর্থে কিনে দিলেন এবং শ্রমিকের ভূমিকায় নিজেরা নেমে কাজ শেষ করলেন। এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমাজসেবামূলক কাজে তাঁদের কি আনন্দ! দেখতে দেখতে দিন সাতেকের মধ্যে তাঁদের ঘর গাঁথা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এখন ঠিক হল আনুষ্ঠানিক-ভাবে সেটি পশ্চিমবঙ্গ বিভাগের কর্তৃপক্ষকে দান করা হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হল আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে মার্কিন ছাত্রদের স্বহস্ত নির্মিত এই ঘরখানি গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক হল ২১শে অগাস্ট, ১৯৫৩।

সুতরাং ওই দিন সকালে নন্দননগর কলোনিতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। মার্কিন ছাত্রছাত্রী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অধ্যাপিকা নেতা শ্রীমতী গাম্বার এসেছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে পাঠ করেন এমন ছাত্র যাঁরা এই ঘর বানানর কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরাও এসেছিলেন। স্থানীয় উদ্বাস্তু কলোনির অধিবাসীদের প্রতিনিধিরা তো থাকবেনই। সুতরাং সেদিন মহা উৎসাহের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে একটি কল্যাণমূলক কাজ করে মার্কিন ছাত্রছাত্রীরা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দেখে আমাদের সকলেরই মন খুশিতে ভরে গিয়েছিল। মিস গাম্বার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরটি দান করবার আগে একটি ছোট ভাষণে কিভাবে কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল তার বিবরণ দিলেন। তারপর আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় প্রত্যুত্তরে এঁদের কাজের সুখ্যাতি করে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি ছোট ভাষণ দিয়ে এই ঘরটি পুনর্বাসন বিভাগের পক্ষ হতে গ্রহণ করেন। এইভাবেই নন্দননগর কলোনির প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সে বিদ্যালয় এখন বিস্তার লাভ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে।

এই মাসেরই শেষ দিনটি আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল বলে স্মরণ রাখার যোগ্য। একটি নূতন ধরনের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়েছিল। পরিকল্পনার দিক হতে তার যেমন অভিনবত্ব আছে তেমন তাৎপর্যও ছিল সুদূরপ্রসারী। এই মন্তব্যের যথার্থতা বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক কথা বলবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম নামে নগরী প্রাচীনকালে জলপথে বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলে খ্যাতি আছে। এই খ্যাতি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বর্ধমানের দিকে যেতে গেলে আমরা চুঁচুড়া পার হবার পর একটি জায়গা আছে যার নাম আদি সপ্তগ্রাম, তা প্রাচীন সপ্তগ্রামের বর্তমান রূপ। তা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেলে আমরা মগরা নামে একটি জায়গা পাই। এই মগরা বালির জন্য বিখ্যাত। কলিকাতা অঞ্চলে যত বাড়ি হয় তার জন্য যত বালি লাগে তা এই অঞ্চল হতেই আসে। মগরার বালি নাকি গুণে সবার শ্রেষ্ঠ। শুধু মগরা কেন? সপ্তগ্রামের পর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাবার সময় নজর করলে দেখা যাবে এখানে রাস্তার দুপাশে বড় বড় বালির স্তূপ পড়ে আছে। এখানে মাটি কয়েক হাত খুঁড়লেই বালি পাওয়া যায়। মাটি হতে সেই বালি তুলে গাদা করা হয়। সেখান হতে ট্রাকে করে কলিকাতা অঞ্চলে বালি রপ্তানি করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল এত বালি এখানে এল কি করে। সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ওই আদি সপ্তগ্রাম। প্রাচীনকালে তা বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ভাগীরথী দিয়ে এখানে বড় বড় সওদাগরী জাহাজ আসত এবং এখান হতে মাল আমদানী রপ্তানি হত। এই অঞ্চলে সেকালে দুটি বড় নদী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছিল। তাদের প্রশস্ত বক্ষেও সওদাগরী জাহাজ চলাচল সহজ ছিল। এই কারণে সপ্তগ্রামে সেকালে একটি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠেছিল। এখন তা একটি অখ্যাত গ্রামে পরিণত হয়েছে। তবে তার মাটি খুঁড়লে প্রাচীন সংস্কৃতির নানা স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়ে।

সপ্তগ্রামের বর্তমান দুর্দশার কারণ ওখানে প্রবাহিত নদী দুটি মজে যাওয়া। এই নদী দুটি এখন এত শীর্ণকায়া যে মনে বড় একটা রেখাপাত করে না। তাদের ওপর দিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ রক্ষার জন্য যে দুটি সেতু নির্মিত হয়েছে তারাও আকারে এত ছোট যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কুন্তী নদী তবু পদে আছে, দেখলে মনে হয় তাকে ছোট নদীর মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সরস্বতীর দুর্দশা এমন হয়েছে, তা এত শীর্ণকায়া যে তাকে নালা বলে ভুল করলেও দোষ দেওয়া যাবে না। তার একমাত্র ভরসা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে তাকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত হবার ফলে ভূগোলে না হোক, কথাসাহিত্যে সম্ভবত

তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি থেকে যাবে। এই নদী দুটি কেন যে মজে গেল জানা নেই। কিন্তু তার ফলে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব নষ্ট হল এবং বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে তার আভিজাত্য লোপ পেল।

এখন এ অঞ্চলে এত বালি জমার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই কুন্তী ও সরস্বতী নদীই এ অঞ্চলে এত বালি টেনে এনে রেখেছিল। পরে ধীরে ধীরে পলি পড়ে তা মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নদী বালি টানে তা জানা কথা, তবে সে বালি তো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই জমা পড়বে, কিন্তু সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ল কি করে? এরও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যায়। অনেক সময় এমন হয় যে নদীতে প্রবল বন্যা এলে দুকূল প্লাবিত করে যখন তা সমগ্র অববাহিকা ভাসিয়ে দেয়, তার সঙ্গে বালির আস্তরণ সমগ্র এলাকা জুড়ে পড়া সম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আছে। গত ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে দামোদরে যে দুকূলপ্লাবী বন্যা হয় তার ফলে এক বিরাট অঞ্চল বালির আস্তরণ পড়ে কৃষির অযোগ্য হয়ে যায়। পরে ধীরে ধীরে পলির আস্তরণ পড়ার ফলে তা আবার কৃষিযোগ্য হয়েছে। এখনও শক্তিগড়ের কাছে এক বিস্তীর্ণ এলাকা এই কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে আছে।

এইভাবে ওই দুটি মজে-যাওয়া নদীর অতীতের দান মাটির তলায় চাপা অবস্থায় বহুকাল পড়ে ছিল। তারপর কলিকাতা অঞ্চলে জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ি করবার কাঁচা মালের চাহিদা যেমন বাড়ল তেমন এ অঞ্চলের বালির প্রতিও ব্যবসায়ীদের নজর পড়ল। যেখানে মাটির তলায় বালির সন্ধান মেলে সে জমি ইজারা নিয়ে তারা মজুর লাগিয়ে ওপরের মাটি সরিয়ে নিচের বালি ওপরে তুলে গাদা করে রাখে। তারপর পাইকারী হারে বিক্রয় হয়। এ অঞ্চলের মানুষের এইভাবে একটি অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলে গেল।

কিন্তু তার একটি খারাপ দিকও আছে। বালি তোলার কাজ হয়ে গেলে যে জায়গা হতে বালি তোলা হয়েছে তা একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। বালি তোলাই সেখানে প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে মাটি কাটা হয় না। যেখানে বালি আছে শুধু সেখানে কাটা হয়। আর যেখানে যেমন বালি জমা আছে, সেই রকম মাটি গভীর বা অগভীরভাবে কাটা হয়। সুতরাং বালি সরিয়ে নিয়ে যাবার পর যে জায়গা পড়ে থাকে তা না নেয় দীঘির বা পুকুরের রূপ, না নেয় নিচু জমির রূপ। দীঘি বা পুকুরে রূপান্তরিত হলে সেখানে মাছ উৎপাদন করা যেত বা তাকে জলাধার হিসাবে সেচের জন্য ব্যবহার করা যেত। নিচু সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হলে সেখানে সম্ভবত আমন ধান ফলান যেত। কিন্তু কিছুই সম্ভব না হওয়ায় তা পরিত্যক্ত অবস্থায় খালি পড়ে থাকে। ফলে ভাল চাষের জমি নষ্ট হয়ে যায়। এখনও এ অঞ্চলে বালি তোলার

কাজ চলছে। সুতরাং আরও জমি নষ্ট হচ্ছে। এভাবে এতদিন যত জমি নষ্ট হয়েছে, তার পরিমাণ অল্প হবে না।

এখন জেলা-শাসকের মনে প্রশ্ন উঠল—এই জমি কি কোন কাজে লাগান যায় না? সাধারণ জেলা-শাসক হলে হয় তো এ প্রশ্ন আদৌ উঠত না, কিন্তু তিনি অসাধারণ বলেই সম্ভবত উঠেছিল। তার নাম শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সেকালের আই. সি. এস. পাশ সরকারী কর্মচারী। বহুকাল তিনি জেলা-জজের কাজ করে এসেছেন, কিন্তু কোনদিন জেলা-শাসকের কাজ করেন নি, কারণ স্থায়িভাবে তিনি বিচার-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন সরকার এই ধরনের কর্মচারীকে প্রশাসন বিভাগে চলে আসবার অধিকার দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের বলে তিনি চলে এসেছিলেন প্রশাসনিক বিভাগে। এখন তিনি বেশ প্রবীণ কর্মচারী, আমার থেকেও প্রাচীন। তাঁর সেই কারণে বিভাগীয় কমিশনার হবার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু পথে এক বাধা। একটা নিয়ম আছে যে বিভাগীয় কমিশনার হতে হলে অন্তত কিছু দিনের জন্য একজন অফিসারকে জেলা-শাসকের কাজ করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজের আমলে তাঁর সে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সৌভাগ্য হয় নি। এই কারণে বিভাগীয় কমিশনার হবার প্রস্তুতি হিসাবে তাঁকে অস্থায়ীভাবে হুগলী জেলার শাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় আছে বলে আমার জানা নেই।

তাই বলছিলাম, তিনি ছিলেন অসাধারণ জেলা-শাসক। শুধু তাই নয়, বয়সে প্রবীণ হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এই কারণেই বোধ হয় তাঁর নূতন চোখে যখন ও অঞ্চলের বালি ওঠান জমিগুলো দেখলেন তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল ওই নষ্ট-করা জমিগুলো কোন কাজে লাগান যায় কিনা। তা না হলে দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলে এইভাবে বালি তুলে জমি নষ্ট করা হচ্ছে এবং কত জেলা-শাসকের নজরে তা এসেছে কিন্তু তাঁদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন ওঠে নি কেন? এ বিষয় তিনি ভেবে ঠিক করলেন একটি সহজ উপায়ে তাদের কাজে লাগানো যায়। বালি সরিয়ে নেবার ফলে যে গর্তগুলি সৃষ্টি হয়েছে একটু সংস্কার করে নিলে সেগুলিকে জলাশয়ে পরিণত করা যায় এবং তারপর সেখানে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

পতিত জমি এইভাবে কাজে লাগান সম্ভব হলে পরের প্রশ্ন ওঠে সেগুলি কাদের ব্যবহারে লাগান যাবে। এখন হুগলী জেলায় অনেক অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম এবং চুঁচুড়ার সংলগ্ন কাপাসডাঙ্গা এলাকায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তাদের যদি সমবায় প্রথায় মাছের চাষে উৎসাহিত করা যায় তা হলে এই জমিগুলি হতে

একটা অতিরিক্ত আয় হবার সম্ভাবনা থাকে। মাছের জন্য দিন-রাত নজর দিতে হয় না। পোনা ছেড়ে দিয়ে জায়গা পাহারা দেবার ব্যবস্থা থাকলেই চলে। কয়েকটি পরিবার মিলে যদি তার ব্যবস্থা করে তা হলে তা সম্ভব হয়। সুতরাং এই পথেই শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার এক নূতন পরিকল্পনা রচনা করেন।

তিনি এ বিষয়ে পুনর্বাসন বিভাগের অনুমোদন লাভ করেছিলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবারকে একত্র করে পরীক্ষামূলকভাবে তিনি পাণ্ডুয়াতে প্রথম এই অব্যবহৃত জমিতে মাছ উৎপাদন করবার ব্যবস্থা করেন। এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হলে এ অঞ্চলের পতিত জমির এক বিরাট অংশ আবার কাজে লাগান সম্ভব হবে এবং সম্ভবত এখানে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের তথা স্থানীয় পরিবারদের একটি অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলে যাবে। সুতরাং বিষয়টির বিরাট সম্ভাবনা আছে।

এই শুভসঙ্কল্প কাজে পরিণত করবার জন্য তাঁর ইচ্ছায় একটি উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই উৎসবের দিন ধার্য হয়েছিল ৩১শে অগাস্ট ১৯৫৩। ওই দিন ঠিক হয়েছিল আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় ওই মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করবেন। সুতরাং পাণ্ডুয়াতে ওই দিন সকালে আমরা মিলিত হবার পর নির্বাচিত মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রটির উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জেলা-শাসক মহাশয় সংক্ষেপে পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী মহোদয়াকে কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলতে অনুরোধ করেন। তিনি তারপর একটি ছোট্ট ভাষণে এই পরিকল্পনাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রটি খোলা হল বলে ঘোষণা করেন।

(১৩)

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে এই বছর পশ্চিম বাঙলায় চলে এসে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেয়, ভারত সরকার তাদের সকলকে পুনর্বাসনের স্থানে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয় পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এর কয়েক মাস পরে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন নেবার পর বিভিন্ন কলোনি ত্যাগ করে যায়। বিশেষ করে ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা অনুসারে যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কলোনি ত্যাগীর সংখ্যা প্রচুর ছিল। এই অবস্থা দেখে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কেন এই ধরনের বিপর্যয় ঘটল সে বিষয় অনুসন্ধানের জন্য একটি তথ্য সংগ্রাহক সমিতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দোষ-ত্রুটি যা ছিল তা বাহির করা এবং প্রয়োজনমত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সুতরাং তাঁর নির্দেশে ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রকে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তার ভিত্তিতে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশ প্রচারিত হল। তাতে তথ্যানুসন্ধান এবং তার আলোকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দুটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠিত হয়। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটি নিয়োগ হয় তাতে তিনজন সভ্য ছিলেন। তাঁরা হলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব কে. পি. মাথরানি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শ্রীনির্মলকান্তি রায়চৌধুরী এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউটের সহিত যুক্ত পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ শ্রী এস. বি. সেন।

এঁদের ওপর ভার পড়ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যা কিছু কাজ সম্পাদন করেছেন তার একটি সামগ্রিক পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে সাফল্য বা অসাফল্যের পরিমাপ করতে হবে। যেখানে অসাফল্য হয়েছে সেখানে তার কারণ আবিষ্কার করতে হবে। এইভাবে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হবে তার আলোকে ভবিষ্যতে কর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রস্তাব দিতে হবে। উদ্বাস্তুদের ত্রাণ সম্পর্কিত এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত সকল কার্য তো এই কমিটির বিবেচনায় আসবেই; অতিরিক্ত নির্দেশ ছিল ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোলযোগের সময় যে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সম্পত্তি ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তাদের সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধেও তথ্য অনুসন্ধান করে তার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রস্তাব দিতে হবে।

দ্বিতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল মন্ত্রী পর্যায়ের মানুষ নিয়ে। তাতে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামণ দেশমুখ, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। যখন এই নির্দেশ প্রচারিত হয় তখনও পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম কমিটির কাজ শেষ হলে এদের কাজ শুরু হবার কথা। কারণ তথ্যসকল অনুসন্ধান করে তার ভিত্তিতে নূতন প্রস্তাব দিয়ে তবেই তো দ্বিতীয় কমিটির এবিষয় মনোনিবেশ করবার সময় আসবে। মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির ওপর বিশেষ ভার ছিল তথ্যসন্ধানী কমিটি যা নূতন প্রস্তাব দেবে তা গ্রহণ করা হবে কিনা ঠিক করা।

তথ্যানুসন্ধানী কমিটির কাজ শেষ হতে প্রায় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের অকটোবর অবধি লেগে যায়। তা অসঙ্গত নয়। কারণ পশ্চিম বাঙলায় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ হতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সকল কাজই তার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার জন্য সরকারী কর্মচারীদের জবানবন্দী নেওয়া, নানা লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা, সরজমিনে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির ও কলোনি পরিদর্শন এবং সীমান্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেখা—এত সব কাজ করতে

হয়েছিল। তারপর এইভাবে সংগৃহীত করে আনা তথ্য একত্র করে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজের সাফল্য বা অসাফল্যের পরিমাপ করতে হয়েছিল। তারপরে এইভাবে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কাজের উৎকর্ষসাধনের জন্য নানা প্রস্তাব স্থাপন করতে হয়েছিল। সুতরাং কাজটি একাধারে গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বপূর্ণ এবং প্রভূত সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করলে ওই কমিটির কাজ বেশ দ্রুত সম্পাদিত হয়েছিল বলতে হবে।

তথ্যসন্ধানের বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে অনায়াসে বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ বিভাগের এক রকম বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তার ওপর যে দায়িত্ব আরোপ করেছিল তা ঠিকমত সম্পাদিত হয়েছিল কিনা, এই হল মোটামুটি প্রশ্ন। তাতে কতখানি সাফল্য অর্জিত হয়েছিল কতখানি হয় নি, এটিও অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং তথ্যসন্ধানী কমিটি তদন্তের পর যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তার এক হিসাবে খুব মূল্য আছে। তা দেখিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসনের কাজ ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কতখানি সাফল্য লাভ করেছিল বা করে নি। সুতরাং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তা যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই তথ্যগুলিই এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করবে এবং ফলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকবে না। সুতরাং নিচে এই কমিটি দ্বারা সংগৃহীত কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য স্থাপিত হল।

প্রাথমিক ত্রাণের থেকে পুনর্বাসনই এখানে তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ প্রথমটি উদ্বাস্তুদের সাময়িক সুবিধা দান করে, দ্বিতীয়টি তাদের নূতন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়টির সাফল্যের পরিমাণ হতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব কতখানি সার্থকভাবে পালিত হয়েছিল তা বোঝা যাবে। সেই কারণে পুনর্বাসন সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলিরই এখানে উল্লেখ করা হবে।

পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের দুটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা হত: কৃষিজীবী এবং অকৃষিজীবী। কারণ তাদের পুনর্বাসনের রীতি স্বভাবতই বিভিন্ন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে দুই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মাত্র দুটি মূল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। প্রথম, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন এবং দ্বিতীয়, উদ্বাস্তুদের নিজেদের সংগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে যে পরিবারগুলি আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ থাকায়, পুনর্বাসন বিভাগ এদের জন্য দুটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তা হল ইউনিয়ন

বোর্ডের সাহায্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং অনুরূপ রীতিতে বড় ভূম্যধিকারীর জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। এখন এবিষয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২,৩০,০০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠান হয়েছিল। তাদের মধ্যে মোট ২৫,০০০ পরিবার পুনর্বাসনের স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। সুতরাং পুনর্বাসনের সাহায্য পাবার পর আত্ম-পুনর্বাসনে অসমর্থ হয়ে যারা নূতন করে বাস্তুভূমি ত্যাগ করেছিল তাদের হার দাঁড়ায় শতকরা ১১এর মত। অর্থাৎ শতকরা ৮৯টি পরিবার পুনর্বাসনের স্থানে রয়ে গিয়েছিল।

কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে নিচে স্থাপিত তথ্যগুলি এবিষয়ে সাফল্য সম্বন্ধে সুন্দরভাবে আলোকপাত করে :

পরিকল্পনার শ্রেণী		পুনর্বাসনপ্রাপ্তের অনুপাতে বাস্তুত্যাগীর শতকরা হার
সরকার সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	...	১৯.৫
সরকার সংগৃহীত জমিতে সবজী উৎপাদক	...	১৭
সরকার সংগৃহীত জমিতে বারুজীবী	...	৩
নিজের সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	...	৪˙৩
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবী	..	৫৫˙৩

দেখা যাবে ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবীদের বাস্তুত্যাগের হার খুব বেশি ছিল। এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যায় নি বলে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দেই এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হল বারুজীবীদের পুনর্বাসনের পর কলোনি ত্যাগের হার সব থেকে কম। মাত্র শতকরা তিন। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও তা সমর্থিত হয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের হাঙ্গামার সময় ১৯৭০টি বারুজীবী পরিবার আশ্রয় শিবির হতে পুনর্বাসন নিয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র ৬০টি পরিবার পুনর্বাসনের পর বাস্তুত্যাগ করেছিল। তারা চাষের জমির খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে বলেই এমন হয়।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার যে সরকারের সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবীদের কলোনি ত্যাগের হার শতকরা ১৯˙৫, অথচ যে কৃষিজীবী পরিবারগুলি নিজেদের নির্বাচিত জমিতে পুনর্বাসন নিয়েছে তাদের কলোনি ত্যাগের হার শতকরা মান ৪˙৩। এর কারণ দুটি। যে নিজে পরিশ্রম করে জমি খুঁজে নেয় সে পুনর্বাসন পেতে উৎসুক এবং আত্মনির্ভরশীল হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত নিজে জমি নির্বাচন করে নেবার ফলে কৃষির উপযুক্ত জমি সে বেছে নিতে পারে। অপর পক্ষে সরকারের পরিকল্পিত কৃষিজীবীর কলোনিতে এই দুটি

অবস্থারই অভাব ঘটে থাকে। যে পুনর্বাসনে যায়, তার আত্মনির্ভরশীল হবার আকাঙ্ক্ষা তেমন প্রবল নয়; এমনও হতে পারে পাকিস্তানে ফিরে যাবার আকর্ষণ এত তীব্র হয় যে চলে যায়। অপরপক্ষে বিশেষজ্ঞের অভাবে জমিও নির্বাচিত হতে পারে যা চাষের অযোগ্য। এই কারণে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের অভিজ্ঞতার পর পুনর্বাসন বিভাগে একজন কৃষিবিশেষজ্ঞকে স্থায়িভাবে রাখা হয়েছিল। তাঁর কাজ ছিল কৃষিজীবীদের কলোনির প্রস্তাব আসলে, সম্পর্কিত জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে অভিমত দেওয়া তা কৃষির উপযুক্ত কিনা। বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর নিকট হতে অনুকূল অভিমত পাওয়া গেলে তবেই সে পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হত। তা না হলে তা পরিত্যাগ করা হত।

আশ্রয় শিবিরবাসী অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারদের জন্য যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় কলোনি ত্যাগের হার এই রকম ছিল :

পরিকল্পনার শ্রেণী		পুনর্বাসনপ্রাপ্তের অনুপাতে বাস্তুত্যাগীর হার
সরকার সংগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন	...	১৯.১
নিজের সংগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন	...	৯.৪
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় পুনর্বাসন	...	২৭.৯
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় পরিবর্তিত রূপে পুনর্বাসন	...	৩৮.৩

এখানেও কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। দেখা যাবে সরকারের সংগৃহীত জমিতে যেখানে পুনর্বাসন হয়েছে সেখানে কলোনি ত্যাগীর হার তুলনায় বেশি। অথচ যেখানে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি নিজেদের জায়গা বেছে নিয়েছে সেখানে ত্যাগের হার কম। যে কারণগুলি অনুরূপ প্রসঙ্গে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এখানেও ক্রিয়াশীল ছিল। আবার দেখা যাবে ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবী পরিবার যে হারে কলোনি ত্যাগ করে তার প্রায় অর্ধেক হারে অকৃষিজীবী পরিবার কলোনি ত্যাগ করেছিল। সম্ভবত তার কারণ অকৃষিজীবীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল বর্ধিষ্ণু জনপদে বা মফঃস্বলের শহরে। তাই তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া তুলনায় সহজ ছিল। অকৃষিজীবীদের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনার পরিবর্তিত রূপে যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাতেই কলোনি ত্যাগের হার সর্বাপেক্ষা বেশি। তার দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, তাদের কলোনি এমন জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল যা শিল্পাঞ্চল হতে অনেক দূরে। সুতরাং কাজ পাবার সুযোগ কম ছিল। দ্বিতীয় কারণ, তাদের অনেকেই পূর্ব হতেই পাকিস্তানে ফিরে যাবার জন্য সংকল্প করেছিল। তাই পুনর্বাসনের স্থানে আনীত হবার পরেই; পুনর্বাসনের কোন চেষ্টা না করেই তারা কয়েকদিনের মধ্যে বাস্তুত্যাগ করেছিল। তার

ভাল উদাহরণ রামচন্দ্রপুর কলোনি হতে ব্যাপক হারে বাস্তুত্যাগ। এবিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাহেরপুরের অভিজ্ঞতার পর অকৃষিজীবীদের শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

শহর অঞ্চল ব্যতীত প্রধানত আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে গৃহনির্মাণের জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল তা যথার্থ কাজে কতখানি পরিমাণ ব্যবহার হয়েছিল সে বিষয়েও তথ্যসন্ধানী কমিটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তার সারাংশ নিচে দেওয়া হল :

যতগুলি পরিবারকে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তার সংখ্যা—১,১৪,৪৬৩

যতগুলি পরিবার তথ্যসংগ্রহের তারিখ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ শেষ করেছে, তার সংখ্যা—৭৬,২৭১

যতগুলি পরিবার ওই তারিখ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করেছে কিন্তু শেষ করে নি, তার সংখ্যা—৩২,০৯৮

সুতরাং যারা গৃহনির্মাণ ঋণের সদ্ব্যবহার করেছে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৮,৩৬৯। মোট সংখ্যার শতকরা ৯৪,৮ ভাগ তা হলে এই ঋণকে ঠিক পথে ব্যবহার করেছিল।

তথ্যসন্ধানী কমিটি ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তাঁদের সংগৃহীত তথ্যসহ ভবিষ্যতে পুনর্বাসন ও ত্রাণের কাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে স্থাপন করেন। তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রীর স্তরে যে কমিটি নিয়োগ হয়েছিল, তার এই বিষয়টি আলোচনা করবার পালা। এই আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয় এবং ২রা অকটোবর হতে ৩রা অকটোবর পর্যন্ত দুদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের দিল্লীর আপিসে তার সবিস্তার আলোচনা হয়। কমিটির তিন সভ্যই তাতে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হতে আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রিসহ আমরা দুজন সচিবও উপস্থিত ছিলাম। মোটামুটি তথ্যসন্ধানী সমিতির সুপারিশগুলি সবই গৃহীত হয়। শেষ দিনে সমিতির কাজ শেষ হবার পর আমরা প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর ঘরে উপস্থিত হই এবং সেখানে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি তাঁকে জানান হয়।

যে সুপারিশগুলি গৃহীত হয়েছিল তা উদ্বাস্তুদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের অনুকূলে যায়। ফলে আমাদের পুনর্বাসনের কাজ কিছুটা সহজসাধ্য হয়। অবশ্য মৌলিক অসুবিধা যা ছিল তা হল, পুনর্বাসনের জন্য জায়গা পাওয়া ক্রমশই দুষ্কর হয়ে পড়ছিল এবং উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহানুভূতিও কমে আসছিল। সে বিষয় অবশ্য এই কমিটির বিশেষ কিছু করবার ছিল না। যে সুপারিশগুলি গৃহীত হয়ে পুনর্বাসনের কাজকে কিছু পরিমাণ সহজ করেছিল তাদের মধ্যে যেগুলির তাৎপর্য বেশি এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কৃষিজীবীদের পুনর্বাসনের স্থানে পাঠাবার পর জমি উদ্ধার করে ফসল

উৎপাদন করে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য তাদের নয় মাস পর্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা হারে ঋণ হিসাবে খোরাকি দেওয়া হত। এখন ঠিক হল, প্রয়োজন হলে আরও এক বছর পর্যন্ত অর্ধেক হারে খোরাকি দেওয়া চলবে। ফলে যে জমি কৃষিযোগ্য করতে সময় লাগে সেখানেও কৃষিজীবী উদ্বাস্তুকে বসান সহজ হল।

পুর্বে চাষের জমি কেনবার ঋণ বেশিপক্ষে একর প্রতি ১৫০৲ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখন তা বাড়িয়ে ৩০০৲ টাকা ধার্য করা হল। ফলে ইতিমধ্যে দাম বাড়ায় যে জমি পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, তা সম্ভব হল। এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। শেষের দিকে সরকারের পক্ষে যখন জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না, তখনও উৎসাহী উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় এই সুবিধার ফলে জমি সংগ্রহ করে নিজেদের পুনর্বাসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

যারা অকৃষিজীবী তাদের জীবিকার ব্যবস্থার জন্য গ্রামাঞ্চলে ঋণের হার ৫০০৲ টাকা ছিল। তা বর্ধিত করে ৭৫০৲ টাকা করা হল। আগে তাদের খোরাকির জন্য ঋণ দেওয়া হত এক মাসের। এখন তা বর্ধিত করে তিন মাসের জন্য খোরাকি ঋণের ব্যবস্থা হল। যারা ছোটখাট ব্যবসার ওপর নির্ভর করে পুনর্বাসন নেবে তাদের এই ব্যবস্থার ফলে আর্থিক বল বর্ধিত হল।

জবরদখল কলোনি বৈধ করণের জন্য সরকার পরিবার পিছু যে খরচের হার ঠিক করেছিলেন তা হল ১২৫০৲ টাকা। কিন্তু তাতে সকল জবরদখল কলোনির বৈধকরণ সম্ভব হয় না। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল এই হার যদি বর্ধিত করে ৩০০০৲ টাকা করা হয়, তাহলে সব কলোনিরই বৈধীকরণ সম্ভব হয়। সুতরাং এই হার গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তটি খুবই তাৎপর্যপুর্ণ ছিল।

সব থেকে তাৎপর্যপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের হাঙ্গামার সময় যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক সম্পত্তি ত্যাগ করে পূর্বপাকিস্তানে চলে যায়, তখন সেই সম্পত্তির অনেকখানি ওখান হতে আগত উদ্বাস্তুদের দখলে চলে যায় এবং অনেক অংশ খালি পড়ে থাকে। তারপর নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে দুই দেশের উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে এবং ফিরে গেলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই চুক্তি অনুসারে কাজ করবার জন্য একটি আইন পাশ হয় এবং একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে দেশত্যাগীদের সম্পত্তিগুলি স্থাপিত হয়। তার কাজ ছিল কোন উদ্বাস্তু ফিরে এলে যদি সম্পত্তি ফেরত পেতে চায় তার ব্যবস্থা করা। আরও কাজ ছিল, যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে তাকে অস্থায়ি-ভাবে অল্প মেয়াদে ইজারা দেওয়া। এই মেয়াদের সীমা ছিল মাত্র এক বছর।

এত অল্প মেয়াদে স্থায়িভাবে জমির ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এগুলি যারা চলে গেছে তারা তো ব্যবহার করছেই না, অথচ এদিকে পুনর্বাসনের কাজেও লাগান যাচ্ছে না।

এই সমিতি এবিষয়ে কতকগুলি সুপারিশ করেছিল যা এই অসুবিধাগুলি যতখানি সম্ভব দূর করতে পারে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কোন বাস্তুত্যাগী পরিবার ফিরে এসে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখল চাইলে তা তাকে দেওয়া উচিত। তবে যে সম্পত্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে, তাকে পুনর্বাসনের জন্য কাজে লাগান যুক্তিসঙ্গত। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইজারা দেবার মেয়াদ এক বৎসরের অতিরিক্ত করবার ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক কমিটিকে দেওয়া হক এবং যে জমি পরিত্যক্ত হবার পর অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, তা উদ্বাস্তুদের দীর্ঘকালের মেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়া হক।

(১৪)

অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন আমাদের অভিজ্ঞতায় বড় কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি জায়গা নির্বাচন করে তার স্বত্বক্রয় করে সেখানে একটি উপনিবেশ গড়ে উদ্বাস্তু পরিবারদের স্থাপন করা সম্ভব। সেটা খুব শক্ত কাজ নয়; কিন্তু তাতে তাদের আবাসিক সমস্যার সমাধান হয় মাত্র। আরও একটি বড় সমস্যা তখনও রয়ে যায়। তা হল তাদের জীবিকা অর্জনের স্থায়ী উপায় বাহির করা। সেটা সত্যই কঠিন সমস্যা। আমরা নানাভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করেছি; কিন্তু এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় নি, যা সহজে তার সমাধান করে দেয়।

পুনর্বাসন বিভাগ হতে এবিষয় নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। তার কোথাও কিছু ফল হয়েছে; কিন্তু ব্যাপক হারে সমাধানের পথের সন্ধান মেলে নি। একটা জিনিস দেখা গেছে শিল্পাঞ্চলের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে তাদের অনেকেই নিজেদের চেষ্টায় কাজ খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু সকলে ত তা পারে না। সুতরাং নানাভাবে তাদের এবিষয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা হয়েছিল। কলোনি স্থাপন করলেই সেখানে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হত তার জন্য শিক্ষকের দরকার হয়। সাধারণত ২৫ জন ছাত্রের জন্য একটি শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ ধরনের বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব ভারত সরকারই বহন করতেন। সুতরাং কোন কলোনি স্থাপিত হলেই সেখানে কয়েকটি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি হত। সেগুলি সেখানে যে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন নিত তাদের মধ্য হতে নির্বাচন করা হত। তারপর উদ্বাস্তু যুবকদের মধ্যে নানা বিষয়ে কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হত। ফলে দক্ষতা

অর্জনের পর তারা অনেকে কারখানায় কাজ পেত। যারা পড়াশোনায় ভাল হত, তাদের উচ্চতর শিক্ষা দেবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। পরে উচ্চ পরীক্ষায় পাশ করার ফলে তাদের কাজ পাওয়া সহজ হত। কিন্তু এই ধরনের নানা চেষ্টার ফলে কিছু সাফল্য লাভ হলেও ব্যাপক হারে তা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারত না।

ব্যাপক হারে সমাধান খানিকটা সম্ভব হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ সংস্থার মাধ্যমে। তাদের ব্যবহৃত একটি বাস-এর দেখাশোনার কাজে একাধিক মানুষ নিয়োগ করা হয়। এখন কলিকাতা অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার বিস্তারের প্রয়োজন সীমাহীন। তার বাস-এর সংখ্যা বাড়ালে সেখানে উদ্বাস্তু যুবকদের কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। কোন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলেও কনডাকটার হিসাবে কাজে লাগান যায়। সুতরাং এই পথে ব্যাপক হারে পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়েছিল। আমাদের বিভাগ পরিবহণ বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে মোটা টাকার ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল। তা হতে কয়েক কিস্তিতে শত শত বাস কিনে পরিবহণের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট হারে, ঋণের অনুপাতে পরিবহণ বিভাগ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের মনোনীত উদ্বাস্তুকে কাজ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই নিয়ম অনুসারে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু তরুণদের নির্বাচন করে মনোনয়ন করা হত। এইভাবে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু যুবকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু সমস্যা এত বিরাট যে তাতেও তার অংশমাত্র সমাধান হয়েছিল। এই পরিবহণকে কেন্দ্র করেই একটি নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। এবিষয়ে এগিয়ে এসেছিল কয়েকজন উদ্বাস্তু যুবক। তাদের পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করা সম্ভব দেখে এবং তার তাৎপর্য অনুসন্ধান করে আমরা পুনর্বাসন বিভাগের পক্ষ হতে তার সমর্থন করেছিলাম।

যশোর রোড ধরে হাবড়ার দিকে এগিয়ে গেলে দমদম বিমান বন্দর ছাড়িয়ে একটা খাল পাওয়া যায়। তার অব্যবহিত পরেই রাস্তার দুধারে অনেক পতিত ডাঙ্গা জমি পাওয়া গিয়েছিল। সরকার পক্ষ হতে তা হুকুমদখল করে ওখানে একটি কলোনি স্থাপন করা হয়েছিল। এই জায়গাটির নাম অনুসারে তার নাম দেওয়া হয়েছিল গঙ্গানগর কলোনি। ওখানে পুনর্বাসন-প্রাপ্ত কয়েকটি উৎসাহী যুবক সমবায়ের রীতিতে একটি পরিবহণ ব্যবসায়ের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।

কতকগুলি কারণে আমরা এই প্রস্তাবটির সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছিলাম। প্রথমত, সমবায় রীতিতে কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ তাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয় না। যারা শ্রমিক তারাই এখানে মালিক। সমবায় পদ্ধতিতে রচিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আমাকে হতাশ

করেছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ফাটাপুকুরি অঞ্চলে সমবায় পদ্ধতিতে যে কৃষি কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল তা সফল হয় নি। এ বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে শুধু ফাটাপুকুরি নয় আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক বা শিল্পভিত্তিক সমবায় গঠনের যে বিভিন্ন চেষ্টা উদ্বাস্তু নেতাদের সাহায্যে করা হয়েছিল, সেগুলি সফল হতে পারে নি। একটি-মাত্র ব্যতিক্রমের কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। তা হল বনগাঁ থানায় বাগদা অঞ্চলে প্রমথনাথ জোয়ারদার মহাশয় স্থাপিত শ্রীপল্লী কলোনি। এই কলোনিটি তাঁর দক্ষতার গুণে আকারে ছোট হলেও স্বয়ংনির্ভর হয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। যে পরিবারগুলি এখানে আছে তারা বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত, সংগঠিত এবং নেতার নির্দেশে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণভাবে সহ-যোগিতা করে। এই অসাধারণ সাফল্য সম্ভব হয়েছিল তাদের নেতার গুণে। তাঁর পরিকল্পনা, কর্মক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এমন আচরণ—এতগুলি গুণের অপূর্ব সমাবেশেই সেটা সম্ভব করেছিল। তিনি ব্যতিক্রম, কাজেই তাঁর সাফল্য ভরসা দিতে পারে না।

তবে বর্তমান ক্ষেত্রে ভরসা ছিল পরিবহণের পরিবেশ স্বতন্ত্র হওয়ায় সে জটিলতা সৃষ্টির এখানে সম্ভাবনা কম। বাস চালাতে কয়েক জন মাত্র কর্মীর দরকার। এখানে দীর্ঘকাল ধরে অনেক মানুষের মিলিত চেষ্টায় ফসল উৎপাদনের সমস্যা নেই। বাস কিনে নিয়মিত চালাতে পারলেই হল। তারপর উৎপাদিত ফসলের বিপণনের সমস্যা এখানে নেই। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাস চালালে যাত্রীর অভাব হবে না। কাজেই আয়ের পথ সরল এবং সহজ। সুতরাং কয়েকজন সৎকর্মীর তত্ত্বাবধানে থাকলে এই ধরনের ব্যবসায় কখনো মার খেতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনীয় মূলধন ধার দিয়ে এ বিষয় তাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল।

ঠিক হয়েছিল এদের এমন পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে যাতে দুটো বাস কেনা সম্ভব হয়। তা হতে যে লাভ হবে তার কিছু অংশ হতে মূলধন কয়েক বছরের মধ্যে শোধ হয়ে যাবে। লাভের কিছু অংশ যারা শেয়ার কিনবে তাদের মধ্যে ভাগ হয়ে একটি উদ্বৃত্ত আয় আসবে। আর যারা কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হবে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সীমাহীন। এখানকার মানুষ যদি পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবসায় চালিয়ে সফল হয়, তা হলে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধানে এক নূতন পথ খুলে যাবে।

এই দিক হতে ব্যবস্থাটির তাৎপর্য ছিল খুব গভীর। সুতরাং প্রস্তুতিপর্ব যখন সমাপ্ত হয়ে গেল ঠিক হল একটি উৎসবের মধ্য দিয়ে এই সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হবে। অবশ্য প্রস্তাব এসেছিল গঙ্গানগরবাসীদের পক্ষ

হতেই। আমরা তার যুক্তিযুক্ততা দেখে সম্মতি দিয়েছিলাম। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে এই উৎসবের দিন ধার্য হয়। আমি সেই উৎসবে যোগ দিয়ে গঙ্গানগরবাসীর এই শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেছিলাম। পুনর্বাসন বিভাগ হতে আমার অনেক সহকর্মীও তাতে যোগ দিয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ বর্ধন করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টান্ত অন্য উদ্বাস্তু কলোনিগুলিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং আরও কয়েকটি কলোনি গঙ্গানগরের অনুসরণে সমবায় রীতিতে পরিবহণ ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল। যতদূর মনে পড়ে হাবড়ার কলোনিতেও এই ধরনের পরিবহণ সমবায় প্রবর্তন হয়েছিল।

(১৫)

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ হতে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটি নূতন নীতি গ্রহণ করা হল। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে যে আশ্রয় শিবিরে অনিশ্চিত কাল বসে থাকলে প্রথমত আত্মনির্ভরশীল হবার ক্ষমতা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, আত্মমর্যাদাবোধ কমে যাবার ফলে পরমুখাপেক্ষী হবার মনোভাব সঞ্জাত হয়। তৃতীয়ত, দীর্ঘকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাপন করলে মনে একটা অবসাদ বোধও জন্মায়। এই সবগুলি অবস্থায়ই ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। এই সব কারণে এক নূতন নীতি গ্রহণ করা হয় যে যত শীঘ্র সম্ভব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবির হতে স্থানান্তরিত করে পুনর্বাসনের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। অন্তত তা যদি না সম্ভব হয়, তাদের মধ্যে যারা বয়স্ক পুরুষ তাদের ডোল না দিয়ে পরিবর্তে কাজ দিয়ে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে।

পূর্বে ব্যবস্থা ছিল যে জমি পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রহ করা হয় তাকে খানিকটা উপযুক্ত করে নিয়ে তারপর সেখানে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তু পরিবার পাঠান হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় আশ্রয় শিবির ত্যাগ করতে বিলম্ব হত। অপর পক্ষে কোন জায়গায় উদ্বাস্তু পরিবারদের আনবার পূর্বে যে প্রাথমিক উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন হত তাও তো এই উদ্বাস্তু পরিবারদের দিয়ে করান যায়। সুতরাং ঠিক হয়েছিল পুনর্বাসনের জন্য নূতন জায়গা দখলে আনলেই তাতে নির্বাচন করে এমন উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবির হতে পাঠান হবে যাদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া যায়। সেখানে যাবার পর এই পরিবারগুলির মধ্যে যারা বয়স্ক পুরুষ আছে তাদের উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করা হবে। ফলে কাজের অনুপাতে তারা পারিশ্রমিক পাবে। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি থাকলে তারা অতিরিক্তভাবে ডোল পাবে। সুতরাং এই ব্যবস্থার ফলে আশ্রয় শিবির-বাসী-থাকা অবস্থায় ও পুনর্বাসনের প্রস্তুতির জন্য তাদের কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য তার নাম দেওয়া

হয়েছিল ক্যাম্প কলোনি। অর্থাৎ তা ঠিক আশ্রয় শিবিরও নয় কলোনিও নয়, তার মাঝামাঝি অবস্থা সূচিত করে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুসারে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কাজে নিযুক্ত রাখার ক্ষমতা উদ্বাস্তু বিভাগের ক্রমশই কমে আসছিল ; কারণ হুকুমদখল করে জমি পাওয়া ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছিল প্রধানত উদ্বৃত্ত পতিত জমির অভাবে। সুতরাং অন্য উপায়ে তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ হতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হতে থাকে। এই সময় ব্যাপকভাবে নূতন রাস্তার পরিকল্পনা এবং সেচ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। তখন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এইসব উন্নয়নমূলক কাজে তাদের যদি লাগান যায়, তাহলে আশ্রয় শিবিরবাসী কর্মক্ষম উদ্বাস্তুদের প্রায় সকলকেই কাজ দেওয়া যায়। সুতরাং পরে এই অতিরিক্ত নীতি-গ্রহণ করা হয়েছিল যে, সরকার যেসমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছেন, তার কর্তৃপক্ষের সহিত সংযোগ স্থাপন করে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কাজের সংস্থান করতে হবে।

এই সময়ে দুটি ক্ষেত্রে মাটি কাটার কাজ চলছিল। প্রথমত, নানা সেচ পরিকল্পনায় খাল কাটতে বা বাঁধ দিতে মাটি কাটতে হত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থানে বড় বড় রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনায় ও প্রাথমিক কাজ হিসাবে মাটি কেটে রাস্তা বানাবার কাজ সরকার হাতে নিয়েছিলেন। এই সব কাজের যাঁরা তত্ত্বাবধান করেছিলেন তাঁদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের সম্মতি নিয়ে এ সম্পর্কে যা ব্যবস্থা হয়েছিল তা হল এই : এই মাটিকাটা কাজের ঠিকাদারী করতে হবে পুনর্বাসন বিভাগের। অর্থাৎ যে সব উদ্বাস্তু মাটিকাটা কাজ করবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভাগের সোজাসুজি কোন সম্বন্ধ থাকবে না। সাধারণত ঠিকাদারের সাহায্যে এই সব কাজ সম্পাদিত হয় এবং তারাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠিকাদারী কাজ নিয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। পরে শ্রমিক লাগিয়ে তারা সেই কাজ করে। অর্থাৎ শ্রমিকদের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক ঠিকাদারের। এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছিল। পুনর্বাসন বিভাগ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ হতে মাটিকাটার কাজ নেবে এবং সেই কাজ আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের নিয়ে করাবে। এই ব্যবস্থার ফলে সক্ষম উদ্বাস্তুদের বসিয়ে না রেখে আমাদের কাজ দেবার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল।

এই নূতন কাজে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের নিয়োগ করবার জন্য আমাদেরও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হল। যেখানে কাজ সেখানে তাদের পাঠাতে হবে। সুতরাং কার্যক্ষম উদ্বাস্তুদের সপরিবারে কাজের জায়গায় পাঠানর ব্যবস্থা করতে হল। তাই প্রতি পরিবারকে তাঁবু দিতে হল। কাজের জায়গার নিকটে খোলা মাঠ বা জায়গা দেখে বৃষ্টির জল জমবে না এমন স্থানে

নূতন করে আশ্রয় শিবির খুলতে হল। কাজের জায়গাতেই খোলা হত বলে এই নূতন শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরের নাম দেওয়া হল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প।

এই সম্পর্কে আমরা কাজ পেয়েছিলাম রাস্তা বিভাগ হতে সব থেকে বেশি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার মাটিকাটার কাজের ফলে আমরা অনেক আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুকে কাজ দিতে পেরেছিলাম। কলিকাতা হতে যে রাস্তা উলুবেড়িয়া ও বাগনান হয়ে রূপনারায়ণ নদী পার হয়ে বোম্বাই-এর দিকে চলে গেছে সে রাস্তার মাটির কাজ আমরা পেয়েছিলাম। বর্ধমান অঞ্চলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত পাল্লা নামে জায়গাটির সংযোগ সাধনের জন্য যে রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা হয়, তার কাজ আমরা পেয়েছিলাম। কলিকাতার দক্ষিণে উত্তরভাগ হতে ক্যানিং পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার মাটির কাজও আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। ফলে আমাদের পক্ষে এক সময় ত্রিশ হাজারের ওপর উদ্বাস্তুদের ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যা উন্নয়নমূলক কাজে আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের আরও ব্যাপকভাবে মাটির কাজে লাগান সম্ভব করেছিল। কলিকাতার পূর্ব অঞ্চলে এক বিস্তৃত এলাকা জল নিষ্কাশনের অভাবে জলমগ্ন থাকত এবং সে কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-বিভাগ তার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে তাকে জলমুক্ত করে ব্যবহারের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রথম পরিকল্পনাকালেই তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা খুব আগ্রহশীল ছিলেন। কাজের সুবিধার জন্য এই প্রকল্পটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। তার একটি হল দক্ষিণে সোনারপুর আড়পাঁচ প্রকল্প আর দ্বিতীয়টি হল বাঘজোলা অঞ্চল হতে খাল কেটে ঘুনি ও যাত্রাগাছির ভিতর দিয়ে টেনে তাকে কুলটি নদীতে ফেলা। এর ফলে পাতিপুকুরের পূর্ব হতে এক বিরাট এলাকা জলমুক্ত হবার কথা।

এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে কলিকাতার পূর্ব দিক দিয়ে পিয়ালা নদী প্রবাহিত হয়ে মাতলা অঞ্চলে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তা বেশ সজীব নদী ছিল; কিন্তু তৃতীয় দশকে তা খুব তাড়াতাড়ি পলি পড়ে মজে গিয়ে একেবারে মরে গেল। ফলে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক বিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেল। সোনারপুর আর আড়পাচ অঞ্চলে অনেক ধানের জমি ছিল। তা গভীর জলে মগ্ন হয়ে যাওয়ায় সেখান হতে ধান চাষ উঠে গেল। এমনকি গরমের দিনেও সেখানে জল দাঁড়িয়ে থাকত। ফলে যে অঞ্চল এককালে শস্যমণ্ডিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তা জলাভূমিতে পরিণত হল। এই এলাকাকে জলমুক্ত করবার জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রথম প্রকল্প অনুসারে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে উত্তর দিকের অংশ জলমুক্ত

করার জন্য এক নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেটা প্রয়োজন হয়েছিল এই অঞ্চলের গঠনের ভিন্নতার জন্য। সোনারপুর অঞ্চলের জমি আশপাশের জমি হতে নিচু। ফলে বর্ষার জল চারিদিক হতে এসে সেখানে জমা হত এবং চারিপাশের জমি উঁচু হওয়ায় তা নির্গমনের পথ পেত না। যত দিন পিয়ালী নদী সজীব ছিল তা এখানকার জল টেনে নিয়ে বের করে দিত, কিন্তু এখন তা মজে যাওয়ায় জল রয়ে যেত। এই কারণেই তৃতীয় দশকের শেষ হতে এই অংশ স্থায়ীভাবে জলমগ্ন থাকত। সুতরাং এখান হতে জল টানতে হলে খাল কাটলে চলবে না। জল পাম্প করে তুলনায় উন্নত ভূমিতে স্থাপন করে সেখান হতে সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত করতে হবে।

প্রকল্পটি সেইভাবেই রচিত হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল উত্তর ভাগের নিচের দিকে পিয়ালীর যে অংশ আছে সেখানে যদি জল পাম্প করে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে তা সরে যেতে পারবে। সুতরাং ব্যবস্থা হল শাখা-প্রশাখায় খাল কেটে নিম্নভূমির জল প্রবাহিত করে উত্তর ভাগে এনে ফেলতে হবে। সেখান হতে পাম্প করে পিয়ালী নদীর মধ্যে জল ফেলে দিতে হবে। এর জন্য বড় বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প এখানে বসান হল। এত বড় পাম্প এদেশে আর কোথাও নেই। এই প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং ফলে ২৩,০০০ একর জমি জলমুক্ত হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল এখানকার দ্বিতীয় প্রকল্প অনুসারে দক্ষিণে আড়পাচ অঞ্চলের জল খাল কেটে নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা হবে।

ঠিক এই সময়ই ঘটনাচক্রে সেচ বিভাগের পক্ষ হতে আমাদের কাছে একটি নূতন প্রস্তাব স্থাপিত হল। এবিষয় সব থেকে উৎসাহী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-উপদেষ্টা সর্দার দাতার সিং। এমন উৎসাহী মানুষ খুব কম দেখা যায়। তিনি চেয়েছিলেন কলিকাতার সংলগ্ন এই এলাকাগুলির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে এই পতিত জমিগুলি উদ্ধার করে শস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হক। এখন হয়েছে কি তাঁদের বরাদ্দ টাকা ফুরিয়ে গেছে। অথচ আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের খাতে টাকা বরাদ্দ আছে। শুধু তাই নয় আমরা আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের দিয়ে মাটির কাজ করবার ক্ষমতা রাখি। সুতরাং তিনি দেখলেন আমাদের সঙ্গে যদি সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তাহলে শুধু অর্থের সমস্যা নয় শ্রমিকের সমস্যারও সমাধান হয়। এই পথেই একটি অভিনব পরিকল্পনা আমাদের সেচ বিভাগ ও পুনর্বাসন বিভাগের সহযোগিতায় ঘটনাচক্রে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু উদ্বাস্তু বিভাগের অর্থ ব্যবহার করবার যুক্তি দেখাতে হলে উদ্বাস্তুদের স্বার্থের সহিত এই পরিকল্পনা সংযুক্ত করবার দরকার হয়ে পড়ে। সুতরাং এই যুক্তির দাবীতে আমরা প্রস্তাব করলাম যে এই জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা দুটিতে আমরা মাটির কাজের ভার নিতে এবং তার ব্যয়ভার বহন করতেও

সম্মত আছি যদি জল নিষ্কাশনের পর যে জমি উদ্ধার হবে তার একটি ন্যায্য অংশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তাঁদের দিক হতে এ প্রস্তাবে আপত্তি হবার কারণ ছিল না, কারণ ফসল উৎপাদনের প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ, ফসল উৎপাদন পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুরা করবে, কি স্থানীয় কৃষকরা করবে তাতে কিছু আসে যায় না।

পশ্চিম বাঙলার মানুষের পক্ষ হতে কিন্তু এ বিষয় আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক। যারা এই জমির মালিক, জলমুক্ত হবার ফলে তারা অভাবনীয়ভাবে লাভবান হবে। এই লাভের ভাগ বাহির হতে আগত মানুষ নেবে এটা না-ভাল লাগাই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। এই প্রস্তাব যখন সরকারী মহলে উত্থাপিত হয় তখন স্থানীয় অধিবাসীরা ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল ; কিন্তু উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ অর্থে এবং উদ্বাস্তুদের পরিশ্রমে তা উদ্ধার হবে আর তার ভাগ তারা পাবে না এ নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এই যুক্তির বলে ভাগাভাগির প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছিলেন।

মোটামুটি একটা বোঝাপাড়া হয়েছিল যে সোনারপুর আড়পাচ এবং বাগজোলা প্রকল্পের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কার্যকরী হলে যে জমি জলমুক্ত হয়ে আবাদযোগ্য হবে তার একটি অংশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। আন্দাজ করা হয়েছিল যে সোনারপুর আড়পাচ প্রকল্পের প্রথম অংশে যে ২৩,০০০ একর পরিমাণ জমি উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে ১০,০০০ একর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ হবে। অনুরূপভাবে তার দ্বিতীয় প্রকল্প হতে যে জমি উদ্ধার হবে তা হতে ২০,০০০ একর জমি পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার হবে। আর বাগজোলায় যে জমি উদ্ধার হবে তা হতে ১০,০০০ একর জমি একই উদ্দেশ্যে পুনর্বাসন বিভাগকে দেওয়া হবে।

এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ভারত সরকার সোনারপুর আড়পাচের দ্বিতীয় প্রকল্প এবং বাগজোলার প্রকল্পের খালকাটার ব্যয় ঋণ হিসাবে সেচ বিভাগকে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। অতিরিক্তভাবে সমস্ত মাটি কাটার কাজের দায়িত্ব পুনর্বাসন বিভাগ নিয়েছিল। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দিয়ে এই কাজ করান হবে ঠিক হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটি উদ্বাস্তুদের দিক হতে সবদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। প্রথমত, দেশের ভূমি উন্নয়নের কাজে তারা অংশ গ্রহণ করতে পেরে নিজেদের এই দেশের মানুষ বোধ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এত বিরাট মাটির কাজের ব্যবস্থা হওয়ায় আশ্রয় শিবিরবাসী অনেক সমর্থ উদ্বাস্তুকে কাজ দিতে পারা যাবে। তারা কায়িক পরিশ্রম করে নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারবে, সরকারের ওপর এ বিষয়ে নির্ভরশীল হয়ে আত্ম-সম্মান বোধ ক্ষুণ্ণ করতে হবে না। তৃতীয়ত, মাটি কাটার কাজ করে যে জমি তারা জলমুক্ত করে আবাদযোগ্য করবে তার এক অংশ তারা নিজেরাই

পুনর্বাসনের জন্য পাবে। ফলে কাজ করবার উৎসাহ তাদের বেড়ে যাবে এবং কাজ দ্রুত সম্পাদন হবে।

এই সব ব্যবস্থাই সম্ভব হয়েছিল ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের উপদেষ্টা সর্দার দাতার সিংএর উৎসাহে এবং মধ্যবর্তিতায়। তিনি শুধু ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হন নি, কাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই ঠিক হয় ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি তারিখে বাগজোলা অঞ্চলে একটি ছোট অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাটি কাটার কাজ শুরু হবে। খাল কাটাবার কথা ছিল কৃষ্ণপুরের দিক হতে। সুতরাং ওখানে ওই তারিখের পূর্বে কয়েকশত উদ্বাস্তু পরিবারকে স্থানান্তরিত করে তাঁবু দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা জোয়ান পুরুষ তাদের কোদাল এবং ঝুড়ি দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সকালে সর্দার দাতার সিংএর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণও উপস্থিত ছিলেন। একটি প্রাথমিক ভাষণের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পর উদ্বাস্তুরা মাটি কাটার কাজ শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল কারণ এ-কাজটা নানা দিক থেকে অভিনব। যে জমির মাটি কেটে তার মধ্য দিয়ে খাল প্রবাহিত করে তারা ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তুলবে সেখানেই তারা পুনর্বাসন পাবে এই আশ্বাস তাদের প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিল। নিজেদের পুনর্বাসনের পথ তারা কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে নিজেরাই খুলে নেবে ভেবে তারা বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিল।

(১৬)

জবরদখল কলোনিগুলির জমির স্বত্ব ক্রয় করে তাতে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ঘর বেঁধেছে তাদের দখলের অবৈধতা খণ্ডনের নীতি সরকার ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দেই গ্রহণ করেছিলেন। এবিষয়ে আগেই সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের বৈধীকরণের কাজটি জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। প্রথমত যে জমিতে কলোনি উঠেছে তার জরিপ করা দরকার। তারপর সার্ভে ম্যাপের সঙ্গে তার মিল করে বার করা দরকার কোন মৌজায় কোন দাগ জবরদখল হয়েছে। তবেই তা ভূমিসংগ্রহ আইন অনুসারে বিজ্ঞাপন দিয়ে হুকুমদখল করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত এই কলোনির জরিপের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত নকসা আঁকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাতে কোথায় রাস্তা আছে, কোথায় সাধারণের ব্যবহারের জন্য খালি জমি রাখা হয়েছে, কোথায় বাস্তু নির্মাণের জন্য দাগ কাটা হয়েছে সব দেখান দরকার। তারপর পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে প্রতি দাগে কে বসেছে, তার নাম ইত্যাদি। এতগুলি কাজ সম্পাদন হলে তবেই বৈধীকরণের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হয়।

তারপরেও অনেকখানি কাজ বাকি রয়ে যায়। জমি সংগ্রহ করতে যে খরচ পড়েছে তার ভিত্তিতে বাস্তু হিসাবে জমির মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। তারপরেই সেই জমির মূল্য ঋণ হিসাবে দখলকারকে দেওয়া হয়েছে দেখাবার জন্য যে উদ্বাস্তু পরিবার দখলে আছে, তার কর্তার নামে ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হয় এবং সম্পর্কিত একটি দলিলও দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত করতে হয়।

মোট ১৩৩টি উদ্বাস্তু কলোনি ছিল। তাতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের বাস। সুতরাং এই জটিল বৈধীকরণের কাজে যে সময় লাগবে তা বেশ বোঝা যায়। তবু আশা করা গিয়েছিল কাজ শুরু হলে কিছু কিছু কলোনির প্রস্তুতি-পর্বের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে এবং তাদের বৈধীকরণের কাজে হাত দেওয়া যাবে। কাজটির পুনর্বাসন বিভাগের অন্যতম পদস্থ কর্মী নিখিল সেনের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা এগিয়ে দিতে পারছিলেন না। অগত্যা মন্ত্রীর নির্দেশে সে ভার নূতন কর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর পড়ল। তিনি ভার নিয়ে কয়েকটি কলোনির কাজ এগিয়ে দিলেও দেখা গেল সম্পূর্ণরূপে বৈধীকরণের কাজে অনিশ্চিতকাল বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

তার একটা কারণ ছিল। প্রথম পর্বের কাজ হল কলোনির জবরদখলা অঞ্চলের জরিপ করা, তারপরে তার নকসা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে দখলকারী পরিবারদের তালিকা করা। তারপরেই প্রকৃত বৈধীকরণের কাজ শুরু হতে পারে। তখন ভূমিসংগ্রহ আইন অনুসারে হুকুমদখলের মকদ্দমা শুরু করতে হয়। কিন্তু তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। তা শেষ হলে সরকারকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা শক্ত। কারণ, জমির মালিক যদি প্রস্তাবিত হারে আপত্তি জানায় তা আদালতে নিষ্পত্তির জন্য যাবে এবং তার নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছর লেগে যাবে। সুতরাং মালিকের স্বত্বলোপ করে জবরদখলকারীকে ঋণের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ স্বত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বিলম্ব হবেই।

এদিকে যত দেরি হয় ততই জবরদখল কলোনির অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে যায়। দীর্ঘকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তারা অস্থির হয়ে পড়েছে। এই জন্যে বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থার আয়োজন করা হল। ঠিক হল কলোনির দখলে যে জমি আছে তার জরিপ এবং কে কোন দাগে আছে তার তালিকা রচনা শেষ হয়ে গেলেই প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে দখলকারী পরিবারকে একটি লিখিত স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ তা হতে প্রমাণ হবে যে সরকার তার এই বিশেষ দাগের দখল স্বীকার করে নিলেন এবং ভবিষ্যতে স্থায়িভাবে স্বত্ব অর্পণের দায়িত্ব নিলেন। যেখানে কোন দলিল ছিল না সেখানে সরকারের এই প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক দলিলের একটা মূল্য নিশ্চয় আছে। এই দলিলটির নাম দেওয়া হল অর্পণনামা।

জবরদখল কলোনির পরিবারদের মনে একটি নিশ্চয়তার মনোভাবের সৃষ্টি করবার জন্য ঠিক হল অন্তত একটি কলোনির প্রাথমিক কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে তার অধিবাসীদের মধ্যে অর্পণনামা বিতরণের ব্যবস্থা করা হক। মহাজাতিনগর কলোনির প্রস্তুতি পর্বের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ায় ঠিক হল সেখানেই প্রথম অর্পণনামা বিলি হবে। এই কলোনিটি আকারে বড় নয়। কলিকাতার নিকটেই বেলঘরিয়ার কছে তা অবস্থিত। এখন এই ব্যবস্থাটি উদ্বাস্তুদের দিক হতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আংশিকভাবে পালন করবার এটি প্রথম দৃষ্টান্ত। সুতরাং ঠিক হল একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অর্পণনামা বিতরণের কাজটি সম্পাদিত হবে।

এই অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৩ই মার্চ ১৯৫৪। এই দিন বিকালের দিকে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী রায়-সহ আমরা পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীরা ওখানে মিলিত হয়েছিলাম। ওই কলোনির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পক্ষ হতে বৈধীকরণের ব্যাপারটির জটিলতা বুঝিয়ে দিয়ে এই অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভাষণ দেওয়া হল। তারপর মন্ত্রী স্বহস্তে এই কলোনির প্রতি পরিবারকে একটি করে অর্পণনামা দিলেন। এই উৎসবটি একটি কঠিন সমস্যার সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্মরণযোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন জীবিত ছিলেন না। এই বিষয় খবর পেলে নিশ্চয় তিনি খুব তৃপ্তি পেতেন, কারণ জবরদখল কলোনি বৈধীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ছয়

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তার ফল পরে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এতদিন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যে শাখা-আপিস কলিকাতায় স্থাপিত হয়েছিল, তা একজন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই পদে শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় যোগ্যতার সহিত কাজ করেছিলেন। তার পরে শ্রীআর. এস. ত্রিবেদী ওই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যা করে একদিন আকস্মিকভাবে মারা যান। এই আপিসের উপসচিব শ্রীএ. এস. বাম তারপর দীর্ঘকাল এই আপিসের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে যতখানি সম্ভব সহযোগিতা করতেন। তবে নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তাঁদের না থাকায় যখনই নীতির প্রশ্ন উঠত তখনই ফাইল দিল্লী পাঠাতে হত। কাজেই নির্দেশ পেতে দেরি হয়ে যেত। এই জন্য প্রশ্ন উঠেছিল এখানকার শাখা-আপিসের ভার কোন বেসরকারী নেতার ওপর স্থাপিত হলে সুবিধা হয় কিনা।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এ-প্রস্তাবটিতে সোজাসুজি সম্মতি জানিয়েছিলেন ; কারণ তাতে পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত হবারই সম্ভাবনা। বেসরকারী রাজনৈতিক নেতা যদি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিকার পান, তাহলে কেন্দ্রীয় আপিসের কলিকাতায় থাকার সুফল আমরা আরও বেশি অনুভব করব। এখন প্রশ্ন উঠল কে এই কাজের দায়িত্ব নেবেন। ডাঃ রায় এই সম্পর্কে শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। এই মনোনয়নের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এখানকার রাজনৈতিক নেতা শ্রীবাদসাহ্ খাঁর উপযুক্ত সহকর্মী হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর এই প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে চলে আসেন। সুতরাং তিনি নিজে উদ্বাস্তু হওয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যার সহিত পরিচিত এবং স্বভাবতই তাদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ মনোভাব নিয়ে তাদের সমস্যাগুলি দেখবেন। তৃতীয়ত তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকে দীর্ঘকাল ধরে উপদেষ্টা হিসাবে বেশ যোগ্যতার সহিত কাজ করেছেন। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কর্মক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁর প্রতিষ্ঠা আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হওয়া উচিত। এই মনোনয়নের ফলে শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতার শাখা-আপিসের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য কলিকাতায় এসে গেলেন।

আমাদের এই অনুমান যে অসঙ্গত হয়নি, পরবর্তী ঘটনাগুলি তা শীঘ্রই প্রমাণ করে দিল। কলিকাতায় এসে কেন্দ্রীয় আপিসের ভার নেবার সঙ্গে

সঙ্গেই তাঁর কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। তাঁর উপস্থিতি এবং ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার ফলে এখানকার কাজ আরও দ্রুততালে চলল। এখানে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কাজ কেমন ত্বরান্বিত হল, তার দু-একটি উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ নির্ভর করে কতকগুলি ঋণ সময়মত মঞ্জুর করার ওপর। কারণ পুনর্বাসনের খাতে যা ব্যয় হয় সবই ঋণের আকারে দেওয়া হয়। একটি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন দিতে হলে তার জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর হওয়া চাই। কৃষিজীবী হলে বলদ কেনার ঋণ এবং নয় মাসের খোরাকি ঋণ অতিরিক্তভাবে মঞ্জুর করতে হবে। সুতরাং প্রতি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর জন্য কম করে তিন দফা ঋণ মঞ্জুর হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে ব্যবস্থা ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের বিভাগ হতে প্রস্তাব কেন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থিত শাখা-আপিসে পাঠান হবে। তাঁরা সেখান থেকে তার ওপর মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন আপিসে পাঠিয়ে দিতেন। সেখান হতে অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদন নেওয়া হত এবং তার পরে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর হত। এর ফলে কাজ কত বিলম্বিত হত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দুটি নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমত ঠিক হয়েছিল যে, সব ঋণের প্রস্তাব কেন্দ্রে না পাঠিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা হবে যাতে কলিকাতার আপিসেই ঋণ মঞ্জুরীর কাজ শেষ করা যায়। এর জন্য যা নূতন ব্যবস্থা হল তা এই: অফিসারদের নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হবে। তাতে থাকবেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের শাখা-আপিসের যুগ্মসচিব, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের উপসচিব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি। এই সমিতির বৈঠক বসবে প্রতি তিন মাস অন্তর এবং সেখানে আমাদের আপিস থেকে পাঠান পুনর্বাসনের ঋণের প্রস্তাব বিবেচনা করে মঞ্জুর করা হবে। বলা বাহুল্য তিনটি সংশ্লিষ্ট আপিসের প্রতিনিধি একসঙ্গে বসে আলোচনা করে তখনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলে কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয়। ফাইলে নোটের আদান-প্রদান করতে এবং ডাকযোগে ফাইলের দিল্লী যাতায়াত করতে যে সময় ব্যয়িত হয় তা বেঁচে যায়। সত্যই এই ব্যবস্থাটি ঋণ-মঞ্জুরীর কাজ খুব ত্বরান্বিত করেছিল এবং ফলে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই সমিতির ক্ষমতা খানিকটা সীমাবদ্ধ। কারণ তিন মাস অন্তর তা একবার বসে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কোন জরুরী ঋণের বা অর্থদানের প্রশ্ন উঠলে তা নিষ্পত্তির জন্য যতদিন না সমিতির বৈঠক বসে ততদিন অপেক্ষা করতে হত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা হল। ঠিক হল, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের একজন উপসচিব কলিকাতার শাখা-আপিসে

বসবেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কোন প্রস্তাব আসলে তার মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করবেন। তবে প্রতিটি প্রকল্পে তাঁর অর্থ মঞ্জুরী করার ক্ষমতা এক লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তা হলেও অন্তর্বর্তীকালে এই ব্যবস্থা জরুরী সমস্যার সমাধানে খুব কাজে লেগেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছিল। তার প্রধান কারণ পুনর্বাসনের উপযুক্ত জমি পাওয়া ক্রমশই দুষ্কর হয়ে পড়ছিল। তার মূল কারণ হল এখানে যে উদ্বৃত্ত জমি ছিল তার বড় অংশ পুনর্বাসনের কাজে গত কয়েক বছরে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। একটি অতিরিক্ত কারণ হল পশ্চিমবঙ্গ-বাসীদের পাকিস্তান হতে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের হাঙ্গামার সময় তা বিলক্ষণ বর্তমান ছিল, কিন্তু পুনর্বাসনের কাজে যেমন জমি ও চাকুরিতে তাদের ভাগ দেবার প্রয়োজন হল, তেমন নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেখে তাদের সহানুভূতি কমে আসতে লাগল। সুতরাং পুনর্বাসনের জন্য আইনমত কোন জমি গ্রহণ করবার চেষ্টা হলে মালিক সংশ্লিষ্ট আপিসে নানা আপত্তি দেখিয়ে আইনগতভাবে যতখানি সম্ভব বাধা দিত। সেখানে সফল না হলে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বাধা দেওয়া হত। ফলে সোজাসুজি ব্যবহারযোগ্য জমি বিশেষ আর পাওয়া যেত না। যেখানে মালিক স্বেচ্ছায় জমি দিতে এগিয়ে আসত, সেখানেই কেবল জমি পাওয়া যেত ; কিন্তু তার পরিমাণ নগণ্য। আর যে জমি আইনগতভাবে দখল নেওয়া সহজ হত, তা এমন নিকৃষ্ট যে সোজা ব্যবহারযোগ্য নয়। রীতিমত উন্নয়নের ব্যবস্থা না করলে সেখানে উদ্বাস্তু পরিবারদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় না।

এইভাবে যে জমি পাওয়া যেত তা হয় নানা গর্তে ভর্তি না হয় এমন নিচু যে পুকুর কেটে মাটি তুলে তাকে ভরাট করতে হয়। এই প্রসঙ্গে নন্দননগর কলোনির কথা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে। এর উত্তর অংশে যে তিনটি সমান্তরাল অগভীর বিল সৃষ্টি হয়েছিল, সংলগ্ন সেই জমির উন্নয়নের প্রশ্ন এসে পড়ে। এই বিলগুলির একটিকে রেখে যদি তাকে গভীর করে কেটে, তা হতে যে মাটি উদ্ধার হবে তা দিয়ে বাকিগুলি ভরাট করা যায়, অনেক পুনর্বাসনে ব্যবহারের যোগ্য জমি পাওয়া যায়। এই সময় কলিকাতার অতি সন্নিকটে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে এক লপ্তে অনেকখানি জমি কিনতে পাওয়া গিয়েছিল। শিয়ালদহ হতে যে লাইন দক্ষিণেশ্বর ঘুরে বিবেকানন্দ ব্রিজ দিয়ে নদী পার হয়ে চলে গেছে তার বাঁকের মুখে এই জায়গা অবস্থিত। জায়গাটির নাম বনহুগলী। এখানে বেশির ভাগ জমিই নিচু। তাকে ব্যবহার-যোগ্য করতে হলে স্থানে স্থানে পুকুর কেটে তার মাটি ব্যবহার করে বাকি অংশ উঁচু করে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এখন এই ধরনের উন্নয়নের কাজ কায়িক পরিশ্রম দিয়ে করা যায়, কিন্তু তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এখন যন্ত্রের সাহায্যে যদি মাটি কাটা ও মাটি সমান করার কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে জমির উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয়। কারণ এক একটি যন্ত্র আসুরিক শক্তি ধরে এবং তার শ্রান্ত হবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এইখানেই তো যন্ত্রের সুবিধা। এদিকে যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের জমি দ্রুত উন্নীত হলে উদ্বাস্তুদের তাড়াতাড়ি পুনর্বাসন হয়। তাতে তাদের অলসভাবে বসিয়ে রেখে ডোল দিয়ে যে টাকা ব্যয় হত তা বেঁচে যায়।

এই যুক্তির বলেই আমরা শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার নিকট এক প্রস্থ মাটি কাটা যন্ত্র কেনবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তার সমর্থনে ওপরের যুক্তিগুলি স্থাপন করেছিলাম। তিনি এবিষয়ে আমাদের সহিত আলেচনা করে তখনি এই যন্ত্রগুলি কিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঋণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমরা চেয়েছিলাম দুই ধরনের যন্ত্র। এক ধরনের হল যাকে বলা হয় বুলডোজার। তা যেমন চলতে থাকে সামনে মাটি কেটে কেটে, সঙ্গে যে মাটি রাখবার গাড়ি থাকে, তাতে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তারপরে যেখানে ফেলবার সেখানে মাটি ফেলতে পারে। তা মাটি কেটে উঁচুনিচু জমিকে সমান করতেও পারে এবং উদ্বৃত্ত মাটিকে ঠেলে নিয়ে নিচু অংশ ভরাট করতে পারে। আর এক ধরনের যন্ত্র চেয়েছিলাম তার নাম ড্র্যাগলাইন একসক্যাভেটার। তা ওপর থেকে কোদালের মত জিনিস দিয়ে এক ক্ষেপে যা মাটি কাটে তা ওপর দিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত কপিকলের সাহায্যে তুলে নিয়ে অন্যত্র ফেলতে পারে। নন্দননগরের সমস্যায় তা বিশেষ সাহায্য করতে পারে। কারণ এই যন্ত্র এক পাশে বিলের মাটি কেটে অপর পাশে বিল ভরাট করতে বিশেষ উপযোগী।

এই যন্ত্রগুলি পেয়ে আমাদের জমি উন্নয়নের কাজের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-একটি কলোনির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বনহুগলী এখন একটি সমৃদ্ধ কলোনি। এর জায়গা কিন্তু ছিল অত্যন্ত নিচু; ফলে বেশির ভাগ জমি জলমগ্ন থাকত। একে উন্নীত করা হয়েছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই মাটি কাটা যন্ত্রগুলির সাহায্যে। এদের কার্যকারিতা কিন্তু সব থেকে সুন্দর-ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল ব্যারাকপুর মহকুমায় একটি কলোনির উন্নয়ন সাধনের কাজে। জায়গাটি শ্যামনগরের নিকট গারুলিয়াতে একেবারে ভাগীরথী নদীর ধারে অবস্থিত। এখানে আগে বছরের পর বছর ধরে ইট তৈরি হত। ফলে জায়গাটির বিভিন্ন অংশ হতে ইটের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এই গর্তগুলি আবার বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত। জায়গাটির সব থেকে উঁচু অংশ হতে সব থেকে নিচু অংশের ব্যবধান ছিল ৩০ ফুটের মত। একেবারে নদীর ধারে অবস্থিত হওয়ায় এটি মৎস্যজীবী আশ্রয় শিবিরবাসী

উদ্বাস্তুদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। এই ধরনের জায়গা শ্রমিকের সাহায্যে সমতল করা এক রকম অসাধ্য ছিল; কিন্তু কেবল বুলডোজারের সাহায্যে ওপরের মাটি তলায় ফেলে এবং ঠেলা দিয়ে জমিটি কয়েক দিনের মধ্যে সমতল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

(২)

উপযুক্ত নেতা পেলে যে উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় সুন্দর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিতে পারে, তার একটি উদাহরণ পশ্চিম বাঙলায় আছে। ইতিপূর্বে আমরা নববারাকপুর কলোনির জন্মের রোমাঞ্চকর ইতিহাস আলোচনা করেছি। সেখানে একটি ইউনিয়ন বোর্ডের মানুষ পাকিস্তানে স্বগ্রাম হতে বিচ্যুত হয়ে তাদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্টের নেতৃত্বে কি বিরাট কলোনি গড়ে তুলেছিল তা দেখেছি। ঠিক বলতে কি প্রধানত নিজেদের চেষ্টায় এত বড় কলোনি গড়ে তোলা হয়েছে যে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভারতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে নববারাকপুর কলোনি অনন্যসাধারণ।

কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে আর একটি কলোনির কথা আমি জানি যা আকারে বড় না হলেও অন্য দিক থেকে অনন্যসাধারণ এবং সেই কারণে পরিচিত হবার যোগ্য। কলোনিটি গড়ে উঠেছিল কয়েকটি উৎসাহী কর্মী এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীর চেষ্টায়। তাঁদের নেতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চতর বিচার বিভাগীয় সার্ভিসের অফিসার ছিলেন। আশ্রয় শিবিরবাসী মানুষ ব্যতীত তুলনায় অবস্থাপন্ন মানুষেরাও বাস্তুচ্যুত হলে পুনর্বাসন সমস্যা দেখা দেয়। হয়ত জীবিকার ব্যবস্থা তাদের আছে; কিন্তু নূতন করে নিজস্ব বাসগৃহ না বানালে তাদের সমস্যার সমাধান হয় না। এই ধরনের কয়েকশত পরিবার এই কর্মিদলের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের গৃহসমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবার উদ্দেশ্যে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করেছিল। উদ্দেশ্য কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে জমি সংগ্রহ করে তার উন্নয়ন সাধন করে তাকে একটি আদর্শ উপনগরীতে পরিণত করা।

এর জন্য স্থান নির্বাচন হল কৃষ্ণপুরে। বেলগাছিয়া হয়ে যশোর রোড দিয়ে দমদম বিমানপোতের দিকে এগিয়ে যেতে পাতিপুকুর ছাড়িয়ে একটা খাল পার হতে হয়। তার নাম বাঘজোলা খাল। তা পশ্চিম হতে পুর্বদিকে প্রবাহিত। তার সংলগ্ন দক্ষিণ অংশে বাঙ্গুড় কলোনি গড়ে উঠেছে। তারই সংলগ্ন উত্তর অংশের জমি তারা উপনগরী গড়বার জন্য নির্বাচন করেছিল। জায়গাটি ছিল গভীর হোগলা বনে আচ্ছন্ন। তাতে সারা বছর অন্তত তিন চার ফুট জল দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানকার জমি এতই নিচু। তবু যে তা নির্বাচন করা হয়েছিল তার প্রধান কারণ মনে হয় তা কলিকাতার অত্যন্ত সন্নিকট বলে। দ্বিতীয়ত

যোগাযোগের দিক থেকে তার অবস্থিতি বেশ ভাল জায়গায়। পশ্চিমে কাছ দিয়েই যশোর রোড চলে গেছে। কাজেই রাস্তা দিয়ে কলিকাতার সঙ্গে তা ভালভাবে যুক্ত। যখন জমি নির্বাচিত হয়, তখন এখান দিয়ে মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল বসিরহাট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সে রেল এখন উঠে গিয়েছে। কিন্তু এখন তার স্থান নিয়েছে এয়ার পোর্টে যাবার নূতন প্রশস্ত রাস্তা যা ভি. আই. পি. রোড বলে খ্যাত। সুতরাং এখন তার পূর্ব ও পশ্চিম দু দিকেই বড় রাস্তা।

এমন নিচু জায়গার উন্নয়ন বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু বাধার কাছে হার স্বীকার না করে মানসিক বলকে মূলধন করে তাকে অতিক্রম করেই মানুষ বড় কাজ করতে পারে। এই প্রকল্প যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা সেই পথই বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ একটি নকসা রচনা করে জমি ভরাট করতে যে মাটি লাগবে তা সংগ্রহের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত স্থানে পুকুর কাটা এবং তাতে যে মাটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে জমি উঁচু করা। এই উদ্দেশ্যে এখানে তিনটি পুকুর কাটা হয়েছিল। সেগুলি এত গভীর এবং এত সুন্দর করে কাটা যে তারা আজ এই উপনগরীর শোভা বর্ধনের কাজও করে। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ তাদের জল, শানবাঁধান প্রশস্ত ঘাট। তার ওপর চারদিকে বেড়া দিয়ে তাদের শুধু সুরক্ষিত করা হয় নি মনোরমও করা হয়েছিল।

পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত রুচিসম্পন্ন শ্রেণীর জন্য। তাই তার রাস্তাগুলি সুবিন্যস্ত এবং প্রশস্ত। তার জমিগুলি তুলনায় বড়। যাঁদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়েছে তাঁরা সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করেছেন। ফলে উপনগরটি এখন একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তা কলিকাতায় যে সব নূতন কলোনি গড়ে উঠেছে, যেমন নিউ আলিপুর বা যোধপুর পার্ক তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। তার নগর বিন্যাস, রাস্তার প্রসার, বাড়িগুলির পারিপাট্য এদের সহিত তুলনীয়।

এঁদের এই পরিকল্পনার সঙ্গে গোড়ার দিকে সরকারী কর্মসূত্রে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। প্রথম দিকে আমার আশঙ্কা ছিল এত নিচু হোগলা বন নিয়ে তাঁরা উপনগরী গড়ে তুলতে কষ্ট পাবেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অদম্য উৎসাহ সকল প্রতিকূলতাকে পরাভূত করবার শক্তি দিয়েছিল। তাঁদের উপনগরী ঠিক মত গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের হাতের কাজ দেখাতে। তাঁদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাই ১৫ই মে ১৯৫৪ তারিখে ওঁদের উপনগরী পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। গিয়ে যা দেখেছিলাম তাতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এ জায়গা কি ছিল, আর কি হয়েছে! সেদিন যে কথাটা বড় করে মনে হয়েছে তা হল মনের বল আর উৎসাহ থাকলে মানুষ খুব কঠিন কাজেও সফল হতে পারে। সেদিন তাঁদের মনোরম দীঘিগুলি দেখে চোখ

জুড়িয়ে গিয়েছিল, তাঁদের নবনির্মিত সুন্দর বাড়িগুলি দেখে মনে তৃপ্তি হয়েছিল। যারা ঘর হারিয়েছে তারা আরও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে আবার ঘর বানিয়ে প্রকৃত পুনর্বাসন পেয়েছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায়। সুতরাং সেদিন এই কলোনিটি পরিদর্শন করে ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলাম এবং নেতাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে চলে এসেছিলাম।

আমার মনে হয় উৎকর্ষের দিক হতে এমন সুন্দর উদ্বাস্তু কলোনি বাঙলা দেশে আর একটিও নেই। সেদিক থেকে তা অনন্যসাধারণ। তাই কয়েক মাস পরে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন যখন কলিকাতায় এসে উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় স্থাপিত কলোনি দেখতে চেয়েছিলেন আমি এখানে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে গেলে কলোনিবাসীরা বিশেষ উৎসাহ ভরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি তার পরিপাটি রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট কলোনিগুলি গড়ে উঠেছে উৎকর্ষের দিক হতে এটি তাদের সহিত প্রতিযোগিতা করতে পারে। এখানে বলে রাখা দরকার যে দিল্লীর এই কলোনিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সাহায্যপুষ্ট।

(৩)

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের স্থানে নিয়ে যাবার ফলে কতকগুলি ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। তার ফলে কয়েকটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা সফল হয় নি। তার মূল কারণ ছিল পরিকল্পনায় মৌলিক ত্রুটি। যেমন চাষী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য হয় তো যে জমি নির্বাচিত হয়েছিল পরে দেখা গেল তা চাষের উপযুক্ত নয়; সবজি উৎপাদনের জন্য যে জমি নির্বাচিত হয়েছিল সেখানে সবজি উৎপাদন করা যায় না। পুনর্বাসনে যাবার বছর খানেক বা বছর দেড়েক পরে এই মৌলিক ভ্রান্তির কুফল প্রকাশ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদের কেউ কেউ কলোনি ত্যাগ করে চলে গেল। আর যারা রয়ে গেল তারা দুর্দশার চাপে আমাদের কাছে তার প্রতিকার চাইল।

এইসব ক্ষেত্রে করবার জিনিস আছে দুটি। প্রথম হল পরিকল্পনার দুর্বলতা-বশতঃ যেখানে পুনর্বাসন সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এমন কি যদি সেখানে পুনর্বাসন সম্ভব হবে না মনে হয় তাহলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে কলোনি তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, যে ভুল অতীতে করা হয়েছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

আমরাও এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম এবং ঠিক হয়েছিল,' যে সব সরকার কর্তৃক স্থাপিত কলোনিতে পুনর্বাসনের কাজ ভাল অগ্রসর হচ্ছে না তাদের সম্বন্ধে তদন্ত করে অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করা। তারপর যদি মনে হয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়ে সেখানে পুনর্বাসন সম্ভব, তার ব্যবস্থা করা। আর যদি মনে হয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়, তা হলে সেই কলোনিকে তুলে দেওয়া। এই নীতিগ্রহণ করে যে কলোনিগুলি সম্পর্কে অসাফল্যের অনুযোগ এসেছিল তাদের বিষয় অনুসন্ধান করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনেকগুলি ক্ষেত্রে আমি নিজে কলোনিগুলি পরিদর্শন করেছিলাম। যেখানে বিশেষজ্ঞের অভিমতের প্রয়োজন সেখানে অতিরিক্তভাবে বিশেষজ্ঞ পরিদর্শন করে অভিমত দিয়েছিলেন। তার ফলে কতকগুলি কলোনির পুনর্বিন্যাস হয়েছিল। আবার কতকগুলি কলোনি তুলে দেবারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবিষয় দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

খড়্গপুর স্টেশনের দক্ষিণ দিকে তাল বাগিচা অবস্থিত। তার পাশেই ওখানকার বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষণ কেন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি গড়ে উঠেছে। তাল বাগিচা একটি প্রশস্ত টিলার ওপর অবস্থিত। তার পাশ দিয়ে একটি ছড়া বয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল তা সবজি উৎপাদনের পক্ষে বেশ উপযুক্ত। কাছেই খড়্গপুরের মত বড় শহর। কাজেই সবজির চাহিদা এখানে প্রচুর হবে। তাই এখানে একটি সবজি উৎপাদকের কলোনি গড়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ধরনের কলোনিতে প্রতি পরিবারকে বাস্তুজমি ছাড়া আড়াই বিঘা মত চাষের জমি দেওয়া হয়ে থাকে। জায়গাটির আকর্ষণ ছিল বলে সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন নিয়েছিল। সমগ্র কলোনিটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রতি ভাগের জন্য একটি করে বড় ইঁদারা নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাদের প্রতিটির ব্যাস হবার কথা কুড়ি ফুট।

উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুনর্বাসনে যাবার বেশ কয়েক মাস পরে খবর এল এখানকার উদ্বাস্তু পরিবারগুলিতে অনেকে জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছে না। ওখানে আমি নিজেই পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হল ওখানে সবজি উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করাই ভুল হয়েছে। জায়গাটি শুধু ডাঙ্গা জমি নয়, তার মাটি কৃষির উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়টি যে ছড়াটি তার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তার জলে সমগ্র কলোনির জমিতে জল সেচ দেওয়া সম্ভব নয়। দুটি কুপে বেশ জল এসেছে, কিন্তু অন্য দুটিতে জল বেশি ওঠে নি। অবশ্য পাশে খড়্গপুরের মত বড় শহর থাকায় সবজি উৎপাদন করতে পারলে বিপণনের অসুবিধা ছিল না। সুতরাং এখানকার পরিকল্পনার রূপ পরিবর্তন করবার দরকার হয়ে পড়েছিল। বড় রেলের কারখানা ও শহর

কাছে থাকায় এখানে কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন সম্ভব নয় কিন্তু অন্য উপায়ে রেলের কারখানা বা রেল কোম্পানির তত্ত্বাবধানে কাজ পেয়ে বা মুরগী উৎপাদন করে বা কুটীর শিল্প স্থাপন করে কিছু পরিবার এখানে জীবিকা অর্জন করতে পারে।

সুতরাং সেই রকম ব্যবস্থাই করা হল। পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত করে এখানে একটি অকৃষিজীবী পরিবারদের কলোনি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কৃষি ঋণের পরিবর্তে এদের ব্যবসায় ঋণের ব্যবস্থা হল। এদের অনেককে রেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকুরি জুটিয়ে দেওয়া হল। অনেকে নিজের চেষ্টায় কাজ জুটিয়ে নিল। এই কলোনিরই একজন উদ্বাস্তু এমন একটি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যা উল্লেখ করার যোগ্য। তিনি বাড়িতে রুটি বিস্কুট বানিয়ে এখানকার স্টেশনে বিক্রয় করে নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

এই মেদিনীপুর জেলারই আর একটি কলোনির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে শালবনী অঞ্চলে একটি কৃষিজীবীদের কলোনি স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসন নিয়েছিল তারা অনুযোগ করেছিল এখানকার জমিতে চাষ ভাল হয় না। এ অঞ্চলে সাধারণ জমি অনুর্বর। অনেক রাঙা মাটিতে ঢাকা জমি আছে। সেখানে বিশাল শালবনও আছে। তার অনুসরণেই এর নাম হয়েছে শালবনী। আমি একজন কৃষিবিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে এই কলোনিটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। জায়গাটি কিন্তু আপতদৃষ্টিতে অনুর্বর মনে হয় না। অর্থাৎ তা পাথরে ভরা নয়, বীরভূমের খোয়াই অঞ্চল যেমন রাঙা মাটিতে ঢাকা তাও নয়। তার মাটি বাঙলা দেশের সমতল অঞ্চলে যে ধরনের মাটি দেখা যায় তারই মত দেখতে। তবু অনুসন্ধান করে জানা গেল সত্যিই এখানে ভাল ফসল হয় না। কৃষিবিশেষজ্ঞ পরে মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছিলেন যে এজমিতে এসিডের অংশ বেশি এবং সেই কারণেই এখানে ফসল ভাল হয় না। তাঁর পরামর্শ মত কাজেই এই কলোনিটি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত হয়।

এইভাবে মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে অনেকগুলি ছোট ছোট কলোনি পরিদর্শনের পর তুলে দেবার বা ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চণ্ডীপুর ঘোল ঘরিয়া নামে মেদিনীপুরে যে কৃষিজীবীদের কলোনি ছিল, সেখানে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসন পেয়েছিল তারাও অনুযোগ করেছিল যে সেখানে ভাল ফসল হয় না। এখানেও কৃষিবিশেষজ্ঞ গিয়েছিলেন। তিনি পরিদর্শনের পর অভিমত দিয়েছিলেন যে এখানকার জমি চাষের উপযুক্ত। তবে তার উর্বরাশক্তি বাড়াবার জন্য তিনি কিছু মাটির কাজের সুপারিশ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর অভিমত অনুসারে এখানকার উদ্বাস্তু পরিবারদের সেখানেই থেকে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এদের মধ্যে একটি বড় অংশ কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করে'নি। আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে তারা সপরিবারে কলিকাতায় এসে হাইকোর্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পুনর্বাসন অধিকারের কেন্দ্রীয় আপিসের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঠিক বলতে কি হাইকোর্টে যাবার ট্রাম গাড়িগুলি যেখানে এসে থামে তার সংলগ্ন যে খোলা জায়গা আছে সেখানে বাস করতে তারা শুরু করেছিল। তাদের প্রতিনিধিরা আমার কাছে এবং আমাদের মন্ত্রীর কাছে দেখা করে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের দাবী জানিয়েছিল।

আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাই নি। তারা যখন কৃষিজীবী এবং যে জমিতে তাদের পাঠান হয়েছে তা যখন কৃষিবিশেষজ্ঞের মতে চাষের উপযুক্ত তাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করবার সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে যদি তাদের ইচ্ছাপূরণ করা হয়, তাহলে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে যা পুনর্বাসনের কঠিন চেষ্টায় নিযুক্ত সহস্র সহস্র পরিবারের মনকে বিচলিত করতে পারে। সেদিক থেকে তার তাৎপর্য খুব সুদূরপ্রসারী। কারণ পুনর্বাসন হবার কাজটাই কষ্টসাধ্য। তারপর উপযুক্ত জমি পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম চেষ্টাতেই যদি ভাল ফল না মেলে পুনর্বাসন প্রাপ্ত মানুষের ইচ্ছা হতে পারে স্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় চেষ্টা করে দেখা যাক। কিন্তু এমন ইচ্ছা জাগাটাই বিপজ্জনক। কারণ চাহিদার তুলনায় পুনর্বাসনের উপযুক্ত জমি পশ্চিম বাঙলায় সীমাবদ্ধ। তারপর যদি স্থান-পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যাপকহারে জাগে, সে ইচ্ছা পুরণ করা সম্ভব হয় না, এবং পুরণ করলেও বিপদ আছে। আন্দোলন করলে তা পুরণ হচ্ছে দেখলে সে ইচ্ছা উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে শুধু ব্যাপক হারে সংক্রামিত হবে না, তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টায় শিথিলতা আসবে। এই সব বিবেচনা করে আমরা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি নি এবং এবিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হবে না জানিয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে আর একটি কলোনির পরিবারগুলিরও একটা বড় অংশ অনুরূপ দাবী নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। এখন যেখানে কল্যাণী স্টেশন অবস্থিত তার লেভেল ক্রসিং হতে একটি নূতন রাস্তা বারাসাত হতে কৃষ্ণনগরগামী জাতীয় সড়কে মিশেছে হরিণঘাটার সরকারী খামারের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে। এই রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে কল্যাণীর নিকটেই একটু দক্ষিণে গায়েশপুর কলোনি অবস্থিত। তা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে যে সব বড় কলোনি স্থাপিত হয়েছিল তাদের অন্যতম। তার উত্তরে রাস্তার অপর পারে গায়েশপুর হতে আনুমানিক এক মাইল দূরে অনেকখানি জমি সরকারের দখলে আসে। সেই জায়গায় সগুনা ও লিচুতলা নামে দুটি গ্রাম অবস্থিত। কল্যাণী নগরীর

পশ্চিম প্রান্তে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার জবরদখল করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি কলোনি গড়ে তুলেছিল। তারা এক রকম স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। জমিতে সবজি উৎপাদন করে এবং নানা কাজ জোগাড় করে নিয়ে তারা জীবিকা অর্জন করত। এখন তাদের নিয়ে সরকার উভয়সঙ্কটের অবস্থায় পড়লেন। তাদের সরিয়ে না দিলে কল্যাণী নগরী পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে তাদের এখান হতে সরিয়ে দিলে তাদের নূতন করে উদ্বাস্তু করা হয়।

শেষে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটি আপোসের ভিত্তিতে এই সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। প্রজা সমাজতন্ত্র দলের নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই দলটির পরিচয় ছিল। একরকম তাঁর সহযোগিতায়ই এই মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক হয় কল্যাণীর জবরদখল-করা অংশ হতে তারা উঠে আসবে যাতে তার উন্নয়নকার্য অবাধে চলতে পারে। পরিবর্তে সরকার নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের নূতন বাস্তুজমি ও সবজি উৎপাদনের জন্য জমি দেবেন এবং পুনর্বাসন ঋণ দেবেন। তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের স্থানান্তরিত করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ এই স্থানের সহিত তারা বিশেষ পরিচিত এবং এখানকার পরিবেশেই তারা জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন সগুনা ও লিচুতলায় সরকারের দখলে যে জমি ছিল তা এই স্থানের খুব নিকটবর্তী। এই পরিবার-গুলিকে সগুনায় জমি দেবার প্রস্তাব হলে তারা সেখানে নূতন কলোনি করতে সম্মত হল। এইভাবে সগুনা কলোনির আরম্ভ হয়।

তার পাশেই লিচুতলার জমি। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিক থেকে জায়গাটির অবস্থিতি সুবিধাজনক। কারণ কাছেই কাঁচড়াপাড়ার মত বড় শহর। পাশেই কল্যাণী নগরী গড়ে উঠছে এবং সেখানে নানা শিল্প স্থাপনেরও ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনর্বাসন পেলে জীবিকা অর্জনের অনেক সুবিধা জুটবে। সেই সব বিবেচনা করেই এখানে অনেকগুলি অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আশা করা হয়েছিল যে এটি বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এদের জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।

এখানে কিন্তু যারা এসেছিল তাদের পুনর্বাসন সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নি। এখানকার পরিবারগুলি অভাব অনটনের অনুযোগ করেছিল। তুলনায় পাশে সগুনায় যারা বসেছিল তারা নূতন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। এদের মধ্যে একটা দল এখান থেকে চলে গিয়ে অন্যত্র বসতে চাইল। আমরা কিন্তু তাতে সম্মতি দিতে পারি নি, কারণ অকৃষিজীবী

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য এর থেকে ভাল জায়গা পাওয়া দুষ্কর। তাদের জন্য কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকাই সব থেকে বাঞ্ছনীয়। তারা যেখানে পুনর্বাসন পেয়েছিল তা সেই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এখন এদের প্রস্তাব গ্রহণ করে অন্যত্র স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করলে তা এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যা এই শ্রেণীর অন্য উদ্বাস্তুদের মনে পুনর্বাসনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সুতরাং এ প্রস্তাব যে গ্রহণ করা যাবে না, তা তাদের জানিয়ে দেওয়া হল।

এর ফলে এদের নেতারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য নূতন পথ অবলম্বন করলেন। তাঁরা এদের একটা বড় দলকে নিয়ে কলিকাতায় চলে এলেন এবং অকল্যাণ্ড রোডের পুনর্বাসন আপিসের সংলগ্ন স্থানে পরিবারগুলিকে স্থাপন করলেন। তারপর মহাকরণে আমার সঙ্গে এবং আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে অন্যত্র পুনর্বাসনের দাবী জানালেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সামগ্রিকভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ ব্যহত করবে বিবেচনা করে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে আমরা বাধ্য হলাম।

এইভাবে এই দুটি কলোনির পুনর্বাসনের স্থানত্যাগী উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন অধিকারের কেন্দ্রীয় আপিসের সংলগ্ন স্থানে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে মিলিত হল। প্রতিনিধিদল মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে যখন নিজেদের প্রস্তাবের অনুমোদন আদায় করতে পারল না, তখন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য তারা এমন এক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করল যা ইতিপূর্বে উদ্বাস্তুরা কোনদিন প্রয়োগ করে নি। ধ্বনিসহযোগে শোভাযাত্রা এবং সভাসমিতি করে দাবী জানান—এইগুলিই ছিল চাপসৃষ্টি করার প্রশস্ত পথ। এমন কি প্রয়োজন হলে লাইনে বসে রেলগাড়ী আটকান হয়েছে। আন্দোলনকে আরও জোরাল করবার জন্য নেতারা একা বা সদলে অনশনও করেছেন। কিন্তু এবার এসব গতানুগতিক পথ নয়, নূতন পথে এঁরা আন্দোলন পরিচালিত করলেন। সোজাসুজি বলতে গেলে নূতন পথটি হল আমাকে অবরোধ করে আমার ওপর চাপসৃষ্টি করে অন্যত্র পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া।

এখন এ বিষয় আমার প্রাত্যহিক কাজের রীতি তাদের পরিকল্পনাটি রূপায়িত করার অনুকূল। উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমস্যা তখন এমন বিরাট আকার ধারণ করেছিল যে আমার জাগ্রত অবস্থার প্রায় সমস্ত সময় তাতে অতিবাহিত হত। সরকারের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে দুই পর্যায়ে। প্রথম বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে কি নীতি প্রয়োগ করতে হবে তা ঠিক করতে হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সেই নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। নীতি নির্ধারণের জন্য এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য আছে সচিবদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ। তাঁদের পরামর্শ নিয়ে মন্ত্রীরা তাঁদের স্তরে নীতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

নেন। তারপর সেই নীতি প্রয়োগের জন্য আছে মহাধ্যক্ষের অধীনে ডিরেক-টোরেট। কাজেই সাধারণক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র আপিসে দুটি পৃথক অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কাজটি সম্পাদিত হয়। ফলে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় ভার খানিকটা কমে যায়।

পুনর্বাসন বিভাগেও পূর্বে সেই ব্যবস্থাই ছিল। তার কাজের জন্য ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে বিভাগীয় সচিব ও মহাধ্যক্ষ পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। তারপর যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিভাগের দায়িত্ব নিজে নিলেন তিনি কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য একই অফিসারের তত্ত্বাবধানে দুটি আপিস স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে আমি একসঙ্গে বিভাগীয় সচিব এবং পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষের পদের দায়িত্ব নিলাম। সুতরাং আমার কাজের বোঝা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। অবশ্য আমার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক দিতে সরকার কোন দিন কার্পণ্য করেন নি। প্রতিদিন অসংখ্য চিঠির উত্তর দিতে হত, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের সহিত অনেক চিঠির আদান-প্রদান করতে হত। সুতরাং আমার দৈনিক কাজের একটা বড় অংশ ছিল এই সব চিঠির জবাবের শ্রুতিলিখন দেওয়া। তার জন্য সরকার আমাকে দুজন স্টেনো-গ্রাফার দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে প্রতিদিন অনেক উদ্বাস্তু প্রতিনিধি নানা সমস্যা আলোচনা করতে দেখা করতে আসতেন। সে কাজে আমাকে সহায়তা করবার জন্য সরকার আমাকে একজন ব্যক্তিগত সহায়ক দিয়েছিলেন। পরে অতিরিক্তভাবে আরও দুজন সহায়ক আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এতগুলি মানুষের সাহায্য নিয়েও যে কাজ আমার নিজের করতে হত তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে আপিসে আমার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হত। কাজের সুবিধার জন্য আমি একটি ব্যবস্থা করেছিলাম। বিভাগীয় সচিব হিসাবে যে কাজ তা আমি রাইটার্স বিল্ডিংএর আপিসে বসে শেষ করতাম। আর পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ হিসাবে যে কাজ তা শেষ করতাম অকল্যাণ্ড রোডের আপিসে বসে। এখন সচিবের কাজে বিশেষ করে দর্শনপ্রার্থীদের সমস্যা আলোচনা করতে এবং মন্ত্রী মহাশয়ার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করতে এত সময় যেত যে আমি সন্ধ্যা ছটার আগে রাইটার্স বিল্ডিং ত্যাগ করতে পারতাম না। সাধারণত ছ'টার পরে আমি অকল্যাণ্ড রোডের আপিসে কাজ করতে বসতাম। সেখানকার কাজ শেষ করে আমার বাড়ি রওনা হতে হতে ৯-৩০টা হয়ে যেত।

সুতরাং অকল্যাণ্ড রোডে সন্ধ্যার পর আমাকে অবরোধ করা খুব সহজ। আমি বসতাম আপিসের পূর্বপ্রান্তে একতলার একটি ঘরে। তার সামনে এক ফালি ছোট বারাণ্ডা এবং পূর্বদিকে একটি গরাদবিহীন জানালা। এই দুই

কলোনির উদ্বাস্তুদের আচরণ হতে মনে হয়েছিল এইখানেই। তারা আমাকে অবরোধ করে আমার কাছ হতে নূতন স্থানে পুনর্বাসন দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেবে ঠিক করেছিল। কিন্তু একদিনে সে চেষ্টা সফল হয় নি, বার বার চেষ্টা করে তবে তৃতীয়বারে তা নেতাদের অভিপ্রেত পথে পরিচালিত হয়েছিল। তার কারণ আমার মনে হয় উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা আমাকে সত্যই ভালবাসত। আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই অবরোধের কাজে তাঁরা পরিবারের মেয়েদের ব্যবহার করতেন। নেতারা সামনে আসতেন না; তাঁরা দূরে থাকতেন। মেয়েদের দিয়ে অবরোধের ব্যবস্থা হত।

আমাকে প্রথম অবরোধের চেষ্টা করা হয় ১২ই এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে। তখন শুধু চণ্ডীপুর ষোলঘরিয়া কলোনির উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আপিসের সংলগ্ন খালি জমিতে এসে অস্থায়িভাবে বাস করছিল। লিচুতলার উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। ওই তারিখে অকল্যাণ্ড হাউসের কাজ শেষ করবার পর রাত সাড়ে নটার সময় যখন আপিস হতে উঠে বেরিয়ে আসছি, দেখি সামনের বারাণ্ডায় কতকগুলি মেয়ে জড় হয়েছে। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ বারাণ্ডা নামবার সিঁড়িতে বসে ছিল। আমি কেন তারা ওখানে সমবেত হয়েছে জানতে চাইলে তাদের মধ্য হতে একটি প্রৌঢ়া মেয়ে বলল, তারা আমাকে বাড়ি না যেতে দিয়ে আটকে রাখতে চায়। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, তারা চণ্ডীপুর ষোলঘরিয়া উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি, ওখানে ফিরে যাবে না, অন্য জায়গায় পুনর্বাসনের আমার কাছে প্রতিশ্রুতি চায়।

আমি তখন তাদের মাঝখানে সিঁড়িতে বসে পড়লাম। তাদের বুঝিয়ে বললাম যে এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমাকে আটকালেও তা পাওয়া যাবে না। তবে তারা যদি আমাকে আটকে রাখতে চায়, আমি যাব না, ওখানেই বসে থাকব।

আমার কথা শুনে ওরা যেন কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরস্পর আলোচনা করে ওদের মুখপাত্রটি আমায় বলল, তোমাকে ধরে রাখতে চাই না, বাবা। তুমি বাড়ি যাও।

এত সহজে মুক্তি পাব আমি আশা করি নি। আমি ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি রওনা হয়ে গেলাম।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথাপূর্ব অকল্যাণ্ড হাউসের আপিসে বসে কাজ করি, কাজ শেষ হলে রাতে বাড়ি ফিরে আসি। পথে কোন বাধা পাই না। এইভাবে প্রায় দু মাস কেটে গেল। আমার ধারণা হল যে ভবিষ্যতে আর অবরোধের চেষ্টা হবে না।

কিন্তু শীঘ্রই প্রমাণ হয়ে গেল যে আমার ধারণা ভ্রান্ত। ইতিমধ্যে লিচুতলার উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কলোনি ত্যাগ করে আমাদের আপিসের সংলগ্ন খালি

জমিতে এসে গিয়েছে। এইভাবে দুটি কলোনির লোক একত্রিত হয়েছে। দুটি দলেরই অনুযোগ এক এবং দাবী এক। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে দ্বিতীয়বারের অবরোধ সংঘটিত হয়েছিল দুটি দলের সংযুক্ত চেষ্টার ফলে।

তারিখটা ছিল ১লা জুন ১৯৫৪। সন্ধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংএর কাজ শেষ করে আমার প্রতিদিনকার অভ্যাসমত অকল্যাণ্ড রোডের আপিসে আমার ঘরে আমি ফাইল দেখতে বসলাম। ফাইলের কাজ শেষ করে যেখানে যা প্রয়োজন নির্দেশ দিয়ে ৯টার পর আমি বাড়ি ফেরবার উদ্যোগ করলাম। দেখি পূর্বের মত সামনের রাস্তায় উদ্বাস্তু মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। গতবারের থেকে এবার তারা দলে ভারি। গতবারে তাই বারাণ্ডায় যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু এবারে তা সম্ভব হল না। বারাণ্ডায় তারা এমন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে ছিল যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না।

আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম কেন তারা আমাকে এমন করে অবরোধ করতে চাইছে, তারা বলল নূতন জায়গায় পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেবার জন্য।

আমি তখন তাদের বললাম এমন প্রতিশ্রুতি এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, করণ আমার ধারণায় তারা যে কলোনি হতে চলে এসেছে সে কলোনি দুটি পুনর্বাসনে ব্যবহারের যোগ্য। তবে তারা ইচ্ছা করলে আমাকে আটকে রাখতে পারে। তারা উত্তরে জানাল যে তাহলে তারা আমাকে আটকে রাখবে।

আমি তখন বললাম যে যখন আমাকে আটকে রাখাই হবে, আমার তাহলে বাড়ি যাওয়া হবে না এবং যেহেতু অত্যন্ত শ্রান্ত, আমি এখন ঘুমাব। এই বলে টেবিল হতে কাগজপত্র সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাতে কোন বাধা পেলাম না। তারপর টেবিলে শুয়ে পড়লাম। সত্যই সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এদিকে ক্ষুধার্তও হয়েছিলাম। কিন্তু উপায় কি? এরা যখন আমাকে বাড়ি ফিরতে দেবে না, ঘুমোতে চেষ্টা করাই ভাল। তাই চোখ বুজিয়ে ঘুমের কোলে আশ্রয় পাবার প্রতীক্ষায় টেবিলের ওপর শুয়ে রইলাম।

একটু যেন তন্দ্রার ভাব এসেছিল। এমন সময় দরজায় বারবার সজোরে আঘাত শুনে তন্দ্রা কেটে গেল। উঠে ব্যাপার কি দেখবার জন্য দরজা খুলে দেখি আমার চাপরাশী রমানাথ দরজা ঠেলছে। সে যা জানাল তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়: আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বার পর যে উদ্বাস্তু মেয়েগুলি আমার পথ রোধ করেছিল তারা অল্পক্ষণ বাদেই নাকি পরস্পর আলাপ করে ঠিক করল যে সাহেবকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। তাই তারা সদলে বারাণ্ডা ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি দেখলাম সত্যই বারাণ্ডা একেবারে জনশূন্য, প্রাঙ্গণেও কেউ বাধা দেবার নেই। তখন আমি বাড়ি চলে এলাম।

বোঝা যায়, দুবারই আমাকে অবরোধ করবার নির্দেশ এসেছিল পুরুষ নেতাদের কাছ থেকে, কিন্তু অবরোধ করবার ভার পড়েছিল মেয়েদের ওপর। তারা স্বভাবতই কোমল হৃদয়। সারাদিন আপিসের কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায় অপরের কাছে নির্দেশ পেয়েও আমাকে সারারাত আটকে রাখতে পারে নি। প্রথমবারের চেষ্টা তত সবল হয় নি। দ্বিতীয়বারের প্রস্তুতি আরও ভাল ছিল। কিন্তু দুবারেই যখন তারা দেখল আমি বাধা না দিয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে প্রস্তুত আছি, তখন সম্ভবত আমার প্রতি তাদের করুণার সঞ্চার হল। তাই দুবারই তারা চেষ্টা করেও আমাকে অবরোধ করবার মত নৈতিক বল জুটিয়ে নিতে পারল না। তাই দুবারই আমি ছাড়া পেলাম।

তার পরদিন সন্ধ্যায় যথাসময় অকল্যাণ্ডে কাজ করতে গেলাম। আমার আশঙ্কা ছিল আবার আমাকে অবরোধ করবার চেষ্টা হবে, কারণ নেতারা এত সহজে আমাকে ছাড়বে না, যে উপায়ে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছিল আবার সেই উপায় প্রয়োগ হবে এবং এবার এমন সতর্কতার সঙ্গে হবে যাতে অবরোধ না অসময়ে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন আর অবরোধ ঘটল না। বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, তবু অবরোধের চেষ্টা হল না। তখন আমার মনে হয়েছিল এই পথে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করার সংকল্প বোধহয় নেতারা ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু শীঘ্রই প্রমাণিত হয়ে গেল আমার সে ধারণা ভুল। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে যখন তৃতীয়বার আকস্মিকভাবে অবরোধের সম্মুখীন হলাম, আমি তখন একেবারেই তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ১৮ই জুন তারিখে আমার জন্য তৃতীয় অবরোধের ব্যবস্থা হল। এবার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ছিল না। অবরোধের রীতিমত বেশ পরিবর্তন হল। সেদিন সন্ধ্যা ছ'টার পর আমি আমার ঘরে গিয়ে বসে স্তূপাকার ফাইল খুলে তাতে একে একে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি। আমার ঘরে সঙ্গী তখন কেবলমাত্র আমার সেই ব্যক্তিগত আর্দালিটি। এমন সময় হঠাৎ উদ্বাস্তু মেয়েতে ঘর ভরে গেল। দেখতে দেখতে সামনের বারাণ্ডাও ছেয়ে গেল ওই মেয়েদের দলে। ঘরের পুর্বদিকে একটা গরাদবিহীন জানালা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটা খুব হট্টগোলের ধ্বনি হতে লাগল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি আপিসের সমগ্র প্রাঙ্গণ উদ্বাস্তু পুরুষে ছেয়ে গেছে।

অর্থাৎ এবার কৌশল অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ঠিক বাড়ি ফেরবার মুখে আমাকে অবরোধ করা হয় নি। আপিসে ঢুকে বসবামাত্রই অবরোধের ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করবার সুযোগ দেওয়া হবে না বলে ঘরের মধ্যে আমার চারিপাশে অনেক মেয়েকে দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বারাণ্ডাতেও মেয়েরা দাঁড়িয়ে যাতে আমার নির্গমনের পথ অবরুদ্ধ হয়। আর পাছে তারা আগের বারের মত অবরোধ ত্যাগ করে

আমাকে মুক্ত করে চলে যায় সে সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করবার জন্য পেছনে পুরুষরা বেষ্টনী রচনা করেছে। সম্ভবত তারা আশঙ্কা করেছিল আমাকে অবরোধ করা হলে পুলিশের সাহায্যে আমি মুক্ত হবার চেষ্টা করব। সেই জন্যই মনে হয় মেয়েদের দিয়ে ব্যূহ রচনার পরিকল্পনা।

এই অবরোধের ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ হবার পর তাদের দাবী উচ্চরবে ঘোষণা করা হল। আমার প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হল না। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই দুই দলের মানুষকে নূতন জায়গায় পুনর্বাসন দেবার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং দরকার হলে দিনের পর দিন অবরোধ চলবে। আমি তখন জানিয়ে দিলাম আমি সে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।

এদিকে দেখি আমার চাপরাশি বন্ধু আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। আমি তাকে যেতে বললেও সে যায় না। তখন ফাইলে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু দেখলাম যে পরিবেশ আমার জন্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে কাজ করা যায় না; কারণ সারা প্রাঙ্গণভরা মানুষের এবং ঘরের মেয়েদের হৈচৈ কান ঝালাপালা করে দেয়। দ্বিতীয়ত দেখলাম কয়েকটি মেয়ে আমার টেবিলের তলায় ঢুকে আমার দুটি পা চেপে ধরে রইল। উদ্দেশ্য যাতে আমি চেয়ার হতে উঠতে বা তার মধ্যে নড়ে বসতে না পারি। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় কাজে মন বসে না। সুতরাং আমি চুপ করে বসে রইলাম।

তখন মনে হল বাড়িতে একবার খবর দেওয়া দরকার, যে আমার বাড়ি ফেরা হবে না, কারণ এবার যে প্রস্তুতি দেখলাম, আজ যে সহজে মুক্তি পাব না তা বেশ বোঝা গিয়েছিল। আমার গৃহিণীকে ফোন করবার জন্য যেমন ফোনটা ধরেছি, অবরোধকারিণীদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া মেয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ বাবা পুলিশে খবর দিচ্ছ বুঝি?

সে কথা শুনে এই দুরবস্থাতেও আমার হাসি পেল। আমি উত্তরে জানালাম যে আমি পুলিশে কখনই খবর দেব না, তাদের সে ভয় নেই; আমি কেবল বাড়িতে খবর দিচ্ছি যে আমি ফিরতে পারব না, কারণ তারা আমাকে অবরোধ করে রেখেছে। তারপর ফোনে বাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আমার স্ত্রীকে দুঃসংবাদটি সংক্ষেপে জানিয়ে আমি ফোন রেখে চুপ করে বসে রইলাম। আর করবারই বা কি ছিল?

খানিক বাদে দেখি যারা আমাকে ঘিরে রেখেছিল তাদের ভিড় ঠেলে শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য আমার ঘরে এসে উপস্থিত। তিনি ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার কাছে বিশদ বিবরণ নিলেন; কিন্তু তাঁর সেই অবস্থায় করবার কিছু ছিল না। অগত্যা তিনি ওখানেই রয়ে গেলেন। একান্তই প্রীতিপ্রণোদিত আচরণ। আমি অনুরোধ করতেও বললেন, যাব না, থাকব। আমার আর্দালি রমানাথও রয়ে গেল।

দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। রাত বারটা বাজল, একটা বাজল। তারপর দেখি লিচুতলার উদ্বাস্তুদের নেতা আমার ঘরে এসে হাজির। সঙ্গে এক গ্লাস সরবৎ। আমাকে সেটা খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে অনুরোধ করলেন। আমি রাজী হলাম না। আমি বললাম, যেহেতু আমার মতে তাঁরা আমাকে অন্যায়ভাবে অবরোধ করেছেন, আমাকে যতক্ষণ অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হবে আমি খাদ্য বা জল স্পর্শ করব না। ঘণ্টা দুই আগে আমার স্ত্রীও ফোন-যোগে বাড়ী হতে খাবার পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। আমি একই যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে পাঠাতে নিষেধ করেছিলাম। যিনি পানীয় এনেছিলেন তিনি কিছুক্ষণ অনুরোধ করে যখন দেখলেন আমি খেতে সম্মত হলাম না, সরবৎ ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

আমি চেয়ারে আড়ষ্টভাবে বসে আছি, কারণ পা দুটো আমার এমন এঁটে ধরে রাখা হয়েছে যে নড়বার উপায় নেই। যারা ধরে রেখেছে বা ঘিরে রেখেছে তারা পালাক্রমে যাচ্ছে আর পরিবর্তে অন্য দল আসছে। কাজেই তাদের পা দুটো টান করে ধরে রাখার শক্তি অব্যাহত। হঠাৎ বাইরে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। আমার ঘরের পূর্বদিকে যে গরাদবিহীন জানালা ছিল সেখানে অনেক পুরুষ উদ্বাস্তু জমা ছিল সম্ভবত অবরোধ যাতে ঠিকমত পরিচালিত হয় এবং এই জানালার পথে মুক্তির ব্যবস্থা না হয়, তা দেখবার জন্যই তারা সেখানে উপস্থিত ছিল। ওই দিক হতেই একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ অনুভব করলাম। তারপর বাহিরের অস্পষ্ট আলোকে দেখি যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এসেছেন। সেখানে সমবেত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কিছু আলোচনার পর তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে তিনি জানালার ধারে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর বেশ ক্ষিপ্রগতিতে জানালা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে আমার পাশে হাজির হলেন। তাঁর সহিত ইতিপূর্বেই আমার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

সকল বাধা অতিক্রম করে এইভাবে আমার কাছে এসে তিনি এই অবরোধের কারণ কি জানতে চাইলেন। আমার দিক থেকে যা বক্তব্য সংক্ষেপে তাঁকে বললাম। মোটামুটি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে অবরোধকারীদের প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারি না, কারণ আমার ধারণায় তা দিলে পুনর্বাসন ব্যাহত হবে। যে জায়গায় তারা পুনর্বাসন পেয়েছে তা বিশেষজ্ঞের মতে পুনর্বাসনের যোগ্য, সুতরাং তা সত্ত্বেও যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হয়, তাহলে বিভিন্ন কলোনির উদ্বাস্তুদের মানসিক বল ক্ষুণ্ণ হবে এবং একটু অসুবিধায় পড়লেই তারা কলোনি ত্যাগ করতে চাইবে। তাঁর কাজ সংবাদ সংগ্রহ করা। তিনি আমার বক্তব্য শুনলেন। তারপর চলে গেলেন। তখনি তো আপিসে গিয়ে তাঁকে খবর লিখতে হবে যাতে পরের দিন সকালে এখানকার ঘটনার চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়।

এবার আমি শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য এবং আমার ব্যক্তিগত আর্দালিকে অনুরোধ করলাম চলে যেতে, কারণ আমার সঙ্গে তাঁদের নির্যাতন ভোগের কোন অর্থ হয় না। তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করে চলে গেলেন। তারপর আমি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। টেবিলের ওপর হাত রেখে তার ওপর মাথাটাকে স্থাপন করে চুপ করে পড়ে রইলাম। ইতিমধ্যে ঘরে এবং বারাণ্ডায় যে সব মেয়েরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও দেখলাম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। তারা একে একে মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

তারপর বোধ হয় আমি সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম তখন হাতঘড়িতে দেখি সাড়ে চারটা বেজে গেছে। তখন ছিল আষাঢ় মাস, তাই পুব দিকে আঁধার তখনি একটু ফিকে হয়ে এসেছে। আমি চারিপাশে চেয়ে দেখি আমাকে যে মেয়েগুলি অবরোধ করবার জন্য ঘিরে চারিপাশে শুয়েছিল তারা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। সেটা ঘটাই স্বাভাবিক, কারণ অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাদের জেগেই কেটে গেছে। এমন কি যারা আমার পা দুটো ধরে চেপে রেখে দিয়েছিল, তাদের মুঠির চাপও শিথিল হয়ে পড়ে আমার পা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। পেছনেই বাথরুম ছিল। সেখানে গিয়ে কল খুলে চোখেমুখে জল দিলাম। সারারাত দুর্ভোগের পর সেই শীতল জলের স্পর্শ যে কি মিষ্টি লেগেছিল বলবার নয়। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলাম।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। তখনও দেখি আমার প্রহরীদের কারও ঘুম ভাঙে না। আরও খানিক পরে যখন আরও ফরসা হয়ে এল, তারা একে একে জাগল এবং নূতন প্রহরীদের সঙ্গে পালা বদল করল। এখনকার পরিবেশ অনেক শান্ত। যারা ঘিরে রেখেছে তারা হট্টগোল করছে না। রাত্রের বিরাম যেন একটা প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিছু করবার না পেয়ে আমি তখন ঠিক করলাম আগের দিন সন্ধ্যার অসমাপ্ত কাজে মন দিয়ে সময় কাটিয়ে দেব। পাশেই টেবিলে স্তূপাকার ফাইল ছিল। সেগুলি একে একে খুলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লিখে দিতে লাগলাম।

এইভাবে ৮টা বেজে গেল। এমন সময় আমার টেলিফোন বেজে উঠল। আমার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় আমাকে ফোন করছেন। তিনি বললেন, আমার দুর্ভোগ সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর কাছে তিনি খবর পেয়েছেন। তারপর তিনি মুখ্য সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করছেন জানালেন। আরও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী তখন দিল্লীতে ছিলেন বলে তাঁর সহিত টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সম্মতি আদায় করতে দেরি হয়ে গেল। তা না হলে আমাকে উদ্ধারের আয়োজন আরও ত্বরান্বিত হতে পারত।

আমি কিন্তু পুলিশের সাহায্যে মুক্ত হতে চাই নি। যারা আমাকে ধরে

রেখেছে তারা বড় দুর্ভাগা। তাদের সঙ্গে আমার সেব্য-সেবকের সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, এই আমি চেয়েছিলাম। আমার প্রতি মমতা যে তাদের আছে, সে পরিচয় তো আগেই পেয়েছি। কাজেই দুর্ভোগ একটা সীমায় পৌঁছলে তারা-আপনা হতেই ছেড়ে দেবে, এরকম একটা আশা আমার ছিল। সেই ভাবেই এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটে, এই আমি চেয়েছিলাম। তাই এ ব্যবস্থা আমার ভাল লাগে নি।

খানিক বাদে দেখি উদ্বাস্তু দলের নেতা আবার একটি গ্লাসে করে সরবত নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছেন। আবার তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন তা খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে। আমি আবার তাঁর সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম। আরও দু-তিন জন সে অনুরোধে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাতেও সম্মতি দিলাম না। অগত্যা তাঁরা চলে গেলেন। আমি ফাইল দেখার কাজ করে যেতে লাগলাম।

তখন বোধহয় সকাল সাড়ে আটটা হবে। দেখলাম, বড় রাস্তার উপর কতকগুলি পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হল। খানিক বাদে একজন পুলিশ অফিসার একা আমার কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি জানালেন যে মুখ্য সচিবের কাছে তিনি নির্দেশ পেয়েছেন আমাকে বলপ্রয়োগ করে মুক্ত করবার; কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা ঘটছে আমার আপিসের মধ্যে সেহেতু অতিরিক্তভাবে আমার অনুমতি না পেলে তিনি পুলিশবাহিনীকে একাজে নিয়োগ করতে পারেন না। তাই তিনি আমার কাছে বলপ্রয়োগ করে আমাকে মুক্ত করবার অনুমতি চাইলেন।

এই কথা শুনে আমার ভাল লাগল। কারণ ওপর মহল হতে সিদ্ধান্তের কথা জেনে আমি খুব অশ্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি বলপ্রয়োগে মুক্তি চাই নি, যারা আমাকে অবরোধ করে রেখেছে তারা স্বেচ্ছায় আমাকে মুক্তি দেবে এই চেয়েছিলাম। তাই প্রথম উপায়ে মুক্তির প্রস্তুতি দেখে অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। তারপর যখন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে জানলাম যে উপরের এবিষয় নির্দেশ প্রতিরোধ করবার উপায় আমার হাতে আছে, তখন আমার ইচ্ছা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমি তখন তাঁকে জানালাম বলপ্রয়োগে আমাকে উদ্ধার করার প্রস্তাবে আমার সম্মতি নেই। সুতরাং আমার আপিসে পুলিসবাহিনী নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করবার অনুমতি তিনি পাচ্ছেন না। অফিসারটি অত্যন্ত ভদ্র। তিনি তখন বাহিরে চলে গেলেন।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। প্রায় দশটা বাজে। নূতন দিনে নূতন করে আপিস বসবার সময় হয়ে গেল। এমন সময় দেখি উদ্বাস্তুদের মধ্যে কয়েকজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন

খুব নম্র ভাষায় আমাকে জানালেন, আমাকে অনশনে এ রকম অবরোধ করে রাখতে তাঁরা চান না; সুতরাং তাঁরা অবরোধ তুলে নিচ্ছেন এবং আমি বাড়ি চলে গেলে তাঁরা খুশি হবেন। আমি তখন গাড়ী করে বাড়ি চলে এলাম।

এইভাবে এক অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির ওপর শান্তির পরিবেশে একটি যবনিকাপাত ঘটল। এ ঘটনার পর আমাকে আর কোনদিন কোন অবরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। তা প্রমাণ করে সত্যই উদ্বাস্তু ভাইবোনদের প্রীতি লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু এইভাবে ষোল ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার ফলে আমার শরীর জখম হয়ে পড়েছিল। আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে দুদিন আপিসে আসতে পারি নি।

একটু সুস্থ হয়ে অফিসে যোগ দেবার পর আমার আবার এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুখ্য সচিবের দপ্তর হতে আমার কাছে প্রস্তাব আসে যে ওইদিনের অবরোধের সম্পর্কে আমি যেন পুলিশ কমিশনারের কাছে যারা আমাকে অবরোধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করি। আমি কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ করবার সপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি। মানুষ অত্যাচারিত হলে অনুযোগ করে দুটি কারণে। প্রথম প্রতিহিংসার ইচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্য। সেটা কিন্তু উচ্চস্তরের প্রবৃত্তি নয়। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা নিবারণ করবার জন্য। রাষ্ট্রের যা বিচারের ব্যবস্থা তা এই দ্বিতীয় নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু কোনটিই এখানে প্রযোজ্য নয়। কাদের বিরুদ্ধে এখানে প্রতিহিংসা নেব? যারা ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সর্বহারা হয়ে একটা সুবিধা যোগাড় করে নেবার চেষ্টায় আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, তাদের নির্যাতন করে কি কোন তৃপ্তি আছে? দ্বিতীয়ত, নিবারক নীতিও এখানে প্রযোজ্য নয়; কারণ এখানে যারা অবরোধ করেছিল তাদেরই মধ্যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠায়, আমার ওপর মমতা বশত আমাকে নিজেরাই মুক্ত করে দিয়েছে, তাদের এই দৃষ্টান্তই কি আরও প্রবল নিবারক শক্তি হিসাবে কাজ করবে না? সুতরাং আমি সে প্রস্তাবে সম্মতি দিই নি।

এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাকে অন্যভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই অভিজ্ঞতার পর আমার সরকারী কাজে ইস্তফা দেবার একটা দুর্বার ইচ্ছা জেগেছিল। তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত আমার অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের একটা অবলম্বন ছিল বই লেখা। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ওপর একখানি বই লিখেছিলাম। তার পাঠক মহলে সমাদর লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আরও লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উদ্বাস্তু বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর আমার ভাগ্যে অবসর সময় একেবারেই জুটত না। কাজেই বছরের পর বছর ধরে লেখার সুযোগ হতে একেবারে

বঞ্চিত হয়ে মনে একটা অবসাদের ভাব ফুটে উঠেছিল। এই লেখার আকর্ষণে বর্তমান দায়িত্ব যে শৃঙ্খলে আমাকে বদ্ধ করেছে তা হতে মুক্তি লাভের একটা আকুতি ক্রমেই সবল হয়ে উঠছিল।

দ্বিতীয়ত যে পরিবেশে তখন কাজ করছিলাম তাতে আমি খুব স্বস্তিবোধ করছিলাম না। পূর্বে এর থেকে কঠোর দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তখন ডাঃ রায় আমার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কাছে নিজের মনের মত কাজ করবার স্বাধীনতা পেতাম। বর্তমান পরিবেশে তা ঠিক পাচ্ছিলাম না। আমার মন যেভাবে কাজ করতে চায় তা করবার স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে আমার ছিল না। বর্তমান মন্ত্রী মহোদয়ার সহিত সকল বিষয় আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে আমার কোন অনুযোগ ছিল না। আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার খুবই সৌজন্যপূর্ণ ছিল।

এই পরিস্থিতি আমার মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই বোধ হয় আমাকে অবরোধের ব্যাপারটা আমার মনে সরকারী কাজ হতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছাকে অত্যন্ত তীব্র করে তুলেছিল। উদ্বাস্তু ভাইবোনদের ওপর সত্যই আমার কোন রাগ ছিল না; তবু স্বীকার করতে হয়, তাদের ওপর আমার দারুণ অভিমান-বোধ জেগেছিল। যাদের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম করছি, যাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিজের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করেছি, তাদের কাছ হতে এ ধরনের আচরণ আমার অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই যখন তা সত্যই ঘটল, আমার অভিমান-বোধ আমাকে প্রণোদিত করল সরকারী কাজে ইস্তফা দিতে। আমার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং আমার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা করে আমি যখন আমার পত্নীর এ বিষয় সম্মতি চাইলাম, তিনি বিনা দ্বিধায় সে সম্মতি দিলেন। কাজেই আমি সংকল্প করলাম সরকারের কাজে আমার পদত্যাগ-পত্র পেশ করব।

১৮ই জুন তারিখের ঘটনার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে পরের দুদিন আপিসে যেতে পারি নি। ২৩শে জুন তারিখে আমি আবার আপিসে যাবার সময় সঙ্গে পদত্যাগ পত্র নিয়ে গেলাম এবং মুখ্যসচিবের আপিসে সেটা দাখিল করে তবে আপিসের কাজে যোগ দিলাম। আমি তাতে প্রস্তাব করেছিলাম তিন মাস পরে অর্থাৎ ১লা অকটোবর হতে আমাকে সরকারী কাজ হতে মুক্ত করার ব্যবস্থা হক। যেহেতু আমি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকুরী করি এবং আমার চাকুরীর শর্ত একটি চুক্তিপত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আমার পদত্যাগ-পত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্তব্যসহ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চূড়ান্ত আদেশের জন্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি এলে তবেই আমার পদত্যাগ কার্যকর হবে। তার জন্য কিছু সময় দরকার। সেই বিবেচনায় আমি তিন মাস সময় দিয়েছিলাম।

আমি অবশ্য আমার পদত্যাগের পত্র গোপনেই আপিসে দাখিল করেছিলাম। তা সত্ত্বেও আমি যে পদত্যাগ করেছি সে খবর গুজবের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার ফলে আমার অনেক সময় বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। পরের দিনই যখন আপিসে কাজ করছি, কলিকাতার এক বিশিষ্ট ইংরাজি দৈনিকের প্রতিনিধি এসে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে বেশ অসুবিধায় ফেললেন। তিনি সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আমি চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়েছি কিনা। আমি যখন সে বিষয় কিছু উত্তর দিতে অস্বীকার করলাম, তিনি সোজা বলে বসলেন, আপনার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছেন কিনা, তিনি বললেন দেন নি ; এখন আপনি কি বলেন ?

আমি তো সেই কথা শুনে বেশ মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এমনও হতে পারে আমার মন্ত্রীর কাছে এ সংবাদ এখনও পৌছয় নি, বা তিনি সত্যই কোন মন্তব্য করেন নি, আমাকে উত্তেজিত করে কথা বার করবার উদ্দেশ্যে আমাকে এমন কথা বলা হয়েছে। আমি তাই ভাবলাম, এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই ভাল। তাই উত্তরে বললাম, আমি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে প্রস্তুত নই। তা হতে আপনি যা খুশি অনুমান করে নিতে পারেন।

এদিকে এই গুজব ছড়িয়ে যাবার ফলে অনেক উদ্বাস্তুদরদী বন্ধু এবং অনেক উদ্বাস্তু নেতা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে আমাকে অনুরোধ জানালেন। তারপর শুনেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেক টেলিগ্রাম ও চিঠি গিয়েছিল এই অনুরোধ জানিয়ে যে আমার পদত্যাগপত্র যেন না গ্রহণ করা হয়। যাঁরা তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ তার কপিও আমাকে অবগতির জন্য পাঠিয়েছিলেন। এইসব দেখে আমি আশ্চর্য হই নি, কারণ আমি জানতাম উদ্বাস্তু ভাইদের স্নেহ পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং এগুলি তারই পরিচয়।

কিন্তু অনুরূপ অনুরোধ যখন এক বিশেষ মহল হতে এসেছিল, আমি সত্যই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ তা ছিল আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই সময় রাজভবন হতে রাজ্যপালের কাছে আমি একদিন রাত্রে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ পেলাম। তখন রাজ্যপাল ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার পিতার মত তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বেশ পরিচয় ছিল। পিতার সম্বন্ধে আমাকে তিনি চিনতেন এবং সেই কারণে স্নেহও করতেন। কোন উপলক্ষ্য নেই অথচ ডাকলেন সম্ভবত সেই কারণেই, আমি এই ধারণাই করেছিলাম। কিন্তু সেদিন রাতে নৈশভোজের শেষে সে ধারণা আমার বদলে গিয়েছিল। নৈশ আহার সমাপ্তির পর একটা রীতি আছে বিদায় নেবার আগে বসবার ঘরে খানিকটা সময় যাপন করতে হয়। আহারান্তে সেখানে তাই ফিরে এসেছিলাম। আরও দু-চার জন অতিথিও ছিলেন কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অল্প। কিছুক্ষণ পরে ডঃ মুখার্জি সেই প্রশস্ত ঘরের এক প্রান্তে

কথোপকথনের জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। কিছু আলাপ আলোচনার পর, তিনি একটি ছোট কথা বললেন আমার পদত্যাগপত্রকে উপলক্ষ্য করে। তিনি বললেন, তুমি পদত্যাগ কোরো না, এবং সেই সঙ্গে ইংরাজিতে বললেন, 'ডোণ্ট লীভ দ্য লেডি ইন দ্য লার্চ'। নাম করে না বললেও কি বলতে চেয়েছেন তার ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। কাজেই আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু তাঁর এই অনুরোধ আমাকে যেমন আশ্চর্য করল, তেমন বিব্রত করল।

এরপর এ বিষয় আমার মন্ত্রীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার জন্য তিনি নিজেই আমার সুযোগ করে দিলেন। তিনি একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের পর যা বুঝলাম তিনি আমার চাকুরি ত্যাগের ইচ্ছায় বাধা দিতে চান না, তবে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে তাঁর বিবেচনায় আমার আরও কয়েক মাস এই বিভাগে কাজ করা উচিত। সুতরাং এই ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে আমার এই বোঝাপড়া হল যে আমার চাকুরি ত্যাগের পত্র আমি প্রত্যাহার করব না; তবে তা কার্যকর হবে পয়লা অকটোবর হতে নয়, পরের বছর পয়লা এপ্রিল হতে, অর্থাৎ আমার মুক্তি আরও ছয় মাস পিছিয়ে যাবে। তিনি আমাকে কথা দিলেন যে মার্চের শেষে যাতে আমি ভারত সরকারের কাছ হতে চাকুরি ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি পাই তার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। এইভাবে এই ব্যাপারের ওপর তখনকার মত যবনিকাপাত হল।

(৪)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আবার কলিকাতায় এলেন। কলিকাতার উপর মহলের সহিত আলাপ আলোচনা ছাড়া তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পুনর্বাসনের কাজ কেমন চলছে দেখা। সুতরাং আমরা পাঁচ দিনব্যাপী তাঁর এক ভ্রমণসূচী রচনা করলাম। ব্যবস্থা হল প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমরা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে যাব এবং দুপুরের পর ফিরে আসব যাতে তিনি কলিকাতাতেই মধ্যাহ্নভোজন করতে পারেন। আমরা কলোনি নির্বাচন করেছিলাম এমনভাবে যাতে সরকার কর্তৃক স্থাপিত কলোনি ছাড়া যেখানে বেসরকারী চেষ্টায় ভাল কাজ হয়েছে তাও তিনি দেখতে পারেন। যেখানে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কলোনি এখনও গড়ে ওঠে নি, কিন্তু উদ্বাস্তুদের হাতেই প্রাথমিক উন্নয়ন কার্য চলেছে সেখানে নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা করেছিলাম।

৮ই জুলাই ১৯৫৪ তারিখে এই দীর্ঘ ভ্রমণতালিকা অনুসারে পরিদর্শন আরম্ভ হল। তাঁর সঙ্গে থাকতেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতা শাখার উপসচিব শ্রীরাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হতে থাকতাম আমি। কোথাও কোথাও আমাদের উপমন্ত্রী দুজনের একজন সঙ্গে যেতেন। কোথাও বা স্বয়ং মন্ত্রী সঙ্গে থাকতেন।

এইদিন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল উত্তরভাগে। বারুইপুর পার হয়ে যে রাস্তা রেল লাইন ডিঙিয়ে পুর্বে ক্যানিং-এর দিকে চলে গেছে তার ওপরেই উত্তরভাগ অবস্থিত। এখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোনারপুর অঞ্চলের প্লাবিত এলাকাকে জলমুক্ত করবার জন্য বিদ্যুৎ পরিচালিত পাম্প স্থাপন করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার ফলে ২৩,০০০ একর জমি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এবিষয়ে পুর্বেই আলোচনা হয়েছে। তার কিছু অংশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ব্যবহার করা হবে সরকার এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তারই অনুসরণে এই অঞ্চলে ভূমি সংগ্রহ আইন প্রয়োগ করে আমাদের বিভাগ হতে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেখানে কয়েকশত কৃষিজীবী উদ্বাস্তুকে আশ্রয় শিবির হতে নিয়ে গিয়ে বসান হয়েছিল। উদ্দেশ্য তাদের সাহায্যেই তাদের কলোনি গঠন করে সেখানে তাদের স্থায়িভাবে পুনর্বাসন দেওয়া।

শ্রীজৈন সেখানে গিয়ে উদ্বাস্তু পরিবারদের সহিত আলাপ করেছিলেন। তাদের কলোনির যে নকসা রচনা করা হয়েছিল তাও সরজমিনে দেখলেন। এখানে একটা জিনিস স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ অঞ্চলটি দীর্ঘ পনর বছর ধরে পিয়ালী নদী মজে যাবার ফলে জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ জায়গাটি একটি প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হয়েছিল। সম্প্রতি জল নিষ্কাশনের ফলে তা আবার শস্য উৎপাদনের যোগ্য ডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। তার মাটি তাই সাধারণ মাটির মত নয়, বেশ কালো, যেমন মজে যাওয়া পুকুরের তলার পাঁক মাটি হয়ে থাকে। এখন এই মাটিতে উত্তাপ লাগালে তা কয়লার মত জ্বলে। যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে এসেছিল তারা সেটা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং সেই মাটি দিয়ে উনুন ধরিয়ে তাতে রান্না করার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং এখানকার মাটির গুণে তাদের জ্বালানি কাঠের সমস্যার বেশ সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে দীর্ঘকাল জলে প্লাবিত থাকায় নানা জৈব পদার্থের স্তর পড়ায় তার মাটি এই রকম দাহিকা শক্তি লাভ করেছে।

পরের দিন আমরা তাঁকে নন্দননগর এবং নববারাকপুর কলোনি দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুটি দুই ধরনের কলোনি। দুটিই কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত এবং দুটিই অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য নববারাকপুর কলোনির কিছু অধিবাসী কৃষিজীবী হওয়ায় তাদের জন্য সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু ধান উৎপাদনের জমি সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাতে এই কলোনির উপনগরী রূপ ক্ষুন্ন হয় নি। কয়েক হাজার পরিবারের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যার মানুষ মাত্র কৃষিজীবী।

তবু এরা দুই ধরনের এই জন্য বলছিলাম যে মূলত উভয়েই নগর পরিকল্পনা হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেকগুলি পার্থক্য আছে। নন্দননগর কলোনি

সরকারের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে নববারাকপুর কলোনি উদ্বাস্তু নেতাদের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। নন্দননগরে প্রধানত আশ্রয় শিবির-বাসীরা পুনর্বাসন পেয়েছে। নববারাকপুরে প্রধানত যারা আশ্রয় শিবিরবাসী নয় তারা পুনর্বাসন পেয়েছে। তবে তাদের মধ্যে এক হাজার আশ্রয় শিবিরবাসী পরিবারেরও স্থান মিলে গেছে। অধিকন্তু নন্দননগর কলোনি এক বিষয়ে অনন্যসাধারণ। তার দক্ষিণ অংশ সমতল ডাঙ্গা জমি কিন্তু উত্তর অংশের বেশির ভাগ জমিই লম্বা লম্বা বিলে পরিণত হয়েছে। মাটি কাটা যন্ত্র ব্যবহার করে তার কতকগুলিকে গভীর করে কেটে অন্যগুলিকে সেখান হতে লব্ধ মাটি দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা চলেছে।

শ্রীজৈন প্রথমে নন্দননগর কলোনিতে গেলেন, কারণ সেটি কলিকাতার নিকটতর। তখন অনেক উদ্বাস্তু পরিবার গৃহনির্মাণ ঋণ পেয়ে বাড়ি তুলে ফেলেছে। তাদের তোলা অনেক বাড়ি তিনি দেখলেন। ঠিক বলতে কি কে কার বাড়ি তাঁকে দেখাবে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। কাজেই অনেক বাড়িতে তাঁকে যেতে হয়েছিল। একটি বাড়ির গৃহিণী তো তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে স্বাগত জানাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বাড়িতে ঢুকলে শাঁখ বেজেছিল, তাঁর গলায় মালা পরান হয়েছিল। যারা বাস্তুচ্যুত হয় তারা নূতন করে ঘর বানাতে পারলে মনে কতখানি তৃপ্তি বোধ করে তার প্রমাণ এই পরিবারগুলির এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। এখানে আমেরিকার ছাত্রদের দল যে স্কুলঘরটি বানিয়েছিল তা তিনি দেখলেন। এখানে স্বাগত সম্ভাষণ পেয়ে এবং ছাত্রদের এই কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত দেখে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে এই বিদ্যালয়ের গৃহকে সম্প্রসারণ করবার জন্য তিনি দশ হাজার টাকা অনুদানের সিদ্ধান্ত সেখানেই ঘোষণা করে দিলেন।

এরপর তিনি গেলেন নববারাকপুর কলোনিতে। তার বিরাটত্ব সত্যই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য দিল্লী অঞ্চলে বড় বড় কলোনি গড়ে উঠেছে, যেমন প্যাটেল নগর, লাজপত নগর, রাজেন্দ্র নগর প্রভৃতি। সেখানে সুন্দর পাকা রাস্তা, বড় হাসপাতাল, প্রশস্ত বিদ্যালয় গৃহ এবং অসংখ্য এক ধরনের বাড়ি পরিপাটি করে সাজান। কিন্তু এসবই গড়ে উঠেছে সরকারের চেষ্টায় এবং সরকারের সাহায্যপুষ্ট হয়ে। কিন্তু এই কলোনিটি গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায়। অবশ্য কলোনি গড়ে ওঠার পর ব্যক্তিগতভাবে ঋণ হিসাবে সাহায্য এসেছে বা সমষ্টিগতভাবে জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য সরকারী অনুদান এসেছে। তবে তার ফলে উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে ওঠায় যে একটি বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে তা ক্ষুণ্ন হয় নি। একথা সত্য যে তার রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা এবং পাথর দিয়ে বাঁধান নয়, তার বাড়ি-

গুলো ছোট ছোট, কারণ নিজেদের সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে প্রধানত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তা নির্মাণ করেছে। তবু তা সরকারের সাহায্যপুষ্ট দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থাপিত কলোনিগুলি হতে বেশি অভিনন্দনীয়। কারণ আত্মনির্ভরশীলতার তা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত, তা উদ্বাস্তুদের সামবায়িক শক্তির ওপর নির্ভর করে এমন বিরাট কলোনিরূপে গড়ে উঠেছে।

সুতরাং এই কলোনিটি দেখেও শ্রীজৈন মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। সহস্র সহস্র উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দান করে তা মহিমান্বিত। তার ইতিহাসের কথাও ভারি রোমাঞ্চকর। একটি সমগ্র ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান হতে স্থানান্তরিত হবার দৃষ্টান্ত বিরল। এমনকি স্থানীয় বিগ্রহটিও নূতন আবাসে সসম্মানে নিজস্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখানকার মানুষ শ্রীজৈনকে স্বাগত জানাল যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে। সেখানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল এবং স্বাগত জ্ঞাপন করা হল। তিনি যে তাদের আত্মনির্ভরশীল হবার দৃষ্টান্ত দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন তা তাঁর ভাষণে জানিয়ে গিয়েছিলেন।

পরের দিন তিনি দেখতে গিয়েছিলেন বাগজোলা ও কৃষ্ণপুর কলোনি। বাগজোলাতে কোন কলোনি ছিল না। সেখানে কয়েক শত উদ্বাস্তু পরিবারকে স্থাপন করা হয়েছিল খাল কাটার কাজে। সুতরাং যেখানে মাটিকাটার কাজ চলছিল তারই সংলগ্ন স্থানে তারা তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ে বাস করছিল। এখানকার পরিকল্পনার কথা আগেই বলা হয়ে গিয়েছে। এ অঞ্চল জলে স্থায়িভাবে নিমগ্ন থাকে বলে এখানে একটা জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল খালকাটার কাজে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাগজোলা হতে খাল শুরু হয়ে ঘুনি ও যাত্রাগাছির ভিতর দিয়ে গিয়ে তা কুলটি নদীতে পড়বে। ফলে সমগ্র নিমজ্জিত এলাকা জল হতে মুক্ত হয়ে কৃষির যোগ্য হবে। এখানে এই প্রতিশ্রুতিতে উদ্বাস্তুদের মাটিকাটার কাজে লাগান হয়েছিল, তাদের পরিশ্রমের ফলে যে জমি উদ্ধার হবে তার এক অংশ এদেরই পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হবে। সুতরাং ওখানে যারা মাটিকাটার কাজ করছিল তারা খুব উৎসাহভরেই কাজ করছিল।

বাগজোলার মুখেই কৃষ্ণপুর কলোনি। সুতরাং বাগজোলা পরিদর্শনের পর তিনি কলোনিটি পরিদর্শন করতে এলেন। তার বিষয়েও পূর্বে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধ কলোনির মধ্যে তা অন্যতম। সুবিন্যস্ত পাকা পথ এবং সুন্দর বাড়িগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আরও মুগ্ধ করেছিল প্রশস্ত দীঘিগুলি। তাদের কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল সত্যই নয়নকে স্নিগ্ধ করে। এমন সুন্দর দীঘি দিয়ে ভূষিত কলোনি পশ্চিম বাঙলায় আমি আর কোথাও দেখি নি। তিনি তাই বলেছিলেন যে দিল্লী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কলোনিগুলির সহিত তা প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা রাখে। অতিরিক্তভাবে একথাও বলা যেতে

পারে যে দিল্লীর কলোনিগুলি সরকারী সাহায্যপুষ্ট কিন্তু এই কলোনিটি সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মনির্ভরশীল।

পরের দিন শ্রীজৈনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে সরকারের চেষ্টায় গৃহীত জমির ওপর যে কলোনিগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি দেখাতে। তার কিছু অবস্থিত ছিল টালিগঞ্জের দক্ষিণ অংশে আর কিছু ছিল বেহালা মিউনিসিপালিটির সংলগ্ন এলাকায়। জমিগুলি আকারে ছোট ছোট। জবরদখল হয় নি এমন খালি জমি ভূমি সংগ্রহ আইন অনুসারে দখল নিয়ে এই কলোনিগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। এগুলি এত ছোট যে একশ' হতে দু'শ' পরিবারের বেশি কোথাও স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। তাই যারা আশ্রয় শিবিরবাসী নয় অথচ কলিকাতার ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল এমন উদ্বাস্তু পরিবারদের এখানে জমি বিলি করা হয়েছিল। পাকিস্তানে জমি বাড়ি ছেড়ে এসেছে বা জবরদখল কলোনি ছেড়ে এসেছে এমন পরিবারও সেখানে স্থান পেয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট নেতাও এখানে জায়গা পেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ডাঃ জীবনরতন ধরের নাম করা যেতে পারে।

আমরা প্রথমে রায়পুরে গিয়েছিলাম। গড়িয়াহাট রোড ধরে দক্ষিণে গড়িয়ার দিকে যেতে বৈষ্ণবঘাটার কাছে রাস্তার পূর্বদিকে এই কলোনিটি অবস্থিত। ছোট কলোনি, কয়েক ডজন মাত্র পরিবার এখানে জমি পেয়েছিল। এখানে বিশেষ কিছু দেখবার ছিল না।

এখান থেকে দক্ষিণে খানিকটা গেলে রাস্তাটি দুভাগ হয়ে গেছে তার একটি টালির নালা পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, আর অন্যটি পশ্চিম দিকে ঘুরে টালির নালার পাশ দিয়ে চলে গেছে। তার আগের নাম ছিল বাঁশধানি রোড, নতুন নাম হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড। এই পথেই কিছুদূর এগিয়ে নাকতলা কলোনি, রাস্তার উত্তর-দক্ষিণ দুই পাশ জুড়ে অবস্থিত। এখানে একটি সুন্দর বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। একটি কোণে কিছু উদ্বৃত্ত জমি ছিল। সেখানে কলোনির অধিবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি ক্লাব নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আগমনের সুযোগ নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে দিয়ে তার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে তা একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে।

এখান হতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালা অঞ্চলে। ট্রামলাইন যেখানে শেষ হয়েছে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে আরও দক্ষিণে খানিকটা চলে গেলে একটি বড় রাস্তা পাওয়া যায় যা পশ্চিমে বজবজের দিকে চলে গেছে। তার নাম বীরেন রায় রোড। এই রাস্তার সংলগ্ন অংশে জমি সংগ্রহ করে কয়েকটি কলোনি গড়ে উঠেছিল। তাদের একটি পশ্চিম বড়িষায় বড় রাস্তার ধারেই অবস্থিত। অপরটি একটু দূরে বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত। দুইটি ছোট

কলোনি। তিনি এ দুটিও সেদিন পরিদর্শন করেন। বলা বাহুল্য কলোনি-বাসীরা তাঁকে উপযুক্ত সমাদর সহকারে গ্রহণ করেছিল।

পরের দিন ১২ই জুলাই ১৯৫৪ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়কে রিষড়া ও কাপাসডাঙ্গা কলোনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুটি কলোনিই ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত। এই দুই জায়গায় আশ্রয় শিবিরবাসী অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের বসান হয়েছিল। শিল্পাঞ্চল হওয়ায় আশা করা গিয়েছিল যে এখানে জীবিকার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে। রিষড়া কলোনি কলিকাতার নিকটতর। কাপাসডাঙ্গা কলোনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে নৈহাটির রেলব্রীজ ছাড়িয়ে পূর্বদিকে অবস্থিত। অর্থাৎ তা হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় লাগোয়া উত্তরে এবং ব্যাণ্ডেল স্টেশনের অতি নিকটে অবস্থিত।

রিষড়ার উদ্বাস্তরা মন্ত্রী মহাশয়কে বেশ আন্তরিকতার সহিত স্বাগত জানিয়েছিল। এ জায়গাটি রেল লাইনের পশ্চিম প্রান্তে শিল্প এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। কাছেই রিষড়ার বস্ত্র উৎপাদনের কল। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জায়গাটি পছন্দ হয়েছিল। এখানে তাদের আনা হয় জমি দখল পাবার পরেই। এই জমিকে পুনর্বাসনের উপযুক্ত করতে যথেষ্ট মাটির কাজের প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই এখানে ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প খুলে উদ্বাস্তুদের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে তার উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। এই মাটির কাজে যে যত পরিমাণে কাজ করতে পারবে তত পারিশ্রমিক উপার্জন করবে। এখানকার উদ্বাস্তরা এই প্রতিযোগিতায় এত মেতে গিয়েছিল যে রাত্রেও জ্যোৎস্নার আলোয় তারা মাটি কেটে অতিরিক্ত উপার্জন করত। মন্ত্রী মহাশয় যখন যান, তখন উন্নয়ন কার্য শেষ হয়ে বাড়ি উঠে গেছে। উদ্বাস্তুদের মনে একটি নূতন আশা জেগেছে। তাই মন্ত্রী মহাশয়কে উৎসাহভরে স্বাগত জানান তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল'

কাপাসডাঙ্গা কলোনিতে কিন্তু তিনি ভালভাবে অভিনন্দিত হন নি। কলোনিটি তুলনায় বড়। নগর পরিকল্পনা হিসাবে তার উন্নয়নের ব্যবস্থা ছিল। এখানেও নিকটে বড় বড় কারখানা থাকায় কাজের অসুবিধা ছিল না। তবু এখানকার মানুষের মনে তেমন উৎসাহ ছিল না। তার একটা কারণ ছিল। এখানে যে পরিবারগুলির পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের একটি মোটা অংশ আগে পুনর্বাসন পেয়েছিল। সেখানে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত না করতে পেরে তারা কলোনি ত্যাগ করেছিল। অনেকে আবার বাঙলার বাহিরে অবস্থিত আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে চলে এসেছিল। কাজেই তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা তিক্ত ছিল। ফলে তাদের মনে উৎসাহ ছিল না এবং একবার পুনর্বাসনে সাফল্যলাভ করতে না পারায় এবার সফল হবে কিনা সে বিষয় খুব নিশ্চিত ছিল না। এই সব কারণেই মনে হয় তাদের মন স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

ফলে মন্ত্রী মহাশয়ের পরিদর্শনের সময় স্থানীয় নেতারা তাঁকে নানা তিক্ত কথা বলেছিল। আমরা তার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না এবং বেশ লজ্জিত বোধ করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এটি ব্যতিক্রম, আর কোথাও তাঁর সহিত কলোনিবাসীরা অশিষ্ট আচরণ করেছে বলে মনে পড়ে না। কলোনি পরিদর্শন করতে করতে একস্থানে এইভাবে তিনি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তর্কে জড়িত হয়ে পড়লে আমি এবং আমার সঙ্গী কর্মচারিগণ তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে সেখানে রয়ে গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ আলোচনার পর তাদের শান্ত করে আমরা যখন মন্ত্রী মহাশয়কে অনুসরণ করলাম তখন একজন স্থানীয় কর্মচারীর মুখে শুনলাম তিনি উপমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আগেই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাদের বলে পাঠিয়েছেন আমরা যেন সুবিধামত তাদের অনুসরণ করি। অনুমান করা যায় যে আরও বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে তাঁরা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটাই বিবেচনার কাজ মনে করেছিলেন। পরে দেখেছিলাম এই অভিজ্ঞতার তিক্ততা তিনি মনে করে রাখেন নি। তাঁর সে উদারতা ছিল এবং থাকাই উচিত।

(৫)

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের কলিকাতা শাখাআপিসের দায়িত্ব নেবার পর আর একটি বিষয়ে খুব আন্তরিকতার সহিত তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। অকৃষিজীবী আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সব থেকে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেবল ব্যবসায় ঋণ দিয়ে সকলের সমস্যার সমাধান হয় না। যার ব্যবসায় বুদ্ধি আছে সে কিছু মূলধন পেলে দোকান দিয়ে হক, মাল বেচাকেনা করে হক জীবিকা নির্বাহ করে নিতে পারে। কিন্তু অনেকেই তা পারে না। তাদের পক্ষে সহজ সমাধান হল চাকুরি। অনেক উদ্বাস্তু যুবক আমাকে বলত, ঋণ চাই না স্যর, একটা চাকুরি জুটিয়ে দিন। কারণ এটাই তাদের দিক হতে অন্নসমস্যা সমাধানের সহজ পথ।

সুতরাং এই পথেই আমরা নানাভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিলাম। সোজাসুজি বড় বড় নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাদের চাকুরি দেবার চেষ্টা হয়েছিল। এ বিষয় সব থেকে বেশি সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের কাছ হতে। বিভিন্ন জায়গায় নানা শ্রেণীর ছোট চাকুরি খালি হলে তাঁরা পশ্চিম বাঙলার আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। ফলে কয়েক হাজার আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুকে রেলের অধীনে কাজ জুটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এই পথেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপিত পরিবহণ বিভাগের কর্মচারী হিসাবে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল। বোঝাপড়া হয়েছিল

এই রকম যে তাঁরা নূতন বাস কেনবার জন্য যে মূলধন নিয়োগ করবেন তা ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং পরিবর্তে তাঁরা পুনর্বাসন বিভাগের মনোনীত উদ্বাস্তুদের কাজ দেবেন। কিন্তু সমস্যা এত বিরাট যে দু'একটি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় তার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই সূত্রে চিন্তা করেই শ্রীখান্না একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। যদি পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করা যায় তাহলে তা চালাবার জন্য যে নূতন কাজ সৃষ্টি হবে তাতে উদ্বাস্তুদের নিয়োগ করার সুবিধা হতে পারে। এতদিন আমরা চেষ্টা করেছি, যে সব প্রতিষ্ঠান চালু আছে তাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাদের কাছে উদ্বাস্তু যুবকদের কাজের জন্য পাঠাতে। তার সাফল্য নির্ভর করে সে বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির সহানুভূতির ওপর। সরকার পরিচালিত সংস্থা হলে সহানুভূতি পাওয়া যায়, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তা পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি ঋণ দিয়ে নূতন কারখানা স্থাপনে বা চালু কারখানার পরিবর্ধনে সাহায্য করা যায় তাহলে তার পরিবর্তে উদ্বাস্তু যুবকদের কাজ দিতে সম্মত হবে। এই আশাকে ভিত্তি করেই এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এর জন্য ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রক এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ঋণ দেবার উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন এবং এইভাবে তা বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এখন তার সাফল্য নির্ভর করছিল পশ্চিম বাঙলার শিল্পীদের পক্ষ হতে সে বিষয় কতখানি সাড়া পাওয়া যাবে তার ওপর। সুতরাং এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করবার আগে এবিষয় তাঁদের সহিত আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। এ প্রস্তাবে ডাঃ রায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে কয়েক সপ্তাহ আপিসে যেতেন না। তবু এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বাড়িতে শিল্পপতিদের নিমন্ত্রণ করে এক সভা ডেকেছিলেন। সেই আলোচনা সভায় অনেক বিশিষ্ট শিল্পপতি যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীখান্না পরিকল্পনাটির বিবরণ দেবার পর তাদের মধ্যে সাধারণভাবে এ বিষয় আলোচনা হয়েছিল। প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষেও লোভনীয়। কাজেই অনেকে এই পরিকল্পনার সমর্থন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এবিষয়ে তাঁরা সহযোগিতা করবেন।

সুতরাং এই আলোচনার ভিত্তিতে রিহ্যাবিলিটেশন ফাইনান্স এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তার কাজ হল শিল্পপতিদের কাছ থেকে শিল্প স্থাপন বা প্রসারের জন্য ঋণের আবেদন গ্রহণ করা এবং তা পরীক্ষা করে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলে ঋণ দেওয়া। শিল্পপতিদের কাজ হল সেই ঋণের

সাহায্যে শিল্প স্থাপন করা এবং তাতে প্রতিশ্রুতিমত পুনর্বাসন বিভাগের মনোনীত উদ্বাস্তুদের কাজ দেওয়া। এই পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীখান্নার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে বা তার সংলগ্ন স্থানে কিছু শিল্পের প্রসার হয়েছিল। যেমন রিষড়ায় কাপড়ের কলের মালিকগণ এই পরিকল্পনা অনুসারে ঋণ নিয়ে তাঁদের কারখানার পরিবর্ধন করে অনেক উদ্বাস্তুকে কাজ দিয়েছিলেন। একটি প্রতিষ্ঠান হাবড়া কল্যাণগড় কলোনিতে ক্যালসিয়াম কারবনেট উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়ে একটি কারখানা খুলে তাতে স্থানীয় উদ্বাস্তুদের নিয়োগ করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকেশ্বরী মিলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসূর্যকুমার বসু দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে হীরাপুর থানায় দামোদর রেল স্টেশনের কাছে একটি নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করেন। মিলের আশে পাশে যে ছোট শিল্পনগরীটি গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয় সূর্যনগর। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও এই কারখানায় অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবারকে চাকুরি দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সে কাজ দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্বাস্তুদের সহিত কর্তৃপক্ষের বিবাদ হওয়ায় অনেকখানি ব্যাহত হয়।

ডাঃ রায় কিন্তু কেবল একটি সভায় শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ করে ক্ষান্ত হন নি। তিনি বিশেষ বিশেষ শিল্পপতিদের কলোনিগুলিতে কারখানা স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত অনুরোধও করেছিলেন। এ বিষয় তাহেরপুর কলোনির প্রয়োজন সব থেকে বেশি অনুভূত হয়েছিল। কারণ অন্য বড় কলোনিতে বেকার সমস্যা এত প্রখর ছিল না। তার প্রধান কারণ এই কলোনিটি কলিকাতার শিল্পাঞ্চল হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের প্রায় কাছে গ্রামাঞ্চলে তার অবস্থিতি। এখানে একটি বড় কারখানা স্থাপিত হলে তাতে অনেক স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়। এই জন্য বিশেষ করে মেট্রোপলিটন কোম্পানির মালিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ওখানে একটি কাপড়ের কল খুলতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি। জীবনবীমা, ছাপাখানা, বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবসায় ও শিল্পের বিস্তার ছিল। শ্রীভট্টাচার্য পিতার উপযুক্ত পুত্র হিসাবে নিজেও শিল্পে বিশেষ উদ্যোগী। ডাঃ রায়ের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারেন নি এবং একটি কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮ই অগাস্ট তারিখে এই বিষয় ব্যক্তিগত ভাবে তদন্ত করবার জন্য তিনি তাহেরপুর যাবেন ঠিক করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল কলোনি দেখে আসা এবং কাপড়ের কল স্থাপন করতে হলে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা। ওইদিন আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সোজা মোটরযোগে সেখানে যখন হাজির হলাম তখন সকাল দশটা।

ওখানে গিয়ে দেখি কলোনির নেতারা উন্নয়নবিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছেন। উন্নয়ন বিভাগ খোলা হয় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের

অকটোবর মাসে। পরিকল্পনা রচনা এবং তার জন্য বরাদ্দ অর্থ বিনিয়োগ ছাড়া তার ওপর একটি নূতন দায়িত্ব পড়েছিল। তা হল গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে গ্রামে প্রবর্তিত করা। জিনিসটি এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। গ্রামের মানুষের মধ্যে উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলে তাদের ব্যক্তিগত ও মিলিত চেষ্টায় তাদের গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন বিধানই তার লক্ষ্য। বাহির হতে সাহায্য করে নয়, তাদের নিজেদের শক্তিকে প্রয়োগ করে এই কাজ সমাধান করতে হবে, এই তার মূল নীতি। তবে সরকারী কর্মচারীও থাকবেন তাদের সাহায্য করতে কিন্তু তাঁদের সাহায্য করবার ক্ষেত্র সীমিত এবং প্রধানত তা বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ দেওয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এঁদের আদর্শ হল 'হেল্পিং পীপল টু হেল্প দেমসেলভ্‌স্‌'।

এই উদ্দেশ্যে এঁরা ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২রা অকটোবর মহাত্মা গান্ধীর শুভ জন্মদিনে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেন। পশ্চিম বাঙলার যে কটি জায়গা এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবার জন্য প্রথম নির্বাচিত হয় তাদের মধ্যে এই অঞ্চলটি অন্যতম। দেশের যে অংশটি এই পরিকল্পনার অধীনে আনা হয় তাকে উন্নয়ন ব্লক বলা হয়। এখানে ফুলিয়াকে কেন্দ্র করে এই ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম হয়েছিল ফুলিয়া ব্লক। ফুলিয়া বিখ্যাত গ্রাম। রামায়ণের কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি। রাণাঘাট হতে কৃষ্ণনগরের দিকে যে জাতীয় সড়ক গেছে তার পূর্বদিকে তা অবস্থিত। রাণাঘাট হতে শান্তিপুরে যে রেললাইন গেছে ও তার পরে ফুলিয়ায় একটি রেল স্টেশন আছে। স্থতরাং যোগাযোগের খুব স্থবিধা আছে।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে যখন পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তু সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করে তখন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দেকে কলিকাতায় সঙ্গে নিয়ে আসেন। তার পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি নিলোখেরি কলোনি স্থাপন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই প্রধান মন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেন পশ্চিম বাঙলায়ও তিনি একটি আদর্শ উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করুন। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য এই ফুলিয়াকে সেই আদর্শ কলোনি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করেন। আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে নির্বাচিত কতকগুলি পরিবার নিয়ে এই কলোনিটি গড়া হয়েছিল। আদর্শ কলোনির যেমন হওয়া উচিত তাকে আত্মনির্ভরশীল করবার চেষ্টাও তেমন হয়েছিল। তার জন্য কিছু কৃষিজীবী পরিবার এবং কিছু তাঁতি পরিবার এখানে আনা হয়েছিল। হস্তশিল্পের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য একটি কুটির শিল্প গড়বার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানকার উদ্বাস্তু কলোনি ভালরকম জমে নি। তাঁতি পরিবারগুলি জীবিকা অর্জনে সফল হয়েছিল কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা সফল হয় নি।

তখন এই ফুলিয়াকেই কেন্দ্র করে একটি পরিকল্পনা গড়ে ওঠায় সেটা ঐ অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের স্বার্থের অনুকূলেই কাজ করবে আশা করা যায়। সুতরাং শ্রীদে যখন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ হতে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার ভার পেলেন তখন এই ধরনের ব্যবস্থা করে ভালই করেছিলেন। তাতে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের সামগ্রিক উন্নয়ন সংঘটিত হবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তাহেরপুরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে আত্মচেতনা ফুটিয়ে তুলে নানা ভাবে তাদের আত্মোন্নয়নের কাজে উন্নয়ন বিভাগের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছেন দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

উন্নয়ন বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত তাহেরপুরের নেতাদের আলাপ আলোচনা শেষ হবার পর আমি তাদের সহিত শ্রীভট্টাচার্যের পরিচয় করিয়ে দিলাম এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে এসেছেন তাও বুঝিয়ে দিলাম। তাঁরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা শুনে খুশি হলেন, কারণ এখানে কাপড়ের কল স্থাপন করা সম্ভব হলে কলোনিবাসীর জীবিকা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। প্রাথমিক আলোচনার পর তাঁকে সমস্ত কলোনি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান হল। কারখানা কোথায় বসান যাবে সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হল। মোটামুটি ঠিক হল কলোনির পশ্চিমপ্রান্তে যে নূতন রাস্তা হয়েছে তার পাশেই কারখানা স্থাপিত হবে। ওই রাস্তাটি কৃষ্ণনগর যাবার জাতীয় সড়কের সহিত তাহের-পুরকে সংযুক্ত করেছে। নূতন উদ্বাস্তু কলোনি ফুলিয়ার মধ্য দিয়ে তা গিয়েছে। সুতরাং এই দুটি বড় কলোনিরও তা সংযোগসাধন করেছে। তাদের পরস্পর দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। কারখানা করতে হলে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। তাই পাশেই একটি বড় দীঘি কাটার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এইভাবে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে সেদিন শ্রীভট্টাচার্য ফিরে এলেন।

এখানে কাপড়ের কল স্থাপনের পরিকল্পনাটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তবে ফুলিয়াতে একটি ছোট কাপড়ের কল উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।

(৬)

নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে কলিকাতার উন্নয়ন সংস্থা ব্যাপকভাবে এই সময় উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তা খোলার পর ওখানে কিছু নূতন জমি তৈরি হয়। তার একটিতে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা ছোট ছোট দোকান খুলে নানা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছিল। এখন এই নূতন জমিটি ট্রাস্টের প্রয়োজন হওয়ায় যারা এই জমি দখল করেছিল তাদের ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ তা খালি করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই নিয়ে এদের স্থানীয় নেতা আমার সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন যে যারা এখানে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করছে তাদের

যেন উৎখাত না করা হয়। তাঁদের এই অনুরোধের সপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি আছে তা বেশ বোঝা যায়। যারা বাস্তুত্যাগ করে চলে এসেছে এবং একটা জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে যাদের অনশনে দিন কাটাতে হবে তাদের এই জমি হতে সরিয়ে দিলে তাদের জীবিকাচ্যুত করা হয়। সুতরাং কাছাকাছি জায়গায় বিকল্প জমির ব্যবস্থা না করে তাদের সরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

কিন্তু আমার মুস্কিল ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয় সাহায্য করবার আমার কোন ক্ষমতা নেই। ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ দিয়েছেন, জমির মালিক তাঁরা। সরকার এখানে বাহির হতে কোনো নির্দেশ আরোপ করবার ক্ষমতা রাখেন না। আমি যেটুকু করতে পারি তা হল ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে এই বলে অনুরোধ করা যে পারলে তাদের এই স্থানেই দোকান চালাতে দেওয়া হোক এবং যদি তা একান্তই না সম্ভব হয়, পরিবর্তে দোকান করবার জন্য তাদের জায়গা দিয়ে তারপর উৎখাত করা হোক। আমি তাঁদের সে কথা বললে তাঁরা সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমি তখন ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে পত্র দিলাম। এর পর দু-তিন মাস কেটে গেছে এ বিষয় আর কিছু শুনি নি। সুতরাং ধরে নিয়েছিলাম এ বিষয়ে একটা মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা নূতন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি জানলাম যে বিষয়টির মীমাংসা তো হয়ই নি বরং তা নিয়ে ব্যাপারটা বেশ অনেক দূর গড়িয়ে এখানে যারা দোকান খুলেছিল তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ একদিন সকালে দেখি একদল উদ্বাস্তু শোভাযাত্রা করে আমাদের পাড়ায় নানা ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। আমি তখন বুঝতে পারি নি তাদের লক্ষ্যস্থল আমাদেরই বাড়ি এবং আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমার বাড়ির কাছে তারা সমবেত হলে তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি বাড়িতে যেখানে বসে আপিসের কাজ করতাম সেখানে তাঁদের ডাকলাম। আমার কিন্তু সেদিন ওঁদের আচরণে রাগ হয়ে গিয়েছিল। তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত এ বিষয় সোজাসুজি সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই এবং যেটুকু সাহায্য করবার তা করেছি। এইভাবে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা অসঙ্গত। তাঁদের যাওয়া উচিত ছিল ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষের নিকট। দ্বিতীয়, আমি যেহেতু উদ্বাস্তু ভাইদের সেবা করবার ভার নিয়েছি, আমাকে অবরোধ করে বা অন্যভাবে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবার অধিকার তাদের থাকলেও আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে শোভাযাত্রা করে এসে আমার প্রতিবেশীদের ওপর উৎপাত করা তাঁদের উচিত হয় নি। দ্বিতীয় কারণটিই আমাকে বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল।

যাঁরা তাদের নেতা হয়ে আমার কছে এসেছিলেন তাঁদের প্রধান ছিলেন শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। আগে কোন দিন দেখা হয় নি; এইখানেই এই অদ্ভুত

পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ব্যাপারটা শুনে আমি তাঁদের কাছে উত্তেজিতভাবেই প্রতিবাদ জানালাম। বললাম যে, আমাকে তাঁরা যত পারেন উৎপীড়ন করুন; কিন্তু আমার প্রতিবেশীদের উত্ত্যক্ত করা তাঁদের মোটেই উচিত হয় নি। আমার আপিসে তাঁরা আসলেই ভাল হত।

আমার এই উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ স্বভাবতই শ্রীচক্রবর্তীর ভাল লাগে নি। তিনিও উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে যা বললেন তার মর্ম হল এই যে আমার এত রাগ দেখানো মোটেই সাজে না। লেক ব্যারাকে ঝড়ে ছাদ ভেঙে উদ্বাস্তুরা মারা যাবার পরেও যে আমার ঘাড়ে মাথা আছে তা আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।

বাস্তবিকই মাস দুই আগে কালবৈশাখীর ঝড়ে লেক ব্যারাকের এক অংশের চাল ভেঙে পড়ে একটা মানুষ আহত হয়েছিল এবং পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল।

একথা শুনে আমিও প্রতিবাদ করে বসলাম এই বলে: আমি যে উদ্বাস্তুদের হাতে খুন হই নি, সেটা আমার সৌভাগ্য বলা যায় কিনা তা বলা শক্ত। তাদের সেবায় যে দুর্ভোগ আমার ভুগতে হচ্ছে মৃত্যু ঘটলে আমি তার থেকে নিশ্চিত মুক্তি পেতাম।

মানুষের মন কখন কিভাবে কাজ করে বলা যায় না। আমার উত্তর শুনে তিনি হেসে ফেললেন। আমি হেসে ফেললাম। ফলে উত্তেজনা কেটে গিয়ে পরিবেশ হাল্কা হয়ে এল। আলোচনার পর ঠিক হল আমি যেটুকু করতে পারি, সেইটুকুই করলে চলবে, অর্থাৎ ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষকে আমি অনুরোধ করব বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের যেন উৎখাত করা না হয়। এর পরে আর আমার পাড়ায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে শোভাযাত্রা হয় নি।

সেদিনকার এই উত্তেজনার পরিবেশে আলাপের পর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে একটি স্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারপর যতবার দেখা হয়েছে কুশল প্রশ্ন করে প্রীতির বিনিময় ঘটেছে। এমন কি উদ্বাস্তু বিভাগ ত্যাগ করে চলে আসবার বহু বৎসর পরেও তাঁর সহিত দেখা হলে উভয়েই বেশ আনন্দ পাই।

(৭)

নদীয়া জেলার শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর নদীয়া জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর যখন ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ হতে উদ্বাস্তুদের বন্যা এই জেলাকে প্লাবিত করল তখন তিনি তাদের সেবাকে অগ্রাধিকার দিলেন। ঠিকমত বলতে কি নদীয়া জেলায়

পুনর্বাসন সমস্যা যেমন জটিল রূপ ধারণ করেছিল তেমন আর কোথাও করে নি। তার প্রধান কারণ নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তু পরিবারকে পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে এবং এখান হতে যারা পূর্ববঙ্গে চলে গেছে তাদের এখানে ফিরে আসতে উৎসাহিত করা হবে ; যে ফিরে আসবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। সরকারের এই দায়িত্বই ওই জটিলতা সৃষ্টির কারণ।

নদীয়া জেলা হতে ব্যাপক হারে মুসলমান পরিবারগুলি বাস্তুত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল। অপর পক্ষে পূর্ববঙ্গ হতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এই জেলায় চলে এসেছিল। তাদের অনেকে আশ্রয় শিবিরে সাময়িকভাবে স্থান পেয়েছিল, অনেকে সরকার স্থাপিত কলোনিতে বা নিজেদের স্থাপিত কলোনিতে জায়গা করে নিয়েছিল। তার ওপর আবার উদ্বাস্তুদের এক বিরাট অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত জমি দখল করে আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করেছিল। তারপর শান্তি স্থাপিত হলে যখন অনেক মুসলমান পরিবার ফিরে আসতে আরম্ভ করে, তখন তাদের জমি পুনরুদ্ধার করে দেওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এবিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর কর্তব্য ঠিকমত পালন করছেন না, এই ধরনের অনুযোগও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছিল। সেই সম্পর্কে স্বয়ং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী তদন্ত করতে এসেছিলেন। এবিষয় আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে। তারপর একবছর কেটে গেছে।

সাধারণভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যায় নজর দেওয়া ছাড়া শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সবিশেষ সমস্যার প্রতিও মন দিয়েছিলেন। যাতে দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থ যথাসম্ভব সংরক্ষিত হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। একাজে তিনি একরকম সফল হয়েছিলেন ; তাই পুনর্বাসন বিভাগের সচিব হিসাবে আমাকে তাঁর কাজ স্বচক্ষে দেখাবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। সেই জন্য আমাকে তিনি নদীয়ার সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

নদীয়া জেলায় যাবার নিমন্ত্রণ আরও একপক্ষ হতে এসেছিল। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ পুনর্বাসন বিভাগের স্থায়ী শিবিরগুলির তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছিলেন। এই শিবিরগুলিতে পঙ্গু, বৃদ্ধ বা অসমর্থ পুরুষরা সপরিবারে আশ্রয় পেত। আর আশ্রয় পেত অভিভাবকহীন বিধবা মেয়েরা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল প্রথম শ্রেণীর স্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলি। তিনি তাঁর দায়িত্ব অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। শুধু গতানুগতিক দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করে তিনি বসে থাকেন নি। এই স্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলিতে যারা থাকে তাদের উন্নততর জীবনের আস্বাদ দেবার জন্য তিনি অতিরিক্তভাবে চেষ্টা করতেন। এই সম্পর্কে তিনি প্রথম নজর দেন ধুবুলিয়ার স্থায়ী আশ্রয়

শিবিরের প্রতি। এখানেই স্থায়ী আশ্রয় শিবিরবাসীর সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশি। সুতরাং তার প্রতি প্রথম নজর দেবার সঙ্গত কারণ ছিল। এখানে তিনি একটি পাঠাগার স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যাতে আশ্রয় শিবিরবাসী মানুষ বই পড়ে জ্ঞান অর্জন এবং চিত্তবিনোদন করবার সুবিধা পায়। তাকে কেন্দ্র করে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশও গড়ে উঠতে পারে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সত্যই কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নানা জায়গা হতে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি গ্রন্থাগারের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ হতে দান হিসাবে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। প্রস্তুতি পর্ব এইভাবে সমাধান হলে গ্রন্থাগারের নামকরণের প্রশ্ন উঠেছিল। তারও তিনি সমাধান করে রুচিজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জননীর নামে তার নাম দেবার প্রস্তাব করেন অঘোরকামিনী গ্রন্থাগার।

এই নামকরণে শুধু যে ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত হয়েছিল তাই নয় এক ধর্মপ্রাণা পরহিতব্রতে উৎসর্গিত হৃদয় উদার মহিলার প্রতিও যোগ্য সম্মান প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি দুঃস্থের সেবা করতেন, কত অনাথ বালক-বালিকাকে মানুষ করেছিলেন সে বিষয় যাঁরা তাঁর জীবনকথার সহিত পরিচিত তাঁরা ভাল জানেন। তিনি কতখানি শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন তা তাঁর স্বনামধন্য কনিষ্ঠপুত্রের একদিনের আচরণ হতে সুন্দর প্রকট হয়। তা শুধু আমিই ব্যক্তিতভাবে জানি। এখানে তার উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সেটা ছিল ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিক। তার ঠিক আগেই ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব ওঠে এবং সীমানা পরিবর্তিত হয়। সেই সূত্রেই আমরা পুরুলিয়া জেলার এক অংশ এবং কাটিহার জেলার পূর্ব অংশ বিহার রাজ্য হতে পাই। এই প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতে যে বিভিন্ন আন্দোলন উঠেছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল আঞ্চলিক স্বার্থের প্রভাবে দেশের সামগ্রিক সংহতি বোধ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা। তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে আঞ্চলিক সংহতি বিধানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে রিজিয়-ন্যাল কাউন্সিল গঠন করেন। তার সভাপতি হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সভ্য হলেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ আরও দুজন মন্ত্রী। সঙ্গে প্রতি রাজ্য হতে দুজন বিভাগীয় সচিবও থাকতেন। এই কাউন্সিলের সভা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে বসত। তার আলোচ্য বিষয় হত নানা আঞ্চলিক সমস্যা।

সেবার বিহারের রাজধানী পাটনায় তার সভা বসেছিল। ডাঃ রায় ব্যবস্থা করেছিলেন একটা সমগ্র রেক নেবার যাতে সকলে একসঙ্গে রেলযোগে পাটনায়

যেতে পারেন। আরও ব্যবস্থা হয়েছিল যে পাটনায় পৌছাবার পর তা স্টেশনেই খুলে রাখা হবে এবং সভা শেষ হলে তাতে করেই আমরা কলিকাতায় ফিরে আসব। আমি সচিবদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম এবং কাজেই তাঁদের সঙ্গে পাটনা গিয়েছিলাম। সভার শেষে বিকালে হাতে অনেক সময় ছিল কারণ ফেরবার গাড়ী ছাড়বার কথা রাত সাড়ে দশটার পর। সেই সময়টা যে যার বেরিয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের কাজে বা বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। আমার পাটনায় তখন কোন আত্মীয় ছিল না। সুতরাং আমাদের গাড়ীতেই একা বসে ছিলাম।

এমন সময় দেখি সন্ধ্যার মুখে ডাঃ রায় ফিরে আসছেন। তাঁর হাতে কাগজে মোড়া একটা জিনিস। তিনি এসেই আমাকে দেখে বললেন, হিরণ, জানো আজ আমার একটা মস্ত লাভ হয়ে গেল।

তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি লাভ হল স্যর?

তিনি বললেন, তাঁদের পাটনার বাড়িতে তিনি বিকালে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মায়ের ব্যবহৃত কাপড় পেয়েছিলেন। সেইটিই তাঁর সেই মহাসম্পদ যা লাভ করে তিনি এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমার মা-র একখানা কাপড় পেয়ে গেলুম, সেটা সঙ্গে নিয়ে এলুম।

কথাটি বলতে বলতে আবেগের আতিশয্যে তাঁর চোখে প্রায় জল ভরে এল। তিনি মাকে এতই ভালবাসতেন। অবশ্য সকল সন্তানই মাকে ভালবাসে; কিন্তু এখানে বেশ বোঝা যায় সন্তানের মায়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির অতিরিক্ত-ভাবে তাঁর মহৎ হৃদয়ের জন্যও তাঁর মায়ের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

কাজেই দু-জনের কাছ থেকে নদীয়া জেলা পরিভ্রমণের একসঙ্গে দুটি নিমন্ত্রণ আদায় বা প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি যেতে স্বীকৃত হলাম। ঠিক হল ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর, এই দুদিন আমি নদীয়া জেলা পরিভ্রমণে কাটাব।

পুর্বের ব্যবস্থা অনুসারে সকালে কৃষ্ণনগর পৌছে দুপুরের পর নদীয়ার গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথায় যাব তা ঠিক করার ভার তাঁর ওপর। তিনি আমাকে তেহট্ট ও করিমপুর থানার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। এই অঞ্চলেই শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সঙ্গে এক বছর আগে ঘুরে গিয়েছিলাম তখন কি রকম একটা রেশা-রেশির ভাব লক্ষ্য করেছি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে। এবার তার কোন লক্ষণই দেখলাম না। উদ্বাস্তু পরিবার ও পাকিস্তান হতে প্রত্যাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবার একই গ্রামে পাশাপাশি বাস করছে। তাদের

মধ্যে কোন অশান্তি নেই। এটা দেখাতেই বোধ হয় তিনি আমাকে এখানে এনেছিলেন। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যা আমাকে এই মানুষটির প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাবিষ্ঠ করল। যেখানেই যাই, দেখি স্থানীয় নেতাদের আচরণে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনেকেই নিচু হয়ে তাঁর পা স্পর্শ করেন। এমন পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের নিয়ে হতে দেখেছি; কিন্তু তাঁরা ভিন্ন মহলের মানুষ। রাজনৈতিক নেতাকে কেন্দ্র করে এমন দৃশ্য তো আর দ্বিতীয় দেখি নি। দেশের পরম দুর্ভাগ্য এমন সকল মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র একটি জীপ দুর্ঘটনায় পড়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং সেদিন রাত্রে যখন কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে ফিরি এই দুই কারণেই মনে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিলাম।

পরের দিন সকালে মোটরে করে ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিলাম। সেখানে উদ্বোধন উৎসবে কংগ্রেস নেতা শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পত্নী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমার সঙ্গে এসে-ছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এঁরা সকলেই ভাষণ দিলেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মোটা টাকার দান ঘোষণা করলেন। তারপর আমরা গ্রন্থালয় দেখতে গেলাম। গ্রন্থাগারটি বেশ প্রশস্ত। তার মধ্যস্থানের হলঘরটি পরিচ্ছন্নভাবে সাজান হয়েছিল। তার দেয়ালে দেশের জনপ্রিয় নেতাদের ছবি এবং মধ্যস্থলে এই গ্রন্থাগারটি যাঁর নামে উৎসর্গীকৃত সেই অঘোরকামিনী দেবীর আলোকচিত্র স্থাপিত হয়েছে। এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি যে আশ্রয় শিবিরবাসীদের জীবনে নূতন রসের আস্বাদন এনে দেবে তাতে সন্দেহ ছিল না।

(৮)

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সমগ্র পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি নিয়ে পুনর্বাসনের সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকবেন স্থির করেন। সভার স্থান নিধারিত হয় কলিকাতার রাজভবনে। এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত, কারণ পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলিতে পুনর্বাসন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে তারা হল আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ। তা ছাড়া, বিহার ও উড়িষ্যাও তার সঙ্গে আংশিকভাবে জড়িত। এই রাজ্যগুলির কেন্দ্রস্থলেই কলিকাতা অবস্থিত।

এই ধরনের সভার দুটি সুবিধা আছে। প্রথমত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একসঙ্গে একই বৈঠকে অনেকগুলি রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যে সমস্যার সঙ্গে দুটি রাজ্য জড়িত তার সমাধান এই রকম বৈঠকে আলোচনার মধ্য দিয়ে সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং বেশ ব্যাপকভাবে এই সভার আয়োজন হল। ১৫ই নভেম্বর হতে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিন ধরে এই আলাপ আলোচনা চলল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন সব কটি রাজ্যের পুনর্বাসন

মন্ত্রী ও পুনর্বাসন সচিব। কেবল ত্রিপুরা রাজ্যে তখনও গণতান্ত্রিক শাসনরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে তার প্রতিনিধি হয়ে এলেন তার চীফ কমিশনার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না স্থানীয় উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন।

সভার শেষ দিনে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন আমরা করেছিলাম। তার সম্পর্কিত তথ্যগুলি প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। গড়িয়ার দিকে যেতে যে বড় রাস্তা গেছে সেই পথে বাঘা যতীন কলোনির কাছে পুনবাসন বিভাগ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কাছ হতে এক লপ্তে অনেকখানি জমি কিনেছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই জমি ছোট ছোট দাগে বিভক্ত করে উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে বিলি করা যাতে তারা সেখানে নিজেদের ঘর নির্মাণ করে নিতে পারে।

প্রস্তাবটি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায় স্বয়ং পুনর্বাসন মন্ত্রী সে প্রস্তাবে আপত্তি করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি একদিন প্রসঙ্গত আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর ইচ্ছা এই জমিতে বড় বড় বাড়ি উঠুক এবং তা অনেক ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বিভক্ত হোক, যাতে কলিকাতায় জীবিকা অর্জন করে এমন উদ্বাস্তুদের সেগুলি থাকবার জন্য ভাড়া দেওয়া যায়। তিনি এ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার অভিমত কি জানতে চান।

আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম উদ্বাস্তু পরিবারগুলির দিক থেকে তার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে যদি এই জমি নিজেদের বাড়ি করবার জন্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমার মতে যারা বাস্তু হারিয়ে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগী হয়েছে তারা নিজের বলবার মত একখণ্ড জমি পেয়ে তাতে যদি ঘর তুলতে পারে মনে তারা অনেক বেশি তৃপ্তি পায়। তাদের মনে হয় নূতন করে তারা নিজস্ব ঘর পেল। অবশ্য শ্রীজৈনের প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে তারা ভাল ঘর পাবে, কিন্তু তা হলেও তারা সেখানে আসবে ভাড়াটে হিসাবে। বাস্তুহারা হিসাবে তারা অন্তরে যে গ্লানি অনুভব করে, তার ফলে তা দূর হবে না। সেই জন্যই আমি তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলাম।

তিনি আমার মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই জায়গাটিতে বড় বড় অনেক ফ্ল্যাটবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করবার ইচ্ছা যে পোষণ করেন তার আভাস দিলেন। কারণটি তিনি স্পষ্ট করে আমার কাছে ব্যক্ত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তা হল সংক্ষেপে এই: পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করে দিল্লীর আশেপাশে অনেকগুলি উপনগরী স্থাপন করেছেন। যেমন, রাজেন্দ্রনগর, লাজপতনগর, ফরিদাবাদ ইত্যাদি। তাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ দেখলে চোখ ঝলসে যায়। প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়গৃহ, কারখানা—তার সমৃদ্ধির

লক্ষণ প্রকাশ করে। ফরিদাবাদে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব বাড়ি আছে, কিন্তু অন্য উপনগরীগুলিতে তার পরিবর্তে অনেক তলা বিশিষ্ট বহু ফ্ল্যাটবাড়ি সরকার নির্মাণ করে দিয়েছেন। ঝকঝকে তকতকে তাদের চেহারা। তুলনায় পশ্চিম বাঙলায় সে ধরনের উপনগরী স্থাপিত হয় নি। এই পার্থক্য পশ্চিম বাঙলার এম. পি.-দের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাঁরা তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং লোকসভায় এই পার্থক্যমুলক ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

এখন তার জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করতে হয়। তবেই তো প্রত্যুত্তর দেবার মত একটা যুক্তি পাওয়া যায়। সেই কারণেই তিনি এই জমিটিকে অনেক ফ্ল্যাটবিশিষ্ট বড় বড় বাড়ী করবার জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এখন চূড়ান্ত নির্দেশ দেবার ভার তাঁর ওপর। তিনি যখন নির্দেশ দিলেন এখানে ফ্ল্যাটযুক্ত বাড়ি করে উদ্বাস্তুদের ভাড়া দেওয়া হবে আমরা সেই-ভাবেই কাজ শুরু করলাম।

এই কাজটির ভার পড়েছিল কনস্ট্রাকসান বোর্ডের ওপর, তার মুখ্যবাস্তুকার শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টির প্রতি ব্যক্তিগত নজর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করে দিলেন। কাজের পরিমাপের পরিচয় পেলে বোঝা যাবে কত দ্রুতগতিতে এই কাজ শেষ করা হয়েছিল। এখানে যোলখানি বড় বড় চারতলা বাড়ি নির্মাণের প্ল্যান ছিল। তাতে প্রায় সাড়ে ন'শ ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা ছিল প্রতি ফ্ল্যাটে একখানি বাস করবার ঘর, একটি সংলগ্ন রান্নাঘর, একটি স্নানের ঘর এবং সামনে একফালি বারাণ্ডা। প্রতি ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসিক ত্রিশ টাকা। ছোট ছোট ফ্ল্যাট করার উদ্দেশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের নাগালের মধ্যে তাকে স্থাপন করা। পরিবার যদি বড় হয় বা তার সামর্থ্যে কুলায় তা একাধিক ফ্ল্যাট নিতেও পারে। এই কাজটি কনস্ট্রাকসান বোর্ড এক রকম এক বছরের মধ্যেই শেষ করে দিল।

এতগুলি পরিবারের যেখানে বাসের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশেষ করে এ অঞ্চলে কলিকাতার অন্য জায়গার মত ভূগর্ভস্থ ময়লা নিষ্কাশনের নালা ছিল না। তাই শুধু এই বাড়িগুলির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সে ব্যবস্থাও পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হল। এখানকার দূষিত জলও ময়লা শোধনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে শোধিত করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার পরিশোধিত জল টালির নালায় ফেলার ব্যবস্থা হল।

এইভাবে সমস্ত কাজ অতি দ্রুতগতিতে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের গোড়ায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং ঠিক হয়েছিল যে কলিকাতার সভার সমাপ্তির পর ১৮ই নভেম্বর বিকালে এই বাড়িগুলির উদ্বোধন অনুষ্ঠান শ্রীজৈন সম্পাদন

করবেন। যাঁর নির্দেশে এগুলি নির্মিত হয়েছে এই শুভকর্মে তাঁর হাতের স্পর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক সভা উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের অনেক মান্যগণ্য অতিথি যখন উপস্থিত আছেন তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পাবেন। সেটাও একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ।

অনুষ্ঠানের আয়োজনের ভার পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর, কারণ এ কাজের দায়িত্ব তো আমাদেরই। অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন আমরা ঠিক সময়েই করে রেখেছিলাম। কিন্তু অভাবনীয়ভাবে এক বাধা এসে উপস্থিত হল। শেষ দিনের সভায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসনের কাজের গতি মন্দ হয়েছে অনুযোগ করে তীব্র মন্তব্য করেন। গতি মন্দীভূত হয়েছিল সত্যই, তবে তার কারণও কিছু ছিল। প্রধান কারণ ছিল নূতন জমি সংগ্রহ করার অক্ষমতা এবং সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে আপত্তি।

তাঁর এই মন্তব্য আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীমতী রায়কে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। ফলে তিনি এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই চাইছিলেন না। অথচ অনুষ্ঠানের ভার আমাদের ওপর পড়ায় অতিথি সংকারের ভার প্রধানত তাঁরই ওপর বর্তায়। সুতরাং তিনি না গেলে অসৌজন্য প্রকাশের সামিল হয়ে দাঁড়াবে। এই কথাগুলি যখন তাঁকে বললাম, তিনি বুঝলেন এবং যেতে রাজী হলেন। এইভাবে গাঙ্গুলিবাগানে নির্মিত ফ্ল্যাটবাড়িগুলির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সেদিন বিকালে সম্পাদিত হয়ে গেল। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর বিতর্কের রেশ তখনও আমাদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল বলে আমাদের নিজেদের মন খুব তৃপ্তি পেল না।

উদ্বোধন পর্ব শেষ হবার পরে আর একটি কর্তব্যও আমাদের করা বাকি ছিল। কলিকাতায় শ্রীজৈন এসেছেন, এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীরা এসেছেন, এমন সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে। সুতরাং তাকে উপলক্ষ্য করে বালিগঞ্জের রবীন্দ্র সরোবরে অবস্থিত মাড়োয়ারি ক্লাবে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, তার প্রধান অতিথি ছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন; বিশেষ করে যাঁরা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত তাঁদের অনেকেই ছিলেন।

জায়গাটির পরিবেশ ভারি মনোরম। যে রাস্তাটি লেকের সঙ্গে শরৎ বসু রোডকে সংযুক্ত করেছে তার সংলগ্ন জায়গায়, সরোবরের দক্ষিণ তীরে তা অবস্থিত। অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল খোলা তৃণ আচ্ছাদিত মাঠে। নানা টেবিলে নানা লোভনীয় ভোজ্য দ্রব্য। পাশেই রবীন্দ্র সরোবরের স্বচ্ছ জলের বিস্তার। তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীজৈনকে ঘিরে

অনেক অতিথি কথোপকথনে রত। আমি একটু দূরে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ডঃ মেঘনাদ সাহা ঘুরতে ঘুরতে সেই দিকে আসছেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নমস্কার জানালে তিনি প্রতিনমস্কার করে আমার আরও কাছে এগিয়ে এলেন। উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রে তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁকে ছাত্রাবস্থা হতেই মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দুর্দিনের সময় তাঁর আর এক পরিচয় পেয়ে অন্য কারণেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শিখলাম। সেদিন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাকসেনা কর্তৃক অহূত সভায় ভারত সরকারের নূতন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভিন্ন রীতির প্রয়োগের প্রস্তাবে তিনি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তা কোনো দিন ভুলব না। তিনি উদ্বাস্তুদের দরদী বন্ধু ছিলেন।

তিনি কাছে এসে প্রীতি সম্ভাষণ করে-জিজ্ঞাসা করলেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি কি না। আমি বুঝতে পারলাম তিনি কি বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। লোকসভার সভ্য হিসাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি অবহেলার কঠোর ইঙ্গিত করে লোকসভায় তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া তো আমি নিজেই শ্রীজৈনের মনে লক্ষ্য করেছি। আমি তো জানি গাঙ্গুলিবাগানের বিরাট ফ্ল্যাটবাড়িগুলি নির্মাণের পরিকল্পনা এই অবহেলার অভিযোগের ফলেই গড়ে উঠেছে।

আমি তাই উত্তরে বললাম তা তো লক্ষ্য করছি। আপনারা গাছ ধরে নাড়া দিয়েছিলেন, তাই তো আমরা ফল কিছু কিছু কুড়োচ্ছি।

তিনি উত্তরে বললেন, নাড়া দেবার ফল তা হলে পাচ্ছেন? দেখুন না, আরও নাড়া দেব। বলে খুব হাসতে লাগলেন।

(৯)

এই সময় হঠাৎ কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরফি আহম্মদ কিদওয়াই-এর আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও যে কয়জন নেতা ভারতরাষ্ট্রকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে মাতৃভূমি জ্ঞানে গ্রহণ করে হৃদয় দিয়ে সেবা করে গেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, তাঁর কর্মক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব এমন সাফল্যের সঙ্গে আর কেহ বহন করতে পারেন নি। ভারত সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে বিদায়ী ইংরেজ সরকারের কাছ হতে খাদ্যশস্যে রেশনের প্রথা চালু অবস্থায় পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে সরকার তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে নামতে চায় না। আবার

নামাতে চেষ্টা করবার সৎসাহসও কর্তৃপক্ষ অনেক সময় দেখাতে পারেন না ; কাজেই এই অবাঞ্ছনীয় প্রথা স্থায়িত্ব লাভ করে। শ্রীকিদওয়াই প্রথম সুযোগেই তাকে বর্জন করবার সৎসাহস দেখিয়ে শুধু কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন নি, দূরদর্শিতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে সারা দেশে অভাবনীয়ভাবে ভাল শস্য উৎপাদনের সুযোগ নিয়ে তিনি রেশন প্রথাকে তুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং এমন গুণী মন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ভারত সরকারকে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এখন এই গুরুদায়িত্বপুর্ণ পদকে পুরণ করবেন কে, প্রধান মন্ত্রীর ওপর সেই সমস্যার সমাধানের ভার এসে পড়ল। এই শূন্য পদে নিয়োগের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনকে মনোনীত করলেন। সুতরাং যারা পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত ছিলাম তারা তাঁকে হারালাম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর স্থান পুরণ করতে মনোনীত হলেন শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না। তাঁকে পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসাবে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য। নিজে উদ্বাস্তু হওয়ায় উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর হৃদয়ভরা দরদ ছিল। তিনি উপদেষ্টা হিসাবে পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের কাজে আমাদের সাহায্য করবার জন্য ইতিমধ্যে কলিকাতায় তাঁর আপিস স্থানান্তরিত করে এখানেই বাস করছিলেন। মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পরেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কলিকাতাতেই তিনি থাকবেন এবং প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে দিল্লী যাবেন। তাঁর এই ব্যবস্থা একেবারে অভিনব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিহাসে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। তাঁর এই আচরণ হতেই বোঝা যাবে তিনি পশ্চিম বাঙলার পুনর্বাসনের কাজে কতখানি আগ্রহশীল ছিলেন।

মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি আরও ভালভাবে উদ্বাস্তু সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ আশ্রয় শিবির এবং কলোনি দেখবার সিদ্ধান্ত করলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তাঁর শরীর সে সময় বেশ খারাপ ছিল। রক্তচাপ রোগে তিনি ভুগছিলেন। বেশি ঘোরাফেরা করা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পথে যেতেও অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই কারণে ভ্রমণের সময় তাঁর স্ত্রী সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকতেন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিয়ে এক দীর্ঘ ভ্রমণসূচী রচনা করলেন। আপত্তি করলে শুনতেন না, বলতেন, আরে আমি পাঠানের সন্তান, আমি কিছুর তোয়াক্কা রাখি না। তাঁর ভ্রমণের ব্যবস্থাও ছিল একান্ত বাহুল্যবর্জিত। পদস্থ মানুষ সাধারণত অনেক লোকজন, অনেক কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করে থাকেন। তাঁর রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক কারণে তাঁর স্ত্রী হতেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর থাকত তাঁর গাড়ীতে ড্রাইভার ব্যতীত দুজন। এক হল তাঁর ব্যক্তিগত আর্দালি এবং অপর জন আমি। তিনি নিজের সচিবদের

সঙ্গে আনতেন না। বলতেন, আমি থাকতে তাঁদের দরকার হবে না; আমিই তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাতে পারব। মোটরে তাঁর ভ্রমণ শুরু হত প্রাতরাশের পর এবং সুবিধামত রাস্তার পাশে কোনো জায়গায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হত। হয়ত নদীর ধারে বা রাস্তার ধারে বড় গাছের ছায়ায় একটা চাদর পেতে তার ওপর বসে পড়তেন। খাবার তিনি সকলের জন্যই নিয়ে যেতেন। আমাকে আলাদা নিজের জন্য খাবার আনতে দিতেন না। এসব বিষয়ে তাঁর আচরণ সাধারণ পদস্থ মানুষের মত ছিল না।

ভ্রমণসূচী অনুসারে প্রথম যাত্রা শুরু হল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে। আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল টিটাগড় উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথম উদ্বাস্তু যুবকদের হাতের কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করা যাতে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে কোন কারখানায় তারা কাজ পাবার অধিকারী হয়। দ্বিতীয়, দক্ষতা অর্জনের পরে যতদিন না কোথাও স্থায়ী কাজ পায় এখানেই তারা কাজ করে যেতে পারে এই জন্য এখানে উৎপাদন কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। বাহিরের থেকে অর্ডার নিয়ে এই উৎপাদন কেন্দ্রে কাজের ব্যবস্থা হত। প্রধানত তাঁতের কাপড়, সতরঞ্চি, চা বাগানের বা কৃষি-কার্যে ব্যবহারের যোগ্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন হত। কিন্তু যে পণ্যটি সব থেকে বেশি উৎপাদন হত তা হল উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য তাঁবু। পূর্ববঙ্গ হতে সরকারের আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের স্রোত ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রায় অব্যাহত ছিল। কখনো তা ক্ষীণধারায় এসেছে, কখনো তা বিরাট আকার ধারণ করেছে কিন্তু থেমে যায় নি। তাদের আশ্রয়ের জন্য ছোট তাঁবুর চাহিদার অন্ত ছিল না। তাই নিজেরাই উৎপাদন করে এ বিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে অতিরিক্ত লাভ এই যে অনেক উদ্বাস্তু যুবককে কাজ দেওয়া যায়।

শ্রীখান্না এই উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্যকে নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন। এই কেন্দ্রের কাজ দেখে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুকে তা দেখাবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি পরে এই শিক্ষণ এবং উৎপাদন কেন্দ্রটি দেখে গিয়েছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি বিজয়গড় কলোনি দেখতে গিয়েছিলেন। কলিকাতা অঞ্চলে সেটি ছিল সবার প্রথম কলোনি। বাঙলা দেশ বিভক্ত হবার আগে এ জায়গাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে সেনানিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। সেনা বিভাগ জায়গাটি পরিত্যাগ করবার পরেই এই কলোনিটি গড়ে ওঠে। এখানে অনেকগুলি পাকা রাস্তা এবং বড় বড় ছাউনি ছিল। সুতরাং নগর পরিকল্পনার একটি কাঠামো সেখানে তৈরি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তারপর যাদবপুরের উদ্বাস্তু সমিতি তার দখল নিয়ে ছোট ছোট রাস্তার জায়গা রেখে বাস্তু

নির্মাণের জন্য উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে জমি ভাগ করে দিয়েছিল। খেলাধূলার জন্য বড় পার্ক এবং পড়াশোনার জন্য স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থাও রাখা হয়। কিন্তু নূতন রাস্তার যে ব্যবস্থা করা হয় সেগুলি সরু সরু। সম্ভবত বাড়ি নির্মাণের জন্য বেশী মানুষের জমি বরাদ্দের চেষ্টা হতে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি।

তারপর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম হতে এখানে ব্যাপক হারে জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। বাঘা যতীন কলোনি, নেহেরু কলোনি প্রভৃতি এই সময় গড়ে ওঠে। এই নূতন কলোনিগুলি যে এলাকায় গড়ে ওঠে সেখানে পূর্ব হতে সুবিন্যস্ত কোন রাস্তা ছিল না। নূতন কলোনির পরিকল্পনার জন্য সকল রাস্তারই নূতন করে ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে সব রাস্তাগুলিই অপ্রশস্ত হয়ে পড়ে। এখানেও ওই একই ইচ্ছা, অর্থাৎ যত বেশি সংখ্যক পরিবারকে স্থান দেওয়া সম্ভব, এই ইচ্ছা ক্রীয়াশীল ছিল। ফলে এই কলোনিগুলির বিন্যাস বিজয়গড় কলোনি হতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এইভাবে এই অঞ্চলের এক বিরাট অংশ জুড়ে অনেকগুলি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। যে জায়গা জুড়ে সেগুলি অবস্থিত তার পরিমাপ হবে প্রায় দুই বর্গ মাইল। কলোনিগুলি স্থাপিত হবার ফলে এই সমগ্র এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। অথচ সরু সরু রাস্তা থাকায় এবং ময়লা নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে প্রায় বস্তি অঞ্চলের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই জায়গা আগে টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি তা কলিকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার উন্নয়নের ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে সব জবর-দখল কলোনিকে বৈধীকরণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টালিগঞ্জের এই কলোনিগুলি এখন কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৈধীকরণের অতিরিক্ত একটি কর্তব্য সরকারের ওপর এসে পড়বে। তা হল এই অঞ্চলের মহানগরীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই ধরনের পরিবেশ রচনা করা। তার জন্য প্রয়োজন ভূগর্ভস্থ ময়লা জল নিষ্কাশনের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা এবং আভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষার জন্য চওড়া রাস্তার পরিকল্পনা।

এই বিষয় একটি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পুনর্বাসন বিভাগ হতে একটি তদন্তের ব্যবস্থা হয়। তাতে কনস্ট্রাকশান বোর্ড ও পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিংএর দুই মুখ্য বাস্তুকারের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় তদন্তের জন্য তাদের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের প্রতিনিধি এবং করপোরেশনের প্রতিনিধিরাও সঙ্গে ছিলেন। স্থানীয় তদন্তের ফলে একটি খসড়া নকসা রচিত হয়। তাতে ভূগর্ভস্থ ময়লাজলবাহী নালা কোথা দিয়ে যাবে তা দেখান হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাগুলি চওড়া করবার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। এবিষয়ে স্থানীয় কলোনিগুলির প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা হয়। তাঁরা এই

প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন এবং প্রয়োজন হলে রাস্তা চওড়া করবার জন্য বাস্তুজমি ছাড়তেও সম্মত হন।

আলোচনা করে দেখা যায় যে এই খসড়া পরিকল্পনাকে পূর্ণ রূপ দিতে এই অঞ্চলের সকল কলোনিগুলির জরিপের প্রয়োজন আছে। কোথায় বাড়ি আছে, কোথায় রাস্তা আছে, এগুলি জরিপে সঠিক ধরা পড়বে। তখন কোন রাস্তা চওড়া করা হবে এবং ভূগর্ভস্থ নালার বিন্যাস কেমন হবে সে বিষয় চিন্তা করা যায়। সুতরাং একটি প্রাথমিক জরিপের ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই পরিবেশে শ্রীখান্না বিজয়গড় কলোনি দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ জীবনরতন ধর, কারণ তখন তিনি এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। কলোনির মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যবস্থার ত্রুটি করে নি। একটি বড় প্যাণ্ডাল খাটান হয়েছিল এবং একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডাঃ ধর সে সভার পৌরোহিত্য করেন। স্থানীয় প্রতিনিধিরা তাঁকে স্বাগত জানাবার পর তাদের অভাব অভিযোগের বিষয় তাঁকে জানান হয়। আমাকেও ভাষণ দিতে বলা হয়। শ্রীখান্নার উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি সহানুভূতি সূচক আচরণ সত্যই আমাকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। কাজেই আমার ভাষণে স্থানীয় অধিবাসীরা যে তাঁর কাছে সহৃদয় আচরণ আশা করতে পারেন তার উল্লেখ করেছিলাম। শেষে তাঁর ভাষণে জবরদখল কলোনিগুলির বিশেষ সমস্যার প্রতি তিনি যে দৃষ্টি দেবেন সে কথা জানিয়েছিলেন।

তাঁর এই পরিদর্শনের ফলে আমাদের এই অঞ্চলটির জরিপের প্রস্তাব ত্বরান্বিত হয়েছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল এই জরিপের কাজে আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হবে। করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ জরিপের কাজের দায়িত্ব নিতে সম্মত হওয়ায় তার ওপর জরিপের ভার দেবার এবং তার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট করা হয়েছিল। সে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরে গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ হয়। বলা বাহুল্য শ্রীখান্নার সহানুভূতিপরায়ণতা এই সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করেছিল।

ওই ডিসেম্বর মাসেরই ৩১শে তারিখে শ্রীখান্না ধুবুলিয়া ক্যাম্পে যেতে চাইলেন। পথ দীর্ঘ, মোটরযোগে যেতে প্রায় ৯০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। তবু তিনি মোটরযোগেই যেতে চাইলেন। তাতে সুবিধা আছে নিজের ইচ্ছামত যাওয়া আসা করা যায়; দরকার হলে কোন জায়গায় বেশিক্ষণ থাকাও যায়। ট্রেনে গেলে টাইম টেবলএ প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তাই তুলনায় কষ্টকর হলেও, তিনি মোটরেই যাত্রা করলেন। গাড়ীর আরোহী, প্রচলিত ব্যবস্থামত, ড্রাইভার ব্যতীত তাঁর

ব্যক্তিগত আর্দালি, শ্রীমতী খান্না এবং আমি। খুব সকাল সকাল রওনা হয়ে আমরা দশটার মধ্যেই ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরে হাজির হলাম। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দুর্দিনের সময় এটি পশ্চিম বাঙলার বৃহত্তম শিবির ছিল। এক সময় আশ্রিতের সংখ্যা ৬২,০০০ এর ওপরে ছিল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে পুনর্বাসনের যোগ্য পরিবারগুলি স্থানান্তরিত হবার ফলে এখানে জনসংখ্যা বেশ কমে গিয়েছিল। এবং পুনর্বাসনের অযোগ্য স্থায়ী দায় হিসাবে যারা সরকারের আশ্রিত তাদের সংখ্যাই তখন এখানে বেশী ছিল।

এখানকার পরিবারগুলির সুবিধার জন্য এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছিল। আগে জঙ্গী বিমান রাখবার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে এখানে প্রচুর জায়গা ছিল। তার মাঝখানে এক মাইল দীর্ঘ প্রশস্ত রানওয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এই পরিবেশের কথা বিবেচনা করে এখানে একটি বড় যক্ষ্মা হাসপাতাল খুলতে চেয়েছিলেন। জায়গাটি খোলামেলা থাকায় যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্যের অনুকূল। সরকারী আশ্রয় শিবিরগুলিতে অনেক যক্ষ্মা রোগী ছিল। বাহিরের উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়েছিল। এই প্রস্তাবের তিনি যথাসময়ে অনুমোদন করেন।

বিরাট আশ্রয় শিবিরটি দেখে স্থানীয় কর্মচারিগণ ও আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে অনেক সময় কেটে গেল। কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে আশ্রয় শিবিরে তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। যে খাবার তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তাও সেখানে বসে তিনি খেতে চাইলেন না। সুতরাং পরিদর্শনের কাজ শেষ করেই অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলাম।

তখন শীতকাল। রোদের উত্তাপ ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম শিবির ত্যাগ করে রাস্তায় যে-কোন জায়গায় গাড়ী থামিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে নেব। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। ধুবুলিয়াতে মোটর গাড়ীতে যেতে তখন জলাঙ্গী নদী পার হতে হত; কারণ তখনও তার ওপর সেতু নির্মিত হয় নি। ওখানে সরকারের তত্ত্বাবধানে ফেরি থাকত। তাতে মানুষ পার হত, গাড়ীও পার হত। কাজেই এখানে গাড়ী হতে নামতে হত এবং গাড়ীর সঙ্গে নিজে পার হয়ে নদীর অপর পারে উঠে আবার গাড়ী চড়তে হত। শ্রীখান্না ধুবুলিয়া যাবার পথে তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন জলাঙ্গীর ধারে এসে সেখানে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করব।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। শীতকাল বলে জলাঙ্গীর স্রোতের তীব্রতা নেই, ফলে তার জল বেশ স্বচ্ছ। তার তীরে প্রশস্ত চর জেগে উঠেছে। সেখানে সরষে, ডাল, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্য বোনা হয়েছে। ছোলার ক্ষেত,

ডালের ক্ষেত সবুজ আস্তরণে ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন চরের উপর কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছে। সরষে গাছে ফুল ধরতে আরম্ভ করছে। সুতরাং তাদের মাথায় হলদে রঙের ছোপ পড়েছে। ভারি মনোরম পরিবেশ। একেবারে জলের ধারে বালির ওপর বসে আমরা খেতে বসলাম। শীতকাল বলে রোদের স্পর্শ বেশ মিষ্টি লাগছিল; তাকে এড়াবার জন্য গাছের তলায় আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় নি।

নদীর অপর পারে কৃষ্ণনগর শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত এই শহরের কথা উঠল। শ্রীখান্না জানতে চাইলেন তার ইতিহাস। আমি তাঁকে জানালাম এটি অতি প্রাচীন শহর, কলিকাতা থেকে বয়সে অনেক বড় এবং মধ্যযুগে নবদ্বীপের মত এটি বাঙলা দেশের সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র বলে পরিগণিত হত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তার অতীতের গরিমার এখন কি অবশিষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় আমাকে জানাতে হল, এখন তার বিশেষ কিছুই নেই। এককালে যা এক স্থানীয় রাজার রাজধানী ছিল তা এখন নদীয়া জেলার শাসন কেন্দ্র মাত্র। তবে এখনও তা দুটি জিনিসের গর্ব করতে পারে। তাদের একটির আবেদন চোখে, অপরটির রসনায়। একটি মৃৎশিল্প অপরটি মিষ্টান্ন। অর্থাৎ আমি তার বিখ্যাত মৃৎশিল্পের এবং সরপুরিয়ার কথা উল্লেখ করলাম। ফিরে আসতে দেরী হয়ে যাবে বলে তাঁকে আর মৃৎশিল্পীদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি, তবে পথে যেতে মিষ্টান্নের দোকান হতে তাঁকে সরপুরিয়া কিনে উপহার দিয়েছিলাম।

এইভাবে শ্রীখান্না যেখানে জবরদখল কলোনিগুলি সব থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় বর্তমান, তা দেখলেন, যেটি সব থেকে বড় আশ্রয় শিবির তাও দেখলেন। এবার দেখতে চাইলেন একটি বড় অকৃষিজীবী কলোনি। আমাদের সব থেকে বড় অকৃষিজীবী কলোনি ছিল হাবড়ার পাশাপাশি অবস্থিত অশোকনগর এবং কল্যাণগড় কলোনি। কিন্তু সেখানে জীবিকার সমস্যা এত তীব্রভাবে অনুভূত হয় নি। সেগুলি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা খানিকটা অর্জন করেছিল। দেখাতে হলে তাঁকে সেই কলোনিই দেখানো দরকার যেখানে জীবিকা সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। তাই তিনি তাহেরপুর কলোনি পরিদর্শন করবেন ঠিক হল। কাছেই শক্তিগড় ও ফুলিয়া কলোনি থাকায় একই দিনে তিনটি কলোনি দেখা ঠিক হল।

১৯শে জানুয়ারি ১৯৫৫ তারিখে আমরা প্রথমে সোজা কৃষ্ণনগরে গেলাম। তার সংলগ্ন এলাকাতেই শক্তিনগর কলোনি স্থাপিত হয়েছিল। পাবনা জেলার যেসব মধ্যবিত্ত পরিবার দেশ বিভাগের সঙ্গেসঙ্গেই দেশত্যাগী হয়েছিল তারাই এই কলোনিটি স্থাপন করেছিল। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের চেষ্টায়

সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে এই কলোনিটি গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জমি নির্বাচন করে মালিকের নিকট স্বত্ব কিনে তাঁরা এই কলোনিটি স্থাপন করেন। এ বিষয় তা কৃষ্ণপুর কলোনির সহিত তুলনীয়। তার অপর বৈশিষ্ট্য হল সম্ভবত তা পশ্চিম বাঙলায় যতগুলি উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্ভবত বিজয়গড় কলোনি হতেও তা প্রাচীন।

কলোনির বিন্যাসটি সুন্দর। মাঝখানে প্রশস্ত মাঠ আর তার চারপাশে বাড়ি উঠেছে। শ্রীখান্না এখানে এসে সব দেখে খুশি হয়েছিলেন। তারপর কৃষ্ণনগরে সার্কিট হাউসে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে আমরা আবার রওনা হলাম। যে পথ রাণাঘাট হয়ে কলিকাতার দিকে গিয়েছে সেই পথে শান্তিপুর অতিক্রম করবার কিছু পরেই ফুলিয়া এল। ফুলিয়ার ভিতর দিয়ে একটি নূতন রাস্তা হয়েছে যা তাহেরপুরের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করেছে। ছুটি কলোনির ব্যবধান দু মাইলের বেশি হবে না। সুতরাং আমাদের ব্যবস্থা ছিল শক্তিনগর হতে ফেরবার পথে ফুলিয়া ও তাহেরপুর হয়ে তারপর কলিকাতা অভিমুখে রওনা হব।

ফুলিয়া কলোনির ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে নিলোখেরি উদ্বাস্তু কলোনির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার দে এই কলোনিটি গড়ে তোলেন। আংশিকভাবে তা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল; কিন্তু বর্তমানে তার রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা যখন প্রথম প্রবর্তিত হয়, এখানে একটি ব্লক স্থাপন করে ফুলিয়াকে তার কেন্দ্র করা হয়। ফলে ব্লকের আপিস এবং ব্লকের স্তরের অনেক কর্মচারীর তা বাসস্থানে পরিণত হয়। অতিরিক্তভাবে ছুটি গ্রামসেবকদের শিক্ষণকেন্দ্র এখানে স্থাপিত হওয়ায় সেখানে নিযুক্ত অনেক শিক্ষকেরও এখানে বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। ফলে তার বিশুদ্ধভাবে উদ্বাস্তু কলোনির রূপ আর সংরক্ষিত থাকে না। সুতরাং ঠিক উদ্বাস্তু কলোনি হিসাবে দেখবার এখানে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। শ্রীখান্না সাধারণভাবে কলোনিটি ঘুরে তাহেরপুর রওনা হলেন। কারণ সেটিই তখন আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুতরাং ফুলিয়া পরিদর্শনের কাজ তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করে শ্রীখান্না তাহেরপুর রওনা হলেন। স্বয়ং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এখানে আগে আর কখনও আসেন নি। সুতরাং এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখনকার অধিবাসীদের তাই তাঁকে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহ। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল এখনকার নেতাজী সুভাষ পার্ক নামে কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত পার্কটি। আয়তনে তা বেশ বড়। তা স্থানীয় অধিবাসীদের

সমাগমে ভরে গিয়েছিল, তার কেন্দ্রস্থলে শ্রীখান্নাকে অভ্যর্থনা করে বসানোর আয়োজন হয়েছিল।

স্বাগত সম্ভাষণের পর শ্রীখান্না তখন এখানকার পরিবারগুলির অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এই কলোনির নেতৃদ্বয় সর্বশ্রী অতুল বসু ও রেবতী রায় মৌখিক তাঁকে সব বলতে চেষ্টা করলেন। যেখানে ইংরেজিতে কুলোয় না, এঁরা বাঙলায় বলেন, আর আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিই।

এখন হয়েছে কি, উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে যখন তাঁদের বক্তব্য পেশ করছিলেন, এত বড় মাননীয় অতিথির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই হয়তো উত্তেজনাবশে বেশ উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। তাঁর প্রতি অভদ্র আচরণ করবার কোন উদ্দেশ্যই তাঁদের ছিল না। শ্রীখান্না কিন্তু সেটা অবাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তাই ইংরেজিতে আমাকে বললেন, তাঁদের অনুরোধ করতে যেন তাঁরা নিচু গলায় কথা বলেন। সেই সঙ্গে এই মন্তব্যও করলেন যে জোরে আলোচনা করলে যে বিরাট জনতা উপস্থিত আছে তারা ভাববে এঁদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ চলছে এবং ফলে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। সম্ভবত তাঁর দূরদর্শী মন এর থেকে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গোলমালের আশঙ্কা করেছিল। বলা বাহুল্য তিনি কোনদিন পুলিশের রক্ষণাধীনে উদ্বাস্তু কলোনিতে চলাফেরা করতেন না। এখানেও বলতে গেলে আমিই একমাত্র তাঁর সঙ্গী।

উদ্বাস্তু নেতাদের যখন তাঁর ইচ্ছার কথা জানালাম তাঁরা তাঁর উপদেশের তাৎপর্য বুঝলেন এবং নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। যাই হোক, তারপর বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলল। তিনি কলোনির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবেন বললেন এবং বিশেষ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে কলোনির রাস্তাগুলি সব পাশ করে দেবেন। এখনকার আলোচনা শেষ হতে বেশ সময় লেগে যাওয়ায় আমাদের কলিকাতা রওনা হতে দেরি হয়েছিল। কাজেই আমাদের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছিল।

(১০)

এইভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা করে নূতন পুনর্বাসন মন্ত্রী তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। মোটামুটি এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের যত চেষ্টা হয়েছিল তাতে নানা ভুল ত্রুটি ধরা পড়েছিল; অবশ্য কোথাও আংশিক সাফল্যলাভ হয়েছিল। এদিকে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে পাশপোর্ট প্রথা চালু হবার পর উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অনেক কমে এসেছিল। সুতরাং এই ছিল উপযুক্ত সময় যখন আগে স্থাপিত কলোনিগুলির প্রয়োজনমত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যায়।

এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক স্থাপিত কমবেশি তিন শ' কলোনির মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাটা বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর কলোনির মধ্যে। কৃষিজীবীদের বিশেষ সমস্যা ছিল না; চাষের উপযুক্ত জমি পেলেই তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারত। যারা কোন বিশেষ শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছে যেমন তাঁতি, তারাও তুলনায় সহজে আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে। এমন কি যারা মৎস্যজীবী তারা নদীর ধারে কলোনি স্থাপনের সুযোগ পেলে জীবিকা অর্জন করতে পারে। বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা। তাদের প্রধানত বসান হয়েছিল বিভিন্ন শহরের মধ্যেই জমি সংগ্রহ করে ছোট ছোট কলোনিতে, কিম্বা কলিকাতা হতে দূরে এক ব্লগে অনেক জমি সংগ্রহ করে তাতে বড় উপনগরী স্থাপন করে।

সুতরাং বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অকৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য স্থাপিত উপনগরীগুলি। এদের সমস্যা দুটি। প্রথম পরিবার-গুলির জীবিকার সমস্যা এবং দ্বিতীয় হল কলোনিগুলির রাস্তা উন্নয়নের সমস্যা। জীবিকার সমস্যার জন্য শ্রীখান্না ইতিপূর্বেই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তা হল শিল্পপতিদের ঋণ দিয়ে তাঁদের বড় বড় কলোনিগুলিতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য নানা কারখানা স্থাপন করা। নূতন কারখানা স্থাপিত হলেই অনেক নূতন কাজের চাহিদা গড়ে উঠবে এবং ফলে উদ্বাস্তু যুবকদের কাজ দেবার সুবিধা হবে।

দ্বিতীয়টি হল কলোনিগুলির বৈষয়িক উন্নয়নের সমস্যা। আশ্রয় শিবিরগুলি তাড়াতাড়ি খালি করবার উদ্দেশ্যে নূতন কলোনিগুলিকে ভাল করে গড়ে তোলবার আগেই উদ্বাস্তু পরিবারদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যেখানে রাস্তা হবে তাকে চিহ্নিত করে এবং বাড়ি করবার জন্য নির্দিষ্ট দাগগুলি চিহ্নিত করে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে নলকূপ বসিয়েই পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অবশ্য এ রীতির ব্যতিক্রম যে হয় নি তা নয়। তার ভাল উদাহরণ হাবড়া কলোনি যার পরে নাম হয়েছিল অশোকনগর। এটিকে আদর্শ উপনগরী হিসাবে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে পাকা রাস্তার ব্যবস্থা হয়েছিল, জল নিষ্কাশনের জন্য নালাকাটা হয়েছিল এবং ব্যাপক হারে স্যানিটারি পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য কলোনির জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। সেই ব্যবস্থাগুলি না করলে যে এদের প্রতি অবিচার করা হবে তা শ্রীখান্না বুঝেছিলেন। তাই এবিষয় কিছু করবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়েছিলেন। এবিষয় হাল্কাভাবে তিনি কিছু করতে চান নি। সরজমিনে তদন্ত করে প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ নিয়ে এই কলোনিগুলির জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সুতরাং বিলম্ব না করে, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি নগর অঞ্চলে বা উপনগরীর আদর্শে যে সকল উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলির বৈষয়িক উন্নয়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর প্রয়োজনীয় প্রস্তাব দেবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি স্থাপন করলেন। তাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ছিলেন কনস্ট্রাকশান বোর্ডের মুখ্যবাস্তুকার শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মুখ্যবাস্তুকার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু এবং ভারত সরকারের খ্যাতিমান বাস্তুকার ডি. এন. এনড্‌ল। এই সমিতির আমি সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলাম।

সমিতিকে তার সুপারিশ তাড়াতাড়ি পেশ করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। আমারও ব্যক্তিগতভাবে বেশ তাড়া ছিল; কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার যে বোঝাপাড়া হয়েছিল সে অনুসারে ৩১শে মার্চের পর আমি সরকারী চাকুরী হতে মুক্তি পাব। আমার ওপর যখন এই সমিতির নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছিল, ৩১শে মার্চের মধ্যেই বিভিন্ন কলোনি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের সুপারিশ স্থাপন করার কথা হয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে এবিষয় আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। কাজটির ব্যাপকতা বোঝবার জন্য এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার উপনগরী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মোট ১০১টি উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি বড় উপনগরী পরিকল্পনা ছিল। এ ছাড়া যেহেতু জবরদখল কলোনিগুলির বৈধীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলির উন্নয়নের প্রশ্নও সমিতির আলোচনার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫০এর ডিসেম্বরে যে তদন্ত করা হয় তাতে মোট ১৩৩টি জবরদখল কলোনি সরকারের নজরে আসে। বৈধীকরণের জন্য যে আইন পাশ করা হয় (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আইন) তাতে ব্যবস্থা ছিল, যে সকল জবরদখল কলোনি ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের আগে স্থাপিত হয়েছিল কেবল সেগুলিই বৈধীকরণের যোগ্য হবে। এই আইন পাশ হবার পর আরও ৪৬টি জবরদখল কলোনি আবিষ্কার হয়। তারা দাবী করে, তারা সকলেই ওই তারিখের আগে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং সেগুলি ওই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল কিনা তাও এই সমিতির অনুসন্ধানের বিষয় গণ্য হয়। তাদের মধ্যে যেগুলি এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে প্রমাণ হবে তাদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করবার দায়িত্বও এই সমিতির ওপর এসে পড়ে। যাই হক, এই বিরাট কাজের বোঝা সকলের সহযোগিতার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। কাজেই ৩১শে মার্চ তারিখে এই সমিতির সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের নিকট স্থাপন করা সম্ভব হয়।

এদের সম্পর্কে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে মোটামুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলোনিগুলির জন্য যে ব্যবস্থা হবে এদেরও সেই ব্যবস্থা হবে। তবে পানীয় জলের জন্য কেবল নলকূপের ব্যবস্থা থাকবে। যদি স্থানীয় মিউনিসিপালিটির

হাসপাতাল না থাকে তা হলে হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকবে। অনুরূপভাবে যদি সেখানে আলোর ব্যবস্থা থাকে তা হলে নূতন কলোনিতেও তার ব্যবস্থা হবে।

এইসব সুপারিশগুলির আর্থিক তাৎপর্য খুব বেশী। মোটামুটি দশ কোটি টাকার মত হবে। তার মধ্যে কলিকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত কলোনিগুলির উন্নয়নের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল তিন কোটি দুই লক্ষ টাকা এবং সরকার স্থাপিত চারটি বড় উপনগরীর জন্য খরচের হিসাব দাঁড়িয়েছিল মোট দু কোটি সত্তর লক্ষ টাকা।

পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তুদের প্রতি শ্রীখান্নার সহানুভূতিপরায়ণ আচরণ বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত আরও একটি ব্যাপার হতে বেশ প্রমাণিত হয়। বিষয়টি ভাল করে বুঝতে হলে কিছু প্রামাণিক তথ্যের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রথমে গৃহনির্মাণের জন্য উদ্বাস্তুদের ঋণ দেবার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে গ্রামের পরিকল্পনা ও শহরের পরিকল্পনায় কোন পার্থক্য স্বীকৃত হয় নি। দুই ক্ষেত্রেই ঋণের হার সমান ছিল, পাঁচ শ' টাকা মাত্র। গ্রামে চালাঘর নির্মাণ করতে এই ঋণে কোন-রকমে চলত। কিন্তু শহর অঞ্চলে পাকা ঘর নির্মাণ করতে এই ঋণ নিতান্তই অল্প। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার শহর পরিকল্পনার জন্য উচ্চতর হারে ঋণের ব্যবস্থা করেন। তাতে সব থেকে কম ঋণের হার ছিল ১২৫০৲ টাকা। তার ওপরেও ঋণের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে যে পরিবার ঋণ গ্রহণ করবে তাকে গৃহনির্মাণের জন্য আংশিক ব্যয় বহন করতে হবে। অর্থাৎ ১২৫০৲ টাকা পর্যন্ত খরচ হলে সবটাই সরকারের কাছ হতে ঋণের আকারে পাওয়া যেত, আর তার বেশি হলে একটা অংশ উদ্বাস্তু পরিবারকে বহন করতে হত।

এই নূতন হার প্রচলিত হয় ১লা অগাস্ট ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। ইতিপূর্বেই কিন্তু অনেক উদ্বাস্তু পরিবার নগর পরিকল্পনায় আগের হারে ঋণ পেয়েছিল। এই নূতন হার তখন প্রচলিত ছিল না বলে তাদের ৫০০৲ টাকার বেশী ঋণ দেওয়া হয় নি। কিন্তু ১৯৫০এর দাঙ্গার পর যারা এসেছে তারা এই সুবিধা পাবে, আর যারা আগে এসেছিল তারা পাবে না, তা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। পশ্চিম বাঙলার অনেকগুলি বড় উপনগরী পরিকল্পনা এই তারিখের আগেই ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যারা পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদের জন্য রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে পড়ে হাবড়ার অশোকনগর, চাঁদমারির নিকটে অবস্থিত গয়েশপুর কলোনি এবং চাকদহে অবস্থিত খোসবাস মহল্লা ও হামিদপুর কলোনি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যারা এই তারিখের আগে পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদেরও নূতন হারে ঋণ দেওয়া হবে কিনা।

শ্রীখান্না চেয়েছিলেন এই বিষয় একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হক। তিনি এই বিষয়টি সম্বন্ধেও এই বিশেষজ্ঞ সমিতিকে পরামর্শ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই সমিতি সুপারিশ করেছিল যে এসব ক্ষেত্রেও নূতন হারে যে ঋণ প্রবর্তিত হয়েছে, তাই দেওয়া হক। অর্থাৎ তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন তাদের অতিরিক্ত ৭৫০৲ টাকা ঋণ দিতে।

এই প্রসঙ্গে নববারাকপুর কলোনির কথাও এসে পড়ে। এখানে নগর-পরিকল্পনারূপে কলোনিটির বিন্যাস রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই কলোনি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কৃষিজীবী পরিবারদের ৫০০৲ টাকা হারে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এদের সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠে যেহেতু এটি উপনগরীরূপে গড়ে উঠেছে, এখানে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের শহর অঞ্চলে প্রযোজ্য হারে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হবে কিনা। প্রশ্নটির মীমাংসার ভারও শ্রীখান্না বিশেষজ্ঞ সমিতির ওপর অর্পণ করেছিলেন।

এই সমিতি নববারাকপুর কলোনির অকৃষিজীবী পরিবারের জন্যও শহরাঞ্চলে দেয় হারে গৃহনির্মাণ ঋণ দেবার সুপারিশ করে। সেখানে ৩৩৬৫টি অকৃষিজীবী পরিবার ছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল তাদের জন্য ২৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ঋণ বরাদ্দ করতে হবে। এই শ্রেণীর সরকারী কলোনিগুলির জন্য অনুরূপভাবে ৬৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করবার প্রয়োজন হবে। বলা বাহুল্য বর্ধিত হারে এদের ঋণ দেবার সুপারিশ শ্রীখান্নার আনুকূল্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

(১১)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ যে স্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল ধুবুলিয়া রূপশ্রী পল্লী ও চাঁদমারীতে অবস্থিত তিনটি বড় আশ্রয় শিবির। তাতে মোট পরিবার সংখ্যা ছিল চার হাজারের ওপর। এই পরিবারগুলির অভিভাবকরা পুরুষ তবে বার্ধক্য, পঙ্গুতা বা অন্য কোন কারণে জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়ে এখানে সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছে। তাদের সঙ্গে তাদের ওপর নির্ভরশীল সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থাও ছিল। অনুরূপভাবে বিধবা মেয়েদেরও সন্তানসহ স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তাদের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছিল মেয়েদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজের ভারপ্রাপ্ত ডিরেকটরের ওপর।

এখন এই পরিবারগুলির অদূরভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল হবার ক্ষমতা ছিল না। তারা পরে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে একটি উপায়ে। তাদের ছেলেদের যদি লেখাপড়া শিখিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা

যায় তাহলে তখন তারা নিজেদের পরিবারেরও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিম্বা যদি পড়াশোনায় ভাল না হয় মাধ্যমিক পাঠ শেষ করে কারিগরি শিক্ষালাভ করে পরে কোথায় কাজ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

সরকারও এইভাবেই তাদের জন্য চিন্তা করেছিলেন এবং সেই কারণে অনুরূপ ব্যবস্থাও করেছিলেন। আশ্রয় শিবিরেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যারা পড়াশোনায় ভাল হত তাদের জন্য সরকারের খরচে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াবার ব্যবস্থা হত। যারা মাধ্যমিক পাঠ শেষ করে বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেওয়া হত। যারা পড়াশোনায় ভাল হত না, তাদের জন্য ছিল স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাদের কোন বৃত্তি শেখানর জন্য হয় বিভাগ পরিচালিত শিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান হত না হয় কোন কারখানায় শিক্ষানবিশ হিসাবে পাঠান হত। এই পথেই দীর্ঘকাল পরে তাদের পুনর্বাসনের সম্ভাবনা ছিল।

এইসব আশ্রয় শিবিরগুলিতে আশ্রিত পরিবারদের অতিরিক্ত কোন সুবিধা দেওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যে ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এখন অন্যভাবেও স্থায়ী আশ্রয় শিবিরবাসীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এবার তিনি নজর দিয়েছিলেন রানাঘাট রূপশ্রী পল্লী আশ্রয় শিবিরের প্রতি। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপিত প্রাচীনতম আশ্রয় শিবির। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে এটি পাকিস্তান হতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের অস্থায়ী আশ্রয়শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হত। ১৯৫০-এর বড় হাঙ্গামার সময়ও এটিকে অস্থায়ী আশ্রয়শিবির হিসাবে ব্যবহার করা হত। তখন এক সময় এখানে পাঁচ হাজার মানুষ থাকত। তারপরে যখন কুপার ক্যাম্পের আশ্রয় শিবির খোলা হয় তখন এটিকে জীবিকা অর্জনে অসমর্থ পুরুষদের পরিবারসহ বাস করবার জন্য স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পরিণত করা হয়।

এই পরিবারগুলির ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আশ্রয় শিবিরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তাদের স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে হত। এখন দেখা গেল এখানে এতগুলি পরিবার বাস করে যে তাদের মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত যত ছেলে আছে তাদের নিয়ে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা যায়। সুতরাং শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ভাবলেন এখানে বিদ্যালয় খুললে তাদের বাহিরে গিয়ে পড়তে হয় না। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

বলা বাহুল্য তাঁর কর্মক্ষমতার গুণে এখানে একটি বিদ্যালয় সত্য সত্যই গড়ে উঠল। সেই বিদ্যালয়টির উদ্বোধনের জন্য তিনি একটি উৎসবের আয়োজন

করলেন এবং তাতে পৌরোহিত্য করবার জন্য তদানীন্তন রাজ্যপাল সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করলেন। অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হয় ৫ই মার্চ ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে। আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ও সঙ্গে যান। পুনর্বাসন সচিব হিসাবে সে অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

উদ্বোধন উৎসবে ডঃ মুখার্জি এই ব্যবস্থার সুখ্যাতি করে একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। তারপর বিকাল গড়িয়ে যাওয়ায় উৎসবের শেষে আশ্রয় শিবিরের প্রাঙ্গণে একটু জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডঃ মুখার্জি ভারি রসিক মানুষ ছিলেন। চা খেতে বসে তিনি অতি সামান্য আহার করলেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল এত কম খেলে চলবে কি করে, তিনি পাল্টা জবাব দিলেন যে তিনি স্বল্পাহারী বলেই দীর্ঘজীবী হয়েছেন এবং সুস্থ আছেন। বলা বাহুল্য তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর। আমাদেরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন।

এদিকে একটা নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। তা তাঁর চরিত্রের একটি দিকের সুন্দর পরিচয় দেয়। সেই কারণে এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আশ্রয় শিবিরবাসী দুটি ছেলে এসে তাঁকে অটোগ্রাফ সই করতে অনুরোধ করল। তিনি কিন্তু সোজা বললেন, আগে এক টাকা দক্ষিণা দাও তবে সই পাবে, অমনি হবে না।

তিনি সারা জীবন নিজে উপার্জন করেছেন যথেষ্ট। নিজের জন্য যত খরচ করেছেন, তার অনেক বেশী অর্থ সঞ্চয় করে তিনি দান করে গেছেন। রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর উৎসবের ভূষণ হিসাবে এবং অন্যভাবে তাঁর মূল্য বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সেটিকে ব্যবহার করে নিতেন অর্থসংগ্রহের কাজে লাগিয়ে। এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ পরে দানে ব্যয় হত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল কোন বিবাহ উৎসবে নিমন্ত্রিত হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন যদি নিমন্ত্রক তাঁকে একটি নির্দিষ্ট হারে দক্ষিণা দেন। সেই রকম তাঁর ব্যবস্থা ছিল যে অটোগ্রাফের খাতায় সই নিতে হলে তাঁকে এক টাকা দক্ষিণা দিতে হবে।

এ নিয়মের তিনি কোথাও ব্যতিক্রম করতে চাইতেন না। তাই আশ্রয় শিবিরবাসী কপর্দকহীন বালকের অনুরোধেও তিনি বিনা দক্ষিণায় সই দিতে সম্মত হলেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তাঁর এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম না করা হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয় না; কিন্তু এই সমস্যার যেভাবে মীমাংসা হয়ে গেল তা প্রমাণ করে দেবে তিনি কতখানি বিচক্ষণ ছিলেন।

তিনি সই দিতে অস্বীকার করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল তা তখনি সমাধান হয়ে গেল আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ওপর যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তাই দিয়ে। তিনি তখনি হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে দুটো টাকা বার করে

বালকদুটির হয়ে দক্ষিণাস্বরূপ রাজ্যপালের হাতে দিলেন। তিনিও তাঁর প্রস্তাবিত শর্ত পালিত হওয়ায় ছেলে দুটির অটোগ্রাফের খাতায় সই দিলেন এবং তারাও খুশি হয়ে চলে গেল।

(১২)

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষে একটি জিনিস ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে পশ্চিম বাঙলায় নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠবে। তার মূলত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি ছিল তা ইতিমধ্যে পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার হয়ে গেছে। যেমন কলিকাতার মধ্যে এবং আশেপাশে যতখানি জমি ছিল তার প্রায় সবই জবরদখল্ল কলোনিতে ব্যবহার হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত এক লপ্তে চাষের জমি পাওয়া ক্রমশই শক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ উদ্বৃত্ত জমি পূর্বেই সব ব্যবহার হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল যাতে উদ্বাস্তুরা নিজেদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

এই চেষ্টা হতে পুনর্বাসন বিভাগে একটি নূতন পুনর্বাসন রীতি গড়ে উঠেছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল বায়নানামা পরিকল্পনা। নাম হতেই এ রীতিটি কি, সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়। যে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চায় তাকে নিজে চেষ্টা করে জমির সন্ধান করতে হবে এবং জমি পছন্দ হলে জমির মালিকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সরকারের নিকট জমি কেনবার ঋণের দরখাস্ত করতে হবে। সেই ঋণ মঞ্জুর হলে জমি হস্তান্তরিত হবার প্রমাণ দিয়ে গৃহনির্মাণ ঋণের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। তারপর গৃহ-নির্মাণ শেষ হলে আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে পুনর্বাসনের স্থানে চলে গেলে সে অন্য ঋণ পাবে। ইচ্ছা করলে গৃহনির্মাণের আগেও সে আশ্রয় শিবির ত্যাগ করতে পারবে।

এইভাবে ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই শেষের দিকে পুনর্বাসনের কাজ চলত। অর্থাৎ পুনর্বাসন উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত উদ্যমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে পুনর্বাসনের কাজ ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষে সত্যই মন্থর গতিতে চলেছিল। পূর্বাঞ্চলের সভায় এ বিষয় যে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন তা প্রধানত এই কারণেই ঘটেছিল।

সুতরাং পুনর্বাসনের জন্য নূতন পথ খোলবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার চেষ্টাও হয়েছিল। সেই চেষ্টা হতেই সালানপুরের ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বীরভূম জেলায়, বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে, বাঁকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশে অনেক পতিত ডাঙ্গা জমি ছিল যা অনুর্বর বলে অনাবাদী পড়ে থাকত। সেখানে

কোথাও বা পলাশ গাছ কিছু জন্মায়, কোথাও তাও জন্মায় না। কেবল বর্ষাকালে তা তৃণে আচ্ছাদিত হয়, তারপর যখন গরম পড়ে, ঘাস শুকিয়ে যায়। এই জমিগুলির উন্নতিসাধন করে যদি কৃষিযোগ্য করা যায়, তাহলে অনেক পতিত জমি পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়। তা চেষ্টা করে দেখা উচিত, এই বোধ হতেই সালানপুর পরিকল্পনার জন্ম।

সে পরিকল্পনার কথা ইতিপুর্বে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির যুগে তা যে অসাধ্য ছিল তা নয়। একজন কৃষি বিশেষজ্ঞের চেষ্টায় সালানপুরের ডাঙ্গা জমি কৃষিযোগ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু দেখা গিয়েছিল তাতে অনেক খরচ পড়ে। যদিই বা ভারত সরকার সে খরচ বহন করতে সম্মত হন, তার আরও বড় বাধা হল উদ্বাস্তুদের নিজেদের মানসিক বাধা। জায়গার প্রকৃতি এবং দেশের আবহাওয়া পুর্ববাঙলার অনুরূপ না হওয়ায় তারা এখানে পুনর্বাসন নিতে চাইত না। কাজেই এই ভাবে এ পরিকল্পনা সফল হল না। ফলে একটা বিরাট সম্ভাবনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। দণ্ডকারণ্যে পরবর্তীকালে ভারত সরকার পুর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের জন্য যে জমি দিয়েছিলেন বা এখনও দিচ্ছেন তার প্রকৃতি এর থেকে ভিন্ন নয়। সেখান থেকে অনেকে চলে এলেও অনেকে বাধ্য হয়ে থাকছে। স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এমনকি চাষের রীতিও পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তখন উদ্বাস্তুদের মন এতখানি সামঞ্জস্য সাধনের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

পুরাতন রীতিতে পুনর্বাসনের দ্বিতীয় মূল বাধা পশ্চিম বাঙলার মানুষের। এখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিপক্ষে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এদের মনোভাব দেখতে দেখতে কতখানি পরিবর্তিত হয়ে গেল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানি ১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় পুর্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য এদেশের মানুষের মন কাঁদত। তারা যখন দলে দলে বাস্তুত্যাগ করে এখানে আসত তাদের সেবা করবার জন্য কত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে সরকারের আশ্রয়-প্রার্থী যে উদ্বাস্তুরা দৈনিক হাজারে হাজারে আসত, প্রথম কয়েক মাস তাদের খাওয়ানর ভার এইসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই নিয়েছিল।

তারপর, বছরের পর বছর যেমন দিন গড়াতে লাগল, এদের প্রতি পশ্চিম বাঙলার মানুষের মনোভাব ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠল। সহানুভূতির পরিবর্তে দিনে দিনে বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এমন সময় এল যখন সরকারের ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা নানাভাবে ব্যাহত হতে লাগল। কোন খালি জমির সন্ধান পেয়ে যদি সরকারের পক্ষ হতে ভূমি সংগ্রহ আইন বলে তাকে নেবার চেষ্টা হয়, তা হলে নানাভাবে তার বিরুদ্ধে বাধা আসতে লাগল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারা উপর মহলে তদ্বির করে

প্রাণপণে জমি খালাস করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশ্য এরকম ঘটা স্বাভাবিক। দুভায়ের মধ্যে একভাই বেকার হলে অন্য ভাই তার দুরবস্থা দেখে প্রথম দিকে আশ্রয় দেবার জন্য কাছে টানে। তারপর যখন আবিষ্কার করে যে নিজের স্বার্থে টান পড়ছে, তখন সহানুভূতিবোধ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। তখন প্রথমত আচরণে বিরক্তিভাব আসে এবং পরে প্রকাশ্যে তা বিদ্বেষভাবে পরিণত হয়। এটা যে হওয়া স্বাভাবিক তা স্বীকার্য ; কিন্তু প্রশ্ন হল তা কি হওয়া উচিত ছিল ?

এইসব দেখে আমার মনে হয়েছিল গতানুগতিক পুরাতন পথে পশ্চিম বাঙলায় পুনর্বাসন আর ব্যাপক হারে সম্ভব নয়। তা বলে তো সমস্যা আমাদের ছেড়ে দেবে না। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু যখনি অত্যাচারিত হবে বা অভাবের তাড়নায় পড়ে অবহেলিত হবে, তখনি নিরাপত্তার আশায় বা শান্তির আশায় বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। সুতরাং এখানে এসো না বললেও তারা আসবে। কাজেই ভবিষ্যতে অনিশ্চিতকাল ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে একটা নূতন পথ খোলা ছাড়া উপায় ছিল না। সে পথ এমন হওয়া চাই যাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থে আঘাত না পড়ে ; যা তাদের সহিত সঙ্ঘর্ষ না ঘটিয়ে পশ্চিম বাঙলায় পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসন সম্ভব করবে। এবিষয় চিন্তা করে মনে হয়েছিল, তা হলে সে পথ হবে পশ্চিম বাঙলার মানুষের অব্যবহৃত বা অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা নেই এমন জমি উদ্ধার করে সেখানে উদ্বাস্তুদের নূতন উপনিবেশ রচনা করা।

এই পথে চিন্তা করেই আমার মনে হয়েছিল চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে যে সুন্দরবন পড়ে আছে, তারই অংশ উদ্ধার করে উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে। এই কাজ অতীতে যে হয় নি তা নয়। সুন্দরবনের বিস্তৃতি পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহনা হতে পূর্বে দক্ষিণ সাহাবাজপুর নদী পর্যন্ত। এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের তটভূমি হতে উত্তরে পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্যন্ত এককালে সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট বনভূমি তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত জেলার দক্ষিণ অংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল—পূর্বে বাখরগঞ্জ, মাঝে খুলনা এবং পশ্চিমে চব্বিশ পরগণা। এই সুন্দরবনের এক বিরাট অংশ কেটে তাকে কৃষিযোগ্য করে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল।

বাখরগঞ্জ জেলার সমগ্র দক্ষিণ অংশ জুড়ে যে সুন্দরবন তা সবই কেটে ফেলে আবাদি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। পটুয়াখালি মহকুমার দক্ষিণ জুড়ে যে বিস্তৃত বনাঞ্চল ছিল তা এখন গ্রামাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তার ফলে যে বিরাট খাসমহলের সৃষ্টি হয়েছে তার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বড় খাসমহল

আপিস খেপুপাড়ায় স্থাপিত হয়েছে। তার দক্ষিণে লতা চাপলির আশেপাশে একটু সংকীর্ণ জমি ছাড়া সব জায়গাই আবাদে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই জমি আবাদে পরিণত করা সহজসাধ্য হয় নি। এখানে আবাদ করতে একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। তা হল চাষের জমিকে সমুদ্রের লোনা জল হতে মুক্ত রাখা। কোটালের বানের সময় সমুদ্র স্ফীত হয়ে লোনা জল ক্ষেতে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার কোটালের বান সব থেকে মারাত্মক আকার ধারণ করে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে। কারণ তখন বর্ষাকালে নদীগুলি বর্ষার জলে একেবারে ভর্তি থাকে। তারপর যখন সমুদ্রের জল স্ফীত হয় তখন দুদিকের জলের সংঘাতে কোটালের জোয়ার সব থেকে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। সুতরাং তার থেকে জমি রক্ষা করতে এমন উঁচু বাঁধ দরকার যা এই ভরা বর্ষার বানকে রোধ করতে পারবে। বাখরগঞ্জ জেলায় এই ধরনের বাঁধ বেঁধে লোনা জল হতে আবাদী জমিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে তা কোথাও পাঁচ ফুটের ওপরে নয়।

মাঝে খুলনা জেলায় সুন্দরবনকে অক্ষত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হয়েছে এবং ফলে তা এখনও পুর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তার শোভা হৃদয়ঙ্গম হয় পুর্বে কচা নদী হতে বা পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী হতে দেখলে। ঘন দুর্ভেদ্য বনে তা নীল হয়ে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের রূপ নিয়ে দৃষ্টিকে অবরোধ করে। মনে রেখাপাত করবার মত দৃশ্য।

চব্বিশ পরগণা জেলায়ও সুন্দরবনের এক বিরাট অংশ কেটে আবাদে পরিণত করা হয়েছে। মোটামুটি দক্ষিণে যে সুন্দরবন ছিল তার প্রায় অর্ধেক অংশই কেটে ফেলা হয়েছে আড়াআড়িভাবে। পশ্চিমের দিকে আবাদী অংশের বিস্তার হয়েছে প্রায় সমুদ্র অবধি আর পুর্বের অংশে উত্তরে এখনও অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্বমহিমায় সুন্দরবন প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে একথা সত্য যে চব্বিশ পরগণায় সুন্দরবনকে সরিয়ে চাষের জন্য আবাদ শুরু করা হয় একটু তাড়াতাড়ি করে। এককথায় বলা যায়, গঙ্গানদী উত্তর থেকে যে পলিমাটি আনে তা হতে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন তা জলের তলায় স্তরের পর স্তরে সঞ্চিত হয়ে অদৃশ্য অবস্থায় গড়ে ওঠে। তারপর একদিন আসে যখন তা ভাঁটার সময় জলের ওপর মাথা তোলবার ক্ষমতা সঞ্চয় করে। তারপর বছরের পর বছর আরও পলি পড়ে তা ভরা বর্ষার কোটালের জল যতদূর ওঠে ততখানি উঁচু হয়। ঠিক তখনই তা আবাদের উপযুক্ত হয়।

কিন্তু আবাদী জমির চাহিদা এত বেশী যে মানুষ বেশী দিন তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। ছোট জোয়ারের সময় তা জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখলেই তাকে আবাদী জমিতে পরিণত করবার চেষ্টা হয়। জঙ্গল কাটা ছাড়া একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে

পড়ে। তা হল বানের জল হতে জমিকে রক্ষা করবার জন্য তার চারিপাশে বাঁধ নির্মাণ করা। জমি যত আগে উদ্ধার করা হয় বাঁধ তত উঁচু করতে হয়; কারণ পলি পড়ে ভাল করে ভরাট হবার আগেই তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কারণেই দেখা যাবে বাখরগঞ্জ জেলার বাঁধ হতে চব্বিশ পরগণা জেলার বাঁধগুলো বেশি উঁচু। বাখরগঞ্জ জেলায় তাদের উচ্চতা যদি সাধারণত পাঁচ ফুট হয় চব্বিশ পরগণায় তা হবে আট দশ ফুট উঁচু; কোথাও তারও বেশি। কত তাড়াতাড়ি যে চব্বিশ পরগণায় চর ভাল করে গড়ে ওঠবার আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল তা ডায়মণ্ড হারবারের সংলগ্ন ভাগীরথীর বাঁধ দেখলেই বেশ বোঝা যাবে। বাঁধ এখানে রাজপথের মত প্রশস্ত এবং তার পাশে শহর প্রায় পনর ফুট নিচে অবস্থিত।

অসময় বাঁধ দিয়ে কৃত্রিমভাবে সুন্দরবনের জমি উদ্ধার করলে অনেক সময় যে দারুণ বিপর্যয় ঘটে যায় তার সুন্দর উদাহরণ হল তাম্বুলদহ অঞ্চলের বাঁধ। এই জায়গাটি ক্যানিং উপনগরীর খুব নিকটে মাতলা নদীর বাঁকের মুখে অবস্থিত। সম্ভবত ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তার বাঁধ বানের জলে ভেঙে গিয়ে সমগ্র অঞ্চলটি সমুদ্রের লোনা জলে প্লাবিত হয়ে যায়। তারপর শুরু হয়েছিল জোয়ার-ভাঁটার তাণ্ডবলীলা। জোয়ারের সময় বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে যে জল ঢোকে, ভাঁটার সময় তা প্রবল গতিতে আবার বাহিরে নির্গত হয়। এইভাবে দিনে দুবার তাদের আক্রমণে বাঁধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে শুধু বাঁধ নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্ষতি হয় না, মাটিতে লবণের আস্তরণ পড়ে পড়ে তা আর কৃষিযোগ্য থাকে না।

সুতরাং সুন্দরবনের জমিকে আবাদী অঞ্চলে পরিণত করা বেশ শক্ত কাজ। নির্বাচিত জমির চারিধারে প্রয়োজনমত উঁচু বাঁধ শুধু বাঁধলে হবে না, তার জঙ্গল পরিষ্কার করাও রীতিমত কষ্টসাধ্য কাজ। সুন্দরবন অঞ্চলে সাধারণত গরাণ আর সুঁদরী গাছ হয়। এ গাছগুলি উচ্চতায় বেশি বড় হয় না, তবে লোণা জলের মধ্যে জন্মায় বলে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাদের শিকড় হতে কাটির মত খোঁচা খোঁচা ডাল গজিয়ে উর্ধ্ব দিকে ওঠে। ফলে জঙ্গল দুর্ভেদ্য আকার ধারণ করে। একেই তো গাছগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে জন্মায়; তার ওপর এই উর্ধ্বমুখী শিকড়গুলি তাকে আরও দুর্গম করে তোলে। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করা রীতিমত কষ্ট ও পরিশ্রম সাপেক্ষ।

আরও একটা বড় প্রশ্ন রয়ে যায়। তা হল কি ধরনের জমি আবাদে পরিণত করবার জন্য নির্বাচিত হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে নদীগুলির মোহনায় বছরের পর বছর ধরে পলি পড়ে নিত্য নূতন জমির সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের সবগুলিই তো চাষের উপযুক্ত হয় না। ফ্রেজারগঞ্জের ঠিক দক্ষিণে চর পড়ে এক প্রকাণ্ড দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা এখনও আবাদে পরিণত হবার উপযুক্ত হয় নি।

যে জমি যত অপরিণত অবস্থায় উদ্ধার করা হবে, তার তত উঁচু বাঁধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ বাঁধ এতখানি উঁচু করতে হবে যাতে বর্ষাকালের কোটালের বান জমির মধ্যে না প্রবেশ করতে পারে। যত পুরাতন চর হবে বাঁধ ততই ছোট হবে। অপরপক্ষে অপরিণত অবস্থায় বাঁধ দিলে বড় বানের আক্রমণে হঠাৎ বাঁধ ভেঙেচুরে দিয়ে সমগ্র এলাকা একদিকে প্লাবিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাম্বুলদহের দুর্দশা তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সুতরাং সুন্দরবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সফল করতে হলে সব থেকে বেশি সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন জমি নির্বাচনে। যে জমি পলি পড়ে যথেষ্ট উঁচু হয় নি তাকে উদ্ধার করে বসতি স্থাপন করলে ভবিষ্যতে আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই কারণে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পর আমি খবর পেয়েছিলাম যে সুন্দরবনের অনেক এলাকা এমন আছে যেখানে পলি পড়ে পড়ে জমি এত উঁচু হয়ে গেছে যে বর্ষাকালের কোটালের বানেও সেখানে লোনা জল প্রবেশ করতে পারে না। এই ধরনের জমি সম্পূর্ণভাবে আবাদের যোগ্য হয়েছে। হাড়োয়া থানার দক্ষিণে এমন জায়গা মিলবে। তার দক্ষিণে অনেক অংশ এত উঁচু হয়েছে যে সেখানে নিচু বাঁধ দিয়ে জমিকে লোনা জল হতে মুক্ত রাখা যায়। কাজেই এমন জমিতে উপনিবেশ স্থাপন করলেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ থাকে না।

সুতরাং আমার মনে হয়েছিল সুন্দরবনের এই ধরনের উঁচু অংশকে উদ্ধার করে সেখানে পুনর্বাসন সম্ভব। তার কারণ এ জমি উর্বর এবং এখানকার আবহাওয়া পূর্ববঙ্গের অনুরূপ। সুতরাং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করবার অবকাশ নেই। জমি একবার জঙ্গলমুক্ত হয়ে আবাদের যোগ্য হলে তাতে ভাল ধান ফলবে, কারণ পলিমাটি দিয়ে গড়া এই জমি পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চলের মতই উর্বর। দ্বিতীয়ত জলহাওয়া পূর্ববঙ্গের অনুরূপ হওয়ায় যাদের পুনর্বাসনের জন্য পাঠান হবে তাদের সহজেই মন বসবে, কলোনি ত্যাগ করবার ইচ্ছা হবে না। তৃতীয়ত, আরও বড় কথা, সমগ্র এলাকা জুড়ে নূতন আবাদ অঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাদের আরও উৎসাহিত করবে। এ যেন নূতন দেশ গড়ে তোলার সমস্থানীয় হবে। তাতে যারা পুনর্বাসনে আসবে তাদের উৎসাহের সীমা থাকবে না।

এই ব্যবস্থার সব থেকে সুবিধা হল এই যে পশ্চিম বঙ্গবাসীর দখলে বা স্বত্বাধিকারে যে জমি আছে তাকে স্পর্শ করতে হয় না। একেবারে সরকারের অধিকারে প্রকৃতিপ্রদত্ত যে জমি পড়ে আছে সেখানেই এদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। সুতরাং এইভাবে পুনর্বাসন হলে পশ্চিম বাঙলার মানুষের বিরক্তি-ভাজন হতে হবে না এবং এই রীতি অনুসারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে তাদের বাধা দেবারও কোন সঙ্গত কারণ থাকবে না।

লোকসানের দিক থেকে বিবেচনা করলেও এ ব্যবস্থা সামগ্রিক ভাবে দেশের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে যে সংরক্ষিত বন আছে তার পরিমাণ প্রায় পনর শ' বর্গ মাইলের মত। তা হতে মাত্র কয়েক শ' বর্গ মাইল পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হবে। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে যে পশ্চিম বাঙলা ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চল এবং তার যে বনসম্পদের প্রয়োজন আছে, তার থেকে তার সংরক্ষিত বনের পরিমাণ কম।

সে কথা ঠিক; কিন্তু তারও মীমাংসা করা সম্ভব। পশ্চিম বাঙলায় বিভিন্ন জেলায় এমন অনেক ডাঙ্গা পতিত জমি আছে, যা আবাদযোগ্য নয়। বীরভূম জেলা, বাঁকুড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ এবং বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে এমন অনেক জমি পড়ে আছে। বছর দশেক আগে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। সেখানেও এই ধরনের অনেক জমি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। এগুলি যদি আবাদযোগ্য করা যেত, তাহলে পুনর্বাসনের সমস্যা সহজ হয়ে যেত। সালানপুরে পরীক্ষামূলকভাবে সে চেষ্টা করাও হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত· এমন জমি স্বভাবতই অনুর্বর বলে তাকে কৃষিযোগ্য করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, তার আবহাওয়া পূর্ব বাঙলা হতে ভিন্ন ধরনের হওয়ায় সেখানে পুনর্বাসন নেবার একটা অনিচ্ছা দুর্বার মানসিক বাধা হিসাবে কাজ করে।

অপর পক্ষে এই বিরাট অনাবাদী অঞ্চলগুলি যে কোন কাজে লাগান যায় না, তা নয়। এই ধরনের জায়গায় শালগাছ জন্মায় অন্য গাছও জন্মায়। এই সব জমিতে নূতন বন গড়ে তুলে দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। এই ডাঙ্গা জমিগুলির কিছু অংশ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে বনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। কিন্তু অর্থের অভাবে ব্যাপকভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এখন এই দুটি দিক এক করে দেখলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই রকম। এক দিকে প্রচুর পতিত জমি পড়ে রয়েছে যা কৃষিযোগ্য করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ যাকে বনে রূপান্তরিত করা যায়। আর এক দিকের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বন রয়েছে, কিন্তু সে জমি উর্বর হওয়ায় তার বন কেটে তাকে সহজেই কৃষিযোগ্য করা যায়। এই জমি কৃষিযোগ্য করলে উদ্বাস্তুদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের কিছু অংশের বনকে কেটে সরিয়ে ফেলে তাকে আবাদে পরিণত করলে যেটুকু বনসম্পদ নষ্ট হবে তাকে পুনরুদ্ধার করা যায় যদি সমপরিমাণ পশ্চিম অঞ্চলের ডাঙ্গা জমিকে বনে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ বন যাবে সেই অঞ্চলে যেখানে আবাদ হয় না, আর মানুষ বসবে বন কেটে যে জায়গা আবাদযোগ্য করা হবে সেইখানে।

এখন প্রশ্ন হল বনকে পশ্চিম অঞ্চলে সরাতে যে ব্যয় হবে তা কোথা হতে আসবে। তারও সমাধান আছে। সুন্দরবনের সমস্ত জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব সম্পত্তি। উদ্বাস্তুদের বসাতে যে জমি সংগ্রহ করা হয় তার ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকার টাকা দিয়ে থাকবেন। ভারত সরকার এক বিঘা জমির জন্য একশ' টাকা পর্যন্ত ক্ষতি পুরণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং জমির মালিকানা বাবদ প্রতি একরে যে তিন শ' টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পতিত ডাঙ্গা জমিকে বনে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

সুতরাং এই ব্যবস্থায় সব দিক থেকেই সুবিধা। প্রথমত উদ্বাস্তুদের এমন জায়গায় বসান সম্ভব হবে যা সরকারের নিজস্ব খাস জমির অন্তর্ভুক্ত। তা অধ্যুষিত অঞ্চলের বাহিরে থাকায় পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিম বাঙলার মানুষকে নিজের জমি হতে বঞ্চিত করা হবে না। তার আবহাওয়া এমন যে উদ্বাস্তুরা তার সহিত পরিচিত এবং তা উর্বর হওয়ায় কৃষিকে ভিত্তি করে নূতন উপনিবেশ গড়ে তোলা সহজসাধ্য। তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে কিছু বনসম্পদ নষ্ট হবে। কিন্তু তার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে সেই অর্থে দেশের পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরাট পতিত জমি পড়ে রয়েছে সেখানে নূতন বন গড়া যাবে।

এই সব দিক বিবেচনা করে মনে হয়েছিল নূতন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের এই পথে ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই। সেই উদ্দেশ্যে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও বন বিভাগের নিকট পরীক্ষামূলকভাবে এই সুন্দর-বন অঞ্চলে একটি উপনিবেশ গড়বার জন্য জমি চেয়েছিলাম। আমি জমি চেয়েছিলাম সুন্দর বনের উত্তর দিক ঘেঁষে; কারণ সে অঞ্চলে পলি পড়ে মাটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের সম্মতি পেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। তাঁরা ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ৩৬০০ একর জমি পুনর্বাসনের জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু সে জমি দেওয়া হল দক্ষিণ ঘেঁষে বাসন্তীর কাছে হেড়োভাঙ্গায়।

এদিকে আমার চলে যাবার সময় এগিয়ে আসছিল। অগত্যা এইখানেই একটি পরিকল্পনা রচনার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই জমি ক্যানিংএর দক্ষিণে মাতলা নদীর ধারে অবস্থিত। বাসন্তী থানার অন্তর্ভুক্ত হোড়োভাঙ্গা, ঝাড়খালি এবং নস্করপুর—এই তিন মৌজা নিয়ে এই জায়গা। এ ধরনের পরিকল্পনায় অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, এখানে লোনা জল আটকাবার জন্য বাঁধের ব্যবস্থা রাখতে হবে, পানীয় জলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে নলকূপ খুব গভীর না হলে মিষ্টি জল পাওয়া যায় না; কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাই পানীয় জলের জন্য দীঘির ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর বাসের উপযোগী করতে হলে জমিকে উঁচু করতে হবে তবে ভিটে জমি মিলবে। সবার উপর জঙ্গল কাটার সমস্যা তো আছেই।

এই সব সমস্যার কথা চিন্তা করে পরিকল্পনায় বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। উপনিবেশকে বেড় দিয়ে যে বাঁধ করা হবে তা বাহির হতে লোনা জলের প্রবেশ বন্ধ করবে। অতিরিক্তভাবে তাকেই যোগাযোগের পথ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন পানীয় জলের জন্য দীঘি কাটা দরকার, সেই দীঘির মাটি দিয়েই জমি ভরাট করে ভিটে জমি গড়ে তোলা যেতে পারে। সুতরাং বাঁধের বিভিন্ন স্থানে তার সংলগ্ন এলাকায় দীঘি কেটে বিভিন্ন বাসোপযোগী অঞ্চল গড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর অভ্যন্তরভাগের জমিকে চাষের জন্য ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ সম্পর্কে জঙ্গল কাটা ও মাটি কাটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু শ্রীখান্নার আনুকূল্যে তার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বুলডোজার দিয়ে গাছকাটা, মাটি কাটা এবং মাটি সমান করা সহজ। ড্রাগ লাইন এক্সক্যাভেটার দিয়ে দীঘি কাটাও সহজ। দুই ধরনের যন্ত্রই আমাদের কেনা হয়ে গিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সরকারী কাজ ত্যাগ করবার সময় এগিয়ে আসায় আমি এই পরিকল্পনা সরকারের কাছে স্থাপন করার অতিরিক্ত কিছু করতে পারি নি। তবে আমার বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়াকে বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে যদি পশ্চিমবাঙলার মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এই পথেই করতে হবে। সেই দিক থেকে এই নূতন পরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরে জেনেছি, এই পরিকল্পনা আংশিকভাবে কাজে পরিণত করা হয়েছিল এবং তা মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পুনর্বাসন রীতি পরিবর্তিত হওয়ায় বাকি অংশে আর নজর দেওয়া হয় নি।

(১৩)

বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমার একটি বোঝাপড়া হয়েছিল যে ১লা এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখ হতে আমার সরকারী চাকুরী ত্যাগের পত্র গৃহীত হয়ে কার্যকর হবে। মার্চ মাস আসলে আমি সে বিষয় তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। আমাকে জানান হল যে সেই মতই ব্যবস্থা চলছে এবং ঠিক সময়েই আমি চাকুরী জীবন হতে মুক্তি পাব।

১৪ই মার্চ তারিখে রাত্রে আমাদের জয়েণ্ট কমিশনার শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। উপলক্ষ্য, তাঁর পুত্রের বিবাহ সম্পর্কিত উৎসব। সেখানে শ্রীমতী রায় এবং মুখ্যসচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় উভয়েই নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরায়ের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে আমাকে সংবাদ দিলেন, আমার চাকুরী ত্যাগের অনুমতি ভারত সরকার হতে সেই দিনই এসে গেছে। কাজেই ১লা এপ্রিল হতে আমার মুক্তি সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে এই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবার

জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করলেন, ভালই হল, তুমি উঁচু হারের আয়কর হতে রেহাই পেলে। বলা বাহুল্য, তখন লোকসভার বাজেট অধিবেশন চলছিল এবং তাতে আয়কর বৃদ্ধির প্রস্তাব ছিল।

পরের দিন সকালে একটি বিষয় আলোচনার জন্য অন্য অফিসারদের সঙ্গে ডাঃ রায়ের ঘরে গিয়েছিলাম। আলোচনা শেষ হলে আমি যখন উঠে চলে আসছি তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। ইতিমধ্যে অন্যেরা সেখান হতে চলে গেছেন। তিনি সোজা আমাকে বললেন, হিরণ, তুমি চলে যেও না, থাকো। বরং তোমায় কিছুদিন ছুটি দিচ্ছি, ঘুরে এসো।

এমন কথার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি মুখ্যসচিবের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলাম আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। যাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করি তাঁর কথা ঠেলা যায় না। আমি তাই তাঁকে বললাম, স্যার, আপনি যা বলবেন, তাই হবে, তবে তার আগে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, তোমার কথা শুনব। কখন শুনব, পরে জানাব।

আমি তখন নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। আধ ঘণ্টা বাদে তাঁর কাছ হতে ফোন এল। তিনি বললেন, আজ সন্ধ্যায় অ্যাসেমব্লিতে আমার ঘরে তুমি অপেক্ষা কোরো। সেখানে তোমার কথা শুনব। তখন রাজ্যবিধান সভার বাজেট অধিবেশন চলছিল। প্রতিদিন বিকাল ৩টা হতে রাত ৭টা পর্যন্ত তাঁর সেখানেই কাটত।

আমি সন্ধ্যা ৭টার কিছু আগে তাঁর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথাসময় বিধানসভা ভাঙবার ঘণ্টা বাজল। একটু পরেই ডাঃ রায় ঘরে এলেন। তিনি বললেন, কি বলবে বল।

আমি মুখ খোলবার আগেই কিন্তু তিনি বললেন, তুমি কি বলবে আমি জানি। তুমি বলবে, তুমি লেখাপড়া করবে, মুক্তি চাই। আমি বলি তোমার লেখাপড়া এখন ধামাচাপা থাক। আমি তোমাকে চাই, খান্নাও তোমাকে চায় তুমি থাকো। তোমায় ছুটি দিচ্ছি, কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে এসো।

এরপর আমি বলি কি ? আমার কথা তো তিনি নিজেই বলে বসলেন। যেমন স্নেহসিক্ত সুরে কথাগুলি বললেন, তেমন জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন আমাকে তিনি ছাড়তে চান না। তারপর আমার বুঝতে বাকি রইল না যে আমার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত অশোভন হবে। যাঁর সঙ্গে কাজ করে, যাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তাঁর কথা ঠেলা আমার অসাধ্য বোধ হল। হৃদয়ের আবেগে আমি একরকম

বাকশক্তি হারালাম। আমি শুধু বললাম, আপনি যা বলেছেন, তাই হবে স্থির।

পরের দিন সকালের দিকেই মুখ্যসচিব আমাকে বললেন, চার মাসের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে ; কারণ ডাঃ রায়ের কাছ থেকে সেই মর্মে নির্দেশ এসেছে। বুঝতে পারলাম আগের দিনের কথামত আমার ছুটির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দিয়েছেন।

এইভাবে আমার চাকুরী হতে প্রত্যাশিত মুক্তি পাওয়া ঘটল না। পরবর্তী জীবনের কথা ভাবলে মনে হয়, তাতে বোধহয় আমি লাভবান হয়েছি। ছুটির পর কাজে যোগ দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই আবার ডাঃ রায়ের নিজের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল কাজ করতে পেরেছি। পশ্চিম বাঙলাকে নূতন করে গড়ে তোলবার মহৎ ব্রতে এই অনন্যসাধারণ কর্মবীরের কাজে সহায়তা করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

সুতরাং চাকুরী হতে একেবারে মুক্তি না পেয়ে ১লা এপ্রিল হতে আমি চার মাসের ছুটি পেলাম। মানসিক বিশ্রামের জন্য আমি কর্মক্ষেত্র হতে যতখানি সম্ভব দূরে যেতে চেয়েছিলাম। তাই আমার ছুটি কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছিল কাশ্মীর উপত্যকায়। প্রথমে শ্রীনগরে পরে পাহালগামের মনোরম পরিবেশে ছুটির বেশির ভাগ সময় কাটে। জুলাইএর গোড়ায় আমি কলিকাতায় ফিরে আসি।

তখনও ছুটির প্রায় একমাস সময় হাতে ছিল। ভেবেছিলাম ওই সময়টা কলিকাতাতেই কাটাবো। কিন্তু তা সম্ভব হল না। জুলাইএর প্রথম দিকে একদিন হঠাৎ ডাঃ রায় ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে হাজির হবার পর জানতে পারলাম, এক নূতন পরিস্থিতি ঘটায় আমার তখনই কাজে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এইভাবে। মুখ্যসচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের চার মাস ছুটিতে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁর ছুটির সময় শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার মুখ্যসচিবের কাজের ভার নেবেন ঠিক হয়। তিনি তখন ছিলেন পরিবহণ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল। তাঁর জায়গায় পাঠানোর প্রস্তাব হয় আমার স্থলে যিনি পুনর্বাসন বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁকে। কাজেই পুনর্বাসন সচিবের পদ পূরণ করবার সমস্যা ওঠে। ডাঃ রায় বাকি ছুটি ভোগ না করে আমাকে ১৮ই জুলাই হতে পুনর্বাসন বিভাগের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিলেন। এইভাবে ছুটির পর পুনর্বাসন বিভাগেই ফিরে এলাম।

(১৪)

পুনর্বাসন বিভাগে ফিরে এসে দেখি একটি তাৎপর্যপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। সরকার নূতন নীতি গ্রহণ করেছেন যে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের পরে

যারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেবেন না। বোঝাই যায় কেন এই নীতি গ্রহণ করা হল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে পুর্ববাঙলার উদ্বাস্তু এখন অবাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর পক্ষে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায়। পশ্চিম বাঙলার মানুষের ওপরেই ভোটের জন্য নির্ভর করতে হবে। সুতরাং তারা যা চায় না, তা না করাই পার্টির স্বার্থে প্রয়োজন। সহজেই অনুমান করা যায় যে এই কারণেই নীতির পরিবর্তন হয়েছিল। আমি সরকারী কর্মচারী, আমি নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। কাজেই এবিষয় কিছু করবার অবকাশ আমার ছিল না। যেটুকু চেষ্টা করে ছিলাম, তাতে বুঝেছিলাম এচেষ্টায় কোন ফল হবে না।

যাই হোক আমার চোখের কাছে যে সমস্যা তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তাতেই মন দিতে হয়েছিল। তা হল নূতন যারা আসছে এবং সরকারের ওপর আশ্রয়ের জন্য নির্ভর করছে, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের অকটোবরে পাসপোর্ট প্রবর্তিত হওয়া সম্পর্কে যে বিরাট সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছিল তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাদের আগমনের হার অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। ফলে আমরা পুনর্বাসনের কাজে হাত দিতে পেরেছিলাম। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুন অবধি এইভাবেই চলেছিল এবং ফলে আশ্রয় শিবিরে নূতন উদ্বাস্তুর ভর্তির হার খুব কমে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তাদের আগমনের হার হঠাৎ বাড়তে আরম্ভ করল। কেন যে বাড়ল তার কারণ ঠিক করা যাচ্ছিল না। ডিসেম্বর মাসে তাদের আগমনের হার কিছু কমেছিল, কিন্তু থেমে যায় নি। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চে তা কমে দৈনিক ১০০ জন মানুষে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ দৈনিক কুড়িটি পরিবারকে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। তার মানে মাসিক ছ'শ'টি পরিবারের জন্য আশ্রয় দানের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অবশ্য সংখ্যাটা এমন কিছু বেশি নয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তার থেকে বহুগুণ বেশী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অবস্থা এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রথমত, পুর্বে যে জায়গাগুলি আশ্রয় শিবিরের জন্য ব্যবহৃত হত, সেগুলি হয় উঠে গেছে, না হয় অসমর্থ পুরুষদের বা অভিভাবকহীন মেয়েদের জন্য স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পরিবর্তিত হয়েছে। বেশ কিছু দিন আগে আমরা এক নূতন নীতি গ্রহণ করেছিলাম যে নূতন আশ্রয় শিবির না খুলে নূতন আগত আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের সোজা ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে মাটির কাজ হচ্ছে সেখানে তাঁবুতে আশ্রয় দিয়ে উদ্বাস্তুদের রাখা হত বলে তাদের জন্য আশ্রয় শিবিরের নির্দিষ্ট স্থান রাখার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সকল সম্ভাব্য মাটির কাজের জন্য যত উদ্বাস্তুর প্রয়োজন তা

ইতিমধ্যেই মিলে যাওয়ায় নূতন আশ্রয়প্রার্থীদের আর এই পরিপকল্পনায় কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদের পুরাতন রীতি অনুসারে আশ্রয় শিবির খুলতে হয়েছিল।

এখন নূতন আশ্রয় শিবির খুলতে খোলা জমির প্রয়োজন হয়। এখন আর অস্থায়ী ঘর বাঁধবার প্রথা নেই। তাঁবুতেই আশ্রয় দেওয়া সম্ভব। তবু নূতন আশ্রয় শিবির খুলতে যা একান্তই প্রয়োজনীয় তা হল তাঁবু খাটাবার একটি প্রশস্ত খালি জায়গা এবং এই ধরনের জায়গা সংগ্রহ হলে সেখানে প্রয়োজন মত কতকগুলি নলকূপ বসান এবং অস্থায়ী স্যানিটারি পায়খানা স্থাপন। সুতরাং আমাদের হাতের সমস্যার সমাধানের জন্য সব থেকে প্রয়োজন হল আশ্রয় শিবির স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ করা।

কাজেই ছুটির পর পুনর্বাসন বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আমার প্রথম কাজ হল নূতন আশ্রয় শিবিরের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং তার দখল নেবার ব্যবস্থা করা। তাই আশ্রয় শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ডিরেকটার মেজর পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে আশ্রয় শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে হয়েছিল। জায়গাটি এমন হওয়া চাই যে বর্ষার জলে তা ডুববে না, কারণ সারা বছর মানুষের তাকে আশ্রয় করে বাস করতে হবে। তারপর তার অবস্থিতি এমন হওয়া চাই যাতে সংযোগ রক্ষা করা সহজ হয়। কারণ উদ্বাস্তুদের সেখানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর প্রতি সপ্তাহে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করতে হবে। সুতরাং পাকা রাস্তায় বা রেলপথে তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হওয়া চাই।

এইভাবে ডিরেকটারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সম্ভাব্য জমি নির্বাচন করে সেগুলি দখল নেবার ব্যবস্থা করা হল। যে হারে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে হচ্ছে তার ভিত্তিতে সামনের তিন মাসের প্রয়োজনের একটি আনুমানিক হিসাব করে জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হল। সেই অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তাঁবু সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হল। এই অবশ্য করণীয় দায়িত্ব সম্পাদন করে তারপর অন্য বিষয়ে নজর দিতে পারলাম।

(১৫)

তাহেরপুর কলোনির ভার আমাদের বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিয়েছিলেন। তিনিই এখানকার উদ্বাস্তু পরিবারগুলির অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন এবং মন্ত্রী মহোদয়ার তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। আমার সঙ্গে সংযোগ তাঁর বিশেষ ছিল না। এদিকে কয়েকমাস ছুটিতে থাকায় তাহেরপুর সম্বন্ধে ভালরকম অবহিত ছিলাম না। অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীমতী রায় জানালেন যে তিনি ১৫ই অগাস্ট

তারিখে তাহেরপুর কলোনি পরিদর্শনে যাবেন; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি আরও জানালেন তাঁর ইচ্ছা আমি যেন তাঁর সঙ্গে যাই। আমি তখনই যাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। কারণ উদ্বাস্তু কলোনিতে তিনি পরিদর্শনে গেলে আমার সঙ্গে থাকা কর্তব্য।

আমি আভাস পেয়েছিলাম, যে তাঁর আগমনকে উপলক্ষ্য করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। কোথায় মহিলা সমিতি খোলা হবে, কোথায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হবে, কোথায় উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সবগুলিতেই তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ ঘটবে এইরকম ভাবেই ব্যবস্থা হয়েছিল। সুতরাং আমার ধারণা হয়েছিল তাহেরপুরের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং এখানকার মানুষের কাছে শ্রীমতী রায় খুব ভাল ব্যবহার পাবেন।

কিন্তু মানুষের অনুমান যে সময় সময় কতখানি ভ্রান্ত হয় তার পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন তাহেরপুরের অভিজ্ঞতা হতে। সেখানে ইতিমধ্যে নূতন রেল স্টেশন খোলা হয়ে গেছে। কাজেই রেলগাড়িতে গিয়ে আমরা সেখানে নামলাম। আগে নিকটতম রেল স্টেশন ছিল বীরনগর। তা এই কলোনি হতে প্রায় দু মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি ছিলাম। স্টেশন রাস্তার যে পাশে অবস্থিত তার অপর পাশেই তাহেরপুর কলোনি প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। স্টেশনে স্থানীয় অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন, কিছু পুলিশ অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। কলোনির প্রতিনিধিরাও তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তখনও বুঝতে পারি নি পরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে।

কলোনিতে প্রবেশ করবার পরেই কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। প্রথম যেখানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে শ্রীমতী রায় সেই দিকে যেমন এগিয়ে যেতে লাগলেন তার চারিপাশে অনেক কলোনিবাসী জমা হল। তাদের আচরণে উত্তেজনার ভাব পরিস্ফুট। তাদের অনেকে তাঁর সম্পর্কে তিরস্কার-সূচক ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। ইতিমধ্যে তিনি উৎসবের প্রাঙ্গণে এসে পড়লেন। তিনি অনেক কালের সমাজকর্মী এবং কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত। তাঁর মানসিক বলও অসাধারণ। তিনি এই অপমানসূচক ব্যবহার সত্ত্বেও প্রথম অনুষ্ঠানে তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করলেন; কিন্তু তারপরেও যখন কলোনিবাসীদের আচরণে পরিবর্তন ঘটল না, তাদের ব্যবহার তাঁর সহ্যক্ষমতা অতিক্রম করল। তখন তিনি রেল স্টেশনে ফিরে যেতে চাইলেন। স্থানীয় অফিসারদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে সেখানেই ফিরিয়ে পাঠান হল। এদিকে আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ব্যবস্থা ছিল যে তিনি সবগুলিতে

প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কিন্তু নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে তিনি আমাকে সে অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করতে অনুরোধ করলেন।

সুতরাং আমি পেছনে রয়ে গেলাম। স্থানীয় অফিসার এবং পুলিশ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে তিনি যে রেল স্টেশনে নিরাপদে থাকবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং বাকি অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করতে কলোনির মধ্যে যেতে সম্মত হলাম। তখন স্থানীয় উদ্বাস্তু নেতারা একে একে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জায়গায় আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি নিতান্তই কর্তব্য পালনের অনুরোধে একে একে সবগুলি অনুষ্ঠান শেষ করলাম। পূর্বের অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের মন এমন খারাপ করে দিয়েছিল যে, না আমি, না স্থানীয় অধিবাসী, সে অনুষ্ঠানগুলিতে কোন আনন্দ পেলাম। তবে কার্য-সূচী অনুসারে সব অনুষ্ঠানগুলি এইভাবে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হওয়ায় যাঁরা তার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের কিছু পরিমাণে তৃপ্তি হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানের পর্ব শেষ করতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। ঘণ্টা দেড়েক মত হবে। এদিকে আমার মন পড়ে রয়েছে রেল স্টেশনে, কারণ শ্রীমতী রায়ের জন্য আমি মনে মনে উদ্বিগ্ন ছিলাম। ফিরে গিয়ে দেখি তিনি একটি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে হাত পাখার সাহায্যে বাতাস করা হচ্ছে। তিনি ইতিমধ্যে মনকে সংযত করে ফেলেছেন, মনে হল, তবু তাঁর চোখেমুখে তখনও গভীর বেদনার ভাব ফুটে রয়েছে দেখলাম। আমার মন আরও খারাপ হয়ে গেল; কিন্তু কিছু করবার ছিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ফিরবার ট্রেন স্টেশনে এসে থামল। তাতে উঠে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। উদ্বাস্তু ভাইদের আচরণে অভদ্রতা আমার অভিজ্ঞতায় ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। নানা অভাব অভিযোগের তাড়না সত্ত্বেও তারা সংযত আচরণ করতে অভ্যস্ত। সেদিন যে কেন এমন ঘটল আমার কাছে এখনও তা রহস্যই রয়ে গেছে।

(১৬)

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে কেউ ঠেকে শেখে আর কেউ দেখে শেখে। যিনি বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী তিনি বিপদের সম্ভাবনা অনুমান করে নিয়ে বা অন্যের উদাহরণ দেখে শেখেন। আর যিনি চোখ বুজিয়ে একটি নূতন জিনিসের আকর্ষণ বিবেচনা না করে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হন, তাঁর ভাগ্যে ঠেকে শেখা ছাড়া গতি নেই। আমাদের বিভাগ সংক্রান্ত একটি ব্যাপার নিয়ে একটি দারুণ ট্র্যাজিডির মধ্য দিয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষকে ঠেকে শিখতে হয়েছিল।

যে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা হতে এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটি ঘটেছিল তার বিষয় কিছু প্রাথমিক তথ্য স্থাপন করা এখানে প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় অডিট এণ্ড একাউণ্টস্ সার্ভিস-এর বিচক্ষণ অফিসার শ্রীঅশোককুমার চন্দ তখন অডিটর জেনারেল-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর কাছে একটি অভিনব প্রস্তাব দিলেন যে সরকারের যে ব্যয় হয় তার ব্যয়ের পূর্বেই নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে নানা সুবিধা আসে, যেমন অপব্যয় বন্ধ হয়, ফলে ব্যয় সঙ্কোচ হয় ইত্যাদি। যে ব্যবস্থা চালু ছিল এটি তার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। সাধারণ ব্যবস্থা হল বাজেটে ব্যয়ের বরাদ্দ থাকলে যে বিভাগ ব্যয় করবে তা প্রস্তাব দেবে এবং অর্থবিভাগ প্রস্তাব সরকারের আদেশের অন্তর্ভুক্ত কিনা, বাজেটের বরাদ্দ অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা ইত্যাদি দেখে সে প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন। তারপর অর্থব্যয়ে কোন বাধা থাকবে না। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে তার অতিরিক্তভাবে অডিট আপিসে টাকা দেওয়ার আগে তার অডিটের ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রে টাকা আদায়ের জন্য যে বিল হবে তা অডিট আপিসে পাঠাতে হবে, সেখানে পাশ হবে তারপর টাকা দেওয়া যাবে। সাধারণত অডিট হয় টাকা খরচ হবার পর। এই অডিট হতে দেরী হলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খরচের আগে অডিটের ব্যবস্থা হলে আগে অডিট শেষ না হলে কোন খরচই করা যাবে না। তাতে টাকা খরচ করতে দেরী হয়ে যায়। যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহলে দেরী হয়ে গেলে নানা জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এইখানেই এই নূতন প্রস্তাবের মধ্যে বিপদের বীজ নিহিত ছিল।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই নূতন প্রস্তাবটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যখন এই অনুরোধ এল তখন এখানে একটা প্রস্তাব উঠল যে শিক্ষা বিভাগ এবং পুনর্বাসন বিভাগে এই নীতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হক। এই প্রস্তাব শুনে আমি মনে ভারি আতঙ্কগ্রস্ত হলাম। জানা গেল এই দুটি বিভাগকে এই সম্মানের জন্য নির্বাচনের কারণ হল এই দুটি বিভাগেই মোটা টাকা খরচ হয়। আমার আতঙ্কগ্রস্ত হবার বিশেষ কারণ ছিল। যেখানে ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে কাজ করতে হয়, সেখানে নানাভাবে এমন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় যে তাড়াতাড়ি অর্থবরাদ্দ না হলে উদ্বাস্তুদের শুধু কষ্ট হবে না, তারা ক্ষুধার তাড়নায় এমন উত্তেজিত হতে পারে যে দায়িত্বহীনভাবে আচরণ করে বিপদ টেনে আনতে পারে। আশ্রয় শিবিরে প্রতি সপ্তাহে ডোলের জন্য টাকা মঞ্জুর করতে হয়। সে টাকা আসতে দেরী হলে উদ্বাস্তুদের উপবাস ছাড়া আর গতি থাকে না, কারণ তাদের তো নিজস্ব সঞ্চয় বলে কিছু নেই।

সেই রকম যাদের পুনর্বাসনে পাঠান হয়েছে তাদেরও খোরাকি বাবদ ঋণের ব্যবস্থা আছে। সেখানেও তা পেতে দেরী হলে একই অবস্থার উদ্ভব হবে।

এ বিষয়টি যখন আমার মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ের দৃষ্টিগোচর করা হল, তিনিও বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের বিভাগে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ হলে নানাভাবে বিপদ আসতে পারে। শিক্ষা বিভাগের কাজে সরকারের বরাদ্দ অর্থ পেতে দেরী হলে অসুবিধা হয়ত হবে, কিন্তু উদ্বাস্তুদের মত সম্বলহীন মানুষ হয়ে একেবারে উপবাসের সম্মুখীন হতে হবে না। উদ্বাস্তু বিভাগে তার প্রয়োগের কথাই ভাবা যায় না। সুতরাং এ বিষয় আমরা একমত হলাম যে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাধা দিতে হবে। ডাঃ রায়ের নূতন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আগ্রহ অনেক সময় দুর্বার হয়ে ওঠে। এখানেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাই হল। তবে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। ঠিক হল একটি নির্দিষ্ট দিনে শ্রীঅশোক চন্দের উপস্থিতিতে ডাঃ রায়ের সহিত এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হবে।

নির্দিষ্ট দিনে বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কক্ষে যথাসময় এই আলোচনা শুরু হল। আমাদের বক্তব্য আমরা স্থাপন করলাম এবং যথাসাধ্য যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের বিভাগে এই রীতি প্রয়োগ করলে অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। যে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করা হল তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এখানে তা পুনরায় উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছুতেই আমরা ডাঃ রায়ের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করতে পারলাম না। আলোচনার শেষে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

আমার সব থেকে বড় ভাবনা ছিল আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ডোল বিতরণ নিয়ে। আমাদের আশ্রয়ে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার আছে তাদের প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে চাল ডাল ও কিছু নগদ টাকা দেবার ব্যবস্থা ছিল। তা এতই সামান্য যে তা হতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না। কাজেই পরের সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে ডোল না পেলে তাদের কি দুর্দশা হবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আগে ডোল আদায়ের যে ব্যবস্থা চালু ছিল তা এই: প্রতি আশ্রয় শিবির হতে ডোল দেবার নির্দিষ্ট তারিখের কিছু আগে আশ্রয় শিবিরের অধ্যক্ষ তাঁর আশ্রিত পরিবারগুলির প্রয়োজনমত বিল করে স্থানীয় জেলা শাসকের নিকট পাঠাতেন। তিনি পাশ করলে স্থানীয় ট্রেজারি হতে টাকা বরাদ্দ হত। স্থানীয় অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সব কাজ সম্পাদিত হত বলে টাকা নিয়মিত সময়ে পাওয়া যেত। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল বেশ জটিল।

প্রি-অডিটের জন্য কলিকাতায় একাউন্টাণ্ট জেনারেল-এর নূতন আপিস খোলা হল। ব্যবস্থা হল জেলা শাসক তাঁর তত্ত্বাবধানে যত আশ্রয় শিবির আছে তাদের বিল একত্রিত করে সেই আপিসে পাঠাবেন। সেখানে তা পাশ হবে এবং তারপর জেলা আপিসে ফিরে যাবে, তবে ট্রেজারি হতে টাকা দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় যে টাকা পেতে কত দেরী হয়ে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের বিভাগীয় আপিস তাগিদ দিয়েও নিয়মিত তাকে সময়মত পাশ করান একরকম অসাধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কা ছিল।

অগত্যা বিপদে পড়লে অন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করে দেখেছিলাম। প্রতি জেলা কেন্দ্রে যে ট্রেজারি আছে তা জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে থাকে। জরুরী অবস্থায় তাঁকে নিজের বিবেচনামত, মঞ্জুরি না থাকলেও, ট্রেজারি হতে টাকা তুলে খরচ করবার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই ক্ষমতা যে বিধি অনুসারে করতে হয় তা ট্রেজারি রুলস্-এ স্থান পেয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক জেলাশাসক এই ক্ষমতার অত্যধিক ব্যবহার করেছিলেন বলে সরকার এই বিধিটি সাময়িকভাবে তুলে দিয়ে তার ব্যবহার নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাটি কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এবং আপৎকালীন বিধি হিসাবে খুব কার্যকর হয়। এদিকে যখন প্রি-অডিটর-এর নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা উদ্বাস্তু বিভাগের ওপর প্রয়োগ হতে চলেছে তখন আকস্মিক বিপদ এড়াতে এই ধরনেরই একটি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি তাই অর্থবিভাগের এই নূতন পরিস্থিতির ভিত্তিতে এই নিষেধ প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। ভাগ্য যখন প্রতিকূল হয় তখন ধাপে ধাপে এইভাবেই বিপদের পথ তৈরি হয়ে ওঠে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগের নিকট কুমিতলা নামে একটি জায়গায় একটি অস্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। আশ্রয় শিবিরটি বেশ বড়ই, কয়েক শত পরিবার সেখানে তাঁবু ফেলে বাস করছিল। যে রেল লাইন লালবাগ হতে উত্তরে জিয়াগঞ্জ হয়ে লালগোলা গেছে তার পাশেই আশ্রয় শিবিরটি অবস্থিত ছিল। তা মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিল। নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হল অগাস্ট মাসের প্রথম হতে। এখন আর আশ্রয় শিবিরে ডোল দেবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার বিল জেলা কর্তৃপক্ষ পাশ করতে পারবেন না, তা কলিকাতায় নূতন স্থাপিত প্রি-অডিট আপিসে পাঠাতে হবে। সেখানে অনেক বিল জমা হয়ে পড়েছিল, সেগুলি তাড়াতাড়ি পাশ করা শক্ত হচ্ছিল। এর ফলে ডোল পেতে দেরী হওয়ায় অনেক আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুরা অস্থির হচ্ছিল। সেখানকার জেলা কর্তৃপক্ষ এবিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং আমরা ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে

তাগিদ দিয়ে সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি পাশ হয় তার চেষ্টা করছিলাম। এই কারণে ডোল পেতে অল্পবিস্তর সকল আশ্রয় শিবিরেই দেরী হয়ে যাচ্ছিল।

আমার যতদূর মনে পড়ে কুর্মিতলার আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তুদের ডোল পাওয়া দু'সপ্তাহ বাকি পড়ে গিয়েছিল। এরাও জেলাশাসকের নিকট অনুযোগ করেছিল। তিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং আমরাও অডিট আপিসে তাগিদ দিয়েছিলাম। মনে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভের আশঙ্কা থাকলেও আমাদের আশাবাদী না হয়ে উপায় ছিল না। মনে ভেবেছিলাম যে খুব বড় কিছু দুর্ঘটনা সম্ভবত কোথাও ঘটবে না।

কিন্তু আমাদের সকল আশাকে ধূলিসাৎ করে দুর্ঘটনা যে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজিডির আকার নিয়ে আবির্ভাব হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তারিখটা ছিল ২৫শে অগাস্ট ১৯৫৫। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হঠাৎ স্বরাষ্ট্র সচিব আমাকে ফোন করে জানালেন যে মুর্শিদাবাদ থেকে খবর এসেছে যে কুর্মিতলার আশ্রয় শিবিরবাসীর একটি দল চলন্ত ট্রেন থামাতে গিয়ে কয়েকজন মারা গেছে এবং অনেকে জখম হয়েছে। তখন বিধানসভা চলছিল। আমি সেখানেই সে খবর মুখ্যমন্ত্রীকে এবং আমার বিভাগীয় মন্ত্রীকে জানালাম। আমাদের আশ্রয় শিবিরের মানুষ নিয়েই যখন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে আমাদের আপিস হতে একজনের ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে আসা উচিত মনে হয়েছিল। সুতরাং আমি শ্রীমতী রায়কে সেই পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং নিজেই যাবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনাকে আমি পাঠাতে চাই না। আমি একজন উপমন্ত্রী এবং বিভাগীয় ডিরেক্টারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তাঁর নির্দেশ মত সেদিন শেষ রাত্রের ট্রেনে তাঁরা দুজন রওনা হয়ে গেলেন এবং স্থানীয় তদন্ত শেষ করে রাত্রে কলিকাতায় ফিরে এলেন। বিভাগীয় ডিরেক্টর সেই রাত্রেই আমার কাছে এসে জানিয়ে গেলেন যে আশ্রয় শিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং যারা জখম হয়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। তিনি আরও জানালেন যে আশ্রয় শিবিরে কোন অশান্তি নেই। এই খবর শ্রীমতী রায়কে জানান হল।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী রায় আমাকে জানালেন একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং সে বিষয় তিনি আমার পরামর্শ চান। ব্যাপারটা এই। তাঁর কাছে খবর এসেছে যে যাঁরা আগের দিন কুর্মিতলার আশ্রয় শিবিরের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন তাঁরা আশ্রয় শিবিরে আদৌ যান নি; তাঁরা বহরমপুর গিয়ে সেখান হতেই তদন্ত করে চলে এসেছেন। অথচ ঘটনাস্থলে তদন্ত না হলে আমাদের বিভাগের একটি অত্যন্ত লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এখন এ অবস্থায় কি কর্তব্য সে বিষয় তিনি আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন।

আমি এ কথা বলতে দ্বিধা বোধ করি নি যে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করা একান্তই আমাদের কর্তব্য এবং যে পরিবারগুলির আত্মীয়স্বজন প্রাণ হারিয়েছে তাদের সহিত সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিত। এ অবস্থায় আমি এবার নিজে ঘটনাস্থলে যাবার অনুমতি চাইলাম। এবার তিনি সঙ্গেসঙ্গেই অনুমতি দিলেন।

সুতরাং সেদিন রাত্রের গাড়িতেই আমি মুর্শিদাবাদ জেলা অভিমুখে রওনা হলাম। প্রথমে বহরমপুর নেমে জেলাশাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তারপরে দুজনে জীপে চড়ে কুর্মিতলা অভিমুখে রওনা হলাম।

আমরা সকাল ১০টা আন্দাজ আশ্রয় শিবিরে পৌছালাম। সেখানে তখনও একটি থমথমে ভাব বর্তমান ছিল। দেখলাম রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিও সেখানে এসে তদন্ত করছেন। কারণ দুর্ঘটনার সঙ্গে রেল কোম্পানিও জড়িত ছিল। উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে যা বুঝলাম, দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এইভাবে।

একাধিক সপ্তাহ ডোল না পাবার ফলে পরিবারগুলির একান্ত দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই তাদের অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলে এবং পরে তা উত্তেজনায় পরিণত হয়। এখন তাদের এমনভাবে একটা প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ইচ্ছা হয়, যা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। রেল লাইন কাছে থাকায় রেল লাইনে দাঁড়িয়ে গাড়ি আটকাবার সিদ্ধান্ত হয়। বিকালে লালগোলা হতে একটা গাড়ি দক্ষিণে যাবার কথা। সুতরাং তাকে আটকাবার জন্য তারা রেল লাইনের ওপর এসে জড় হয়। এখন হয়েছে কি, লাইনটা এখানে বাঁকা পথে ঘুরে গিয়েছে এবং বাঁকের মুখেই কুর্মিতলার আশ্রয় শিবির অবস্থিত। সুতরাং লাইনে যে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দূর থেকে ইঞ্জিনের ড্রাইভারের তা দেখা সম্ভব ছিল না। বাঁক ঘুরেই দেখতে পেলেও গাড়ি থামাবার সময় ছিল না। সুতরাং লাইনে মানুষ জড় হয়ে থাকা সত্ত্বেও গাড়ি থামে নি; যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখন দেখেছে গাড়ি থামছে না তখন পালাতে চেষ্টা করেছে। বেশীর ভাগই পালাতে পেরেছে। যে পারে নি, সে জখম হয়েছে। যে বেশী জখম হয়েছে সে মারা গেছে।

রেলগাড়ি আটকে যে উদ্বাস্তু ভাইরা অতীতে প্রতিবাদ জানায় নি তা নয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি এই প্রথায় প্রতিবাদ জানান বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই প্রতিবাদেরও একটা রীতি আছে। যারা অতীতে এইভাবে প্রতিবাদ করেছিল তারা এমন জায়গায় লাইনে বসত যেখানে গাড়ি থামা অবস্থায় তাদের গাড়ি হতে দেখা যায়। সেই কারণে সাধারণত রেল স্টেশনের সামনেই এইভাবে ট্রেন আটকাবার ব্যবস্থা হত। কিন্তু চলন্ত ট্রেনকে থামাবার

চেষ্টা করায় যে রীতিমত বিপদ আছে তা বোঝাতে হয় না। মোটর যেমন নানা গাড়ির এবং পায়ে চলেছে এমন মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করে রাস্তায় চলে, রেলগাড়ি ত আর তা চলে না। তার জন্য আলাদা বেড়া দিয়ে পৃথক করা আলাদা পথ আছে। সিগন্যাল নিষেধ না করলে তার অবাধে চলবার অধিকার আছে। সুতরাং ড্রাইভার সর্বক্ষণ রাস্তা দেখে চলে না। কাজেই মানুষ যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তার নজরে তা নাও পড়তে পারে। চীৎকার করেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়, কারণ চলন্ত গাড়ির গর্জন সব চীৎকার ডুবিয়ে দেবে। এখানেও ঘটেছিল তাই। ফলে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জন পাঁচেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং অনেক বেশী জখম হয়েছিল।

আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের আমি সেই কথাই বলেছিলাম। তাদের বলেছিলাম এইভাবে চলন্ত ট্রেন থামাবার চেষ্টা করে তারা দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিল এবং সেই ভুলের মাশুল তাদের দিতে হয়েছে এই মর্মান্তিক ট্র্যাজিডির ভিতর দিয়ে। তারা নিজেরাও আমার মতে মত দিয়েছিল। অবশ্য ভুল যে ওপর মহলেও হয়েছিল, সেকথাও অনস্বীকার্য। গোড়ায় ভুল না হলে ত এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

আমি তারপর শোকার্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তাদের সমবেদনা জানিয়েছিলাম। একটি ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার ফলে যে শোকের মূর্তি দেখেছিলাম তা ভারি মর্মস্পর্শী। যারা দুর্ঘটনার ফলে মারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল সদ্য বিবাহিত এক তরুণ। সে তাদের পরিবারে এক তরুণী বিধবাকে রেখে গেছে। সরকার যে তার ভরণপোষণের ভার স্থায়িভাবে নেবেন তার প্রতিশ্রুতি আমি তার আত্মীয়দের দিলাম।

ইতিমধ্যে পরস্পর আলাপ আলোচনা করবার ফলে আমাদের মধ্যে প্রথম দিকে আচরণে যে আড়ষ্টতা ছিল তা কেটে গিয়েছিল। আমি যখন বিদায় নিয়ে ফিরতে চাইলাম তারা আমাকে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু দিতে চাইল। যারা সব ত্যাগ করে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তারা কিবা দেবে? তবু তারা দিতে উৎসুক। যে তাঁবুতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তার আশে-পাশে ফাঁকা জমিতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বর্ষার জলের সুযোগ নিয়ে যে যার কিছু সবজী উৎপাদন করেছিল। তারা ডাঁটা লাগিয়েছে, লম্বা বেগুন লাগিয়েছে, আর শশা লাগিয়েছে। অন্য জিনিস ত রান্না না করে খাওয়া যায় না, অগত্যা গাছ হতে শশা পেড়ে আমাকে দিতে চাইল। তাদের হাতের গুণে শশাও হয়েছিল সুন্দর। এক একটি দশ বারো ইঞ্চি লম্বা। আমি তাদের দেওয়া গুটি কয়েক শশা নিয়ে ট্রেনে কলিকাতা রওনা হলাম। কলিকাতা পৌঁছে শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা জানিয়ে এলাম। সঙ্গে যে শশা এনেছিলাম তাও উদ্বাস্তু ভাইদের উপহার হিসাবে তাঁর হাতে দিয়ে এলাম।

এইভাবে এই ট্র্যাজিডির ওপর যবনিকাপাত ঘটল। বলা বাহুল্য তারপরেই এই পরীক্ষামূলক প্রি-অডিট রীতি তুলে দেওয়া হয়েছিল।

(১৭)

সেপটেম্বর মাস হতে আমার ওপর একটি নূতন দায়িত্ব এসে পড়ল। ইতিপুর্বে উদ্বাস্তুদের জন্য উপনগরীগুলি স্থাপিত হয়েছিল সেগুলির উন্নয়নের সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি নিযুক্ত হয়েছিল। আমি ছিলাম তার সভাপতি। ছুটিতে যাবার আগে আমাদের সুপারিশসহ বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করে গিয়েছিলাম। ছুটি হতে ফিরে আসবার পর আবার একটি অনুরূপ দায়িত্ব আমার ওপর স্থাপিত হল। নির্দেশ হল আমাকে সভাপতি করে পুর্বে যে উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল তা সরকার স্থাপিত অকৃষিজীবী গ্রাম্য উদ্বাস্তু কলোনিগুলি পরিদর্শন করে তাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ সুপারিশ দিক। অবশ্য মৎস্যজীবীদের কলোনি এই তালিকার বাহিরে রাখা হয়েছিল।

এ কাজটিরও দায়িত্ব অনেক। এই শ্রেণীর মোট ৭৩ টি কলোনি ছিল। তারা দুটি শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসে যে কলোনিগুলি সরকারের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংগ্রহ আইন বলে জমি সংগ্রহ করে স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে একলপ্তে জমিদারের কাছে জমি কিনে যেখানে উদ্বাস্তুরা নিজেরা জমি নির্বাচিত করে বসেছিল। প্রথম শ্রেণীতে ৬৮ টি কলোনি পড়ে এবং বাকিগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এই কলোনিগুলি পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। সেগুলি পরিদর্শন করে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তবে তাদের সম্বন্ধে উন্নয়নের ব্যবস্থার সুপারিশ করা যায়। সুতরাং এই কাজেই আমার দুমাস কেটে গেল।

ঠিক বলতে কি পুনর্বাসন বিভাগে এই আমার শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। অকটোবর মাসে একদিন ডাঃ রায় আমাকে বললেন তিনি আমার ওপর নূতন গঠিত উন্নয়ন বিভাগের ভার দিতে চান। আমি বুঝেছিলাম পুনর্বাসন বিভাগে আমার কাজ করবার আর বিশেষ অবকাশ নেই; কারণ সরকারের নীতি পরিবর্তিত হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আর হবে না। সুতরাং তাঁর প্রস্তাবে আমি সম্মতি না জানানর কোন কারণ দেখলাম না। যাঁর ইচ্ছায় কাজে ফিরে এসেছি তাঁর ইচ্ছায়ই কাজ করা সঙ্গত। সুতরাং ৫ই নভেম্বর, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে আমি পুনর্বাসন বিভাগ ত্যাগ করে উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য তার আগেই আমাদের বিশেষজ্ঞ সমিতির গ্রাম্য কলোনিগুলি সম্বন্ধে সুপারিশগুলি সরকারের কাছে স্থাপন করে এসেছিলাম।

সাত

উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আনুষঙ্গিক ফল। ইংরেজ সমগ্র ভারতকে এক শাসনব্যবস্থার অধীনে একটি সাময়িক ঐক্য দিয়েছিল। ইংরেজ যখন চলে গেল তখন তার ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত খণ্ডিত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হল; মধ্যভাগে ভারত ও দুই প্রান্তে পাকিস্তান। ভারতকে যে শক্তি এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছিল তার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার।

এই শক্তিকে বল সঞ্চার করেছিল তিনটি বিভিন্ন পক্ষ। ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য যখন ভালভাবে স্থাপিত হল তারপর ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে পশ্চিমের দেশাত্মবোধমূলক সাহিত্য এবং আদর্শের সহিত পরিচয় ঘটায় এদেশেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ আত্মবিস্তার করতে আরম্ভ করল। প্রথমে সাহিত্যিক রচনায় তার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়, যেমন রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বা হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত'। তার কিছু পরেই সেই আকাঙ্ক্ষা কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। তার প্রথম সূত্রপাত দেখি উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে নবগোপাল মিত্রের নানা কার্যকলাপে। তিনি ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুমেলা প্রবর্তন করে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা ও স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন। তার কিছু পরেই ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় এবং তারপর মূলত তার তত্ত্বাবধানেই স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের দেশাত্মবোধের বিকাশে একটি মারাত্মক ত্রুটি থেকে যায়। ভারতের প্রাচীন গৌরবের রূপ দেশের নেতাদের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে নূতন যে দেশমাতার ছবি তাঁরা মানসপটে এঁকেছিলেন তাতে হিন্দুর সংস্কৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল, মুসলমানের জন্য সেখানে বিশেষ স্থান রাখা হয় নি। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে এক নূতন স্বাধীন জাতির রূপ প্রথম দিকে কেউ দেশের মানুষের সামনে স্থাপন করতে পারেন নি। নবগোপাল মিত্রের মেলার নামকরণ হয়েছিল হিন্দুমেলা। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশমাতার যে মূর্তি আঁকলেন তাঁকে দুর্গার আদর্শে গড়লেন। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত প্রথম যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন যোগ রইল না। হিন্দু সেখানে একা চলল। অবশ্য পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নায়কত্বে হিন্দু মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু তাতে প্রথম দিকের ত্রুটি সম্পূর্ণ সংশোধন করা সম্ভব ছিল না; কারণ সেই ত্রুটির সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপনের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগের অভাব হেতু। যে কারণেই তা ঘটুক এই দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুর তুলনায় তাদের অনগ্রসর করে রেখেছিল। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা স্থায়িত্ব পেয়েছিল। নিজে অনগ্রসর হওয়ায় এবং অপর সম্প্রদায় অগ্রসর হওয়ায় স্বভাবতই মুসলমান নিজের ভবিষ্যৎকে হিন্দুর সহিত পৃথক করে ভাবতে শিখেছিল। নিজের ধর্মকে এবং সংস্কৃতিকে হিন্দু প্রাধান্য দেওয়ায় মুসলমানেরও নিজের ধর্মকে প্রাধান্য দেবার ইচ্ছা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই হল দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

তৃতীয় শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছিল স্বয়ং ইংরেজদের প্ররোচনায়। ইংরেজ এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করতে আসে নি। এসেছিল ব্যবসায় ও বাণিজ্য করতে। ঘটনাচক্রে তারা এখানে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। এখন তার স্বভাবতই কাজ হবে রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থকে যতখানি সম্ভব সংরক্ষিত করা। তাই হল তার স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষ গোরু পোষে গোরুর কল্যাণ সাধনের জন্য নয়, তার দুধ যতখানি পারে দোহন করবার জন্য। এখন ভারতরূপ গোধন দুই শরিকের সম্পত্তি। তার দুধ ভোগ করবার অধিকার ইংরেজ নিজ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ অবস্থায় দুই শরিক যদি এক হয় তাহলে গোরু বেদখল হয়ে যেতে পারে। তাদের মধ্যে বিবাদ বাধলে ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তাকে কায়েমী করে ভারতের স্বাধীনতা লাভকে ব্যাহত কিম্বা বিলম্বিত করাই তার নীতি।

এখন দুই শরিক গোড়া হতেই ভিন্ন পথে চলতে শুরু করেছিল। হিন্দু মুসলমানের কথা ভাবল না, মুসলমান কেবল স্বার্থ সংরক্ষণে নজর দিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজ নানাভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের পৃথক রাখতে চেষ্টা করল এবং খানিকটা সক্ষমও হল। মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিস্ফূরণের জন্য আলিগড় কলেজ স্থাপিত হল। পরে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হল। হিন্দুর প্রভাব হতে মুসলমানকে মুক্ত রাখবার জন্য সেকালের বৃহত্তর বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হল। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হল তা প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের সহযোগিতা পেল না। তারপর এই ভেদনীতিকে স্থায়ীভাবে ক্রিয়াশীল রাখবার জন্য ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ভারত আইনে বিধান সভায় মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা হল। তারপরে দুটি ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়েছিল। দুটিতেই এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল। এটি অতি মারাত্মক অস্ত্র। এই নীতি রাজনীতির

ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানকে নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। ফলে তাদের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মিলতে দেয় না।

তা যে কত বড় দুর্বার বাধা তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে বেশ ভাল করে বোঝা গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে উদার মনোভাব সম্পন্ন খান আবদুল গফর খাঁ বা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চেষ্টায় কোন ফল হয় নি। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যে আদর্শ গ্রহণ করেছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের আকর্ষণ তার প্রতি ছিল বেশি। এদিকে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমান অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়তে যত্নবান হয়েও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারল না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক দল চাইল ভারত দ্বিখণ্ডিত হক। তার একটি হবে হিন্দুপ্রধান এবং অপরটি মুসলমান প্রধান। কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে সফল না হলে তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করতেও প্রস্তুত ছিল।

এই পরিবেশে ঠিক স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বোধ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছিল। পাকিস্তান হবে কিনা এই নিয়ে আপিসে, ক্লাবে, রাজনৈতিক সভায়, ঘরোয়া বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল। সুতরাং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে শ্রমিকদল গঠিত নূতন ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে ভবিষ্যৎ ভারতের শাসন-ব্যবস্থার যে খসড়া তৈরি হয় তা মুসলমান সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারে নি। তাতে সমগ্র ভারতকে অখণ্ড রেখে একটি মহারাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে ইচ্ছা করলে তাদের ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হবারও অধিকার ছিল। জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবটির সহিত অসহযোগিতা করল।

সুতরাং নূতন পরিবেশে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অগাস্ট তারিখে যখন জাতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে নূতন কেন্দ্রীয় কাউনসিল গঠন করা হল, লীগ শুধু তাকে বর্জন করল না, কলিকাতায় দাঙ্গার ব্যাপক ব্যবস্থা করে তার হিংসাত্মক প্রতিবাদ জানাল। বাঙলা দেশে তখন মুসলীম লীগ ক্ষমতায় সুতরাং এখানে এই ধরনের হিংসাত্মক কাজ করলে সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হিন্দু এমন প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাঘাত করল যে লীগ পরিচালিত সরকারই হস্তক্ষেপ করে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

তার প্রতিবাদে এবার নূতন ক্ষেত্রে হিন্দুর ওপর ব্যাপক অত্যাচারের ব্যবস্থা হল। এর জন্য নোয়াখালি জেলা নির্বাচিত হল, কারণ হিন্দুর সংখ্যা সেখানে মুসলমানের অনুপাতে নিতান্তই কম। এরই ফলে কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম

উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়েছিল। তাদের ত্রাণকার্য তখন সরকার করেন নি, করেছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। হিন্দুও এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়ল না। তারা এর প্রতিশোধ নিল সাহেবগঞ্জে ব্যাপক হারে মুসলমানের ওপর অত্যাচার করে।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হিংসা ও প্রতিহিংসামূলক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা এত তিক্ত হয়ে উঠল যে অখণ্ড স্বাধীন ভারত গঠন করবার সংকল্প নেতাদের মনে ক্রমশই শিথিল হতে লাগল। কূটনৈতিক চালে মুসলিম লীগ যা পারে নি, দাঙ্গার ফলে তা সম্ভব হল। কারণ দাঙ্গা আনে পাণ্টা দাঙ্গা। তার ফলে চক্রবৃদ্ধি হারে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠে। সুতরাং রাজনৈতিক নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের জন্য ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হক। এই সিদ্ধান্তে তদানীন্তন সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড-মাউণ্টব্যাটন একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখের এক ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের কথা তিনি ভারতবাসীকে জানান। মোটামুটি তিনি জানান যে মুসলমান সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ সংখ্যা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে ভারতে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হবে, তবে সে ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও বাঙলা প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হবে। তার কারণ এই দুই প্রদেশে খানিক অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্য অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ই অগাস্ট তারিখে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবির্ভাব হয়।

এই ভাবেই বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি পৃথক বঙ্গ গঠিত হয়। হিন্দুপ্রধান অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয় এবং তা ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়; আর মুসলমানপ্রধান অংশ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ। তা নূতন গঠিত অপর রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে তার রাষ্ট্রিক নামের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে নূতন নাম নেয় পূর্ব-পাকিস্তান। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু ও শিখপ্রধান অঞ্চল পূর্ব পাঞ্জাবে ভারতের সহিত যুক্ত হয় এবং মুসলমানপ্রধান অংশ পশ্চিম পাঞ্জাব পৃথক হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগাস্ট তারিখে এই বিভাগ কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পাঞ্জাবের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা বেধে যায়। ব্যাপক হারে খুন, লুঠ, নারী নিগ্রহ তার অঙ্গ। ফলে উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অবস্থার চাপে দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মানুষ বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল। পশ্চিম পাঞ্জাব হতে শিখ ও হিন্দু ভারত রাষ্ট্রে চলে আসে এবং পূর্ব পাঞ্জাব হতে মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান যেমন হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় হতে মুক্ত হয় তেমন পূর্ব পাঞ্জাব মুসলমান অধিবাসী

হতে মুক্ত হয়। এইভাবে এই দুই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দ্রুত ঘটনার আবর্তনের চাপে চিরস্থায়িভাবে সমাধান হয়ে যায়।

পশ্চিম বাঙলা ও পুর্ব পাকিস্তানে অনুরূপভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মানুষ বিনিময় হয়ে যেতে পারত, যদি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে দাঙ্গা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উভয় বঙ্গে ঘটেছিল তা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অগাস্টে ঘটত। কিন্তু তা ঘটে নি। অথচ তা ঘটবার সম্ভাবনাটাই এক সময় খুব বেশী ছিল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অগাস্ট তারিখে যে হিংসার আগুন জ্বালান হয়েছিল তা সারা বছর ধরে জলেছিল, কোনদিনই নির্বাপিত হয় নি। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই খুন জখম ঘটত। এই সব ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল তা সমগ্র বাঙলা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। কলিকাতার বাহিরেও যে দুচারটে ঘটনা ঘটে নি তা নয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে উত্তরবঙ্গে সৈয়দপুরের দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য। তবু দেখা গেল, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অগাস্টএর পর নাটকীয়ভাবে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হওয়া দূরের কথা অন্তত বাহিরে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা এই দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলিকাতাতেই হয়েছিল।

এর কারণ একটা ছিল নিশ্চয়। সেটা সম্ভবত এই যে বাঙলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম ভিন্ন হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী হতেই তাদের উভয়ের এক সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাদের পরস্পরকে বেশ ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছিল। সম্ভবত অনুকুল অবস্থা পেলে বাঙলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান এমন ভাবে মিলে যেতে পারত যে তারা এক জাতি গড়ে তুলতে পারত। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বাঙলা বিজয়ের পর ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠিত হতে চলেছিল। তার বহিঃপ্রকাশ দুটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকট। উভয় সম্প্রদায়ই বাঙলা ভাষাকে গ্রহণ করেছিল এবং বাঙলা সাহিত্য রচনায় অনুরাগী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখি হুসেন শাহ গৌড়ের রাজার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে অনেক কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব পদ রচয়িতা কবিশেখর বিদ্যাপতি তাঁদের একজন। শ্রীখণ্ড নিবাসী যশোরাজ খাঁ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে কাব্য রচনা করেন তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হুসেন শাহ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র নসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ পিতার প্রবর্তিত রীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর উৎসাহে মহাভারতের একটি বাঙলা অনুবাদ রচিত হয়েছিল।*

সাহিত্য চর্চার পরিবেশে এই ঘনিষ্ঠতার পরিণত রূপটি আমরা পাই ময়মনসিংহের আখ্যান কবিতাগুলির মধ্যে। এই অসাধারণ কাব্যগুলির রচয়িতা

* কণক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হিন্দু যেমন আছেন তেমন মুসলমান আছেন। এই কাব্যগুলির প্রথম অংশে যে ঈশ্বর প্রশস্তি আছে তাতে উভয় সম্প্রদায়ের রীতিই সম্মানিত হয়েছে। আর একটি বিশেষত্বের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গাথা-গলির মধ্যে যে সমাজের পরিচয় পাই সেখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শান্তির পরিবেশ সূচিত হয়। দুই সমাজের চিত্রই সহানুভূতির সহিত অঙ্কিত হয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতার আরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম সাধকদের মধ্যে বাংলা দেশের বাউল এক অনন্যসাধারণ সম্প্রদায়। তারা কোন প্রচলিত ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করে না। তারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ নয়। তারা প্রতিমা পুজা, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরকে তারা নিজেদের মনের মধ্যেই আবিষ্কার করে তাঁকে 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে তাঁকে পাওয়ার সাধনাই তাদের সাধনমার্গ। যেসব বাউল গান রচিত হয়ে এখনও প্রচলিত আছে তাদের বয়ান হতে দেখা যায় তার রচয়িতা কোথাও হিন্দু, কোথাও মুসলমান। এই বাউল সাধকদের মধ্যে বিখ্যাত লালন ফকির অন্যতম। তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই সমানভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন।

এইসব কারণে মনে হয় শত শত বৎসর ধরে বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করে ধর্মে বিভিন্ন হয়েও একটি ঘনিষ্ঠতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এমনকি তার ফলে ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গেও পরস্পরের ওপর কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিখ্যাত পীরের দরগায় প্রদত্ত সিন্নি হিন্দুর বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। সত্যনারায়ণ পুজায় সিন্নি বিতরণের প্রথায় মুসলমানী রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। সেই কারণে এই ঘনিষ্ঠতা রাজনৈতিক কারণে বিঘ্নিত হলেও একেবারে নষ্ট হতে পারে নি। তাই উত্তেজনার মুহূর্তে দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা বাধলেও তা থেমে যায় এবং থেমে গেলে শান্তিতে সহাবস্থিতি আবার সম্ভব হয়। সেই কারণেই সম্ভবত এক বিশেষ স্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্তে যেদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, সেদিন কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান বৎসর-ব্যাপী দাঙ্গার কথা ভুলে একসঙ্গে উৎসবে মাততে পেরেছিল। আর সেই কারণেই সম্ভবত পূর্ববঙ্গ নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও সেখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

দুই সম্প্রদায়ের শান্তি বিঘ্নিত না হলেও কিন্তু দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ হতে হিন্দুর বাস্তুত্যাগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিল কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে। কারণ তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য এই শ্রেণীর মানুষ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালিয়েছে, আত্মত্যাগ করেছে, এমন কি

আত্মাহুতি দিয়েছে তারা দেখল ভাগ্যের বিড়ম্বনায় স্বাধীনতা তাদের দেশে এলো কিন্তু ভোগে এলো না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রের স্রষ্টার আদর্শ ধর্মভিত্তিক হওয়ায় তারা নিকৃষ্ট নাগরিকের পদে অবনমিত হল। যারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন তাদের এই অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করা সম্ভব নয়।

তাই তারা পুর্বপুরুষের ভিটা ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় এসে নূতন করে ঘর বাঁধতে চাইল। কেউ বা পশ্চিম বাঙলার মুসলমানের সঙ্গে নিজের স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় করে বাস্তুসমস্যার সমাধান করল। এরা তুলনায় সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। তাই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি। নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে। এই কারণেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিম বাঙলায় উদ্বাস্তু সমস্যা এমন উৎকটরূপে দেখা দেয় নি, যে সরকারের তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আর সেই জন্যই বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর দেন নি।

তারপর একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বেড়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছিল নিজামের হায়দারাবাদ রাজ্যকে কেন্দ্র করে। ভারত রাষ্ট্রের একেবারে মধ্যস্থানে অবস্থিত হয়েও নিজাম স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেখানে অন্য সামন্তরাজগণ দলে দলে নিজেদের রাজ্যগুলির ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছিলেন সেখানে তিনি এক প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব নিয়ে সামরিক শক্তিসঞ্চয়ে উদ্যোগী হলেন। ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে তা প্রতিকূল হওয়ায় ১৯৪৮ এর অগাস্ট মাসে এক আকস্মিক সামরিক অভিযান করে ভারত সরকার কয়েক দিনের মধ্যে সমগ্র হায়দারাবাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেন।

কিন্তু হায়দারাবাদের নিজাম ধর্মে মুসলমান হওয়ায় এর প্রতিক্রিয়া পুর্ববঙ্গের মধ্যে বিস্তার লাভ করল। সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হল এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করল। দাঙ্গাহাঙ্গামা না ঘটলেও তাদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হবার ফলেই এই প্রথম ব্যাপকহারে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আসা শুরু হয়ে গেল। এবার আর তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাস্তুত্যাগের ইচ্ছা সক্রিয় হয়ে উঠল। ফলে আমরা দেখি ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে হাজারে হাজারে হিন্দু বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয়ের জন্য এল। তাদের অনেকেই আশ্রয়ের জন্য এবার সরকারের মুখাপেক্ষী হল, কারণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার তাদের ক্ষমতা ছিল না। এতদিনে উদ্বাস্তু সমস্যা এমন আকার ধারণ করল যে সরকার নজর না দিয়ে পারলেন না। এই সময়েই অর্থবল নেই এমন উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য প্রথম আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। দেখা যায় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে ১৯,৯০৯ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল।

ক্রমে ধীরে ধীরে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বেশ কমে এসেছিল। তখন পশ্চিম বাঙলার আশ্রয় শিবিরগুলিতে মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৭০,০০০। তাদের মধ্যে ৭,৫০০ মানুষ পুনর্বাসনের অযোগ্য ছিল কারণ, হয় তাদের পরিবারের কর্তা ছিল বৃদ্ধ বা অসমর্থ, নয় তাদের পরিবারে বয়স্ক পুরুষ অভিভাবক ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বছর পুনর্বাসন-যোগ্য মানুষগুলির পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন এবং ফলে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির মধ্যে তাদের সকলেই আশ্রয় শিবির হতে পুনর্বাসনের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

ঠিক তারপরেই ঘটল উদ্বাস্তুদের ব্যাপকতম আকারে পশ্চিম বাঙলায় আগমন। এইবার তাদের আগমন প্রকৃত বন্যার রূপ ধারণ করল। যত রকম সম্ভাব্য পরিবহণের ব্যবস্থা হতে পারে সবই ব্যবহার হল। আকাশ যানে, রেল পথে, স্টীমারে হাজার হাজার মানুষ এল। যাদের তা সম্ভব হল না তারা পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করল। এবার এই ব্যাপক বাস্তুত্যাগের কারণ দাঙ্গা এবং হত্যা। প্রথমে শুরু হল খুলনা জেলায়। তারপর যখন পশ্চিম বাঙলায় তার খবর এল, এদিকেও শুরু হল পাল্টা দাঙ্গা। তারপর দুই বঙ্গেই তা ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং এবার যারা এল তারা নিতান্তই প্রাণভয় এল। এবার সব শ্রেণীর হিন্দুই আসতে লাগল। যে কৃষিজীবী সেও চাষের জমির মায়া কাটিয়ে চলে এল। এই বছর আশ্রয় শিবিরে মোট আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫৪,৫৬৪। মুসলমান পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরও সংখ্যা কম হবে না। এবার কিন্তু বাস্তুত্যাগ দুই রাষ্ট্রেই ব্যাপক হারে ঘটেছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে আশ্রয় শিবির প্রার্থীর সংখ্যা আরও বেশী হত।

এক সময় মনে হয়েছিল পাঞ্জাবে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে যা ঘটেছিল বাঙলা দেশেও তাই হয়ত ঘটবে; কিন্তু তা ঘটে নি। ক্রমে ক্রমে উভয় বঙ্গেই শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল। সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার অভাববোধও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল। ফলে বাস্তুত্যাগের হার ধীরে ধীরে কমে গেল। উভয় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐক্য-বোধ সম্ভবত সেটাকে এবারও সম্ভব করেছিল।

এইবার পশ্চিম বাঙলায় যে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমন ঘটল সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে পার্থক্য লক্ষিত হল। এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হতে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা হতে বঞ্চিত করা হয় নি। পুনর্বাসনের সাহায্য চাইলে তারা পেয়েছে, আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় চাইলে তা পেয়েছে। এবার কিন্তু প্রথম দিকে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন নীতি

গ্রহণ করা হল। নির্দেশ এল যারা আশ্রয় চাইবে তাদের সীমান্ত অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হবে না। বোঝাই গিয়েছিল এদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর মনোভাব রীতিমত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি চান নি তারা এখানে স্থায়িভাবে আশ্রয় পায়, তাঁর ইচ্ছা তারা স্বদেশে ফিরে যায়। অবশ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা এ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ডঃ সাহা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা যে এমন অবস্থায় এই সব পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন। অবশেষে জনমতের চাপে ভারত সরকার এই নীতি পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সাহায্য করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

তারপর উভয় রাষ্ট্রে এই ব্যাপক হারে বাস্তুত্যাগ সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীজওহরলাল নেহেরু পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল লিয়াকত আলি খাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। অনুরূপ অবস্থায় পাঞ্জাব সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল এবার তা হল না। এবার নূতন নীতি প্রয়োগ করা হল। এবার ঠিক হল সম্পত্তি এবং মানুষ বিনিময় নয়, উদ্বাস্তুদের যে যার নিজেদের দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে এবং ফিরে গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে তাদের দেওয়া হবে।

এই চুক্তির বিপক্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন। ঠিক বলতে কি এই নূতন নীতির প্রতিবাদেই তিনি একরকম মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছিলেন। এমন কি একটি নূতন রাজনৈতিক দলও গঠন করেছিলেন। তাঁর স্থাপিত সেই ভারতীয় জনসংঘ দল এখন ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এমন কি ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে তা রীতিমত শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত ডঃ মুখোপাধ্যায় জীবিত থাকলে আরও তাড়াতাড়ি তা শক্তি সঞ্চয় করত। সে যাই হোক, প্রতিবাদে ডঃ মুখোপাধ্যায় সেই কথাই প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একই সমস্যা সম্পর্কে দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপরীত রীতি প্রয়োগ করবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবের সম্পর্কে যদি মানুষ বিনিময় রীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে বাঙলার সম্পর্কে সে নীতি গ্রহণ করা হবে না কেন?

এমন কি লোকসভার বিতর্কেও ডঃ মুখোপাধ্যায় এই প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রীর জবাব চেয়েছিলেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তা একটি উচ্চস্তরের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর স্থাপিত। তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"তা (মানুষ) বিনিময়) আমরা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক নীতি

গ্রহণ করেছি তার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত প্রশ্নও এখানে জড়িত আছে। এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন জড়িত।"*

সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যেহেতু ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে তার নিজস্ব মুসলমান নাগরিককে অন্য রাষ্ট্রে পাঠালে আদর্শচ্যুতি ঘটবে। এ যুক্তি অবশ্য খুব সবল নয়, কারণ বলপূর্বক পাঠানর ত প্রশ্ন উঠছে না, যে স্বেচ্ছায় যাবে তাকে পাঠানর প্রশ্ন উঠছে। অবশ্য স্বভাবতই তার যে উত্তর মুখে আপনি আসে তা হল সে নীতি পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে আগে প্রয়োগ করা হয় নি কেন? ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ঠিক সেই জবাবই দিয়েছিলেন এবং উপহাস করে বলেছিলেন আগে যখন এই মহান আদর্শ ঠাণ্ডা-ঘরে পাঠান হয়েছিল এবারও ঠাণ্ডাঘরে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়াই বেশি যুক্তিসঙ্গত।

মনে হয় আসলে এই নীতি নির্ধারিত হয়েছিল উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণায় নয়; তাতে বিশুদ্ধ রাজনীতির প্রভাব ছাড়া অন্য কোন নীতিরই প্রভাব ছিল না। পাঞ্জাবের সমস্যার যখন উদ্ভব হয় তখন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু যখন বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যা বড় আকারে দেখা দিল তখন কাশ্মীরের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সেই কারণেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ভাল করে প্রচার করবার জন্য মানুষ বিনিময় নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এই নীতির মধ্যে যে ত্রুটি রয়ে গেল তার সন্ধান ডঃ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি হতেই পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জিনিসটি দেখলেন না। ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বিনিময় ঘটলেও ভারতের বাকি অংশ জুড়ে যে বিরাট সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, ভারতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ দেখিয়ে তা প্রমাণ করা যেত। দ্বিতীয়ত বলপ্রয়োগ করে কাউকে ভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠানর প্রশ্ন উঠছে না। একটি বাস্তব পরিবেশের চাপে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তারই স্বাভাবিক সমাধান আপনা হতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে সম্প্রদায় যে রাষ্ট্রে থাকা নিরাপদ নয় মনে করেছিল সে সম্প্রদায়ের লোক নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছিল। যা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে চলেছে তার স্বীকৃতি দেওয়াই এখানে যুক্তিসঙ্গত ছিল।

অপর পক্ষে পাকিস্তানে যে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় রয়ে গিয়েছিল তাদের নিরাপত্তা দেখার যে প্রতিশ্রুতি ভারত বিভাগের সময় রাজনৈতিক নেতারা দিয়েছিলেন এই ব্যবস্থায় তা পালন করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। ভিন্ন রাষ্ট্রে যে মানুষ বাস করে তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কখনই সম্ভব নয়। একান্ত বর্বরোচিত অত্যাচার ঘটলেও তা নিবারণ করা

* লোকসভায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ তারিখের বিতর্ক।

বাহিরের রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব ; চুপ করে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেছে গত ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তানে যে দাঙ্গা হয়ে গেছে তা হতে। সেবারকার দাঙ্গা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গার সহিত তুলনীয় না হলেও বেশ ব্যাপক আকার লাভ করেছিল। তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর কি দুর্দশা হয়েছিল তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে কানাডায় প্রকাশিত এক বিদেশী পত্রিকার প্রতিনিধির লেখা হতে। যেহেতু তিনি বিদেশী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে নিরপেক্ষ নয় এমন সন্দেহ করবার কারণ নেই এবং তাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া অযুক্তিসঙ্গত হবে না। বিবরণটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

"বর্তমান সপ্তাহে বৈচিত্র্যহীন অপরিচ্ছন্ন ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটল তাকে বিদেশীদের ভাষায় বলা হয়েছে 'নীরব থাকবার ষড়যন্ত্র'। লজ্জায় এবং ভারতের দিক হতে প্রতিহিংসার আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার একটি বীভৎস পাইকারী হত্যাকাণ্ডকে ঢেকে গোপন করবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করেছেন। ধর্মপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ডের বন্যা সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করতে স্থানীয় প্রেসকে নিষেধ করা হয়েছিল। বাহিরের সাংবাদিকরা দেখল তাদের পাঠান বিবরণ বাহিরে যাচ্ছে না। এমন কি আমেরিকার কূটনৈতিক মহলের মানুষ ভান করল যে ১৯৫০-এর পর যে বীভৎসতম ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেল তার সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না। ব্যাপক হত্যার বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে মার্কিন কূটনৈতিক দূতেরা সাংবাদিকদের তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে বক্তৃতা শুরু করে।

"কিন্তু কূটনৈতিক সূত্র হতে দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট পাকিস্তানী নাগরিকের কাছ হতে ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া বিবৃতি হতে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হতে এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পশ্চিমের সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী মহল হতে তার বীভৎস চিত্রটি প্রকাশ হয়ে পড়ল। পূর্ব পাকিস্তানে কম করে এক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের নিজেদের বিবরণ হতে গুজব ভিত্তিক খবর ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি। পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীরা বলেন, এই সংখ্যা কল্পনাপ্রসূত ; কিন্তু ঠিক বললে বলতে হয় তা কম করে ধরা হয়েছে।

"কম করে দশ হাজার হিন্দু গৃহহীন হয়েছে। ঢাকার চারপাশে গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত, ভস্মীভূত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে। যে মাটির ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের বেশির ভাগের দেয়ালে উর্দুতে তাড়াতাড়ি লেখা কাঁচা অক্ষরে বলা হয়েছে, 'এটি মুসলমানের বাড়ি।'......যখন শত শত আহত মানুষ নিয়ে খোলা ট্রাকগুলো ঢাকার জনবলে দুর্বল হাসপাতালগুলিতে ঢুকতে লাগল, বিদেশী ডাক্তাররা স্বেচ্ছায় তাদের সেবা করতে চাইলে পাকিস্তানী অফিসাররা তা গ্রহণ করলেন না।...শান্তিবাহিনীর নার্সদেরও সরিয়ে নেওয়া হল।...কোন বিদেশীকে

এই ব্যাপক হত্যার চারপাশে যে লৌহ যবনিকা তোলা হয়েছিল তার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।"*

সুতরাং যে মানুষ দাঙ্গার ভয়ে পূর্ব পাকিস্তান হতে চলে এসেছে তাদের ভারতের ভূমিতে স্থায়িভাবে আশ্রয় দেওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা যা তাদের ভবিষ্যতে এমন অত্যাচার হতে মুক্ত রাখতে পারে। যারা এসেছিল তাদের ফিরিয়ে দিলে তাদের আবার বিপদের মুখে ফেলে দেওয়ার সামিল হয়। তাই সংখ্যালঘু সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক প্রতিষেধক ব্যবস্থা হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে যে রাষ্ট্রে সে সংখ্যাগুরু সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া। তা না সম্ভব হলে অন্তত যারা এসেছে তাদের মনোনীত দেশে তাদের থাকতে দেওয়া। এই দিক হতে দেখতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত চুক্তি মানবিকতা নীতিদ্বারা সমর্থিত নয় এবং অতিরিক্তভাবে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে নি বরং তা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের আগমনের স্রোত যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন আশ্রয় শিবিরে যারা ভর্তি হতে আসত তাদের মাসিক হার ছিল গড়ে পাঁচ হাজার। কিন্তু ওই বছর জুন হতে হঠাৎ তাদের আগমনের হার বেড়ে গেল। জুন মাস হতে যারা আশ্রয় শিবিরে ভর্তি হতে লাগল তাদের সংখ্যা মাসিক দশ হাজার উঠে গিয়েছিল। এবারকার আগমনের হার বৃদ্ধির কারণ ছিল কিন্তু স্বতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে খরার জন্য খাদ্যাভাবে মানুষ চলে আসতে লাগল। খুলনা হতে একটি বড় স্রোত প্রবাহিত হল বসিরহাটের সীমান্ত অঞ্চল পার হয়ে। তারা ইটিণ্ডাঘাটে ইচ্ছামতী নদী পার হয়ে ভারতে আসত। তাদের সুবিধার জন্য তাই ইটিণ্ডাঘাটে একটি বিশেষ কেন্দ্র খুলতে হয়েছিল। ফলে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সমগ্র বৎসর ধরে যত উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে ভর্তি হয়েছিল তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭৯,৮০১ জন।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অকটোবর হতে উভয় রাষ্ট্রে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হয়। তার ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ইচ্ছামত যাতায়াত সম্ভব হবে না এই আশঙ্কায় অনেক মানুষ পাকিস্তান হতে চলে আসে। ফলে ঠিক ওই তারিখের আগে কয়েকদিন ধরে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সে কয়দিন অবস্থা এমন হয়েছিল যার সঙ্গে ১৯৫৭-এর ঘোরতম দুর্দিনগুলির তুলনা চলে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে এই উপলক্ষে মোট ১,২৭,০০০ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে এবং তাদের মধ্যে ৩৬,০০০ মানুষ আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেয়। সম্ভবত যারা আসবে ঠিক করেছিল কিন্তু নানা কারণে আসা বিলম্বিত হয়েছিল, তারা এই নূতন পরিস্থিতির চাপে একসঙ্গে এসে পড়েছিল।

From the correspondent of Times Incorporated of Montreal, Canada of East Pakistan.

একসঙ্গে এতগুলি মানুষ এসে পড়ার ফলেই সম্ভবত তার পর হতে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। ১৯৫২-এর ডিসেম্বর হতে ১৯৫৪-এর জুন অবধি উদ্বাস্তুদের আগমনের হার অভাবনীয়রূপে কমে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গড়ে মাসিক ভর্তির সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও নিচে অর্থাৎ দৈনিক হার মাত্র ৩০ জন বা ছয়টি পরিবার। এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে তখন পাকিস্তানে মোটামুটি অবস্থা শান্ত ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুন হতে কিন্তু উদ্বাস্তুদের আগমনের হার আবার বেড়ে গেল। তার স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল। এই সময় পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে ইউনাইটেড ফ্রন্টদল মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই দুই ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা অসঙ্গত হবে না।

এই পরিবর্ধিত হারে আগমন আমার পুনর্বাসন বিভাগ ত্যাগ করে যাওয়া পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি দৈনিক ১০০ পরিবার সরকারের আশ্রয় শিবিরপ্রার্থী হত। অর্থাৎ আশ্রয় শিবিরে মাসিক ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫,০০০ মানুষ। তাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু তখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছেন যে সরকারের তত্ত্বাবধানে আর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না।

এখন এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব মূলত ভারত সরকারের। যদিও এতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে পুনর্বাসনের ভার নিয়েছিলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে ভারত সরকারের তাদের জন্য পুনর্বাসনের নূতন ব্যবস্থা করতে হয়। এই সূত্রেই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার উৎপত্তি। মাদ্রাজ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্যসচিব শ্রীরামমূর্তি তখন ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনার, পরিকল্পনা রূপায়ণের পরামর্শদাতা (Advisor, Programme Administration)। আকাশ পথে মাদ্রাজ হতে দিল্লী যেতে মাঝপথে দণ্ডকারণ্যের বিরাট বনাঞ্চল তাঁর বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন এই জমির সংস্কার করে বসতি স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। এখন পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন সমস্যা তাকে ত্বরান্বিত করল। যা ছিল একটি প্রস্তাব তাকে কার্যকর করবার জন্য রীতিমত তাড়া পড়ে গেল। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার অংশ জুড়ে এই দণ্ডকারণ্য অবস্থিত। তার মধ্যে পর্বতমালা আছে এবং নিম্নভূমিও আছে। এখানে প্রথমে ৮০,০০০ বর্গমাইল জমি নিয়ে একটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হয়। পরে তা যখন বাস্তব রূপ নেয় তাকে আরও ছোট করা হয়। মোটা-

মুটি উড়িষ্যার কোরাপুট জেলা এবং অন্ধ্র প্রদেশের বাস্তার' জেলার মোট ২৫,০০০ বর্গমাইল জমি নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এই সমগ্র জায়গাটিকে চারটি অংশে ভাগ করে ভূমি উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়।

যেহেতু দণ্ডকারণ্য নাম, এমন ধারণা করলে ভুল হবে যে সমস্ত জায়গাটাই বনে ভরা এবং মানুষের বসতি সেখানে একেবারে নেই। ঠিক তা নয়। জায়গাটি অনুর্বর বলে বসতি ঘন নয়। নিম্নভূমিতে আদিবাসীদের গ্রাম আছে। কাজেই মধ্য আন্দামানে অরণ্য কেটে উদ্বাস্তুদের যে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল তার সঙ্গে এর তুলনা হবে না। আন্দামানে অনধ্যুষিত অঞ্চলের জঙ্গল কেটে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে নূতন বাঙলা দেশ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে তা সম্ভব হবে না। আদিবাসীরাই সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থেকে যাবে। উদ্বাস্তু বাঙালী পরিবারগুলি মাঝে মাঝে দ্বীপের মত সেখানে গ্রাম স্থাপন করে বাস করতে পারবে।

তারপর দ্বিতীয় কথা, এই অঞ্চল উর্বর নয়, বার্ষিক বারিপাতও বেশী নয়, সারা বছরে ৩৫ ইঞ্চির মত। সুতরাং এ ধরনের জমিতে পূর্ব বাঙলায় বাস করতে অভ্যস্ত উদ্বাস্তু কৃষিজীবীদের স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করা অসম্ভব না হলেও কষ্টকর। জায়গা অনুর্বর হওয়ায় বছরে একটার বেশী ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। বর্ষায় যে বারিপাত হয় তা আমন ধান উৎপাদনের পক্ষেও অনুপযুক্ত কারণ তা পরিমাণে কম এবং বর্ষাকাল সেখানে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। জোয়ার ভুট্টা বজরার মত স্বল্প মেয়াদী ফসলেরই তা উপযুক্ত। কাজেই তাদের জীবন ধারণের রীতি পরিবর্তিত করে তবে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করা সম্ভব।

সুতরাং এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাতে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। এখানে সাফল্যলাভ নির্ভর করে ভাগ্যের আশাতিরিক্ত আনুকূল্যের ওপর। তবু ভারত সরকারের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ তখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এই কাজের দুরূহতা বিবেচনা করেই ভারত সরকার যোগ্যতম প্রশাসকদের এই পরিকল্পনা তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীসুকুমার সেন অন্যতম।

কাজেই এটা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে যেতে উৎসাহ দেখায় নি। তাদের নানাভাবে চাপ দিয়ে যেতে বাধ্য করতে হয়েছিল। এমনকি অনেক পরিবার সরকারের আর্থিক সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও দণ্ডকারণ্যে যায় নি। ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরের অনেক পরিবার দণ্ডকারণ্যে যেতে অস্বীকার করলে তাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পুনর্বাসনের নানা সাহায্য হতে বঞ্চিত করা হয়। তবু তারা এখনও সেখানেই রয়ে গেছে।

এ অবস্থায় যারা দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিল তাদের অনেকে যে উপনিবেশ ত্যাগ করে চলে এসেছে তা দেখেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শোনা যায় এপর্যন্ত এখানে ২০০-এর ওপর গ্রামে ১০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েক হাজার পরিবার ফিরে এসেছে। শোনা যায় ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ হতে কয়েক লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসে। তাদের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হয়েছিল কিন্তু তাদের অর্ধেক ইতিমধ্যে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে আরও যে ফিরবে না তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই দণ্ডকারণ্যে এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পুনর্বাসনের চেষ্টা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে এখনও তা বলা যায় না। এটা নিশ্চিত যে আন্দামানের পুনর্বাসনের মত তা সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতি দণ্ডকারণ্যের হবে না, হবে পশ্চিম বাঙলার; কারণ যারা ফিরে আসছে তারা পশ্চিম বাঙলায় এসেই আশ্রয় নিচ্ছে। সরকারের গৃহীত রীতি অনুসারে পুনর্বাসনের কোন সাহায্য তারা পাবে না। সুতরাং সম্পূর্ণ নিজের শক্তির ওপর তাদের দাঁড়াতে চেষ্টা করতে হবে। তারা প্রাণপণ পশ্চিম বাঙলায় জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করে নিজেদের পুনর্বাসনের স্থান সংগ্রহ করে নিতে চেষ্টা করবে। নিজেদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে কতখানি পারবে তা বলা যায় না। সুতরাং নিচের তলার মানুষ হয়েই তারা থাকবে। যারা উপযুক্ত পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে শক্তিমান নাগরিক হয়ে দেশের সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে পারত, তারা সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে।

অপর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান হতে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমন ভবিষ্যতে যে বন্ধ থাকবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোন উপলক্ষকে অবলম্বন করে আবার উদ্বাস্তু স্রোত বইতে পারে। বেশি দিনের কথা নয় ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের হাঙ্গামার পরও তাই দেখা যায় বড় রকমের উদ্বাস্তু স্রোত পূর্ববঙ্গ হতে প্রবাহিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় চেয়েছিল তাদের সোজা দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল। বাকি মানুষের বেশির ভাগ সংখ্যাই যে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তা ধরে নেওয়া যায়। তারাও বর্তমান রীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য কোন সাহায্য পাবে না। সুতরাং তারাও নিজেদের চেষ্টায় যতখানি পারবে দাঁড়াবে, তবু একথা সত্য যে তাদেরও একটি বিরাট অংশ অর্থনীতির দিক থেকে পঙ্গুর মত জীবন যাপন করবে।

এই সব দেখে মনে হয় নিজেদের নৈতিক কর্তব্য এড়াতে চেষ্টা করলেই এড়ান যায় না। তা বাঁকা পথে আরও জটিল আকার ধারণ করে নিজেদের স্কন্ধেই নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'যারে তুমি দূরে ফেলো সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে', তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। পশ্চিম বাঙলার দুর্বল অর্থনীতিকে এই অবাঞ্ছিতের দল আরও পঙ্গু করবে।

অপর পক্ষে নিজের নৈতিক কর্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে পশ্চিম বঙ্গে এদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে অবস্থা ভিন্ন রকম হতে পারত। এই সহস্র পরিবারগুলি প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে স্বাবলম্বী হতে পারত। দায় না হয়ে তারা দেশের সম্পদ হতে পারত। দণ্ডকারণ্যে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাঙলায় খরচ হলে তার অর্থনীতিকে বলবান করে তুলত।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পুরাতন রীতিতে পশ্চিম বাঙলায় আর পুনর্বাসন চলত না। চাষের উদ্বৃত্ত জমি পশ্চিম বাঙলায় বসতিপুর্ণ অঞ্চলে সত্যই ছিল না। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর যে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের খাসে এসেছিল তা স্থানীয় বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের পক্ষেই পর্যাপ্ত ছিল না। নূতন শিল্প স্থাপন করে তাকে ভিত্তি করে হয়ত কিছু পরিবারের পুনর্বাসন হত। কিন্তু এখনও যারা আসছে তাদের মধ্যে কৃষিজীবীই সংখ্যায় বেশি। সুতরাং ব্যাপক হারে কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যের অনুরূপ পরিকল্পনা বাঙলা দেশেই রচনা করতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তার জায়গা কোথায়। জায়গা পশ্চিম বাঙলাতেই আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ জুড়ে যে সুন্দরবন আছে, তার পরিমাণ ১৫০০ বর্গ মাইল। একশত বর্গ মাইলে ৬০,০০০ একরের ওপর জমি পাওয়া যায়। তাতে অনায়াসে ২০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে বসান যায়। তারপর এই প্রাথমিক উৎপাদকদের ভিত্তি করে শিক্ষক, দোকানদার, ছুতোর, কুমার কামার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষও আরও শতকরা দশভাগ বসান যায়। সুতরাং এইভাবে পুনর্বাসন দেবার সঙ্গতি যে পশ্চিম বাঙলার নেই তা নয়। কথা উঠতে পারে সুন্দরবনে জঙ্গল পরিষ্কার করে কি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব? তা সম্ভব কি না তার উত্তর হেড়োভাঙার উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নিকট হতে পাওয়া যাবে। এখানে দণ্ডকারণ্য হতে অনেক সহজ পথে পুনর্বাসন সম্ভব। আর এ কথা নিশ্চিত যে এখানে যারা পুনর্বাসন পাবে তারা উপনিবেশ ত্যাগ করে চলে আসতে চাইবে না।

পরিশিষ্ট

(ক)

৩১।১২।৫৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা :

(১)	১৯৫০এর ডিসেম্বরের আদমসুমারি অনুসারে	২৩,০৪,৫১৪
(২)	১৯৫১ জানুয়ারি হতে ১৯৫২ এপ্রিল পর্যন্ত আশ্রয় শিবিরে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	৮৫,৪৫৭
(৩)	১৯৫২ মে হতে অকটোবর পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	১,৯৩,৬৬৮
(৪)	১৯৫২ নভেম্বর হতে ১৯৫৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	১৩,০৪৪
(৫)	১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	৬৫,৯১৮
	মোট—	২৬,৬২,৬০১

(খ)

আশ্রয় শিবিরে স্থাপিত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা :

বৎসর	সংখ্যা
১৯৪৮ (জুলাই-ডিসেম্বর)	৬৪,৭৪৪
১৯৪৯	৪১,৩০৩
১৯৫০	২,৫৪,৫৬৪
১৯৫১	৭৯,৮০৫
১৯৫২	৫৫,৮১৬
১৯৫৩	১০,৪৭৪
১৯৫৪	৫০,৮৩৮
মোট—	৫,৫৭,৫৪৪

(গ)

আশ্রয় শিবির হতে পুনর্বাসন স্থানে প্রেরিত উদ্বাস্তুর সংখ্যা :

বৎসর		সংখ্যা
১৯৪৯	...	৯০,০৭৫
১৯৫০	...	৮৫,৯০৭
১৯৫১	...	১,৮১,৯৫০
১৯৫২	...	২০,১২৫
১৯৫৩	...	১৮,০১৬
১৯৫৪	...	১২,৪৭৭
মোট—		৪,০৮,৫৫০

(ঘ)

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর সংখ্যা :

চব্বিশ পরগণা

মালঙ্গা	...	৭০১
কালিকাপুর	...	২৪৭
নন্দননগর	...	১,৫৯৩
বাগজোলা	...	৫,০৪৬
সন্তোষপুর	...	৫৩৩
সোনারপুর	...	৬,৬৪৭
তালদি	...	৬৪৬
বাহিরসোনা	...	১,৮০৯
আশ্রফাবাদ	...	৭৯৩
বালটিয়া	...	২,১২১
রাণিগাছি	...	১,১৪৩
কুন্তি	...	২০৪
		২১,৪৮৩

মেদিনীপুর

দক্ষিণসোল	...	২৪১
তালবাগিচা	...	৮৩৫
ঝাড়গ্রাম	...	২৯৯
চণ্ডীপুর ষোলঘরিয়া	...	৪১০
		১,৭৮৫

বীরভূম

দীঘা	...	১,১৬৯
কাঙ্গারপুর	...	১,৩৯৩
রাজনগর	...	৭৬১
মেহেরপুর	...	১,০১০
		৪,৩৩৩

বর্ধমান

সালানপুর	...	২,৪১৬
সাংকো	...	১,২১৯
উরা	...	১,২৬০
স্থরুল	...	১,৫৫৬
পাল্লা	...	৮,৪৩৬
চাচই মহেশপুর	...	১,৪৫৯
মহেশডাঙ্গা	...	৫,৯৪০
চাচই	...	১,২৬৩
		২৩,৫৪৯

হাওড়া

কালজুড়ি	...	১,২৫২

হুগলি

বৈকুণ্ঠপুর	...	৯৯০
বলাগড়	...	৬৪৬
জিরাট	...	৯১৬
		২,৫৫২

মোট— ৫৪,৯৫৪